ভ্সেভলোদ নেস্তাইকো

দুই ইয়ারের যত কাণ্ড

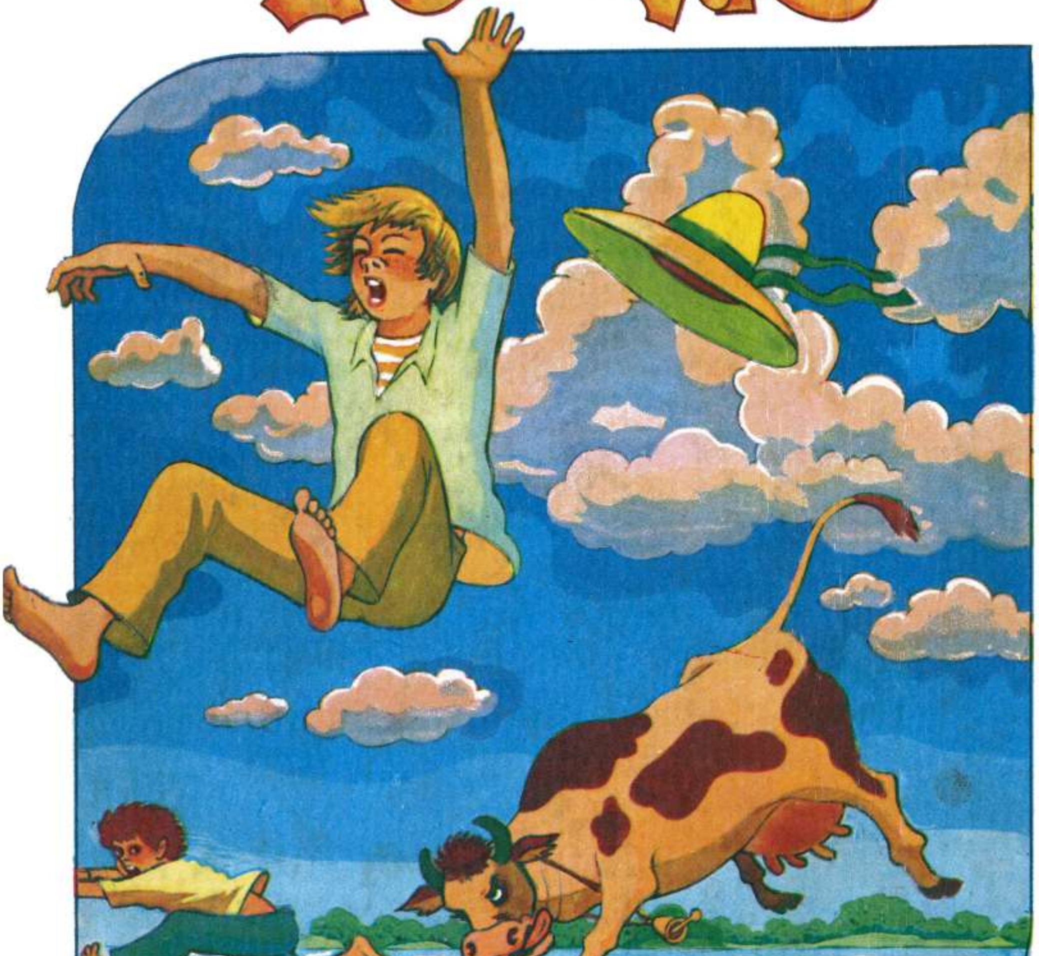

'রাদুগা' প্রকাশন . মস্কো

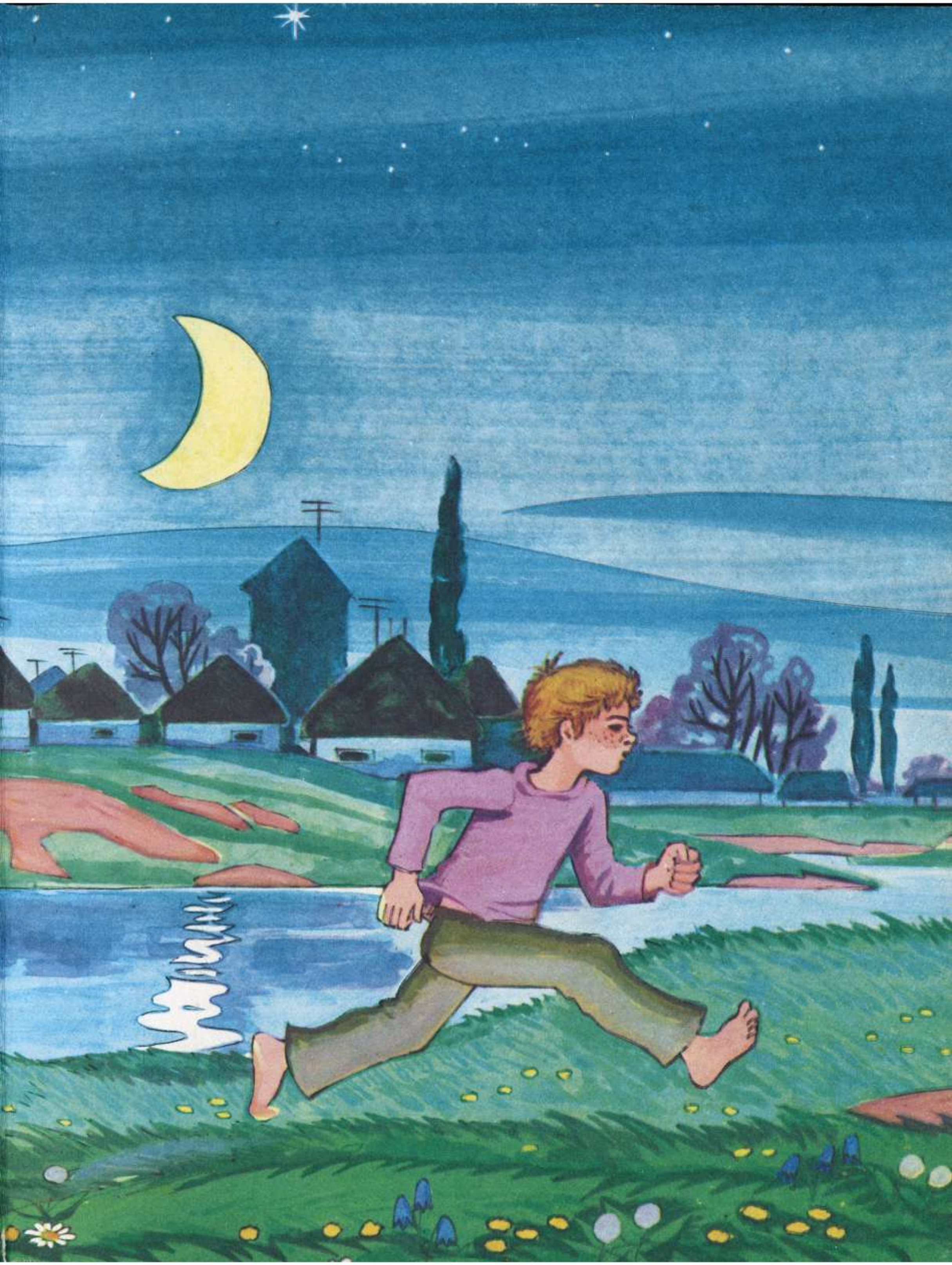

ভ্‌সেভলোদ নেস্তাইকো

দুই ইয়ারের যত কাণ্ড

দুটি উপাখ্যান

ছবি এঁকেছেন ভ. স্থরিকভ

'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: অরুণ সোম

Всеволод Нестайко

ТОРЕАДОРЫ ИЗ ВАСЮКОВКИ

На языке бенгали

Vsevolod Nestaiko

TWO TOREADORS FROM

VASUKOVKA VILLAGE

In Bengali

© বাংলা অনুবাদ ·সচিত্র · 'রাদুগা' প্রকাশন · মস্কো · ১৯৮৭

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

ISBN 5-05-001229-5

সূচী

আজব এড্‌ভেঞ্চার

প্রথম পরিচ্ছেদ। **শুয়োরের খোঁয়াড়ের নীচে পাতাল রেল** . . . ৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। **চীনের মহাপ্রাচীরের আড়ালে। কারা এই কার্নিশ?** . . . ২০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ। **ভুট্টাক্ষেতের ঘটনা** . . . ৩০
চতুর্থ পরিচ্ছেদ। **পরীক্ষা** . . . ৪৭
পঞ্চম পরিচ্ছেদ। **জাভা হল রবিন্‌সন** . . . ৫৬
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। **দ্বীপের সন্ধানে** . . . ৬২
সপ্তম পরিচ্ছেদ। **নির্জন দ্বীপে রবিন্‌সনের অবতরণ** . . . ৭৬
অষ্টম পরিচ্ছেদ। **'ফের পরীক্ষা' দ্বীপে প্রথম দিন। রবিন্‌সনের জবানীতে বন্ধু ও সহপাঠী পাভেলকে কথিত বিবরণ** . . . ৮২
নবম পরিচ্ছেদ। **ঐ দিন ঐ রাতের ঘটনা পাভেলের জবানীতে** . . . ৯০
দশম পরিচ্ছেদ। **খাঁটি জলদস্যু** . . . ১০১
একাদশ পরিচ্ছেদ। **আকস্মিক আগন্তুকের দল: ইগর, ভালকা এবং অন্যান্যরা** . . . ১০৯
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। **স্বপনে ও জাগরণে** . . . ১৩৫
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ। **'হাত তোল!'** . . . ১৪৩
শেষ পরিচ্ছেদ। **উপসংহার** . . . ১৫৯

ঘড়ি নিয়ে ঘোরাঘুরি

প্রথম পরিচ্ছেদ। **'এঃ!' বললাম আমি আর জাভা** ১৬৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। **পাতাল রেলের ঘটনা। 'মহাকাশচারী'। কিয়েভ মিলিশিয়ার সঙ্গে বিরোধ** . ১৮০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ। **সাক্ষাতের জন্য জাভার ব্যস্ততা। কানমলা** ১৯২

চতুর্থ পরিচ্ছেদ। **স্নানের ঘাট। নাগরদোলা। জলডুবি। তেরো নম্বর ফ্ল্যাটের অচেনা লোকটি** ২০০

পঞ্চম পরিচ্ছেদ। **তেরো নম্বর ফ্ল্যাটের অচেনা জারের সন্ধানে। থিয়েটারে সাক্ষাৎকার। জাভা রেন্‌-এর গরিমা ও পতন** ২২২

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। **গুমটি। কানের বদলে কান!** . ২৩৮

সপ্তম পরিচ্ছেদ। **মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ** . . . ২৪৯

অষ্টম পরিচ্ছেদ। **'জারমশাই, আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল!' 'হুঁ-হুঁ, এইবার!'** ২৫৭

নবম পরিচ্ছেদ। **ফিল্‌ম স্টুডিওতে। প্রথম চমক। দ্বিতীয় চমক** ২৭০

দশম পরিচ্ছেদ। **কোথায় ঘড়ি? শত্রুর ডেরায় পদার্পণ** . ২৭৯

একাদশ পরিচ্ছেদ। **কিয়েভ 'ডিনামো' বনাম মস্কো 'টর্পেডো'** ২৮৮

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। **কসাকের বংশ — নেই তার ধ্বংস। কসাক-নেতা কারাফোলকা। নীপার-কসাকদের পত্র। কবরখানায় রাত (স্মৃতিচারণ)** . . . ২৯৭

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ। **নৈশ অভিযান। গুহায় গুলিবর্ষণ** ৩১৩

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ। **'অ্যাটেনশন প্লীজ!.. স্টার্ট!.. মেশিন চালু করুন!' ঘড়ির মালিকের সন্ধান। জাভা স্তানিস্লাভ্‌স্কি ও পাভেল নেমিরভিচ্‌-দানচেঙ্কোর জন্ম** ৩৩৮

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ। **জাভা স্তানিস্লাভ্‌স্কি ও পাভেল নেমিরভিচ্‌-দানচেঙ্কোর অপমৃত্যু। তবুও আমরা জীবিত!** ৩৭২

টীকা-টিপ্পনী ৩৮২

আজব এডভেঞ্চার

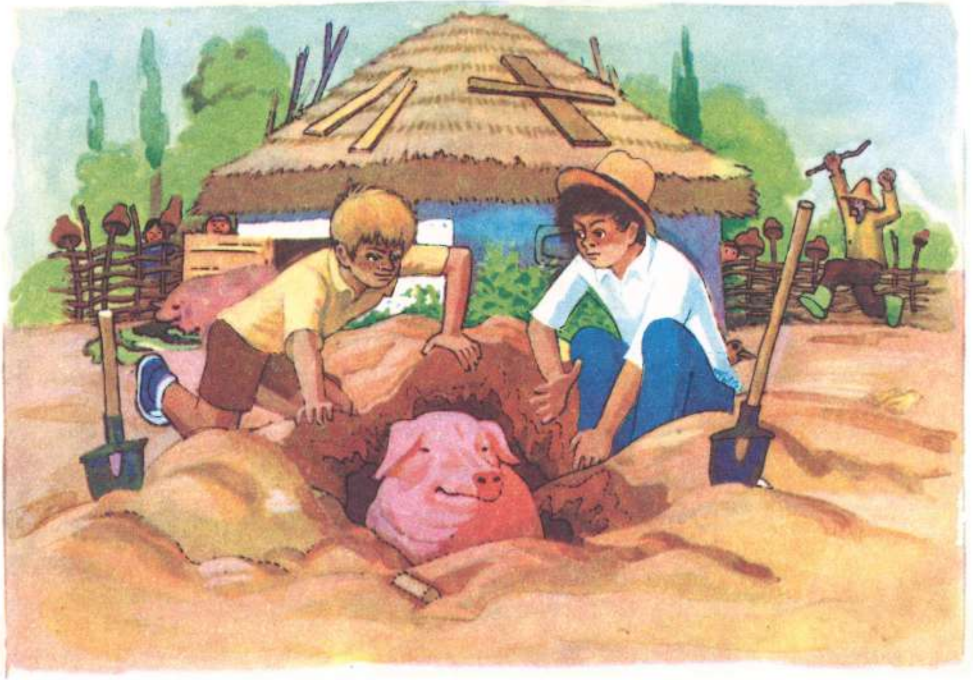

প্রথম পরিচ্ছেদ

শুয়োরের খোঁয়াড়ের নীচে পাতাল রেল

'এই হতভাগা, কান্ডজ্ঞানহীন আহাম্মক! ভানিয়া! বেরিয়ে আয় বলছি, এক্ষুনি! নইলে এমন পিটুনি দেব যে সারা হপ্তা ধরে মনে থাকবে। বেরিয়ে আয়, বলি কানে গেল? — বেরিয়ে আয়!'

আমরা মাড়াইয়ের জায়গার পেছনে ঘন লম্বা লম্বা আগাছার মধ্যে মাটিতে নাক গুঁজে পড়ে থাকি নিশ্বাস বন্ধ করে।

'বেরিয়ে আয় বলছি হারামজাদা, ভালো হবে না বলছি! আমাকে ত জানিসই!'

'জানি, জানি' — আমার বন্ধুর নিশ্বাসপ্রশ্বাস তখনও শোনা যায় কি যায় না, তবে শেষ পর্যন্ত সে সাহসে ভর করে গলার আওয়াজ বার করল। 'দাদু!' করুণস্বরে সে সাড়া দিল।

'চলে আয়, চলে আয়!'

'দাদু!' আরও করুণস্বরে আমার বন্ধুটি আবার বলল। 'আপনি ঘরে চলে যান, আমরা বেরোচ্ছি।'

'তবে রে পাজিরা, ওঁরা আবার শর্ত রাখছেন আমার সামনে! বেরিয়ে এলি!'

'কিন্তু আমরা ত ইচ্ছে করে করি নি। আমরা যে পাতাল রেল বানাতে গিয়েছিলাম, এই যেমন আছে কিয়েভে।'

'তোদের পাতাল রেলের মজা আমি দেখাচ্ছি। এমন পাতাল রেল দেখাব যে...'

'আমরা ত আর জানতাম না। আমরা এক্ষুনি সব বুজিয়ে দিচ্ছি — কিচ্ছু চোখে পড়বে না। শুয়োরের খোঁয়াড়ও সাফ করে দেব। আপনি সরে যান দাদু।'

কথাবার্তা আরও অনেকক্ষণ ধরে চলল। অবশেষে দাদু শেষ বারের মতো গালাগাল বর্ষণ করলেন, গলা খাঁকারি দিলেন এবং খোঁড়া পা ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে ধীরে ধীরে কুটিরের দিকে চললেন।

আমরা লম্বা আগাছার ঝাড় থেকে বেরিয়ে এলাম।

শুয়োরের খোঁয়াড়ের কাছাকাছি আসতে আমাদের সামনা-সামনি নাকি সুরে ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করতে করতে এগিয়ে এলো দু' মনী ওজনের শুয়োর মানিউনিয়া, ভূগোলের ম্যাপের মতো ছোপধরা তার সারাটা শরীরে।

'উঃ, জানোয়ার আর কাকে বলে!'

ওর জন্যই ত আমরা এমন ফেসাদে পড়লাম।

আমাদের আইডিয়াটা ছিল মহৎ — শুয়োরের খোঁয়াড়ের নীচে পাতাল রেল খোঁড়া। সকলের পক্ষেই এটা হত একটা তাক-লাগানো ঘটনা। ভাসিউকোভ্‌কায় প্রথম পাতাল রেলের লাইন! 'মাড়াই' স্টেশন, 'বাঁকা নাশপাতি গাছ' স্টেশন। এপার-ওপার তিন কোপেক। আত্মীয়স্বজন — বিনি পয়সায়। অঙ্কের দিদিমণির কাছ থেকে — পাঁচ কোপেক।

আমরা শুয়োরের খোঁয়াড়ের নীচে প্রায় অর্ধেকটা সুড়ঙ্গ খুঁড়ে ফেলেছিলাম, এমন সময় ঘটে গেল এক অভাবিত দুর্ঘটনা — হতভাগা শুয়োর মানিউনিয়া

মাটিতে ধসিয়ে পড়ে গেল আমাদের সুড়ঙ্গের ভেতরে। পড়ে ত গেল দিব্যি, কিন্তু বেরিয়ে আসার বেলায় — ঢুঢু! আর এমনই কাইমাই আওয়াজ তুলল যে দাদু খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে হাজির হলেন। অতঃপর...

দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমরা পাতাল রেলের সুড়ঙ্গ বুজিয়ে ফেলতে থাকি। থেকে থেকে ভয়ে ভয়ে এদিক-ওদিক তাকাই — বলা যায় না অতর্কিতে কখন দাদু এসে হাজির হয়ে আমাদের কান মলে দেন। যদিও উনি কথা দিয়েছেন যে আমাদের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত উনি আমাদের ছোঁবেন না, তবে কে তাঁর মতিগতির কথা বলতে পারে... সাবধানের মার নেই। মানিউনিয়াকে গর্তের ভেতর থেকে উঠিয়ে আনার সময় তিনি যেরকম গালাগালটা করেছিলেন তা যদি তোমরা শুনতে! ওঃ, সে কি গালাগাল! কোথায় যে তিনি এ সমস্ত কথা শিখলেন কে জানে? — কোন অভিধানে খুঁজে পাবে না!

তবে রক্ষা এই যে দাদুকে দেখা যাচ্ছে না। যতক্ষণ আমাদের কাজ চলছে (কাজটা অনেকক্ষণের, বিরক্তিকর, যাচ্ছেতাই), ততক্ষণে আমার বন্ধুর সঙ্গে তোমাদের আলাপ করিয়ে দিই।

তোমরা অবশ্যই জান যে জাভা নামে একটা দ্বীপ আছে। ভারত মহাসাগরে। সেই যে, সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও, কালামান্টান, বৃহৎ সুন্দা দ্বীপপুঞ্জে...

তবে এ জাভা কোন দ্বীপ নয়।

জাভা হল আমার প্রাণের বন্ধু, আমার জুড়িদার। জাভা রেন্।

তোমরা হয়ত ভাবছ, জাভা? — এ আবার কী বিদ্ঘুটে নাম রে বাবা! এখানে তাহলে বলা দরকার যে ও নিজেই নিজের এরকম নাম রাখে, যখন ওর বয়স ছিল এক বছরেরও কম। হয়ত ওর নিজের মুখেই ওর ভালো নাম ইভান বা ডাকনাম ভানিয়ার অমন রূপ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সে যাই হোক না কেন নামটা ছিনে জোঁকের মতো তার সঙ্গে এঁটে রয়ে গেল। এমন কি আমাদের গাঁয়ের মিলিশিয়াম্যান কমরেড ভালিগুরাও তাকে ঐ নামেই ডাকে।

মোটের ওপর ওদের বাড়ির সকলেই মনে ধরার মতো।

ওর বাবা বেহালা বাজান। ওদের গোরুটার নাম 'অবদান'। আর দাদু ভারাভা (ওঁর পরিচয় তোমরা ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছ) ডাকসাইটে শিকারী। শিকারের সময় গুলি ছুঁড়তে গিয়ে বাঁ চোখটা রুমাল দিয়ে বাঁধেন। তার কারণ

হল এই যে দাদুর বাঁ চোখটা ডান চোখ ছাড়া কোঁচকানো যায় না। বাঁ চোখ কোঁচকাতে গেলে ডান চোখটা আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যায়।

তবে হ্যাঁ, তাক বটে ভারাভা দাদুর! ওঃ কী হাতের টিপ্!

কিয়েভ থেকে যে সব শহুরে শিকারী ভোল্গা গাড়ি চেপে শিকার করতে আসে তারা ত বিলকুল হাঁ হয়ে যায়।

'দাদু, আপনি হলেন দস্তুরমতো চ্যাম্পিয়ন' — তারা বলে।

আমাদের গাঁয়ের পাশে যে ঝিলটা আছে, রেন্ পরিবারের দাদুর সম্মানে লোকে ত সেটার নামই দিয়েছে রেন্ ঝিল।

জাভার মা অঞ্চল সোভিয়েতের প্রতিনিধি, ভুট্টা উৎপাদনকারী কর্মিদলের প্রধান।

একবার ছোট বোন ইরার সঙ্গে ঝগড়া হতে জাভা তাকে সকলের সামনে ঘুষি মেরে বসে, তাতে সে কান্নার বদলে হঠাৎ চিৎকার করে বলে:

'নাম ডোবালি! গাঁয়ে আমাদেল মায়েল নাম ডোবালি!' ইরা 'র' উচ্চারণ করতে পারত না, তার বদলে বলত 'ল'।

মেয়েটা এমনই সোরগোল তুলল যে জাভা একেবারে ভেবাচেকা খেয়ে গেল। লজ্জায় লাল হয়ে বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর এক ছুটে পালিয়ে গিয়ে কোন রকমে মানসম্মান বাঁচাল।

তবে এরকম ঘটনা একবারই ঘটেছিল। মোটের ওপর বলতে গেলে জাভার স্বভাব-চরিত্রের তুলনা মেলা ভার। স্বভাব-চরিত্র আর বলব কী, যেন ইস্পাত। লাখে এরকম একটা মেলে।

জাভা নিজেই বলে:

'ওরে পাভেল, আমরা দুজনায় দিব্যি মিলেছি! বাজে কথা নয়, আমাদের মাথায় সত্যি সত্যিই কল্পনা খেলে। ঠিক কিনা বল্?'

'ঠিকই বলেছিস...' আমি সায় দিয়ে বললাম।

'শুনলি ত কাল গাঁয়ের দোকানের সামনে সালিভোন দাদুর কথাগুলো? — 'ঐ যে চলল জাভা আর পাভেল। ওঃ ছোঁড়া বটে দুটো! বাজপাখি! বাজপাখি, ডাকুও বলতে পার। ওদের পিঠে ভাঙার যুগ্যি কোন ডাল খুঁজে পাবে না হে''

'শুনেছি। ঠিক কথা।'

'আমি চাই, সকলেই যেন আমাদের নিয়ে এমন কথা বলে। আমাদের নামডাক যেন পয়লা মে'র রেডিওর খবরের মতো সারা ভাসিউকোভ্কায় ছড়িয়ে পড়ে।'

'হ্যাঁ, তা ত বটেই...' আমিও স্বীকার করলাম।

আমাদের গৌরব বৃদ্ধির খাতিরে জাভাও সব সময় উঠে পড়ে লেগে থাকত কোন না কোন মজার ফন্দিফিকির বার করার কাজে।

আমরা দুই শ্রীমানই বন থেকে একটা পেঁচা ধরে ক্লাবে যখন 'পরিবারে শিশুপালন' বিষয়ের ওপর বক্তৃতা চলছিল তখন সেটাকে ওখানে ছেড়ে দিই। বক্তৃতামঞ্চ থেকে বক্তা পড়ে গেলেন, জলের জগটা এসে উলটে পড়ল তাঁর মাথার ওপর।

একবার গরমকালে জাভা বলল:

'আয় ষাঁড়ের লড়াই লাগিয়ে দেওয়া যাক।'

'কী?' আমি চট করে ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না।

'তোর মনে আছে ক্লাবে আমরা 'টরিঅ্যাডর' নামে একটা বিদেশী ফিল্ম দেখেছিলাম?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব মনে আছে। কিন্তু তাতে কী হল?'

'মনে আছে, এরেনাতে একটা ক্ষ্যাপা ষাঁড়, আর একজন টুপিপরা লোক ছোরা হাতে নিয়ে ষাঁড়টার নাকের সামনে নাচানাচি করছে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ...'

'আর তারপর লোকটা ধাঁ করে এগিয়ে এসে ঝপাং করে বসিয়ে দিল ষাঁড়টার গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে হাততালি।'

'হুঁ হুঁ। চমৎকার! কিন্তু তাহলে ত মেরে ফেলতে হবে। গোরুটোরু জাতীয় গৃহপালিত পশু মেরে ফেলতে কে আমাদের দেবে বল্?'

'আকাট আর কাকে বলে! 'মেরে ফেলতে হবে'! এ কি মাংসের কারবার পেয়েছিস না কি? এটা ত লোক-দেখানো। যেমন হয় স্টেডিয়ামে। ফুটবল খেলার মতো। এখানে বড় কথা হল ষাঁড়ের নাকের সামনে সুন্দর করে লাল চাদর নাড়ানো আর কায়দা করে তার শিঙের গুঁতো এড়িয়ে যাওয়া। তুই দেখেছিস ত যাকে খাঁটি বীরপুরুষ বলে, টরিঅ্যাডররা হল তাই। এখানে বড় কথা হল তালিম, কায়দা আর সাহস। বুঝলি কিনা? ভাসিউকোভ্কার ইতিহাসে এই

প্রথম ষাঁড়ের লড়াই। টরিঅ্যাডর ইভান রেন্, টরিঅ্যাডর পাভেল জাভ্গরোদ্নি! সমস্ত ইউক্রেন থেকে লোকজন এসে জুটবে। রেডিওতে আর টেলিভিশনে রিলে করা হবে। এমন কি জ্মেরিঙ্কায় তোর আত্মীয়স্বজনরাও দেখতে পাবে।'

আমি মুচকি হাসলাম। খাসা ব্যাপার! রেডিওতে টেলিভিশনে আর মোট কথা... জ্মেরিঙ্কায় আত্মীয়স্বজনদের চোখে পড়বে।

আমরা বেশ জুত করে একটা জায়গায় বসে বিশদ আলোচনা করতে লেগে গেলাম। প্রথমেই দরকার একটা ষাঁড়। যৌথখামারের ভালো জাতের ষাঁড় পেত্কা প্রার্থী হিশেবে সঙ্গে সঙ্গে নাকচ হয়ে গেল। ওটা এমনই ভয়ঙ্কর চিজ যে স্বয়ং পশুপ্রযুক্তিবিদ ইভান স্ভিরিদভিচ পর্যন্ত তাকে ভয় পান। চোখদুটো ট্র্যাক্টরের হেড লাইটের মতো। আর আকারে সে হল কম্বাইনের সমান। পা ঠুকে ঠুকে মাটি খুঁড়ে তোলে, যেন একটা মাটি খোঁড়ার যন্তর। এক মাইল দূরে থাকতে এগোতে ভয় হয়।

আমাদের এখানে একজন গরমকালে বাগান বাড়িতে বিশ্রাম করতে এসেছিল, ষাঁড়টার তাড়া খেয়ে তাকে টেলিগ্রাফের খুঁটিতে পর্যন্ত চড়ে বসতে হয়।

না বাপু, পেত্কা ষাঁড়ের সঙ্গে আমাদের শত্রুররা গিয়ে যুঝুক গে!

সত্যি কথা বলতে গেলে কি, আসল ষাঁড় বলতে যা বোঝায়, আমাদের এখানে পেত্কা ছাড়া আর কেউ সেরকম ছিল না। এই কারণে দ্বিতীয় প্রার্থী হল জোরা নামে একটি ছাগল। আমিই তাকে প্রার্থী খাড়া করেছিলাম প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে। জোরা ছাগলটাকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারতাম না, কারণ একবার আমি যখন স্নান করছিলাম সেই ফাঁকে ও আমার পরবের নতুন শার্টটা চিবিয়ে খেয়ে ফেলে।

কিন্তু জাভা আমাকে সমর্থন করল না।

'না, চলবে না,' জাভা বলল। 'জোরা অনবরত ব্যাব্যা করে, ওর জন্যে আমরা লোকের হাততালির আওয়াজই শুনতে পাব না। তাছাড়া, এ ত আর ছাগলের লড়াই নয়, এ যে ষাঁড়ের লড়াই। দরকার বেশ বড়সড় আর শিঙওয়ালা কিছু — ষাঁড় কিংবা গোরু।'

'শোন্, আচ্ছা স্রেফ গোরু হলেও ত চলতে পারে? ষাঁড়ই যে লাগবে এমন কথা ত আর কোথাও লেখা নেই!'

জাভা চিন্তিত হয়ে পড়ল।

'কী জানি বাপু, তা হবেও বা।'

'তাহলে...' আমি বললাম, 'তোদের 'অবদানের' চেয়ে যোগ্য প্রার্থী আর হতে পারে না।'

''অবদান' কেন? তোদের গোরু মান্‌কা নয় কেন?'

'তার কারণ হল এই যে আমাদের মান্‌কার বাছুর আছে, আর ওর একটা শিঙ ভাঙা। তুই কি চাস লোকে আমাদের দেখে হাসুক? এক শিঙওয়ালা গোরুর সঙ্গে টরিঅ্যাডরদের লড়াই? ক্যারিকেচার! দুনিয়ায় এমন ধারা আর কখনও হয় নি।'

''অবদানকে' দিয়ে অবশ্য চলতে পারে। কিন্তু ও খানিকটা গোলমেলে।'

''গোলমেলে' কী রকম? তার চেয়ে বরং বল্ না যে স্রেফ ম্যাকে ভয় পাস।'

'আমি ভয় পাই? দাঁড়া তোর কানে অ্যায়সা একটা লাগাব না, তুই দেখতে পাবি আমি কেমন ভয় পাই। কথা ফিরিয়ে নে বলছি, নিলি!'

'আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি, কিন্তু যাই বলিস না কেন, তুই ভয় পাস।'

'ভয় পাই?'

'পাস।'

'ভয় পাই বলছিস?'

'পাসই ত।'

জাভা সহ্য করতে না পেরে আমার কানে ঘুষি মারল। জবাবে আমিও ঘুষি মারলাম জাভার পেটে। আমরা জড়াজড়ি করে ঘাসের ওপর পড়ে গেলাম, গড়াতে গড়াতে গিয়ে পড়লাম রাস্তার ওপরে। রাস্তার যত রাজ্যের নোংরা আমাদের জামায় লেগে গেল। প্রথম হুঁশ হল আমার। 'দাঁড়া,' আমি বললাম 'যথেষ্ট হয়েছে। ষাঁড়ের লড়াইয়ের বদলে গড়াল কিনা দুই বোকার লড়াইয়ে।'

'তোরই ত দোষ। ...আচ্ছা, ঠিক আছে,' জাভা রাজী হয়ে বলল। ''অবদানকে' নিয়েই দেখা যাক। তোর মান্‌কা অবিশ্যি সত্যি সত্যিই টেলিভিশনের অনুপযোগী। ওটা বোকা।'

আমার ইচ্ছে হচ্ছিল মান্‌কার হয়ে এই অপমানের জবাব দিই, কিন্তু শেষকালে মত পালটে ফেললাম। আর মারামারি করতে প্রবৃত্তি হল না।

গোরু চরানোর মাঠের দিকে যে রাস্তাটা গেছে, পর দিন সকালে আমরা দুজনে সেখানে এসে মিললাম। আমি মান্‌কাকে আগে আগে তাড়িয়ে নিয়ে চললাম, আর জাভা — 'অবদানকে'। গোরুদুটো ধীরেসুস্থে, অলসভাবে লেজ নাড়াতে নাড়াতে যাচ্ছিল, এটা যে তাদের পক্ষে কত বড় ঐতিহাসিক দিন তা তারা মোটেই অনুমান করতে পারছিল না।

জাভার মাথায় ছিল তার মা'র কানাতওয়ালা টুপি। এটা পরে তিনি কিয়েভে যেতেন সভাসমিতি করতে। টুপিটা জাভার পক্ষে একটু বড় ছিল, ঢলঢল করে ওর চোখের ওপর এসে পড়ছিল। চোখে যাতে অন্তত কিছুটা দেখা যায় এবং পড়ে যেতে না হয় তার জন্য জাভাকে সর্বক্ষণ মাথা ঝটকাতে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল ও যেন থেকে থেকে মাথা নুইয়ে কাউকে সেলাম জানাচ্ছে।

বলাই বাহুল্য টুপিটা জাভা নিয়েছে কোন রকম জিজ্ঞেসাবাদ না করে।

আমার বগলে ছিল একটা ছোট গালিচা। বিখ্যাত গালিচা! আমার জ্ঞান হওয়া থেকে ওটাকে আমার মনে আছে। আমার জন্মের একেবারে গোড়া থেকে ওটা আমার খাটের শিয়রে ঝুলত। গালিচাটা ছিল লাল রঙের আর তার ওপর চিকনের কাজ করা তিনটি মজার কুকুর ছানা, পাশাপাশি বসে আছে গায়ে গা ঠেস দিয়ে। এরা হল কি'উ কি'উ, ঘেউ ঘেউ ও গরগর। আমি যতক্ষণ ঘুমিয়ে না পড়তাম ততক্ষণ মা এদের নানা কীর্তিকাহিনী আমাকে অনর্গল বলে যেতেন। আমি এখন বড় হয়ে যাওয়ায় গত দুবছর হল গালিচাটা পড়ে আছে তোরঙ্গের ভেতরে, তাই এখন কি'উ কি'উ, ঘেউ ঘেউ ও গরগর-এর গা থেকে জোর ন্যাপথালিনের গন্ধ ছাড়ছে।

গালিচা আর টুপি ছিল আমাদের টরিঅ্যাডরীয় সম্পত্তি। এছাড়া পথে আমরা বাদামের ঝাড় থেকে ডাল কেটে বানিয়ে নিলাম দুটো তলোয়ার। আমরা পুরোদস্তুর তৈরি।

আমরা চলতে চলতে গাইতে লাগলাম 'কারমেন' অপেরার গীত:

'টরি-অ্যাডর, জোর ক-দম্‌, টরি-অ্যাডর, টরি-অ্যাডর...'

আমরা গান গেয়ে চলি, কিন্তু তখনও আমাদের জানা ছিল না আমাদের জন্য কী অপেক্ষা করছে।

আকাশ নীলে নীল, খাঁটি স্পেনীয় আকাশ। আবহাওয়া — ষাঁড়ের লড়াইয়ের সম্পূর্ণ উপযোগী।

আমরা আমাদের গোরুদুটোকে খেদিয়ে নিয়ে গেলাম মাঠের কিনারায়, পুকুরের কাছাকাছি — লোকচক্ষুর খানিকটা আড়ালে।

'তোর মান্‌কাকে একপাশে কোথাও হটিয়ে নিয়ে যা, যাতে ও গন্ডগোল না বাধায়,' জাভা বলল, 'তারপর আয়, শুরু করা যাক।'

আমি কোন তর্ক করলাম না। তাছাড়া আমাদের মান্‌কা আবার বেশ রগচটা ধরনের: ওর পক্ষে ষাঁড়ের লড়াই না দেখাই ভালো।

জাভা মাথার টুপিটা ঠিকঠাক করে নিল, পরনের প্যান্টটা কষে বাঁধল, আমার গালিচাটা নিল, নিশ্বাস ফেলল, নেচেকুঁদে, পা টিপে টিপে এগোতে লাগল 'অবদানের' দিকে। ঠিক তার মুখের কাছাকাছি এসে তার চোখের সামনে দোলাতে শুরু করল গালিচাটা। আমি নিশ্বাস বন্ধ করে রইলাম — শুরু হল বলে...

'অবদান' চুপচাপ ঘাস খেয়ে চলছিল।

জাভা গালিচাটা আরও জোরে দোলাতে লাগল। 'অবদানের' বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই।

জাভা গালিচা দিয়ে ওর নাকের ফুটোর ওপর ঝাপটা মারল। 'অবদান' কেবল মুখ ঘুরিয়ে নিল।

জাভা বিরক্ত হয়ে হুঙ্কার ছেড়ে আরও একবার সর্বশক্তিতে গালিচার ঝাপটা মারল ওকে। 'অবদান' আলস্য ভরে পায়ে পায়ে সরে গিয়ে জাভার দিকে লেজ ঘুরিয়ে দাঁড়াল। জাভা আবার ছুটে সামনে এগিয়ে এসে নাচাকোঁদা শুরু করে দিল।

আধঘণ্টা বাদে সে বলল:

'আসলে আমি ওর গা সওয়া হয়ে গেছি কিনা, ও আমাকে ভালোবাসে। আচ্ছা, এবারে লাগা দেখি তুই।'

এক ঘণ্টা বাদে হাঁপাতে হাঁপাতে আমি বললাম: 'ধুত্তোর, গোরু ত নয়, ভাগাড়ের মড়া। দুঃখের কথা এই যে আমার মান্‌কার কেবল একটা শিঙ, নইলে তোকে দেখিয়ে দিতাম সত্যিকারের গোরু কাকে বলে।'

আবার কাজে লেগে গেল জাভা। সে থেকে থেকে যুদ্ধ-কৌশল বদলাতে

লাগল: কখনও গোর্র দিকে চুপিসারে এগিয়ে যায় এবং অতর্কিতে গালিচা দিয়ে তাকে ঘা মারে, কখনও বা ছুটতে ছুটতেই লাফিয়ে পড়ে। কখনও পাশ থেকে ছুটে আসে। কিন্তু 'অবদানকে' কোন মতেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত করা গেল না।

আমাদের চুলের ঝুঁটি ভিজে জবজবে হয়ে গেল, গালিচা আমাদের হাতে নার্ভাস হয়ে কাঁপতে লাগল — মনে হচ্ছিল কিঁউ কিঁউ, ঘেউ ঘেউ, গরগর — ওরা সব ডাক ছেড়ে উঠল বলে। অথচ 'অবদানের' কিছুতেই কিছু হচ্ছে না।

একবার জাভা 'অবদানের' কান চেপে ধরতে সে তার বিষণ্ণ চোখদুটি তুলে কটমট করে জাভার দিকে তাকিয়ে বলল:

'হাম্বা-আ!'

বোঝাই যাচ্ছে গোজাতীয় ভাষার এই শব্দের অনুবাদে অর্থ দাঁড়ায়:

'ওহে ছোকরারা, এখান থেকে সরে যাও। আমাকে ঘাঁটিও না।'

কিন্তু আমরা সময়মতো অর্থটা ধরতে পারলাম না।

হেই হেই হাঁকডাক ছাড়তে ছাড়তে তার সামনে লাফাতে লাফাতে আমরা তাকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহবান করলাম। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছিলাম যে জাভা তার 'অবদানের' এই কান্ডকারখানা দেখে আমার সামনে লজ্জা পাচ্ছিল।

অবশেষে জাভা ক্ষেপে গিয়ে চেঁচিয়ে বলল:

'এই পাভেল, ওকে মার দেখি এক ঘা, মার, আচ্ছা করে মার! ভয় পাচ্ছিস কেন? এই যে দ্যাখ না, আমি যেমন দিচ্ছি!'

জাভা সপাটে লাথি ঝাড়ল 'অবদানের' ঠোঁটের ওপর।

আর হঠাৎ... হঠাৎই আমি জাভাকে দেখতে পেলাম শূন্যে, উঁচুতে। সেখান থেকে, শূন্য থেকে শুনতে পেলাম তার মরিয়া আর্তনাদ:

'আ-আ-আ!'

আমার মনে হয় ও বোধ হয় শূন্যে থাকা অবস্থায়ই দৌড় শুরু করে দিয়েছিল: কেননা ওর পাদুটো মাটি স্পর্শ করতে না করতে ও প্রাণপণে ছুট দিল পুকুরের দিকে। আমি ছুটলাম ওর পেছন পেছন। এটা ছিল আমাদের বাঁচার একমাত্র রাস্তা। আমরা ছুটতে ছুটতে গিয়ে পড়লাম পুকুরের মধ্যে, জলকাদার সাঙ্ঘাতিক ফোয়ারা ছিটিয়ে। থামলাম গিয়ে একেবারে মাঝপুকুরে।

আমরা যেখানে গিয়ে পড়লাম সত্যি কথা বলতে গেলে, সেটা নামেই পুকুর। কোন এক কালে সেখানে সত্যি সত্যিই ছিল একটা বড় পুকুর। কিন্তু অনেক কাল হল শুকিয়ে গেছে, নোংরা কাদা জমে অতি সাধারণ এক জলার আকার ধারণ করেছে। সবচেয়ে গভীর জায়গাটায় আমাদের গলাজল। ঠিক এখানেই আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি।

'অবদান' জলার চারদিকে ছোটাছুটি করতে করতে আমাদের উদ্দেশে হাম্বা হাম্বা রবে গোজাতীয় ভাষায় কী যেন শাপশাপান্ত করে চলল। জলায় নামার ইচ্ছে তার ছিল না। সে ছিল খুঁতখুঁতে স্বভাবের ফিটফাট গোরু।

আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

পুকুরের তলাটা ছিল পলিমাটিতে ভর্তি, পাঁকাল, জল — নোংরা, ঘোলাটে, দুর্গন্ধ।

আমি আর জাভা অনেকক্ষণ এই নোংরা কাদাজলে দাঁড়িয়ে রইলাম। অন্তত আধঘণ্টার কম হবে না, যতক্ষণ না 'অবদান' শান্ত হয়ে শেষকালে সরে গেল। দেখা গেল সে দিব্যি মানুষের মতো আর উদার স্বভাবের গোরু বটে; কেননা টরিঅ্যাডর জাভাকে সে শিঙ দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় নি, ফেলে দিয়েছিল স্রেফ মাথা দিয়ে ছুঁড়ে। আর হতভাগ্য আমরা যখন শুয়োর ছানার মতো কাদামাখা অবস্থায় জলা

থেকে উঠে এলাম তখন সে তার প্রতি আমাদের দুর্ব্যবহার নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য করল না। তার সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব হয়ে গেল।

এর পর থেকে 'অবদানকে' মারা ত দূরের কথা, জ্যাভার মা তাকে যে সমস্ত মিঠাই দিত জাভা সব সময় 'অবদানকে' তা দিয়ে আপ্যায়ন করত।

এই হল আমাদের 'অবদান'-ঘটিত ইতিহাস।

এখন আমরা ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে আমাদের ব্যর্থ পাতাল রেলের সুড়ঙ্গ বুজিয়ে ফেলছি দেখে 'অবদান' গোয়ালঘর থেকে উঁকি মেরে সমবেদনার দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। এমন কি আমাদের মনে হচ্ছে যেন ওর চোখে জল। 'আমাদের আদরের 'অবদান'! কী বিরাট আর কী দরদী তোমার মন! একমাত্র তুমিই আমাদের বুঝতে পারছ, আমাদের জন্যে দরদ দেখাচ্ছ। ওগো গোরুটি, তোমাকে ধন্যবাদ!'

'ওরে হতভাগারা, এখনও শেষ হয় নি?' অতর্কিতে পেছন থেকে শোনা গেল ভারাভা দাদুর বজ্রকণ্ঠ।

আমরা অসতর্ক হয়ে পড়েছিলাম -- এখন সামলাও ঠেলা।

সামনে শুয়োরের খোঁয়াড়ের দেয়াল, দুপাশে লম্বা লম্বা আগাছার ঝাড়, পেছনে ভারাভা দাদু। পালাবার কোন রাস্তা নেই। আমরা উটকো বসা অবস্থায় ভয়ে জড়সড় হয়ে গেলাম — যেন চিলের সামনে মুরগীর ছানা।

'ভয় পাস নে, গায়ে হাত দিচ্ছি না!'

এই কথায় আমরা সিধে হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। আমরা দুজনেই একসঙ্গে নিশ্বাস ফেললাম — আওয়াজে মনে হল কেউ যেন সাইকেলের চাকার টায়ারে পাম্প ঠেলে দিল। আমাদের থরথর কম্পমান ঠোঁটদুটো আপনাআপনিই বিস্তৃত হয়ে উঠে মুখে ফুটিয়ে তুলল একটা বিশ্রী রকমের বেহায়া হাসি। কিন্তু আমাদের হাসিতে দাদুর কোন বিকার দেখা গেল না। এ ধরনের হাসি তিনি পছন্দ করতেন না। ভারাভা দাদু ছিলেন কড়া মেজাজের লোক।

দাদুর মুখটা ছিল গত বছরের পচাগলা পাতার মতো ছাইরঙা আর ছোপ ধরা। ঠোঁটজোড়া সরু, চাপা আর এমনভাবে বোজা যেন সেলাই করা। চোখের পাতায় লোমের চিহ্ন নেই, চোখদুটি গোলগোল আর স্থির, মোরগের চোখের মতো। এই গোলগোল স্থির চোখ দেখে মনে হত দাদু যেন কী কারণে অবাক হয়ে আছেন

ত আছেনই। কিন্তু ঐ মনে হওয়া পর্যন্তই। দুনিয়ায় সম্ভবত এমন কিছুই ছিল না যা ভারাভা দাদুকে অবাক করতে পারে। তাঁর বয়স এখন চলছে তিরাশি।

'ওরে শেষ কর্ রে ছোঁড়ারা, যা, পড়া করতে যা, শিগগিরই পরীক্ষা যে!'

আমরা মুখ বাঁকালাম। এটা আমাদের জানা ছিল। কিন্তু পরীক্ষার কথা ভাবতে আমাদের মন চাইছিল না। কারা যে এই সব জিনিস ভেবে বার করেছে! তাও আবার বসন্তকালে, যখন আকাশে বাতাসে ফুটবল আর ডাংগুলির গন্ধ, যখন চারদিকে পাখিদের কলকাকলি, যখন এত রোদ আর চমৎকার গরম যে আমি আর জাভা দিনে তিন বার করে স্নান করছি। গত বছর ক্লাস ফোরে থাকতে কী ভালোই না ছিল! পরীক্ষা-টরীক্ষার কোন বালাই ছিল না। ক্লাস ফাইভে না উঠলেই ভালো হত। আমি আর জাভা জীবনে কখনও পরীক্ষায় বসি নি। এই হবে প্রথম। যদিও আমরা বড়াই করে বলি 'মরুক গে!' — কিন্তু পরীক্ষার কথা ভাবলে আমাদের দুজনেরই পেটের ভেতরটা কেমন যেন গর্গর্ করে ওঠে। একটা পরীক্ষায় বসার চেয়ে বিশটা সুড়ঙ্গ বোজানোও ভালো।

'সবই সারা হয়ে গেছে মনে হচ্ছে, দাদু। ঠিক যেমনটি ছিল। সত্যি কিনা?' পায়ের সামান্য চাপ দিয়ে টাটকা মাটি ঠুকতে ঠুকতে ভয়ে ভয়ে বলল জাভা।

দাদু চোখ টেরছা করে আমাদের কাজটার দিকে তাকিয়ে দেখলেন — দেখা যাচ্ছে তিনি তেমন একটা সন্তুষ্ট নন। কিন্তু বললেন:

'যা, শিগগির যা বলছি। তবে হ্যাঁ, জেনে রাখবি, ফের যদি এমন হয় কান ছিঁড়ে শুয়োরের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দেব!'

শুয়োরের খোঁয়াড় সাফ করার ব্যাপারে দাদু কিন্তু কোন উচ্চবাচ্য করলেন না, আমরাও মনে করিয়ে দিলাম না — এই কাজটায় একেবারেই কোন মজা নেই। লম্বা আগাছার ঝাড়ে পিঠ ঘেঁষে আমরা কাত হয়ে দাদুর পাশ দিয়ে সরে যাই, তার পাশ কাটিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট মারি। ওঃ, ঠিক সময়মতো সটকাতে পেরেছি: আরেকটু হলেই দাদুর খসখসে হাত খপ্ করে আমাদের প্যান্ট নির্ঘাত চেপে ধরত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চীনের মহাপ্রাচীরের আড়ালে। কারা এই কুনিশ?

আমি থাকি জাভার বাড়ির চারটি বাড়ি পরে। এক মিনিট বাদে আমরা এখন আমাদের বাগানে এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছি। আমরা বসি চেরি গাছের নীচে তক্তা দেওয়া ইয়া উঁচু এক বেড়ার পাশে। আমাদের আর পড়শীদের বাগানের মাঝখানে এই বেড়া। আমরা বসে বসে আমাদের পাতাল রেলের শোচনীয় পরিণতির কথা ভাবি আর মনে মনে কষ্ট পাই। তবে বেশিক্ষণ মন খারাপ করে থাকা আমাদের ধাতে নেই।

'ওরে চল্ রে, চীনের মহাপ্রাচীরের ওপরে চড়া যাক!' জাভা বলল।

'চল্, চল্,' আমি বললাম।

সঙ্গে সঙ্গে আমরা বেড়া বয়ে উঠতে থাকি।

তিন মিটারের ইয়া উঁচু এই বেড়াটি তৈরি করেছে আমাদের পড়শী কুনিশ। আমি আর জাভা এটার নাম দিয়েছি চীনের মহাপ্রাচীর। মাত্র একটি জায়গা দিয়েই বেড়াটার ওপর ওঠা যায়, যেখানে আমাদের বুড়ো চেরি গাছটা ওর বাগানের গায়ে ঝুঁকে পড়েছে। সেখানে প্রায় ওপরের দিকে বেড়ার গায়ে আমরা দুটো ফুটো করে নিয়েছিলাম, ঐ ফুটো দিয়ে প্রায়ই লক্ষ করি শত্রু-এলাকায় কী ঘটছে। তোমরা হয়ত ভাবছ আমরা একেবারেই নির্লজ্জ, অভদ্র ছেলেপুলে — পরের বাড়িতে উঁকিঝুঁকি মারি। মোটেই না। ব্যাপারটা মোটেই অমনি অমনি নয়। তোমরা যে জান না ঐ লোকগুলো কী রকম। স্বাভাবিক, ভালো লোকজন কি পড়শীদের কাছ থেকে অমন বেড়ার আড়াল দেয়? তাও আবার কী কারণে? কুনিশদের বাগানের ঠিক সীমানায় একটা নাশপাতি গাছ বেড়ে উঠেছিল, তার একটা ডাল এগিয়ে আসে আমাদের বাগানের মধ্যে। আর ঐ ডাল থেকে নাশপাতি প্রায়ই পড়তে লাগল আমাদের সীমানায়। আমরা অবশ্য সব নাশপাতিই ওদের ফেরত দিয়ে দিতাম, কিন্তু মাঝে মাঝে হঠাৎ কোন ফল গাছ থেকে খসে পড়লে শুয়োরে (তাকে কি আর বলে বোঝানো যায় কোন্‌টা কার সম্পত্তি?) গপ্

করে খেয়ে ফেলে — সব সময় ত আর চোখে চোখে রাখা যায় না। আর এই নেহাৎই বাজে কতকগুলো পড়া ফলের জন্যই কুনিশ তুলে দিল চীনের মহাপ্রাচীর। এদিকে নাশপাতি গাছটা যেন ইচ্ছে করেই দেখতে দেখতে শুকিয়ে গেল।

কুনিশ-গিন্নির কাঁধ চওড়া, সে মোটা না হলেও কেমন যেন চারকোনা ধরনের। চোখজোড়া খুদে খুদে, যেন বোতামের গায়ে ছোট ছোট ফুটো, আর নাকটা পেল্লায়, দেখতে কুড়ুলের মতো। যদি সত্যি সত্যিই তা না হত, আমি কখনও বিশ্বাসই করতাম না যে কোন মেয়েলোকের এত বিরাট নাক হতে পারে।

কুনিশের আবার উলটো, তার নাকটা ছোট্ট। তবে হ্যাঁ, লোমশ ছিল বটে কুনিশ — ভয়ঙ্কর! হাত-পা, কাঁধ, বুক, পিঠ — সব, সব ছিল তারের মতো শক্ত, কটা রঙের ঘন লোমে ঢাকা। এমন কি তার কানেও ছিল চুল, আর সেগুলো খাড়া খাড়া হয়ে থাকত আঁশের মতো (এই আঁশের ভেতরে জড়িয়ে না গিয়ে কী করে কুনিশের কানে শব্দ গিয়ে পৌঁছুত তা ভেবে আমরা অবাক হয়ে যেতাম)। নাকের খাঁজে গজগজ করত, এমন কি নাকের ডগায়ও।

তাছাড়া কুনিশ ছিল কেমন যেন ভেজাভেজা — পাতাল কুঠরির স্যাঁতসেঁতে দেয়ালের মতো। হাত সব সময় ভেজা, ঘাড় ভেজা, কপাল ভেজা। একবার সে তার মড়ার মতো ঠাণ্ডা ও ভিজে হাত দিয়ে আমার কাঁধ ধরেছিল। আমার সর্বাঙ্গে একেবারে হিহি কাঁপুনি ধরে গেল। আর কুনিশ যখন হাসত তখন তার নাকে খিঁচুনি ধরত, কপালের চামড়ায়ও খিঁচুনি ধরত (কোঁচকানো নয়, যাকে বলে খিঁচুনি ধরা তাই)। আর ব্যাপারটা ছিল রীতিমতো অস্বস্তিকর। তখন মনে হত তার দিকে না তাকিয়ে উলটো দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিই।

কুনিশদের কর্তা-গিন্নি দুজনের সংসার। ছেলেপুলে ওদের ছিল না। আর আত্মীয়স্বজনও, আমার মনে হয়, ছিল না।

কুনিশ কিংবা কুনিশ-গিন্নি দুজনের কেউই যৌথখামারে কাজ করত না বললেই চলে। সে নিজেকে পঙ্গু বলে বিবেচনা করত, কেননা তার পেটের ওপর ডান দিকে ছিল একটা কাটা দাগ। প্রায়ই সে ঐ দাগটা দেখিয়ে যুদ্ধে আঘাত পাবার ভয়ঙ্কর কাহিনী বলত। কিন্তু লোকে বলে ওর কথা সত্যি নয়: ওটা কোন

আঘাত-টাঘাত নয়, নেহাৎই অ্যাপেন্ডিসাইটিস — যুদ্ধেরও অনেক আগে ছোট থাকতে যে অ্যাপেন্ডিস্যাইটিস অপারেশন হয়েছিল তারই চিহ্ন।

কুনিশ-গিন্নিও নিজেকে গুরুতর অসুস্থ মনে করত। তার ব্যাধিটা ছিল চিকিৎসার অসাধ্য আর রীতিমতো রহস্যজনক। সে চোখ কপালে তুলে পড়শী মেয়ে-বৌদের কাছে ফিসফিস করে এই ব্যাধির বর্ণনা দিত আর বলত: 'ওঃ আমি যা ভুগছি, যা ভুগছি, কী আর বলব!'

অথচ চিকিৎসার অসাধ্য এই ব্যাধির জন্য রোজ বাজারে ভারী ভারী ঝুড়ি বয়ে নিয়ে যেতে এবং উৎসব-পার্বণের দিনে এক বোতল মেথিলেটেড স্পিরিট পান করতে তার কোন অসুবিধা হত না। নীল রঙের ভয়ঙ্কর মেথিলেটেড স্পিরিটের বোতলের ওপরে আঁকা থাকত একটা মড়ার মাথা আর তার নীচে আড়াআড়ি দুটো হাড়, সেই সঙ্গে লেখা থাকত: 'সাবধান! বিষ!' কুনিশরা এই লেখাটাকে আমল দিত না। ওরা মেথিলেটেড স্পিরিটটাকে কী ভাবে যেন চোলাই করে পরে পান করত। এ ব্যাপারে কুনিশ ছিল বিশেষজ্ঞ। সে বলত:

'জিতোমিরের মেথিলেটেড স্পিরিট — বাস্তবিকই জঘন্য, বিষ। কিন্তু চেরনিগোভের... তোমাদের বলব কী, চিজ বটে! ইউক্রেনের মৃতসঞ্জীবনী বলতে হয়! খাও, একশ বচ্ছর পরমায়ু পাবে।'

কুনিশ-গিন্নি, বিশেষ করে কুনিশ মদ খেতে ভালোবাসত। কুনিশ মদ খেত প্রায় রোজ। আর উৎসবের দিনগুলিতে, অর্থাৎ নববর্ষ, বড়দিন, পয়লা মে, ইস্টার, দেহচর্চা দিবস, ভজনালয়ে যাওয়া ইত্যাদি উপলক্ষে (কুনিশরা একটাও গির্জার উৎসব এবং আমাদের সোভিয়েত উৎসবও বাদ দিত না) তারা মদ খেত সপরিবারে, দুজনে মিলে।

এরকম দিনে সকাল বেলায় কুনিশ-গিন্নি গেটের বাইরে বেরিয়ে এসে গাঁয়ের ক্লাবঘরের ছাদের ওপরকার টেলিভিশন-অ্যান্টেনার উদ্দেশে ক্রুশ করত (আমাদের গাঁয়ে গির্জা না থাকায় এখানকার ভক্ত লোকেরা সকলে টেলিভিশন-অ্যান্টেনার উদ্দেশে ক্রুশ করত, কেননা ওটা দেখতে ছিল ক্রসচিহ্নের মতো)।

তারপর কুনিশ-গিন্নি ফিরে আসত নিজেদের আঙ্গিনায়। সেখানে চেরি গাছের নীচে টেবিল পাতা থাকত, শুরু হয়ে যেত উৎসবের সকালের খাওয়া-দাওয়া। ঘণ্টাখানেক বাদে চীনের মহাপ্রাচীরের ওপাশ থেকে শোনা যেত:

আহা ওই রাত
করেছিল মাত্ —
টাটাত না বুক,
মনে হত সুখ...

কুনিশরা দুজনে মিলে মাতাল অবস্থায় নাকী সুরে এই গান গাইত। কয়েক পাত্তর চলার পর সব সময় তাদের গানের ঝোঁক হত। গান গাইত তারা অনেকক্ষণ, দু-তিন ঘণ্টা। তারা ইউক্রেনীয় লোকগীতি, রুশ গান আর সোভিয়েত সুরকারদের গান গাইত।

তারপর একেবারে সন্ধ্যা পর্যন্ত দুজনে পাল্লা দিয়ে বাগানে নাক ডাকিয়ে লোকের কানে তালা ধরিয়ে দিত, মনে হত যেন বেড়ার ওপাশে দুটো ট্র্যাক্টর চলছে।

কুনিশরা সর্বদা উৎসব-অনুষ্ঠান করত কেবল দুজনে মিলে। ওরা কাউকে নিমন্ত্রণ করত না। তাদের কাছে কেউ আসত না, তারাও যেত না কারও কাছে। তারা ছিল বেজায় কৃপণ, তাদের ভয় হত পাছে কেউ দেখে ফেলে ঘরে কী আছে। লোকজনের কাছে সব সময় কাঁদুনি গাইত।

'আমি যে একেবারেই গরিব!' কুনিশ বলত। 'কায়ক্লেশে দিন কাটাই। মাইরি বলছি! শীতকালের জন্যে পর্যন্ত কিছু বাঁচিয়ে রাখতে পারি নি।'

অথচ কুনিশ-গিন্নি রোজ সকালে বাজারে যায় দুটো বিরাট বিরাট বস্তার ভারে নুয়ে পড়ে। বস্তাগুলোর ভেতরে থাকত ঝুড়ি আর দুধের বোতল। কুনিশদের গোরুটা ছিল গ্রামের সেরা গোরুগুলোর একটা।

একদিন আমি শুনতে পাই মেয়েরা বলাবলি করছে:

'ওঃ সেই গোরুর যা দুধ! ওঃ কী দুধ! যেন চর্বি! ছুরি দিয়ে কাটা যায়।'

'হুঃ, তা হবে না কেন শুনি? ওটাকে যে রুটি খাওয়ায়। রোজ শহর থেকে বস্তা টেনে আনে। আর বস্তার ভেতরে কী থাকে জানিস? পাঁউরুটি! বাইশ কোপেক দামের এককেটা রুটি। আমার গোরুকে অমন খাওয়াই না তাকেও দোয়ালে ননী পাওয়া যাবে।'

'হ্যাঁ, তা বটে! বাজারে কিন্তু আমি দেখেছি — দুধ বেচে পানসে, নীল। জল মেশায় অন্তত অর্ধেক।'

'মিলিশিয়া তাহলে আছে কী করতে?'

'কুনিশ-গিন্নিকে নিয়ে পড়ে থাকার সময় মিলিশিয়ার নেই। মিলিশিয়া চোর-ডাকাত ধরতে ব্যস্ত।'

'কুনিশ-গিন্নি কি চোর-ডাকাতের দলে পড়ে না? সত্যিকারের ডাকাত আর কাকে বলে!'

সংক্ষেপে বলতে গেলে, চীনের মহাপ্রাচীরের ওপাশে কিছু একটা গোলমেলে, সন্দেহজনক কাজকারবার চলছিল। আমি আর জাভা অনেকদিন যাবত এটা লক্ষ করে আসছি।

একদিন আমি শুনতে পেলাম কুনিশ রহস্যজনক স্বরে তার গিন্নিকে বলছে:

'শিগগিরই আমাদের এখানে বড় রকমের অদলবদল হবে। তোমাকে ত আগেই বলেছি। সংবাদ সঠিক।'

একবার, সন্ধ্যাবেলায় যখন অন্ধকার হয়ে এসেছে তখন তাদের বাড়িতে মোটরসাইকেলে করে এলো দুটো তাগড়া চেহারার লোক। তারা মোটরসাইকেলের সাইড-কার্-এ কেরিয়ারে কী যেন বোঝাই করে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল। পরে আরও দুবার এসেছিল, সেও সন্ধ্যাবেলায়।

একদিন কুনিশ প্রচণ্ড মাতাল অবস্থায় চাখানার সামনে দাঁড়িয়ে গোটা পাড়া মাত করে চেঁচিয়ে বলে:

'তোমাদের মাথার আমি থোড়াই পরোয়া করি। কিসের মাথা! ঘোড়ার ডিম। সভাপতি না আরও কিছু, সে হল গিয়ে... এই যে আমার এখানে, দেখেছ ত?' এই বলে কুনিশ হাতের মুঠো পাকিয়ে দেখাল। 'আমি ইতিমধ্যে যথাস্থানে লিখে পাঠিয়েছি। তোমাদের মাথা শিগগিরই বাতাসে উড়ে যাবে... এক ফুঁয়ে উড়ে যাবে... হি-হি-হি!'

ইভান ইভানভিচ আমাদের গ্রামের মাথা — যৌথখামারের সভাপতি, পরিচালক হিশেবে ভালো, আমাদের এখানে সকলেই তাঁকে রীতিমতো ভালোবাসে। অলস, নিষ্কর্মা আর মাতালরা ছাড়া আর সবাই। ঐ সব লোককে তিনি কোন রকম প্রশ্রয় দিতেন না। কুনিশ ওঁর সম্পর্কে সব সময় যেখানে যেখানে সম্ভব অভিযোগ

ও আর্জি লেখে। আর লেখে সে সকলকে দেখিয়ে দেখিয়ে। গেট খুলে দিয়ে উঠোনে টেবিলটা বার করে এনে বসে আর ইস্কুলের ছাত্রের মতো মাথাটা এক দিকে হেলিয়ে, জিভ বার করে কাগজের ওপর কী সব হিজবিজি লিখতে থাকে।

'আবার কী সব আগড়ম-বাগড়ম লিখতে বসেছে,' ভারাভা দাদু বিদ্রূপ করে বলেন।

কর্নিশের অভিযোগ অবশ্য সভাপতির কোন ক্ষতি করতে পারে নি। কিন্তু অজ্ঞ লোকজনের মনে এর ফলে কর্নিশের প্রতি শ্রদ্ধা এমন কি ভীতিও জাগ্রত হয় — যে-লোক লেখে তার শক্তিও আছে স্বীকার করতে হয়। শোনা যায় কোন এক সময় বিচক্ষণ লোকেরাও নাকি এই সব আর্জির জন্য কর্নিশকে সমীহ করে চলত। এতে সে আমাদের চোখে আরও রহস্যজনক ও হেঁয়ালি হয়ে দাঁড়ায়।

আর একবার আমরা ঘটনাক্রমে কিছু কথাবার্তা শুনে ফেলার পর সম্পূর্ণ খেই হারিয়ে ফেললাম।

ঘটনাটা ঘটেছিল কিয়েভে। শীতের ছুটির সময় ক্লাসসুদ্ধ আমরা সকলে বেড়াতে গিয়েছিলাম শহরে।

আমাদের সকলে যখন ফিলার্মনিতে কনসার্ট শুনতে রওনা হয়ে পড়েছে তখন আমি আর জাভা 'মিনিট খানেকের জন্য' পিছিয়ে পড়ে গেলাম, এক ছুটে নাগোরদোলাটা দেখে নেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য (শীতকালে চালু না থাকলেও আকর্ষণীয় ত বটে)।

আমরা ছুটে গেলাম, নাগরদোলাটার আশেপাশে একটু ঘোরাঘুরি করে (দুর্ভাগ্য এই যে এখন চালু নেই) ফিরে যাবার জন্য তৈরি হয়েছি, এমন সময় দেখতে পেলাম বেঞ্চে কর্নিশ বসে আছে কোন এক অজানা লোকের সঙ্গে। আমাদের দিকে পিঠ করে বসে আছে — আমাদের দেখতে পাচ্ছে না। তাহলেও আমরা কিন্তু ওকে সঙ্গে সঙ্গে চিনে ফেললাম। আর বলাই বাহুল্য, অবাক হয়ে গেলাম। এখানে, কিয়েভে, নাগরদোলার সামনে কী করছে সে? আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। শুনতে পেলাম এই রকম কথাবার্তা:

'পঁচিশের কমে হবে না,' কর্নিশ বলল।

'বিশ, এর বেশি পারব না,' অপরিচিত লোকটি বলল।

'আরে, আপনি বুঝতে পারছেন আমি কী ঝুঁকি নিচ্ছি! আপনি কী মনে করেন আমার জেলে যাবার সাধ হয়েছে? পঁচিশ, এর কমে হবে না।'

'আচ্ছা বেশ, আমার কথাও থাক, আপনারটাও থাক — তেইশ।'

'বলেছি ত পঁচিশ। এর কমে পারব না। পারব না!'

বলেই সে হঠাৎ চুপ করে গেল — গাছের সারির মাঝখানের পথ দিয়ে একজন মিলিশিয়াম্যান চলছিল। কুনিশ আর অজানা লোকটি এক লাফে বেঞ্চ ছেড়ে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এর পর থেকে এই সন্দেহজনক কথাবার্তা আমাদের মনে কোন স্বস্তি দিল না।

'এর অর্থ কী হতে পারে?' জাভা ধীরে ধীরে বাঁ চোখ কুঁচকে বলল।

'হ্যাঁ, তা ত বটেই, কী হতে পারে?' ডান চোখ কুঁচকে বললাম আমি।

'শোন্,' জাভা দুচোখই কুঁচকে বলল, 'এমনও ত হতে পারে যে কুনিশ একজন স্পাই? ও হয়ত আমাদের জন্মভূমি বিকিয়ে দেবার মতলব করছিল?'

'বড় শস্তায় মনে হচ্ছে না? পঁচিশ রুব্‌লে জন্মভূমি?..'

'কোত্থেকে জানলি যে রুব্‌ল? হতে পারে হাজার, এমন কি কোটি।'

'কী যে বলিস?' আমি অবিশ্বাসের সুরে বললাম।

''কী যে বলিস' নয়। ওর ওপর নজর রাখা দরকার।'

'তা দরকার,' আমি স্বীকার করলাম।

আমরা ওর ওপর নজর রাখতে লাগলাম। নিয়মিতভাবে। প্রায় রোজ।

তবে আমাদের পর্যবেক্ষণে আপাতত কোন ফল পাওয়া গেল না। কুনিশ গৃহস্থালি নিয়ে ব্যস্ত রইল, শুয়োরকে খাওয়ায়, গোয়ালঘর সাফ করে, চালাঘর মেরামত করে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এমন কিছু করে না যাকে স্পাইয়ের কাজ বলা চলে। সত্যি কথা বলতে গেলে কি এই লক্ষ রাখা ব্যাপারটায় আমার এখন বিরক্তি ধরতে শুরু করেছে। শেষকালে আমি মনে মনে বললাম যে এই শেষবারের মতো চীনের মহাপ্রাচীরের ওপরে উঠব।

এবারেও আমরা কৌতূহলজনক কিছু দেখতে পেলাম না। কুনিশ সবজি বাগানে কাজে ব্যস্ত ছিল। কুনিশ-গিন্নিকে দেখা যাচ্ছিল না — ঘরের ভেতরের বোধ হয়, আবার এমনও হতে পারে যে আদৌ বাড়িতে নেই। মিনিট পাঁচেক উঁকিঝুঁকি

মেরে দেখার পর আমরা নেমে আসতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় ক্নিশ-গিন্নি ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বলল:

'ওগো, রাস্তায় গিয়ে একবার দেখে এসো না, কেউ নেই ত? আর গেটটা বন্ধ করে দাও। নইলে হতভাগারা আবার দেখে ফেলবে...'

আমরা সঙ্গে সঙ্গে কান খাড়া করলাম।

ক্নিশ রাস্তায় উঁকি মেরে চারপাশ দেখে নিল, তারপর গেটটা বন্ধ করে দিয়ে গিন্নির সঙ্গে ঘরের ভেতরে চলে গেল।

'শুনলি? দেখলি?' উত্তেজিত হয়ে ফিসফিস করে বলল জাভা।

আমি ভেবে কূল পেলাম না কী জবাব দেব।

'ঘরের ভেতরে ওরা কী করে, যেমন করেই হোক উঁকি মেরে দেখতে হয়,' জাভা জানাল। 'হয়ত স্পাইগিরি করে পাওয়া টাকা বালিশের খোলে ভরবে, নয়ত রেডিওর মারফত কোন খবর-টবর পাঠাবে...'

'আয়, বেড়াটা ডিঙোই, তারপর গিয়ে চড়ি ওদের বাড়ির পাশের ঐ বাদাম গাছটার ওপর; ওখান থেকে জানলা দিয়ে সবকিছু দেখা যাবে,' আমি ফিসফিস করে বললাম।

'যা বলেছিস।'

আমরা আর সময় নষ্ট না করে মিনিট খানেক বাদেই গিয়ে চেপে বসলাম বাদাম গাছের ঘন ডালপালার ওপর, সেখান থেকে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে লাগলাম ক্নিশদের ঘরের ভেতর। ঘরের ভেতরটা অন্ধকার-অন্ধকার, আমরা তাই চট্ করে বুঝতে পারলাম না ওখানে কী ঘটছে। অবশেষে দেখতে পেলাম যে ক্নিশ আর ক্নিশ-গিন্নি টেবিলের ধারে বসে চামচ দিয়ে কী যেন খাচ্ছে। বেশ ভালো করে লক্ষ করার পর আমরা দুজনে অবাক হয়ে মুখ চাওয়া-চাউয়ি করতে লাগলাম। ওরা খাচ্ছিল... কেক। সচরাচর যেমন হয়ে থাকে বিস্কুট-কেক — ওপরে ক্রীম ও চকোলেটের গোলাপফুল আর জড়ানো নক্সকাটা। ওরা কেক খাচ্ছিল চামচ দিয়ে, যেন জাউ খাচ্ছে।

'কম্ম শোধ, বেচে দিয়েছে!' জাভা আচমকা ফিসফিস করে বলল।

'কী বেচে দিয়েছে?' আমি বুঝতে পারলাম না।

'দেশটাকে বেচে দিয়েছে, বেইমান! কেক যখন চামচ দিয়ে তুলে গবগব করে

সাঁটাচ্ছে তখন আর দেখতে হবে না!' জাভার কণ্ঠস্বরে এমন দৃঢ়তা ও সুনিশ্চয়তার আভাস যে মনে হচ্ছিল কেকটা বুঝি কুনিশদের বিশ্বাসঘাতকতার নির্ঘাত প্রমাণ।

আমরা এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম যে কুনিশ কখন ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে তা খেয়ালই করি নি। একমাত্র তখনই তাকে দেখতে পেলাম যখন সে দেউড়িতে দাঁড়িয়ে সিগারেট পাকাচ্ছে। ঘটনাটা এমনই আচমকা যে আমি চমকে গেলাম, আমার পায়ের নীচের ডালটা মড়মড় করে উঠল। আমরা কুনিশের নজরে পড়ে গেলাম।

'অ্যাই, তোরা ওখানে কী করছিস? ওরে চোর! ওরে কুত্তার বাচ্চারা! পরের গাছে উঠেছিস, শয়তানের ঝাড় কোথাকার! দাঁড়া মজাটা দেখাচ্ছি এখুনি! এর জন্যে আমি তোদের ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব! নাম বলছি, পাজী!'

সে গাছের নীচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এত জোরে হাত নাড়ছিল যে মনে হচ্ছিল তার ফলে যেন বাতাস তোলপাড় হয়ে উঠল। নেমে আসা মানে নির্ঘাত মৃত্যু। আমরা ওপরে উঠতে লাগলাম।

কুনিশ নীচে দাঁড়িয়ে তর্জনগর্জন করে চলল।

'জানেন, ছোটদের ভালোবাসতে হয়,' হঠাৎ করুণস্বরে বলল জাভা।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাদের ভালোবাসতে হয়,' আমি সায় দিয়ে বললাম আর সেই সঙ্গে কান পেতে শুনে আঁতকে উঠলাম — আমার পায়ের নীচের ডালটা মড়মড় আওয়াজ করছে।

'সোভিয়েত মানুষেরা সব্বাই ছোটদের ভালোবাসে,' জাভা বলে চলল। 'ইস্কুলের দিদিমণিও সেই কথা বলেন, আর সমস্ত কাগজেও তাই লেখে।'

কুনিশ বেজায় খাপ্পা হয়ে উঠল:

'আমি তোদের ভালোবাসতে যাচ্ছি! ভালোবাসা কাকে বলে টের পাবি এখন! তোরা আবার বাচ্চা! তোরা হলি ডাকাত, বাচ্চা নয়! এ ধরনের বাচ্চাদের খুন করতে হয়!'

তখন জাভা বলল:

'জানেন, আমরা কিন্তু আপনাকে কিয়েভে দেখেছি। আপনি আর একজন কার সঙ্গে পার্কে দরাদরি করছিলেন...'

কর্নিশ হঠাৎ চুপ করে গেল। একেবারে সঙ্গে সঙ্গে। রেডিও বন্ধ করে দিলে যেমন হয়। তারপর আমতা-আমতা করে কী সব বিড়বিড় করল, যার বিন্দুবিসর্গ আমরাও বুঝতে পারলাম না, আবার চুপ করে গেল। তার চেহারায় হতভম্ব ভাব।

কর্নিশ-গিন্নি তার স্বামীর চিৎকারে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল, সেও এই সময় ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। তারপর কর্তার উদ্দেশে ঝাঁঝিয়ে বলল:

'আরে, বাচ্চাদের পেছনে আবার লাগতে গেলে কেন? অ্যাঁ? ইস্, দেখ দেখি, কী ভয় পেয়ে গেছে, আহা বেচারিরা, মুখ একেবারে শুকিয়ে গেছে গো...'

'আরে না না, আমি কি আর সত্যি সত্যিই কিছু করতে যাচ্ছি?' এবারে একেবারে অন্য স্বরে বিড়বিড় করে বলল কর্নিশ। 'আমি কি আর মারতাম, আমি কেবল একটু ভয় দেখাতে চাইছিলাম যাতে গাছে না চড়ে।'

'ভয় পেয়ো না ছেলেরা। গাছ থেকে নেমে পড়ে বাড়িতে চলে যাও। যাও, যাও,' স্নেহমাখা সুরে বলল কর্নিশ-গিন্নি।

বেশি অনুরোধ করার দরকার ছিল না। আমরা চোখের পলকে বাদাম গাছ থেকে নেমে পড়ে কর্নিশদের পাশ কাটিয়ে এক ছুটে রাস্তায় গিয়ে পড়লাম।

'এখন কী বলবি বল্?' জাভা জিজ্ঞেস করল।

'বোঝ কান্ড! কী ভয়ই না পেয়ে গেল যখন তুই বললি! মুখে রা'টি নেই, জিভ আর সরে না। তার মানে, ব্যাপার গুরুতর।'

'আমি তোকে কী বলেছিলাম!'

'আর দ্যাখ্, কুনিশ-গিন্নি সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা কেমন ঘুরিয়ে নিল, চেপে যাবার চেষ্টা করল... ওঃ কী ধূর্ত!'

'সংক্ষেপে বলতে গেলে, ওদের পেছনে নজর রাখা দরকার — এতে আর কোন সন্দেহ নেই! ওদের মুখোস খুলে দিতে হবে! যে ভাবেই হোক, যেমন করেই হোক! শক্তি খরচে কার্পণ্য করলে চলবে না। এই কাজে নিজেকে সঁপে দিতে হবে!'

যাই হোক, কুনিশের মুখোস খুলে দেওয়ার কাজে দুর্ভাগ্যবশত ঠিক এই মুহূর্তে আমরা নিজেদের সমর্পণ করতে পারলাম না। দুঘণ্টা বাদে ইস্কুল, অথচ আমাদের পড়া এখনও তৈরি হয় নি।

আমরা দুজনে একসঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে চললাম পড়া তৈরি করতে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভুট্টাক্ষেতের ঘটনা

একবার (ঘটনাটা ঘটেছিল গত বসন্তকালে) জাভা হঠাৎ প্রস্তাব করে বসল: 'আয় পাভেল, নতুন এক জাতের ভুট্টা ফলানো যাক।'

আমি ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম: ওর কি অসুখ-বিসুখ করল না কি? এদিকে ও বলে চলেছে:

'বুঝলি পাভেল, ভুট্টা হল খুবই উঁচুদরের চাষের জিনিস, নতুন জাতের ভুট্টা ফলানো — দেশের পক্ষে একটা বড় কাজ। মোট কথা, মিচুরিনের পন্থায় যারা নতুন জাতের ফসল ফলায় তারা সকলেই দারুণ শ্রদ্ধার পাত্র — মহাকাশচারীদের

চেয়ে কোন অংশে কম নয়। এই দ্যাখ্ না, আমার মা, গণপ্রতিনিধি, মিটিং করতে কিয়েভে যান আবার সব সময় প্রেসিডিয়ামে বসেন।'

আমি অনেকক্ষণ ধরে শুনলাম, শেষে আর ধৈর্য ধরতে পারলাম না।

'হুঃ, তুইও যেমন!' আমি বললাম, 'কী মজার কাজই না বার করলি — ভুট্টা ফলানো।'

ও আমার দিকে তাকিয়ে অবজ্ঞাভরে মুখ বাঁকাল।

'পাভেল, তুই হলি একটা আকাট মূর্খ,' ও বলল। 'তুই কিছুই বুঝিস না। জানিস, আমি যদি নতুন জাতের ভুট্টা বার করতে পারি তার অর্থ আমার কাছে কী হতে পারে? একটা হিল্লে হয়ে যেত আমার! ওঃ, কী বলব! কোন ব্যাকরণ-ট্যাকরণ নয়, প্যাণ্টের জন্যে আমাকে ভয়ে ভয়ে থাকতে হত না। মা যদি আমাকে প্যাণ্টের জন্যে বা ব্যাকরণের জন্যে বকতে শুরু করেন, আমি অমনি তাঁকে বলব নতুন জাতের ভুট্টার কথা। সঙ্গে সঙ্গে মা হয়ে যাবেন অবাক, দুনিয়ার আর সবকিছু ভুলে যাবেন। ভুট্টা যে তাঁর প্রাণ। আমি তাহলে চিরকালের মতো ঝামেলা থেকে রেহাই পেতাম।'

জাভার বহু দুর্ভাগ্য ব্যাকরণ ছাড়াও প্যাণ্টের সঙ্গে জড়িত ছিল। জাভার পরনের প্যাণ্ট পুড়ে যায়। যে কোন নতুন প্যাণ্ট, তা যত মজবুত কাপড়েই তৈরি হোক না কেন, দুসপ্তাহের মধ্যে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত। তার কারণ এই যে জাভার স্বভাবটাই ছিল ঐ রকম। জাভা ত হাঁটত না, দৌড়ুত না, ও উড়ত। বিমান-বিজ্ঞানের ভাষায় প্রকাশ করতে গেলে (আমি আবার বৈমানিক হতে চাই কিনা!) ওর স্বভাবটা হল গিয়ে রিঅ্যাক্টিভ — ঘণ্টায় হাজার হাজার কিলোমিটার। এই ধকল আর গতিবেগ সর্বোপরি সহ্য করতে পারত না তার প্যাণ্ট। ছিন্নভিন্ন হয়ে প্যাণ্টের নীচের দিকটা ঝালরের আকার ধারণ করত। জাভা বেজায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাঁচি দিয়ে ঝালরগুলি কাটত। তাকে বেশ ঘন ঘন এই কর্তনকর্মে ব্যস্ত থাকতে হত আর তার ফলে প্যাণ্ট প্রতিবারই ক্রমাগত খাটো হতে থাকত। তাছাড়া জাভা কোন না কোন কিছু দিয়ে সব সময় প্যাণ্টে খোঁটা লাগিয়ে ফেলত এবং এই 'কোন না কোন কিছুর' গায়ে প্যাণ্টের টুকরো আটকিয়ে থাকত আর তার ফলে জাভার প্যাণ্ট শেষ পর্যন্ত হত বেল্ট-সর্বস্ব।

হ্যাঁ, নতুন জাতের ভুট্টা ফলানোর কাজটা জাভার পক্ষে ছিল বড় দরকারী এবং কাজের মতো কাজ।

'তুই বুঝলি কিনা,' সে আমাকে বোঝাতে থাকে, 'কাজটা মনে না ধরার ত কোন কারণ নেই। কে বলতে পারে আমরা খাঁটি মিচুরিনপন্থী বৈজ্ঞানিক হব না? ওটা কি খারাপ? গোটা দেশের লোক আমাদের সম্পর্কে জানতে পারবে। পত্রিকায় ইয়া বড় বড় অক্ষরে লেখা হবে।'

'না,' আমি বললাম, 'আমার কাজ নেই। আমি বৈমানিক হতে চাই। বৈমানিক আর মিচুরিনপন্থী বৈজ্ঞানিক একসঙ্গে হওয়া যায় না, কেননা আকাশে ভুট্টা জন্মায় না। যে-কোন একটা হতে হবে। তাছাড়া আমার বিশ্বাস হয় না যে আমরা সত্যিকারের দামী কিছু ফলাতে পারব। তার জন্যে যে এখানে কিছু থাকা দরকার,' এই বলে আমি নিজের মাথায় আঙুলের টোকা দিলাম, 'আর কাজও করা দরকার অনেক। না, না!'

'তুই হচ্ছিস এক নম্বরের বাচাল।'

'আর তুই হলি একটা ঝিম্ ধরা মাছি!'

'তুই... তুই হলি গিয়ে ...ছিঃ তোকে!'

'তোকেও ছি-ছি দিতে হয়!'

আমরা সেদিন দারুণ ঝগড়া করলাম। অবশ্য দুদিন বাদে আমাদের ভাব হয়ে গেল, তবে ভুট্টার কথা আমরা আর তুললাম না। স্কুলের ছুটির সঙ্গে সঙ্গে আমি অন্য গাঁয়ে বেড়াতে চলে গেলাম, ফিরে এসে দেখি জাভা নেই — সে চলে গেছে পাইওনীয়ার ক্যাম্পে। এই ভাবে সারাটা গরমকাল আমাদের দেখাসাক্ষাৎই হল না। আমাদের দেখা হল একমাত্র স্কুলের পড়াশুনা শুরু হতে। বসন্তকালে আমাদের সেই যে কথাবার্তা হয়েছিল তা অবশ্যই আমি বেমালুম ভুলে গেছি। হঠাৎ সে আমাকে বলল:

'জানিস পাভেল, আমি কিন্তু শেষ অবধি নতুন জাতের ভুট্টা লাগিয়েছি।'

আমার মুখ হাঁ হয়ে গেল।

'গাঁজাখুরি...' আমি বললাম। 'কোথায়? কী ভাবে?'

'মা'র জমিতে। একবার আমি চিলেকোঠায় উঠলাম, তুই আমাকে যে চাকাটা উপহার দিয়েছিলি ওটার খোঁজে। আর আমাদের চিলেকোঠায়, তুই ত জানিসই সব সময় গড়াগড়ি যাচ্ছে ভুট্টার শিষ — লাখে লাখে। আমি ত চাকা খুঁজে চলছি, খুঁজতে খুঁজতে আচমকা চোখে পড়ে গেল একটা অস্বাভাবিক আকারের গোটা ভুট্টার শিষ — হুবহু যেন একটা বাচ্চা শুয়োর। অমন জন্মে দেখি নি। আমার মনে সঙ্গে সঙ্গে খট করে লেগে গেল: আরে, এটা বোধ হয় নতুন জাতের কোন ভুট্টা — আপনাআপনিই জন্মেছে, দৈবাৎ, আর ঘটনাটা কেউ জানে না। মা হয়ত অন্যান্য ভুট্টার শিষের সঙ্গে ওটাকে লক্ষ করেন নি, ওটার দিকে নজর দেন নি। বোঝ্ কাণ্ড! ভাগ্য আপনাআপনি এসে গেল হাতের মুঠোয়। আমি ভুট্টার দানা ছাড়িয়ে নিলাম। ওঃ দানা বটে! ওরকম একটা দানা দিয়ে যদি তোর কপালে বাড়ি মারা যায় তাহলে ইয়া বড় ঢিবি বেরিয়ে যাবে... আমি চুপে চুপে মা'র জমিতে চললাম, সবচেয়ে ভালো জায়গা বেছে নিয়ে লাগানো ফসল সেখান থেকে খানিকটা তুলে ফেলে দিয়ে পুরো এক সারি আমার ঐ ভুট্টা বুনে দিলাম। কিছু খুঁটিও পুঁতে এসেছি যাতে জায়গাটা মনে থাকে, গোলমাল না করে ফেলি।'

'তাতে হল কী?' আমি অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করি। 'তোর ঐ ভুট্টা ফলেছে কি?'

'হ্যাঁ, খুব সম্ভব। আমি জানি না। তারপর যে আমি ক্যাম্পে চলে গেলাম। চল্, আজ দুজনে মিলে যাওয়া যাক, দেখা যাবে। কী বলিস?'

'বেশ,' আমি বললাম, 'এমনই যখন ব্যাপার তখন যেতে হয় বৈ কি। তাছাড়া হপ্তা দেড়েক বাদে ক্ষেতের ভুট্টা তোলা শুরু হয়ে যাবে। তোর ঐ ভুট্টা কম্বাইন দিয়ে তোলা হয়ে গেলে তখন আর পাত্তাই করতে পারবি না।'

এই কথাবার্তা হচ্ছিল টিফিনের সময়। ক্লাসের ছুটির পর জাভা বলল:

'চল্।'

'খেয়ে নিলে হত না?' আমি বললাম।

'আরে, খাওয়ার কী আছে? মারা যাবি না। আমরা তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। চট করে দেখে ফিরে চলে আসব। সন্ধে অবধি ঢের সময় পাবি খাওয়ার।'

ও এতটা অধৈর্য হয়ে পড়েছে দেখে আমি রাজীই হয়ে গেলাম। কে জানে, হয়ত বা ও সত্যি সত্যিই নতুন কোন জাতের ভুট্টা বার করেছে!

আমরা চললাম।

গাঁ থেকে বেরিয়ে এসে মাঠের পথ ধরে চললাম।

আকাশে মেঘের চিহ্ন নেই। সূর্য আলো দিচ্ছে, সেপ্টেম্বরের রোদ — তেমন গরম নেই, প্রাণ জুড়ানো।

পথের দুপাশে ঘন সবুজ দেয়ালের আকারে বনের মতো ভুট্টা ক্ষেত, ভুট্টা গাছগুলি তিন মিটার কিংবা তারও বেশি উঁচু হবে। এ বছর চমৎকার ফসল ফলেছে।

আমরা চলছি ত চলছিই। গ্রাম আর এখন চোখে পড়ে না।

'আর কত দূর রে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আরে না। আর সামান্য, এই ত।'

এর পর আমরা অন্তত আরও মাইল দুয়েক পেরিয়ে গেলাম। অবশেষে জাভা বলল:

'এই যে এখানে। দেখতে পাচ্ছিস, ফলকে লেখা আছে?'

সত্যিই, পথের পাশে একটা খুঁটির গায়ে প্লাই উডের বোর্ড ঝুলছে, তার ওপর আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা আছে:

এক নম্বরী বুকোভিন্ জাতের ভুট্টা
নাদেজ্দা রেন্-এর বরাদ্দ জমি
আয়তন ৮·৫ হেক্টর

'ঠিকই ত,' আমি বললাম, 'এটাই বটে।'

'চল্,' জাভা বলল, 'এবারে ভেতরে যেতে হবে।'

আমরা পথ থেকে মোড় নিয়ে ভুট্টা ক্ষেতের ভেতরে ঢুকে গেলাম। জাভা আগে আগে, আমি ওর পেছন পেছন।

হঠাৎ যেন ঘন জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পড়লাম। ওঃ কী ঘন ভুট্টার ক্ষেত রে বাবা! সব সময় হাত দিয়ে পাতা সরাতে হচ্ছে যাতে নাকের ওপর বাড়ি না লাগে। তায় আবার অসুবিধার সৃষ্টি করছে স্কুলব্যাগ — বেধে যাচ্ছে। জাভাকে আমি সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে ফেললাম, ওকে চোখে দেখতে পাচ্ছি না। কেবল সড়সড় আওয়াজ শুনে বুঝতে পারছি কোথায় যেতে হবে।

কিছুক্ষণ বাদে জিজ্ঞেস করি:

'কী হল? আর কত দূর?'

'এই ত, এসে গেলাম,' সামনে শুনতে পাই জাভার প্রফুল্ল কণ্ঠস্বর। রিঅ্যাক্টিভ আর কাকে বলে!

'দাঁড়া দেখি, অত তাড়াহুড়ো করিস নে,' আমি চিৎকার করে বললাম, 'নইলে আমি দেখতে পাচ্ছি না কোন দিকে যেতে হবে!'

ইতিমধ্যে দু-দুবার আমার হাত থেকে ব্যাগ পড়ে গেছে, ভুট্টার কর্কশ পাতার ঘায়ে গাল গেছে ছড়ে।

শেষকালে আবার জিজ্ঞেস করলাম:

'কী হল? খুঁজে পেলি?'

'না, এখনও পাই নি। বড় ঘন।' তার কণ্ঠস্বরে আর সেই প্রফুল্লতার আভাস পেলাম না।

'শোন্,' আমি বললাম, 'চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে হামা দিয়ে চল্। নইলে জীবনে কখনও ঐ খুঁটিগুলো চোখে পড়বে না।'

এই কথা বলে আমি নিজেই চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে হামা দিয়ে চললাম ব্যাগটা দাঁতে চেপে ঝুলিয়ে, যাতে অসুবিধার সৃষ্টি না করে।

হামা দিয়ে চুপচাপ চলতে থাকি — ব্যাগ দাঁতে চেপে ধরে ত আর তেমন বেশি কথাবার্তা চালানো যায় না। চারপাশে তাকিয়ে তাকিয়ে খুঁটির খোঁজ করি। এই ভাবে ছুটতে ছুটতে নাকে ঠোক্কর খেলাম সোজা জাভার প্যান্টের সঙ্গে। দেখি সেও চলেছে ব্যাগ দাঁতে চেপে ধরে। আমরা বসলাম ব্যাগ মাটিতে রেখে, কোন রকমে দম নিচ্ছি।

'কী হল রে?' জিজ্ঞেস করলাম।

'আরে বুঝলি,' ও ভেবাচেকা খেয়ে বলল, 'এই ঝোপেঝাড়ের মধ্যে খোঁজা বড় কঠিন। এখানেই কোথাও হবে, কিন্তু খুঁজে বার করতে পারছি না।'

'আয় তাহলে,' আমি বলি, 'নিয়মমাফিক কাজে নামা যাক। নিয়মমাফিক যতটা সম্ভব এই জমিটাকে আঁচড়ে দেখা যাক। তুই একদিক থেকে হামা দিয়ে আসতে থাক, আমি আরেক দিক থেকে, তারপর দুজনে এসে মিলব। ভুট্টা লাগানো হয় চৌকো সার দিয়ে খুপরি বেঁধে আর আমরাও আঁচড়ে চলব ঐ চৌকো খুপরি ধরে। ব্যাপারটা অতি সহজ।'

জাভা উল্লসিত হয়ে উঠল।

'ঠিক বলেছিস। আমি অনেক আগেই বলেছিলাম যে পাভেল, তুই হলি একটা জিনিয়াস। কেবল একটা কথা বলি, আয় আমাদের ব্যাগগুলোকে এখানে রাখা যাক, ওগুলোকে দাঁতে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া বড় শক্ত।'

আমরা আমাদের ব্যাগ রেখে হামা দিয়ে চলতে শুরু করলাম — আমি একদিকে, জাভা অন্য দিকে।

চলতে চলতে দেখতে থাকি। যদিও আমি বলেছিলাম যে ব্যাপারটা অতি সহজ, চৌকো ধরে বার করা যেতে পারে, কিন্তু দেখা গেল তেমন সহজ মোটেই নয়। মাথাটা যদি জমির একেবারে কাছাকাছি ধরা যায়, তাহলে ঐ চৌকোগুলো— সারগুলো তবু খানিকটা দেখা যায়, অথচ মাথা ওঠালেই চৌকো-টৌকোর কোন বালাই নেই, শুধু ঘন ঘন পাতা। সব সময় ত আর মাটিতে গাল ঘষটানো যায় না।

হামা দিয়ে চলছি ত চলছিই, কখনও সোজা, কখনও আঁকাবাঁকা, হাঁটুদুটো ইতিমধ্যে ছড়ে গেছে — খুঁটির কোন পাত্তা নেই।

'জাভা,' আমি হাঁক পাড়লাম।

'এই যে আমি!' দূর থেকে সাড়া মিলল।

'চল্ রে,' আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'পিছু ফেরা যাক!'

'চল্!'

আমি পিছু ফিরতে লাগলাম। আমার মনে হল সামনে আসতে যতটা সময় লেগেছিল পেছিয়ে যেতে যেন তার চেয়ে অনেক বেশি সময় লাগছে। অনেক আগেই জাভার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যাবার কথা, অথচ ওকে এখনও দেখতে পাচ্ছি না। এমন কি ওর গলাও শুনতে পাচ্ছি না।

'জাভা!' শেষকালে আমি ডাক দিলাম।

'এই যে আমি!' বহু দূরে থেকে, ডান পাশের কোন এক জায়গা থেকে শোনা গেল তার কণ্ঠস্বর।

'জাভা!' আমি চেঁচালাম। 'ধুত্তোর, তুই গেলি কোথায়! অন্য দিকে চলেছিস দেখি।'

'তুই,' ও চেঁচিয়ে বলল, 'তুইই ত চলেছিস অন্য দিকে। আমি ঠিকই চলেছি!'

'কী যে করিস! এদিকে এগিয়ে আয়!'

'তুই এগিয়ে আয় না!'

এই ভাবে ডাকাডাকি করতে করতে আমরা একে অন্যের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলাম। অনেক সময় লাগল। অবশেষে আমাদের দুজনের দেখা হল। দুজনেই ক্ষিপ্ত হয়ে আছি।

'কী হল?' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'পেলি?'

'পেলি, পেলি!' ভেঙচি কেটে ও বলল। 'আমি পেলে কি আর তোর দিকে হামা দিয়ে আসতাম? তাহলে ত আমিই তোকে ডাকতাম!'

'থাক,' আমি বললাম, 'যথেষ্ট হয়েছে। তোর ঐ মিচুরিন-পদ্ধতি আমাকে বিরক্তি ধরিয়ে দিল। আমি বাড়ি চললাম। আমার খিদে পেয়েছে। আমার ব্যাগ কোথায়?'

'যেখানে রেখেছিলি সেখানেই আছে।'

আমি মাটিতে শুয়ে পড়ে চারপাশে নজর বুলিয়ে দেখতে লাগলাম। একগাদা ধুলো গিলে ফেললাম, কিন্তু ব্যাগের দেখা পেলাম না।

'তোর জন্যেই এমন কাণ্ড হল, তোরই ত দোষ,' আমি বললাম। 'কোথায় চলালি তার নেই ঠিক। তোর জন্যেই ত আমাদের ব্যাগ খোয়া গেল। এখন এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে চেষ্টা করে দ্যাখ্, খুঁজে বার করতে পারিস কিনা।'

'আমার দোষ নেই, তুইই ত তালকানা হয়ে বোকার মতো কোথায় যেন হামা দিয়ে চলতে গিয়ে সব গুলিয়ে ফেললি।'

'যাক গে,' আমি বললাম, 'ঝগড়াঝাঁটি পরে করা যাবে, আয় আগে ব্যাগ খুঁজে বার করি।'

আমরা ব্যাগের খোঁজে হামা দিয়ে চললাম।

এবারে আমরা চললাম একসঙ্গে, এমন কি নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য আমি জাভার প্যান্ট চেপে ধরে রাখলাম।

আধঘণ্টা বাদে আমরা বুঝতে পারলাম যে ভুট্টার এই গভীর অরণ্যের মধ্যে ব্যাগ খুঁজে বার করা ঐ খুঁটিগুলো খুঁজে বার করার চেয়ে সহজ নয়। আমাদের হাঁটু আগুনের ছেঁকার মতো জ্বলতে লাগল। আমরা যখন আবার উঠে দাঁড়ালাম তখন আমাদের প্রায় পড়ে যাবার দশা — দুই পা অবশ হয়ে গেছে, গুটিয়ে আসছে, আমাদের ভার ধরে রাখতে পারছে না।

আমি বললাম:

'ওরে জাভা, ব্যাগ-ট্যাগ বাদ দেওয়া যাক এখন, চল্, বাড়ি যাই। খাওয়াদাওয়া করে আবার ফিরে আসা যাবে ব্যাগের খোঁজে। এইসা খিদে পেয়েছে যে মাথা কাজ করছে না। মাথাটা কেমন যেন ভোঁভোঁ করছে, কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'চল্,' জাভা সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল, 'আমারও পেটের চামড়া পিঠে এসে ঠেকেছে। আমাদের পেটে খিদে কিনা, হয়ত সেই কারণেই খুঁজে পাচ্ছি না। খাওয়াদাওয়া করে আসার পর আমরা সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগ খুঁজে পাব, এমন কি খুঁটিগুলোও। চল্।'

জাভা উল্লসিত হয়ে আগে আগে ছুটে চলল। আমি ওর পেছন পেছন। হাঁটুতে ব্যথা সত্ত্বেও আমরা বেশ তাড়াতাড়িই চলছিলাম, প্রায় ছুটেই চলছিলাম।

ভুট্টার পাতা আমাদের গালে ঘা মারছিল। কিন্তু আমরা তাতে ভ্রূক্ষেপ করলাম না। আমাদের তখন খাবার তাড়া।

হাঁটা ক্রমেই আরও কঠিন হয়ে দাঁড়াল।

আমি ঘন ঘন হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম:

'জাভা, আমরা যেন বড় বেশি সময় ধরে চলছি।'

জাভা চুপ করে রইল।

'জাভা,' আরও ঘন ঘন নিশ্বাস নিতে নিতে আমি বললাম, 'রাস্তা কোথায় রে?'

জাভার মুখে কথা নেই।

'জাভা,' আমি প্রায় হাঁসফাঁস করতে করতে চেঁচিয়ে বললাম, 'আমরা অন্য দিকে চলেছি!'

জাভা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'তা কোন্ দিকে যেতে হবে বল্? তুই জানিস, কোন্ দিকে?'

'না,' আমি কোন রকমে খাড়া থেকে বললাম, 'তুইই ত আমাকে এখানে টেনে এনেছিস, এবারে তুইই বার করে নিয়ে যা!'

জাভা শক্তি হারিয়ে ধপ্ করে মাটির ওপর বসে পড়ল।

'আমি তোকে বার করে নিয়ে আসতাম,' দম নিতে নিতে এই কথা বলে সে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। 'তোকে বার

করে নিয়ে আসতাম যদি তুই আমাকে গুলিয়ে না দিতিস। এখন আমি কিছু জানি না।'

'কিছু জানিস না মানে? এই ভাবে ফাঁসিয়ে দিয়ে তারপর বলতে চাস যে কিছু জানিস না?'

'কোন্ দিকে যেতে হবে জানি না। এই হল মোদ্দা কথা। এখানে কেবল ক্ষেত আর ক্ষেত কিলোমিটারের পর কিলোমিটার চলে গেছে। ঠিক দিকে যদি না যাই, তাহলে দুদিন হাঁটলেও বেরোবার কোন সম্ভাবনা নেই। আমরা একেবারেই পথ হারিয়ে ফেলতে পারি।'

'কী? কী সব আগড়ম-বাগড়ম বলছিস? এ ত আর বন নয়, জলার জঙ্গলও নয়, এ হল ভুট্টাক্ষেত। ভুট্টাক্ষেতের ভেতরে আবার পথ হারানোর কী আছে? উঠে পড়্, আমাকে এক্ষুনি বার করে নিয়ে চল্! আমার খিদে পেয়েছে, শুনছিস? খিদে পেয়েছে আমার!'

'তুই যখন মনে করছিস যে পথ হারানোর কিছু নেই, তখন তুই নিজেই বেরিয়ে পড়্ না কেন।'

'কী বল্লি — নিজে? বলছিস নিজে বেরিয়ে পড়ি না কেন? তোর মা হলেন ভুট্টা চাষের বিশেষজ্ঞ। আর আমার মা গয়লানী। যদি বলিস গোয়ালের কথা, সেখান থেকে আমি চোখ বন্ধ করে বেরোতে পারি।'

'আয় একটু জিরিয়ে নিই। খালি ঘ্যানঘ্যান। তুই আবার পাইলট হতে চাস! কিসের তুই পাইলট! তোর কোন মনের জোর নেই! অপদার্থ কোথাকার! তোরই নামের মহাকাশচারী পাভেল পপোভিচ যদি জানতে পারতেন যে তাঁর দেশে এমন লোক আছে... এঃ! কেবল ভালো নামটায় কালি ছিটোচ্ছিস!'

আমরা যদি ক্লান্ত না হতাম আর এমন শোচনীয় পরিস্থিতিতে না পড়তাম, তাহলে হয়ত মারামারিই বাধিয়ে বসতাম। কিন্তু নিজেদের মধ্যে হানাহানি করে শক্তি ও উদ্যম ক্ষয় করার উপায় আমাদের ছিল না।

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে জাভার পাশে শুয়ে পড়লাম।

হঠাৎ আমার মাথায় একটা আইডিয়া খেলে গেল।

আমি বললাম:

'আচ্ছা জাভা, গাছে উঠে যদি তাকিয়ে দেখি কোথায় যেতে হবে তাহলে কেমন হয়?'

'গাছে চেপে? গাছ বলতে তুই কী বুঝিস? এ যে ভুট্টাগাছ। ফসল। ফসলের গা বেয়ে কেউ উঠেছে এমন কথা আমি জন্মে শুনি নি।'

'এই দ্যাখ্ না,' আমি বললাম। 'দেখতে পাচ্ছিস, কেমন মজবুত। বাঁশের মতো! হয়ত ভার সহ্য করতে পারবে।'

'তাহলে উঠে পড়্।'

'না তুই ওঠ্। তুই আমার চেয়ে হালকা আছিস — তোর প্যাণ্ট অনেকটা খাটো, প্যাণ্টের বোতামও কম। আমি তোকে উঠতে সাহায্য করব।'

গোড়ায় জাভার ইচ্ছে ছিল না। সম্ভবত তার খারাপ লাগছিল এই ভেবে যে বুদ্ধিটা ওর মাথা থেকে বেরোয় নি। আইডিয়ার ক্ষেত্রে নিজের একচেটিয়া প্রভুত্বে সে অভ্যস্ত। পরে অবশ্য হাল ছেড়ে দিয়ে বলল:

'আয় তাহলে, চেষ্টা করে দেখা যাক।'

আমরা বেশ উঁচু আর মোটাসোটা গোছের একটা ভুট্টাগাছ বেছে নিলাম, আমি সেটার গায়ে পিঠ ঠেকালাম, এক হাতের আঙুলের ফাঁকে আরেক হাতের আঙুল গেঁথে নিয়ে হাত পাতলাম জাভাকে ধরার জন্য — ও আমার হাতের ওপর পা রেখে দাঁড়াবে। আমি ওকে বললাম:

'তুই আমার ওপর বেশি ভর দিবি, ভুট্টাগাছটা কেবল আঁকড়ে ধরবি।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' এই বলে জাভা কঁকিয়ে কুঁথিয়ে আমার গা বেয়ে উঠতে লাগল। এবারে হাঁটু দিয়ে কাঁধের ওপর দাঁড়াল, দুহাতে আমার মাথার ওপর ভর দিল।

ওঃ, জুতোটা বেধে গেল আমার নাকে। কিন্তু আপাতত আমি মুখ বুজে সহ্য করি। ওর জুতো আমার কাঁধে চেপে চেপে বসেছে, জুতোর গোড়ালিতে কাঁধের হাড় ভাঙে ভাঙে অবস্থা। আমি টলমল করতে থাকি, হাঁটুদুটো কাঁপে, কেবলই দুমড়ে আসতে থাকে।

'জাভা,' আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'ওরে দ্যাখ্ দ্যাখ্, আমি কিন্তু পড়ে গেলাম!'

...সঙ্গে সঙ্গে কী যেন মড়মড় করে উঠল একটা গোলমাল আর করকর আওয়াজ কানে এলো — মনে হল ভুট্টাক্ষেতে যেন বোমা পড়ল।

আমি মাটিতে নাকমুখ থুবড়ে পড়ে যাই। মুখের ভেতরে বালি, কানে বালি। নাক ঝাড়ি, থুথু করি, চোখ কচলে তাকাই, চেঁচিয়ে বলি:

'জাভা, কোথায় তুই? বেঁচে আছিস?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ-চ্-চো!' ভেঙে-পড়া ভুট্টাগাছের গাদার ভেতর থেকে উঁকি মারল জাভার মাথা।

'কী হল, কিছু দেখতে পেলি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'কিছুই না, কিছুই চোখে পড়ল না,' ও বলল। 'নাকের সামনে কেবল ভুট্টার শিষ দুলছে।'

জাভা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আমি আকাশের দিকে তাকালাম।

'হাস্যকর ব্যাপার,' আমি মনে মনে ভাবলাম। 'মহাকাশচারীরা পৃথিবী থেকে শত শত কিলোমিটার দূরে অসীম আকাশে গ্রহতারার মাঝখানে ওড়ে, কিছুই হয় না ওদের। আর আমরা কিনা ভুট্টাক্ষেতের মধ্যে বেসামাল হয়ে পড়লাম!'

আমি আমার চিন্তার খেই ধরে বললাম:

'জাভা, এটা একটা বাজে ব্যাপার। এ হতেই পারে না, কেননা এটা অসম্ভব। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত ভুট্টাক্ষেতের মধ্যে কেউ পথ হারায় নি। আসলে হয়েছে কি, আমরা চলেছি অন্য দিকে। আমার স্পষ্ট মনে আছে আমরা যখন চলছিলাম তখন সূর্য ছিল আমাদের পেছন দিকে। চল্, পিছু ফেরা যাক।'

প্রথমে জাভা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। কিন্তু আমি সম্ভবত এতখানি দৃঢ়তার সঙ্গে কথাটা বলেছিলাম যে জাভা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'কে বলতে পারে? হয়ত ঠিকই বলেছিস। চল্।'

আমরা পায়ে পায়ে এগিয়ে চললাম।

ওঃ, চলা যে কী কঠিন! বাব্বাঃ, কী কঠিনই না চলা!

আমাদের পায়ের কোন সাড় আমরা পাচ্ছিলাম না। আমরা নেহাৎই যান্ত্রিকভাবে রণপার মতো একের পর এক পা ফেলছিলাম। কেন যে আমরা হাঁটু ঘষটে হামা দিতে গেলাম!

আধঘণ্টা, একঘণ্টা, না দুঘণ্টা — কতক্ষণ আমরা হাঁটলাম, কিংবা এক কিলোমিটার, দুই কিলোমিটার, না দশ কিলোমিটার — কতটা আমরা

পেরোলাম, বলা কঠিন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি আর ধৈর্য ধরতে পারলাম না।

আমি বললাম:

'জাভা, আর পারছি না! আমি এখন পড়ে যাব। আয়, একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক।'

আমরা আবার মাটিতে শুয়ে পড়লাম।

আমরা অনেকক্ষণ শুয়ে রইলাম।

চারদিকে নিস্তব্ধতা। কেবল ভুট্টাগাছের কর্কশ পাতাগুলো আমাদের মাথার ওপর সড়সড় করছে।

দূরে কোথায় যেন বটের পাখি ডেকে উঠল, তারপর আবার সব চুপচাপ।

এমন কি ফড়িংদের আওয়াজও শোনা যাচ্ছে না।

'আচ্ছা, আমরা যদি এখান থেকে একেবারেই বেরোতে না পারি?' জাভা মৃদুস্বরে বলল। 'কেউই ত জানে না আমরা কোথায় গেছি। তাই আমাদের খুঁজেই পাবে না, আমরা মারা যাব। দুসপ্তাহ বাদে কম্বাইন এসে ভুট্টা সমেত আমাদের হাড়গোড় উদ্ধার করবে।'

আমি বললাম:

'যাই বল্ না কেন, দুপুরের খাওয়াটা অন্তত খেয়ে নিলে হত। তাহলে অন্তত আরও কিছুক্ষণ টিকে থাকা যেত। এই ভাবে থাকলে ত সকাল নাগাদই টেঁসে যাব।'

খাওয়ার কথা মনে হতে আমার এমন খিদে পেয়ে গেল যে আমি প্রায় কেঁদেই ফেললাম।

'আমাদের আজকে দুপুরের খাওয়া হল বাঁধাকপির সুপ আর মাংসের পিঠে,' জাভা বিষণ্নস্বরে বলল।

'আর আমাদের হল নুড্ল আর মুরগীর রোস্ট,' আমি কোনমতে চোখের জল সামলে বললাম।

না, আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না।

আমি বললাম:

'জাভা, শোন্, লোকজনকে ডাকাডাকি করা যাক। আয় রে জাভা, লোকজনকে ডাকাডাকি করি।'

কিন্তু জাভার পৌরুষ আমার চেয়ে বেশি।

'কী যে বলিস!' সে বলল। 'লোক হাসাবি না কি? সুস্থ সবল ছেলেরা দিনে-দুপুরে যৌথখামারের ভুট্টাক্ষেতের ভেতরে কিনা বাঁচাও বাঁচাও করে চেঁচাবে!'

'তা হোক গে,' আমি বললাম, 'কেউ যদি হাসতে চায় ত হাসুক।'

'না,' জাভা বলল, 'তাই যদি বলিস, তাহলে বরং গান ধরা যাক।'

'ঠিক আছে,' আমি বললাম, 'আয় গান ধরি।'

আমরা প্রথমে যা মাথায় এলো তাই ধরলাম। আর প্রথমেই কেন জানি না, আমাদের মাথায় এলো মহাকাশচারীদের গান।

'দূর দূর গ্রহের ধূলিধূসরিত পথে...' করুণকণ্ঠে ইনিয়ে-বিনিয়ে ধরল জাভা।

'...রয়ে যাবে আমাদের পদচিহ্ন,' আমি আরও ইনিয়ে-বিনিয়ে টানলাম।

আমরা অনেকক্ষণ গান গাইলাম। যা যা গান জানতাম তার প্রায় সবগুলোই গাইলাম। কেন জানি না, বিশেষত বেশ ভালো ওতরাল সেই গানগুলো যেগুলোর শুরু এই ভাবে: 'প্রান্তরে হায় রয়েছে সমাধি', 'হায়, আমি বড়ই অসুখী', 'হায়, চাঁদ কেন দাও আলো', 'হায়, জল কেন ছলছল', 'হায়, আমি একাকিনী', 'হায়, ওগো ফসলের ক্ষেতে'...

এই 'হায়' আমরা এমন গুরুগম্ভীর গর্জনে উচ্চারণ করছিলাম যে মনে হচ্ছিল কেউ যেন আমাদের পাঁজরে লাথি মারছে।

'অথৈ সাগর রয়েছে ছড়িয়ে' গানটাও বেশ জমল। বিশেষত ভালো হচ্ছিল 'বুড়িমা বৃথাই করে পুত্রের আশা' — এই চরণটি। তিনবার আমরা এই গানটা গাইলাম আর তিনবারই 'বৃথাই' জায়গাটায় আসতে আমার কণ্ঠনালীতে খিঁচ ধরতে থাকে। অবশেষে আমাদের গলা সম্পূর্ণ ভেঙে যেতে গান থামিয়ে দিতে হল।

খিদের চোটে আর গানের তাড়নায় শক্তি হারিয়ে এবং হতাশায় ভেঙে পড়ে আমরা শুয়ে রইলাম।

আমি কেন যেন প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢোকালাম, হঠাৎ হাতে শক্ত কী একটা যেন ঠেকল। ওটা বার করতে অবাকই হয়ে গেলাম: আরে, এটা যে মিঠাই! গতকাল খেতে ভুলে গেছি। তায় আবার পেপারমিণ্ট দেওয়া! জলপিপাসা কম পাবে।

'জাভা,' আমি ভাঙা ভাঙা গলায় বললাম, 'এই দ্যাখ্!'

জাভা তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল:

'একটা?'

'একটা।'

মিঠাইটা পকেটের চাপে পড়ে গলে গেছে, মোড়কের কাগজটা এমনভাবে গায়ে লেগে গেছে যে দাঁত দিয়েও ছিঁড়ে ওঠানো যায় না। দিনকাল ভালো থাকলে আমি হয়ত ওটাকে ফেলেই দিতাম। কিন্তু এখন ওটার যা দাম, ওঃ কী বলব!

আমি মিঠাইটা সন্তর্পণে কামড়ে অর্ধেক করলাম। কিন্তু ভালোমতো ভাগ করা গেল না: একটা ভাগ বড়, আরেকটা ছোট হয়ে গেল। আরও কামড়াতে গেলে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যেতে পারে।

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বড় খণ্ডটা জাভার দিকে বাড়িয়ে দিলাম।

'এটা কেন? আমাকে ওটা দে।'

'না,' আমি বললাম, 'নে। তোর বেশি খিদে পেয়েছে।'

'তা কেন পারে?'

আমি বললাম:

'কারণ এই যে, আমি সকালের খাবারটা ভালোমতো খেয়েছি: ওমলেট খেয়েছি, সসেজও খেয়েছি, আর খেয়েছি দুধ।'

'আর আমি! আমি খেয়েছি পুরো এক থালা আলু সেদ্ধ আর মাংস, শসা আর টমেটোর স্যালাড। তার মানে আমার চেয়ে বেশি খিদে পাবার কথা তোর। নে।'

'না। এছাড়াও আমি খেয়েছি আপেলের পুর দেওয়া ইয়া বড় এক পিঠে আর জ্যাম। তুই নে।'

'আর আমি খেয়েছি দুটো পিঠে, পুরো এক জগ দুধ, এক গেলাস ননী, অর্ধেক থালা ছানা আর...'

'আমি খেয়েছি সরা-পিঠে, নাশপাতি আর...'

আমাদের সকালের খাবারের ফিরিস্তি ক্রমেই বেড়ে চলল। ঔদার্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিণতি হল এই যে জাভা বড় ভাগটা থেকে বেশ কায়দা করে ছোট্ট একটা টুকরো কামড়ে আলাদা করল, এই ভাবে ভাগদুটো সমান হল।

আমরা মিঠাইটা যতক্ষণ ধরে পারা যায় চোষার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কয়েক মিনিট বাদে মুখে ওটার স্বাদ পর্যন্ত রইল না। আরও বেশি খিদে পেয়ে গেল। খিদে আর জলতেষ্টাও। বিশেষ করে জলতেষ্টা।

দেখতে দেখতে আমরা খিদের কথা ভুলেই গেলাম। তেষ্টা, দারুণ তেষ্টা।

একমাত্র এখনই নিজেদের সত্যিকারের হতভাগ্য বলে মনে হতে লাগল। শুকিয়ে যাওয়া ঠোঁট আমরা কোন রকমে নাড়তে থাকি।

সূর্য ডুবতে থাকে, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে।

সামনে রাত। সকাল অবধি আমরা টিকে থাকব কি?

'আমাকে ক্ষমা করিস রে পাভেল, যদি কোন অপরাধ করে থাকি,' হঠাৎ শান্ত ও মর্মস্পর্শী স্বরে বলল জাভা।

আমি বুঝলাম যে ও আমার কাছ থেকে বিদায় নিতে চাচ্ছে।

'তুইও আমাকে ক্ষমা করিস রে জাভা,' ভাঙা ভাঙা রুদ্ধকণ্ঠে বললাম আমি।

এই অল্প বয়সে আমাদের সাধের জীবন এমন যা-তা ভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে মনে হতে আমি চোখের সামনে অন্ধকার দেখলাম। আমরা একে অন্যের কাছ থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম, নাক টানতে লাগলাম, অন্তিম মুহূর্তের অপেক্ষায় ধূলিধূসরিত মাটির বুকে উষ্ণ অশ্রুবিন্দু ঝরালাম। আমার বাঁ পাটা ঝিম ধরে গেল (হয়ত বেকায়দায় শুয়েছিলাম বলে)। 'ওঃ, এখনই একটা পা অবশ হয়ে গেছে। তার মানে, আর বেশি দেরি নেই!' একথা ভেবে আরও গভীর দুঃখে আমি ঘন ঘন নাক টানতে লাগলাম।

হঠাৎ একেবারে পাশেই কে যেন জোরে বলল:

'রেডিও কিয়েভ। সন্ধ্যা ছয়টা। এখনকার বিশেষ বিশেষ সংবাদ হল...'

আমাদের কে যেন চাঙ্গা করে তুলল।

'জাভা,' আমি বললাম, 'আরে, এ যে রেডিও, গাঁয়ে চলছে! আমাদের আর ভয় নেই!'

ও বলল:

'পাভেল, রেডিও চলছে, ততক্ষণ ছুট দেওয়া যাক! বন্ধ হয়ে গেলে আবার পথ গোলমাল করে ফেলব।'

আমরা গা ঝাড়া দিয়ে উঠলাম। ওঃ, যা গা ঝাড়াটা দিলাম! কান ভোঁভোঁ করতে লাগল।

কিন্তু কয়েক পা ছুটতে না ছুটতেই জাভা কিসে যেন হোঁচট খেয়ে আছড়ে মাটিতে পড়ে গেল। আমিও ছুটন্ত অবস্থায় মুখ থুবড়ে পড়লাম ওর গায়ের ওপর।

হুঁশ ফিরে আসতে উঠে বসে তাকিয়ে দেখলাম — আরে, এ যে আমাদের ব্যাগ। হুবহু রূপকথার গল্পের মতো! আমরা আনন্দে ডগমগ হয়ে বোকার মতো হেসে উঠলাম।

আমরা যখন গ্রামে পেঁছুলাম তখন জাভা চিন্তিতভাবে বলল:

'হ্যাঁ, রেডিও একটা জিনিসের মতো জিনিস বটে!'

'আর ভুট্টা — তারও জোর কম নয়। বিশেষ করে যৌথখামারের ভুট্টা...'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরীক্ষা

গরমের ছুটির আগেই আমরা পুরনো চেপটা নৌকো থেকে ডুবোজাহাজ বানাব বলে ঠিক করি। বলাই বাহুল্য, এই আইডিয়াটাও ছিল জাভার।

'জল ছেঁচে তুলতে হবে, ফুটোফাটা বন্ধ করতে হবে, আলকাতরা লেপতে হবে, ওপরে তক্তা লাগাতে হবে। এখানে থাকবে পেরিস্কোপ। আর এই এখানে হ্যাচওয়ে। তলায় থাকবে ভার,' উদ্বিগ্ন হয়ে বলল জাভা।

'আর ইঞ্জিন?'

'বৈঠায় কাজ চলে যাবে। আমাদের ত আর খুব তাড়াতাড়ি চলার মতো নৌকো দরকার নেই। ডুবোজাহাজ হলেই হল।'

'কিন্তু নিশ্বাস নেওয়া যাবে কী করে?'

'পেরিস্কোপের ভেতর দিয়ে।'

'আর ওপরে ভেসে উঠব কী করে?'

‘ভার তুলে তুলে ফেলে দিতে থাকব, তাহলেই নৌকো ভেসে উঠবে।’
‘কিন্তু জলে ভরে উঠে ডুবে যায় যদি?’
‘তুই কী রে — সাঁতার জানিস নে নাকি? যত সব!’

* * *

কত তাড়াতাড়িই না দিনগুলো চলে যায়। আমাদের ডুবোজাহাজের গায়ে আলকাতরা মাখাতে না মাখাতে, তার তলির ফুটোয় ফেঁসো লাগাতে না লাগাতে (ওপরটা ঢাকার এবং পেরিস্কোপ লাগানোর সময় আর পেলাম না) এসে গেল পরীক্ষা। কাল পরীক্ষা। আমরা নদীর পাড়ে বসে বসে আগুন জেবলে আলকাতরা ফোটাই — নৌকোর গায়ে শেষ পোঁচ লাগাই।

আলকাতরা টগবগ করে ফুটছে, যেন জাউ সেদ্ধ হচ্ছে। এদিকে আমাদের বুকের ভেতরটাও টগবগ করতে থাকে আগামীকালের দুর্ভাগ্যের উদ্বেগজনক ভাবনায়।

‘আরে, আমার মন খারাপ করার কী আছে?’ জাভা যেন নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাবে বলে। ‘যাই বল্ না কেন সবটা ব্যাকরণ শেখা আমার সাধ্যি ছিল না। দুসপ্তাহে! দুসপ্তাহে শেখে সাধ্যি কার! লোকে কত কত বছর ধরে ভেবে বার করেছে, ভেবে ভেবে মাথার ঘিলু শুকিয়ে ফেলেছে। এই ব্যাকরণের পেছনে মাথা ঘামিয়ে ঘামিয়ে কত পন্ডিতেরই না টাক পড়ে গেল! আমি কিনা সেই জিনিস দুসপ্তাহের মধ্যে শিখে ফেলব! এ কি সিনেমা নাকি!’

‘সারা বছর পড়তে তোকে কে মানা করেছিল?’ আমার বলার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু বললাম না: এখন আর বলে লাভ নেই, তাছাড়া আমিই বা এমন কী বুদ্ধিমান? — আমি নিজেও তেমন একটা পড়াশুনা করি নি, কাল বাজে নম্বর পেয়ে যেতে পারি। আটকায় কে? পরীক্ষা — পরীক্ষাই, কে জানে কেমন হবে — ভালো, না মন্দ।

‘যাই হোক না কেন, আয় না অন্তত কিছু কিছু জিনিস ফের পড়ে দেখা যাক, সাবধানের মার নেই,’ আমি বললাম।

'মরার আগে প্রাণ ভরে নিশ্বাস নেওয়া যায় না। কেবল মাথার ভেতরে সব গুলিয়ে যাবে।'

'কারাফোলকাকে কিন্তু আমি দেখেছি পুরনো পড়া ফের পড়তে, আর গ্রেবেনিউচকাও তাই করে।'

'করুক গে। ওরা সব জানে, ফের পড়া ওদেরই শোভা পায়। আমরা কিছুই জানি না। ফের পড়ার মতো কিছুই আমাদের নেই। আমাদের শেখা দরকার। অথচ একসঙ্গে সব শেখাও সম্ভব নয়।'

কী ভালোই না লাগল যে জাভা 'আমি', 'আমাদের' বলে উল্লেখ করছে। ও জানে যে আমি সব সময় সবকিছু ওর সঙ্গে সমান সমান ভাগ করে নিতে চাই — আনন্দ ও বিষাদ দুইই।

সন্ধ্যার অন্ধকার পর্যন্ত আমি আর জাভা নদীর পাড়ে নৌকোর পাশে বসে রইলাম।

অবশেষে এলো সেই দিনটি, আমাদের জীবনের প্রথম পরীক্ষার দিন।

স্কুলে উৎসবের সমারোহ, আড়ম্বর, যেমন হয়ে থাকে নির্বাচনের সময় (আমাদের এখানে প্রচারকেন্দ্র ও নির্বাচনী কেন্দ্র সব সময় হয়ে থাকে স্কুলে)। করিডরে লম্বা গালিচা বিছানো, জানলার তাকে ফুল, ক্লাসঘরের টেবিল লাল কাপড়ে ঢাকা। এমন কি ঢোকার মুখে হলঘরে ঝুলছে প্ল্যাকার্ড: 'স্বাগতম্!'

মেয়েদের গায়ে সাদা এপ্রন, ছেলেরা এমন ধোয়ামোছা হয়ে আর চুল ফিটফাট আঁচড়ে এসেছে যে সচরাচর তেমন দেখা যায় না।

ক্লাসঘরে ঢুকি। বুকের ভেতরটা হিম হয়ে আসে, উ'চু থেকে জলে ঝাঁপ দেওয়ার আগে যেমন হয়। আমরা বসি। প্রত্যেকে যে যার আলাদা আলাদা ডেস্কে। অন্যের কাছ থেকে টুকে লেখার কথা ভাবাই যায় না। ঘণ্টা বাজল।

এলেন গালিনা সিদরভনা। সুন্দর চুলের সাজ, পরনে সিল্কের পোশাক। তাঁর পেছন পেছন এলেন আমাদের ভূগোলের মাস্টারমশাই নিকোলাই পাভলভিচ। উনি আমাদের সহকারী পরীক্ষক।

গালিনা সিদরভনা বোর্ডের সামনে দাঁড়ালেন, তিনি হাতের মুঠোয় হাত চেপে ধরেন, মনে হয় যেন এখুনি গান গাইবেন (বোঝাই যাচ্ছে যে তিনিও উদ্বিগ্ন)। তিনি বললেন:

'প্রথম পৃষ্ঠায় প্রত্যেকে লেখ: 'শ্রুতলিপির পরীক্ষা, ভাসিউকোভ্‌কা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণী খ বিভাগের ছাত্র (ছাত্রী)' — তারপর যার যার নাম পদবী।'

আমরা রুদ্ধশ্বাসে মাথা নীচু করে লিখে চলি।

পরীক্ষা শুরু হয়ে গেল।

ছাত্রছাত্রীদের নিশ্বাসের ফোঁসফোঁস আওয়াজ হচ্ছে, কলম খসখস চলছে।

আমার পরিপাটি জামার কলারের নীচ দিয়ে গলগল করে ঘাম ঝরছে। ওঃ, কী নরকযন্ত্রণা এই পরীক্ষা!..

অবশেষে — শেষ হল।

আমরা টুঁ শব্দটি না করে বেরিয়ে আসি। সকলে কেমন যেন নেতিয়ে পড়েছে, চলেছে কোন রকমে — দুদিনের পাইওনীয়ার-পদযাত্রার পর যেমন হয়ে থাকে।

আমি জাভার দিকে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলাম:

'কেমন হল রে?'

ও কেবল হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল। দেখেশুনে মনে হচ্ছে ওর গতিক খারাপ। এখন সমস্ত আশা-ভরসা তার মা, যিনি হলেন একজন গণপ্রতিনিধি আর সেই সব ওপরওয়ালা যাঁরা মাস্টারমশাই ও দিদিমণিদের কাছ থেকে দাবি করেন ছেলেমেয়েরা যেন ভালো নম্বর পায়।

অনেক আগেই সকলের বাড়ি চলে যাবার সময় হয়ে গেছে, কিন্তু সবাই স্কুলের আশেপাশে ভিড় করে আছে, কেউ সেখান থেকে নড়ছে না। প্রত্যেকেই জানার জন্য অধীর হয়ে পড়েছে ব্যাপারটা কী রকম দাঁড়াল, কী রকম লিখেছে সে। গালিনা সিদরভনা আর নিকোলাই পাভলভিচ ক্লাসরুমের দরজা বন্ধ করে দিয়ে খাতা পরীক্ষা করছেন।

এমন কি স্কুলের যে কুকুরটা সব সময় আমাদের সঙ্গে আঙিনায় ছুটোছুটি করে সেও এখন শান্তশিষ্ট হয়ে দোরগোড়ায় বসে আছে — যেন সেও উদ্বেগ বোধ করছে।

নিকোলাই পাভলভিচ ইতিমধ্যে দুবার দেউড়িতে বেরিয়ে এসেছিলেন সিগারেট খেতে, তিনি বললেন:

'তোমরা এখানে কী করছ? বাড়ি চলে যাও। অমনিতেও আজ কিছু বলা হবে না। কাল সকালে এসো।'

আমরা খানিকটা এলোপাতাড়ি পা ফেলি, গেটের দিকে এগিয়ে যাই। তারপর তাকিয়ে দেখি কে একজন যেন রয়ে গেছে।

'বটে,' প্রত্যেকে ভাবে, 'ও রয়ে গেল, ফল জেনে নেবে, আর আমি কিনা বোকার মতো বাড়িতে বসে থাকব। না, তা চলবে না!'

তাই ফিরে আসতে হয়। প্রথমে মেয়েরা মাটিতে ঘর কেটে এক পায়ে লাফাতে লাগল, ছেলেরাও বল ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু করে দিল। যাই হোক না কেন, এতে করে সময় ততটা দীর্ঘ মনে হয় না।

অবশেষে দরজা খুলে গেল, দেউড়িতে বেরিয়ে এলেন গালিনা সিদরভনা। সকলে সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেল তাঁর দিকে। ছেলেরা চুপ করে রইল, কিন্তু মেয়েরা ছাতারপাখির মতো কিচিরমিচির করে বলল:

'বলুন না দিদিমণি! বলুন না, আপনার পায়ে পড়ি, বলুন!'

গালিনা সিদরভনা মাথা নাড়িয়ে অসম্মতি জানান, বলেন: 'কাল, কাল।' কিন্তু মেয়েরা নাছোড়বান্দা।

'সবটা না বলুন, অন্তত একটু আঁচ দিন না দিদিমণি!'

দিদিমণি হেসে বললেন:

'হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে। সবাই শান্ত হও। নম্বর জানানো হবে কাল, অভিভাবকদের সামনে। তবে, মোটের ওপর সকলেই প্রোমোশন পেয়েছে ক্লাস সিক্সে... সকলেই, কেবল পায় নি...'

বলতে বলতে তাঁর দৃষ্টি এসে ঠেকল জাভার ওপর।

'কেবল পায় নি রেন্। রেন্, তোমাকে আরও একবার লিখতে হবে। শরৎকালে। আবার পরীক্ষায় বসতে হবে। ডিকটেশন এমনই লিখেছ যে ফেল তো ফেল, একেবারে গোল্লা। দোষ তোমার নিজের — কতবার তোমাকে বলেছি...'

জাভার দিকে তাকাতে আমার খারাপ লাগছিল। সে দাঁড়িয়ে ছিল ফেকাসে হয়ে, মাথা নীচু করে।

ওঃ, মা হলেন গণপ্রতিনিধি! কোথায় গেল সেই ওপরওয়ালারা যাঁরা

মাস্টারমশাই ও দিদিমণিদের কাছ থেকে দাবি করেন ছেলেমেয়েরা যেন ভালো নম্বর পায়!

জাভা চিরকাল স্বাধীন প্রকৃতির, হাসিখুশি। তাকে আর কখনও আমি এমন অপমানিত, এমন করুণ ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় দেখি নি। সকলেই উৎফুল্ল ও সুখী, ক্লাস সিক্সে প্রোমোশন পেয়েছে বলে। অন্য দিকে জাভা — একমাত্র জাভাই পড়ে রইল, তাকে আবার দিতে হবে পরীক্ষা। আমার ভয় হচ্ছিল এই বুঝি ও কেঁদে ফেলে। সম্ভবত ওর নিজেরও সেই আশংকা হচ্ছিল, কেননা হঠাৎ এক পায়ে ভর দিয়ে বোঁ করে উলটো দিকে ঘুরে গিয়ে এক ছুটে পালিয়ে গেল। কেউ ওর নাগাল ধরতে ছুটল না। এমন কি আমিও না। কী বা বলতে পারতাম আমি ওকে, কী ভাবেই বা দিতে পারতাম সান্ত্বনা? আমি ক্লাস সিক্সে প্রোমোশন পেলাম, কিন্তু ওকে ফের পরীক্ষা দিতে হবে।

জীবনে এই প্রথম আমাদের দুজনের দুরকম ভাগ্য। কোন এক সময় আমরা যেমন সমান সমান ছিলাম, আগামী শরৎকালের আগে, ওর ফের পরীক্ষা দেওয়ার আগে পর্যন্ত কিছুতেই আমরা আর সেই পর্যায়ে আসতে পারছি না। তাছাড়া, শরৎকালেই বা কী হয় কে বলতে পারে?

আমি ভারাক্রান্ত মনে বাড়ি ফিরে চললাম। জীবনের প্রথম পরীক্ষা পাশের আনন্দ আমার আর রইল না।

ঐদিন জাভাকে আর দেখতে পেলাম না। ওর বাড়ির লোকে এই দুঃসংবাদটাকে কী ভাবে গ্রহণ করেছিলেন আমি জানি না। হ্যাঁ, পিঠে-টিঠে নির্ঘাত ভাজা হয় নি, কলের গানও বাজে নি।... কেবল এইটুকুই জানি যে পর দিন অভিভাবকদের সভায় জাভার মা উপস্থিত ছিলেন না। তিনি সম্ভবত দারুণ লজ্জা পেয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত, ডিকটেশনের পরীক্ষায় আমি টায়-টোয়ে পাশ করি নি, বেশ ভালো নম্বর পেয়েছিলাম। এটা জানার পর আমি সাঙ্ঘাতিক উত্তেজিত হয়ে পড়লাম।

সারা বছরের ফলাফলের হিশেবে আমি অবশ্য কোনমতে ওতরালাম, কিন্তু সে যাই হোক না, পরীক্ষায় অত ভালো নম্বর পাওয়া কী বলে... কী বলে যেন... ঐ যাকে বলে লটারিতে 'মস্ক্‌ভিচ' গাড়ি পাওয়া — অনেকটা সেই রকমই। আমি স্বপ্নেও ভাবি নি!

এর কারণ সম্ভবত ভড়কে যাওয়া, নার্ভের ওপর চাপ। প্রথম বিস্ময়ের ঘোরটা কেটে যাবার পরই আমার মনে হল, জানতে পেলে জাভার হয়ত খারাপই লাগবে। আমার দুঃখ হল, ভাবলাম: 'হয়ত বন্ধুর মতো আচরণ করি নি। কিন্তু আমি কি আর এটা চেয়েছিলাম!..'

বিষণ্ণ লাগছিল, যদিও অমনিতে মনে হতে পারে উৎফুল্ল না হওয়ার কোন কারণই আমার ছিল না: পরীক্ষায় পাশ করেছি, ক্লাস সিক্সে উঠেছি, পরশুদিন যাচ্ছি কিয়েভে আমার কাকার কাছে পুরো এক মাসের জন্য।

আমার বড় সাধ ছিল জাভার সঙ্গে কিয়েভে যাই, যাই সেখানকার ইতিহাসে মিউজিয়মে, সেখানে দেখি কসাকদের অস্ত্রশস্ত্র, বড় বড় বীরদের নিজস্ব জিনিস... মোটের ওপর সবকিছু ঘুরে ঘুরে দেখি। ঐ দুদিনের বেড়ানোতে আমরা আর কতটা দেখতে পেয়েছি? কিন্তু পুরো একটা মাস কিয়েভে — এটা যে দারুণ ব্যাপার! আমি ইতিমধ্যে বাবার সঙ্গে কথাবার্তা বলে ঠিক করে রেখেছিলাম, জাভার সম্পর্কে কাকারও আপত্তি ছিল না। এখন কিনা... জাভার মা কি আর ওকে এখন কিয়েভে যেতে দেবেন! মনে ত হয় না। কিন্তু হতেও ত পারে... একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী?

আমি জাভার কাছে গেলাম। সে রোয়াকে বসে বসে ওদের শুয়োর মানিউনিয়ার জন্য কাঠের গামলায় আলু আর বিট ছুলছিল। ওটা ছিল এক অতি বিশ্রী কাজ, জাভা এ কাজ সব সময় এড়িয়ে চলত। আর এখন কিনা ও বুড়ো মানুষের মতো নুইয়ে পড়ে বাধ্য হয়ে ভোঁতা ছুরি দিয়ে ঢিবলে ঢিবলে আলু আর ইঁদুরের মতো লিক্‌লিকে শেকড় বার করা বিট কাটছে! তার মুখের চেহারা... ওঃ, এমনই তার মুখের চেহারা...

বিট কাটতে কাটতেই জাভা নীরবে আমার উদ্দেশে মাথা নাড়ল।

'জাভা,' কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম আমি। 'কী হল রে জাভা, অ্যাঁ?'

'কী আবার হবে? কিছুই না,' মাথা না তুলে মৃদুস্বরে বলল ও।

আমি বুঝতে পারছিলাম না কী বলা যায় এর পর। আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। সেও চুপ করে রইল। তারপর ঐ ভাবে আমার দিকে না তাকিয়েই হঠাৎ জিজ্ঞেস করল:

'কিয়েভ যাচ্ছিস?'

'পরশ্বদিন। আর তুই?'

'আমি?' বাঁকা হাসি হাসল ও। 'প্যারিস। তারপর রিও-ডি-জেনিরো।'

বৃথাই জিজ্ঞেস করা। বলাই বাহ্বল্য ও কোথাও যাচ্ছে না। কোথাও যাচ্ছে না, বেচারি জাভা। অথচ সবাই যাচ্ছে। এই ত কারাফোলকা, আজ সকালে চলে গেল সম্বদ্রের ধারে, পাইওনীয়ার ক্যাম্পে। আমি আর জাভা সম্বদ্রের ধারে কখনও যাই নি। কেবল সিনেমায় দেখেছি। কী ইচ্ছেই না ছিল আমাদের সম্বদ্রের ধারে যাবার!.. নীল দিগন্ত, সাদা জাহাজ, ঢেউয়ের মাথার ওপর ডাকাডাকি করছে গাংচিলের দল, ডানা ঝাপটাচ্ছে অ্যালবাট্রসরা, কুয়াসার মধ্যে মিটমিট করছে আলোকস্তম্ভের বাতি। 'নর্থ-ইস্টের দিকে?' ক্যাপ্টেন হাঁকছে।

সম্বদ্র।

গত বছর আমরা দ্ববার পালিয়ে সম্বদ্রে যাবার তাল করেছিলাম। দ্ববারই স্টেশনে যাবার আগেই আমরা ধরা পড়ে যাই।

কারাফোলকা কোথাও পালায় নি, অথচ দিব্যি জাঁক করে রিজার্ভড কামরায় চলেছে। জানলার পাশে বসে আছে। পাজীটা আবার কিনা প্ল্যাটফর্মে উনিশ কোপেক দামের আইসক্রীম কিনে খেয়েছে। আমি নিজের চোখে দেখেছি।

'তাহলে বলছিস, পরশ্বদিন,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে জাভা বলে। 'ভালো কথা, ফিরে এসে বলবি কী কী দেখলি।'

তার কথাগ্বলির মধ্যে নির্দয় ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দেবার এমন একটা বেদনা প্রকাশ পেল যে কী বলব! এই কি আমার সেই সাহসী, নির্ভীক বন্ধ্ব জাভা!

ওঃ, কী মান্বষ কী হয়েছে!

তোমরা ত জান না ও কী দার্বণ ডাংগ্বলি খেলে, কী চমৎকার পেনাল্‌টি শট মারে, প্বসিউইলোর প্বরনো মগডাল থেকে কেমন করে মাথা নীচু করে জলে ঝাঁপ দিতে পারে! তোমাদের বাঘা বাঘা পড়্বয়া ছেলেরা একবার চেষ্টা করেই দেখ্বক না, করেই দেখ্বক না কতটা পারে!

ওঃ, কী বলব, লোকে সত্যিই কিছ্বর কদর দিতে জানে না!

কুটির থেকে বেরিয়ে এলেন ভারাভা দাদ্ব। আমাদের দিকে না তাকিয়ে তিনি

চললেন তাদের ঢালের কাছে যে কুয়ো ছিল সেটার দিকে। দাদু সবে শিকলের ঝনঝন আওয়াজ তুলে কুয়োর ভেতরে বালতি নামিয়েছেন অমনি রাস্তা থেকে কুয়োর কাছে এসে হাজির হল... কুনিশ।

'নমস্কার দাদু,' ভদ্রভাবে নমস্কার জানিয়ে সে আড়চোখে আমাদের দিকেও তাকাতে লাগল। তারপর হঠাৎ বলল: 'আপনাদের খারাপ খবরটা শুনলাম; খারাপ মানে, বড়ই খারাপ বলতে হয়। আপনাদের ছেলেটা স্কুলের পরীক্ষায় ফেল করেছে। সারা গাঁয়ে ঐ একটিই। ওঃ হো হো হো!'

দাদু ভুরু কুঁচকে চুপ করে রইল। এদিকে কুনিশ বলে চলল:

'আর বলবেন না, যা আমলাতন্ত্র চলছে ঐ স্কুলে। আর ওখানেই বা বলব কেন, এখন সর্বত্র চলছে। ছেলেটা ক্লাস সিক্সে ওঠে এটা আদৌ ওদের মনের ইচ্ছে ছিল না। বুঝলেন কিনা, ইচ্ছে করেই ফেল করিয়ে দিয়েছে। জানে যে মা হল গণপ্রতিনিধি, উদ্দেশ্যটা হল তাঁকে বেকায়দায় ফেলা। মোটের ওপর ঐ স্কুলে ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য খোয়ানোই সার হয়। কার যে এটা দরকার... এই দেখুন না, একজন পড়াশুনা করে ইঞ্জিনীয়র হল, অথচ তার পরনের প্যান্ট নেই, কিন্তু আরেকজন সইটই করতে জানে না, অথচ তার রুটি আছে, এমন কি সেই সঙ্গে মাখনও আছে... তাই বলি কি...'

দাদু ঠিক এই সময় বালতিটা টেনে ওপরে তুললেন।

'মাফ করবেন, আমার সময় নেই,' এই বলে কুনিশের দিকে দৃকপাত না করেই দাদু কুটিরের দিকে চললেন।

কুনিশ মুখ বাঁকিয়ে সেখান থেকে চলে গেল।

বড়ই দুর্ভাগ্য এই যে তার পেছনে নষ্ট করার মতো সময় আমাদের নেই, সামনে নতুন করে পরীক্ষা, এখন আমরা তার স্বরূপ প্রকাশ করতে পারছি না! কিন্তু সাবধান! আমরা তোমাকে ঠিকই বাগে পাব, কুনিশ! আমরা সব ফাঁস করে দেব!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জাভা হল রবিন্‌সন

আমি কিয়েভে গেলাম।

কী আর বলব তোমাদের? গোটা মাসটা, তোমরা বুঝতেই পারছ, তোফা কাটল। প্রথমেই আমি অবশ্য গেলাম ইতিহাস মিউজিয়ম দেখতে। সেখানে আমি গিয়েছিলাম আমার কাকার সঙ্গে, তিনি আমাদের দেশ ইউক্রেনের, বিশেষত কিয়েভের ইতিহাস সম্পর্কে অনেক কথা বললেন। সারা দিন আমরা মিউজিয়মের নানা হলঘরে ঘুরলাম। মোট কথা কিয়েভের যেখানে যেখানে সম্ভব ঘুরলাম। এমন কি ডুবন্ত ডানা লাগানো 'রকেট' মোটরলঞ্চে চেপে নীপার নদীর বুকেও বেড়ালাম।

এই এক মাস জাভার জন্য আমার মন বড় খারাপ লাগছিল। সব সময় জাভার কথা মনে হত, খারাপ লাগত এই ভেবে যে ও আমার পাশে নেই। কোন কিছু দেখলেই সব সময় আমার মনে হত: 'এটা হয়ত জাভার ভালো লাগত! এটা দেখতে পেলে জাভা হয়ত খুশি হত!'

এমন কি কিয়েভ থেকে আমি ওকে একটা চিঠিও লিখি, কিন্তু চিঠির জবাব ও দেয় নি। হয়ত ওর ভয় ছিল যে লেখার মধ্যে ভুল করে বসবে। কে বলতে পারে ওর মনের কথা? আমাদের জাভার আবার দেমাক আছে।

অবশেষে আমি বাড়ি ফিরে এলাম। মা আর বাবার সঙ্গে দেখা হতে তাঁদের প্রণাম করেই ছুটলাম জাভার কাছে। পকেটে আছে ইলেক্‌ট্রিক বাতি 'ডাইনামিক'— হাতে ধরে চাপ দিলেই ভেতরে কী যেন একটা ঘোরে আর ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ করে, সঙ্গে সঙ্গে বাতি জ্বলে ওঠে — ব্যাটারী-ট্যাটারীর কোন দরকার পড়ে না। কিয়েভ থেকে জাভার জন্য এটা উপহার।

জাভার উদ্দেশে চলি, এদিকে আমার নিজেরই বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ করতে থাকে, রেলগাড়ির চাকার মতো আওয়াজ করতে থাকে — খটাং-খট্ খটাং-খট্ খটাং-খট্... উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি আমি। পুরো একটা মাস আমাদের দেখাসাক্ষাৎ নেই। এগোতে এগোতে দেখি, আমি যাবার আগে ওকে যেমন দেখে গেছি তেমনি ভাবে রোয়াকে বসে গামলার ওপর ঝুঁকে পড়ে আলুর খোসা ছাড়াচ্ছে! এ যে

একেবারে সিনেমার দৃশ্য! যেন এই পুরো এক মাস সময়ের মধ্যে সে রোয়াক থেকে ওঠেই নি।

আমি গলা খাঁকারি দিতে ও মাথা তুলল, আমাকে দেখতে পেল। আমরা দুজনেই দুজনের দিকে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলাম। ওঃ, কী আনন্দ!

'কী রে! ভালো ত?' আমি ওর পিঠে চাপড় মারি।

'ভালো! তারপর?' ও আমার কাঁধে ঠেলা মারে।

আমরা ত আর চুমো খেতে পারি না!

আমি পকেট থেকে টর্চটা বার করলাম।

'এই নে, এটা তোর জন্যে,' আমি বললাম।

ও বিব্রত বোধ করল, হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল।

'আরে এটা আবার কেন? কী যে করিস!..'

একথা বললে কী হবে, ওর চোখদুটো জ্বলজ্বল করতে থাকে। তা হবে না কেন? এমন টর্চলাইট! যত খুশি জ্বালাও!

জাভা তৎক্ষণাৎ সেটার কাজের ক্ষমতা পরখ করতে লেগে গেল। এদিকে আমি দিয়ে চললাম কিয়েভের বিবরণ। নিজের অভিজ্ঞতার ভাগ তাকে দিতে আমার আর তর সইছিল না। এটাই ত নিয়ম — অভিজ্ঞতার ভাগ অন্য কাউকে না দিলে সত্যিকারের আনন্দ পাওয়া যায় না। আমি অনর্গল বলে চললাম, আর ও চুপচাপ, মাথা নেড়ে চলল, থেকে থেকে সায় দিয়ে বলতে লাগল: 'আচ্ছা', 'বোঝ কাণ্ড', 'তারপর?' 'চমৎকার'। ব্যাপারটা কেমন যেন অনভ্যস্ত, কেননা বরাবরই কথা বলত ও, আর শুনতাম আমি। ওর কল্পনাশক্তি ছিল আমার চেয়ে বেশি। এখানে হল তার উলটো। গোড়ায় আমি নিজের ভাবে মোহিত হয়ে থাকায় কিছুই লক্ষ করি নি। পরে লক্ষ করলাম যে ও ক্রমেই বিষণ্ণ ও গম্ভীর হয়ে পড়ছে।

আমি যেন হোঁচট খেয়ে অর্ধেক কথার মাঝখানেই থেমে গেলাম:

'...তবে মোট কথা... মোট কথা, বলার মতো বিশেষ কিছু নেই। তা যাক গে, তোর খবর কী বল্। আর কনিশের ব্যাপারটা? তুই নজর রেখে নতুন কিছু বার করতে পেরেছিস নাকি?'

'না,' জাভা হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বলল। 'ওকে আমি প্রায় দেখিই নি।'

'আর তোর নিজের? নিজের খবর কী?'

জাভা কাঁধ ঝাঁকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলল:

'কিছুই না।'

'কিছুই না কী রে? মাছ ধরা। ফুটবল খেলা। ডাংগুলি। অ্যাঁ?'

'না।'

'না — কী রে?'

'মাছ ধরতে আমি একবারও যাই নি। ফুটবল খেলি নি। ডাংগুলিও না।'

'কী যে বলিস?'

'তবে আর বলছি কী? মা আমাকে কোথাও যেতে দেন না। কেবল পড়া তৈরি কর্ আর শুয়োর-গোরুর তদারক কর্। সত্যিকারের ভূমিদাস যাকে বলে। তারাস শেভচেংকোর* মতো। এখন কবিতা লিখলেই হল: 'ত্রয়োদশ বর্ষ মোর হইল পূরণ...'

'যা ব-লে-ছিস,' যতদূর সম্ভব সমবেদনার সুরে টেনে টেনে বললাম আমি।

জাভা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল:

'আমি একেবারে তিত-বিরক্ত হয়ে গেলাম, পাভেল। আর পারি না। ভাবছি পালিয়ে যাব।'

'কোথায়?'

'কোন নির্জন দ্বীপে-টিপে।'

'কী যে বোকার মতো কথা বলিস! নির্জন দ্বীপ আর পাবি কোথায়? অমন দ্বীপ আজকাল হয় না।'

'হয়, হয়। তুই জানিস না।'

'আমরা দুজনে সমুদ্র অবধিই যেতে পারলাম না, আর তুই বলছিস পালাবি? প্রথম স্টেশনেই ত তোকে ধরে ফেলবে।'

'স্টেশনে আমি যাচ্ছি না। স্টেশনে যাব কী করতে?'

'তাহলে কী করে যাবি?'

---

* বিখ্যাত ইউক্রেনীয় কবি।

'ঝোপঝাড়ে ঢাকা চড়ার ভেতরে গিয়ে গা ঢাকা দেব। জানিস, ওখানে কত দ্বীপ আছে!'

এটা আমি জানতাম। আমাদের এখানকার চড়াগুলো বিখ্যাত। আমাদের গাঁ থেকে শুরু করে ঝোপঝাড়ে ঢাকা এমন চড়া কিলোমিটারের পর কিলোমিটার চলে গেছে দক্ষিণ দিকে। কোথাও যেতে গেলে যতদূর চোখ যায় সর্বত্রই এরকম ঝোপঝাড়ে ঢাকা নীচু চড়া, এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত জুড়ে আছে।

পরিষ্কার জলের মাঝে মাঝে আছে জলাভূমি, নলখাগড়া আর উইলোর ঝোপে ঢাকা সামান্য উঁচু উঁচু জমি আর ছোট ছোট দ্বীপ। তবে ঐ ধরনের ঝোপঝাড়ের মধ্যে বেতের ঝোপই বেশি। বেতঝোপের চড়ার ভেতর দিয়ে লোকে কেটে নিয়েছে পরিষ্কার জলে যাতায়াতের সংকীর্ণ আঁকাবাঁকা পথ, যাকে বলা হয় ফালি। এগুলির ভেতর দিয়ে নৌকো যাতায়াত করতে পারে। এই আঁকাবাঁকা জলধারার ফালির মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলা বিচিত্র নয়।

সঙ্গত কারণেই যুদ্ধের সময় এধরনের চড়াগুলি ছিল আমাদের গেরিলাদের আশ্রয়স্থল। শত শত গেরিলা এখানে আত্মগোপন করে থাকত, জার্মানরা তাদের সঙ্গে কোনমতে পেরে উঠত না।

চড়ার জঙ্গলের মধ্যে বুনো পশুপাখি ছেয়ে আছে পোকা-মাকড়ের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে। বুনো হাঁস, বালিহাঁস, কাদাখোঁচা... কী নেই সেখানে!

শিকারীদের কাছে আমাদের চড়াগুলি সত্যিকারের স্বর্গরাজ্য। 'এল্‌ডোরাডো'— আশ্চর্য জগৎ, বলেন আমাদের ভূগোলের মাস্টারমশাই নিকোলাই পাভলভিচ। তিনি একজন পাকা শিকারীও বটেন।

হ্যাঁ, আমাদের এই চড়াগুলির নামডাক আছে। ওখানে জনমানবশূন্য কোন দ্বীপ খুঁজে পাওয়া অবশ্য খুবই সহজ ব্যাপার।

'কিন্তু ওখানে তুই বাস করবি কী করে? মারা যাবি। মনে আছে গুনকার কী হাল হয়েছিল।'

...আমাদের গাঁয়ে কোন এক সময় বাস করত গুনকা নামে এক হাবাগোবা গোছের লোক। সে ছিল ভবঘুরে, ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছিল এখানে। কেউ জানে না কী ভাবে সে আমাদের গাঁয়ে এসে হাজির হল। শীতকালে খালি মাথায়, খালি পায়ে ঘুরে বেড়াত। বুড়িরা তাকে পুণ্যাত্মা বলে মনে করত। শান্তশিষ্ট

লোক ছিল, কারও কোন ক্ষতি করত না। আপন মনে গাঁয়ে ঘুরে বেড়ায় আর হাসে: 'হি-হি হি-হি।' চড়ার জলেজঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসত। হয়ত চলে গেল — দুদিন কোন পাত্তা নেই। তারপর এসে হাজির — রোগা, খিদেয় ধুঁকছে, সারা মুখ ছেয়ে গেছে কটা রঙের খোঁচা খোঁচা দাড়িতে। এমন কি শীতকালেও জমাট বরফের ওপর দিয়ে সে চড়ায় যেত। কনকনে হিমের মধ্যে চলে যেত, চড়ায় একটা বিশাল ধুনি জ্বালাত, লোকে ভাবত বুঝি চড়ার জঙ্গল জ্বলছে। গাঁয়ে ফিরে এসে বলে: 'হুঁঃ! ধুনি জ্বালিয়েছি। এখন গাঁয়ে বেশ গরম হবে।' দুবছর আগে গুনকা চড়ায় গিয়ে আর ফেরে না — জলার মধ্যে কোথাও ডুবে গিয়ে সত্যি সত্যিই মারা গেল, নাকি স্রেফ আমাদের গাঁ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেল কেউ বলতে পারে না। মোট কথা, এরপর তাকে আর দেখা যায় নি।

'গুনকার মতো বেঘোরে মারা যাবার সাধ হয়েছে নাকি তোর?' আমি আবার বললাম।

'মারা যাব না,' জাভা জোর দিয়ে এই কথা বলে জামার নীচ থেকে টেনে বার করল একটা বই। 'এই দ্যাখ্, একজন লোক নির্জন দ্বীপে দিব্যি জীবন কাটিয়েছিল। মারা যায় নি।'

'এটা আবার কী বই?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

''রবিন্সন ক্রুসো'। পড়েছিস?'

'না। ক্রুস্? — সে আবার কী?'

'ক্রুস্ নয়, ক্রুসো। আজব ছেলে বটে তুই! জবর বই!'

'বই — বইই, আর চড়া হল চড়া। তুই বরং ভেবে দ্যাখ্।'

'আমি এর মধ্যে ভেবে দেখেছি। আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। তুই ত আমাকে জানিসই। আমি কেবল তোর অপেক্ষা করছিলাম তোর সঙ্গে পরামর্শ করার জন্যে, যাতে তুই আমাকে একটু সাহায্য করিস।'

এই কথার ওপরে আমি আর কিছু বলতে পারলাম না। কেউ যখন তোমার শরণাপন্ন হয় তখন তাকে ফিরিয়ে দেওয়াটা নোংরা কাজ।

'ঐ দ্বীপে তুই কি অনেক দিনের জন্যে যাচ্ছিস নাকি?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'রবিন্সন নির্জন দ্বীপে কাটায় আঠাশ বছর দুমাস উনিশ দিন,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল জাভা।

'ওরে বাবা! তোর তাহলে তখন বয়স হবে কত? চল্লিশেরও বেশি। ততদিনে আমরা সবাই স্কুল শেষ করব, ইনস্টিটিউটও। কারাফোলকা আকাদমিশিয়ান হয়ে যাবে, গ্রেবেনিউচকা হবে কৃষিবিদ। আমি বৈমানিক... যদি সম্ভব হয়। আর তুই...'

'কী আর করা যাবে?' জাভা আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'শোন্, কনিশের ওপর তাহলে কে নজর রাখবে? কে ওর মুখোস খুলবে, ওর আসল চেহারা ফাঁস করে দেবে? এমনও ত হতে পারে যে ও সত্যি সত্যিই এক বিপজ্জনক অপরাধী?'

জাভা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। আমি উল্লসিত হয়ে উঠলাম। — ভাবলাম এইবার ও ওর মতলব ছাড়বে। কিন্তু তার বদলে ও বলল:

'না, কিছুই আমি ভুলি নি। কিন্তু তোকে একাই নজর রাখতে হবে কনিশের ওপর, তার স্বরূপ প্রকাশ করতে হবে। আমি এখানে আর থাকতে পারছি না। একেবারেই না।'

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম।

'যাই হোক, আরেকটু ভেবে দেখলে হয়ত পালাবি না, কী বলিস? একটু ধৈর্য ধর্, মুখ বুজে না হয় একটু কষ্ট সহ্যই করলি।'

'না, একবার যখন আমি ঠিক করে ফেলেছি তারপর আর কোন কথা নয়!'

'মরুক গে তোর ঐ ক্রুস্, যে তোর মাথায় দ্বীপে পালানোর মতলব ঢুকিয়েছে! তাহলে কি ছেলেবেলা আমাদের আর দেখাই হবে না?' আমি নিরাশ হয়ে বললাম। 'কার সঙ্গে আমি তাহলে ডাংগুলি খেলব? কারাফোলকার সঙ্গে নাকি?'

জাভার কপালে কুঞ্চন দেখা দিল, সে আমার দিকে তাকিয়ে মনে মনে কী যেন চিন্তা করতে লাগল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল:

'দেখা হবে না কেন? তুই একা জানতে পারবি দ্বীপটার কথা। প্রায়ই আসবি। ...রবিন্সনও একেবারে একা ছিল না। পরে সে জংলী ফ্রাইডেকে বাঁচায়, তারপর বাস করতে থাকে দুজনে মিলে। তাই বলছিলাম কি...'

'তার মানে আমি হব গিয়ে তোর জংলী,' ভুরু কুঁচকে আমি বললাম। 'তুই হবি নায়ক আর আমি হব কিনা জংলী! এই তোর ক্রুস্!'

'আরে ক্রুস্ নয়, ক্রুসো। রবিন্সন ক্রুসো। বুঝেছিস?'

'ঐ হল। তুই তাহলে রবিন্সন, এই ত?' বলে আমি দাঁত বার করে হাসলাম। এর পর জাভা আর জাভা রইল না, সে হল রবিন্সন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দ্বীপের সন্ধানে

জাভা ছিল সত্যিকারের রবিন্সন। এই নাম ধারণ করা ছিল তার বিধিলিপি।

'তুই কি আজই দ্বীপে পালিয়ে যেতে চাস?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'ইস, কি চটপটে রে! 'আজই'!' বিরক্ত হয়ে বলল রবিন্সন। 'আগে খুঁজে বার করতে হবে, সুবিধেমতো নির্জন দ্বীপ বাছতে হবে, তৈরি হতে হবে, তারপর ত পালানো!'

'বাছাবাছির কী আছে? যেটার ওপর খুশি নামলেই হল, তারপর বসবাস করতে থাক না।'

'হ্যাঁ, তোর আর কী! আমাকে থাকতে হবে আঠাশ বছর দুমাস উনিশ দিন। ভাবছিস সোজা ব্যাপার?'

'আরে না, আমি ঠিক তা বলতে চাই নি — বাছা ত যেতেই পারে। বলিস ত এখুনি। চল্, যাবি?'

'একটু পরে। ঘণ্টাখানেক বাদে। দাদু যখন দোকানে যাবে।'

'পালানোর আগে তুই বাড়ির লোকজনকে কী বলবি? ওরা যে দুশ্চিন্তা করবে। সারা গাঁয়ে হুলস্থুল ফেলে দেবে। খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে যাবে। আমাদের মিলিশিয়াম্যান কমরেড ভালিগুরা থেকে শুরু করে কেউ বাদ যাবে না। আমি বেশ বুঝতে পারছি!'

'আমি অবশ্যই বলব না: 'ওগো, আমার আত্মীয়স্বজনরা, আমি তোমাদের ছেড়ে নির্জন দ্বীপে পালাচ্ছি। তোমরা সুখে থাক। চিঠি লিখো।' এটা হবে হাস্যকর।

এভাবে কেউই নির্জন দ্বীপে পালায় না। মা-বাবাকে মোটেই কিছু বলার দরকার হবে না। মা আগামীকাল অগ্রণী কর্মীদের সম্মেলনে যোগ দিতে কিয়েভে যাচ্ছে। এক সপ্তাহ থাকবে, তার কম নয়। বাবা আছে জেলাসদরে। বাড়িতে থাকার মধ্যে কেবল দাদু। তা দাদুকে মাথা খাটিয়ে কিছু একটা বলা যাবে। ধর্ না কেন, বলব যে পেস্কিতে হান্না মাসীর কাছে যাব। ইরাও এখন সেখানে আছে। কিছু একটা ভেবে বার করব 'খন। যাতে আগে থেকে সোরগোল না পড়ে যায়।'

'আর তারপরে কী হবে? তোর মা এসে যখন জানতে পারবেন যে তুই নিখোঁজ হয়ে গেছিস তখন?'

'আমার তাতে কী? খুঁজুক না। খুঁজে না পেলেই হল। বুঝলি ত, গুনকাকেও লোকে খোঁজাখুঁজি করেছিল, তিন দিন ধরে খোঁজাখুঁজি করার পর শেষকালে হাল ছেড়ে দেয়। তারপর আর কিছুই নয়। এখন লোকে কদাচিৎ ওর কথা মনে করে। আমার ব্যাপারেও তাই হবে...' বলতে বলতে আমাদের রবিন্সনের গলা কেঁপে উঠল। সম্ভবত লোকে তাকে ভুলে যাবে এই চিন্তাটা হাজার হলেও তার কাছে তিক্ত লাগছিল। সে তাই তাড়াতাড়ি কথার মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে বলল: 'আসল কথাটা হল ভালো দেখে একটা দ্বীপ খুঁজে বার করা দরকার। দেখতে হবে জায়গাটায় যেন মাছটাছ থাকে আর শিকারও মেলে, যাতে...'

'তুই কি বন্দুকও নিবি নাকি?'

'তা নয় ত কী? রবিন্সন ক্রুসোর ত কয়েকখানা বন্দুক ছিল। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না, আমার একমাত্র ছররা বন্দুক নিয়েও আমি বেকায়দায় পড়ব না। আমার ছররা বন্দুক ত তুই জানিসই। গুলি ছোঁড়ে ঝড়ের মতো। দাদুর রাইফেলের চেয়েও ভালো।'

এটা অবশ্য রবিন্সনের বাড়িয়ে বলা। কিন্তু আমি তর্ক করলাম না: ছেলেটা আঠাশ বছরের জন্য অজ্ঞাতবাস করতে চলেছে নির্জন দ্বীপে, এতে যদি সান্ত্বনা পায় ত পাক না। গত বছর দাদু ওকে ওর জন্মদিনে একটা ছররা বন্দুক কিনে দিয়েছিলেন, এর পর থেকে তিনি ওকে সঙ্গে করে শিকারে নিয়ে গিয়ে তালিম দিতে থাকেন। একনলা বন্দুকটার জন্য এবং সে যে বড়দের মতো সত্যিকারের শিকারে যায় সেই জন্যও বটে, রবিন্সনের গর্বের অন্ত ছিল না। আমি ওকে ঈর্ষা করতাম আর মনে মনে বন্দুকের স্বপ্ন দেখতাম।

বার-বারান্দায় কাশির আওয়াজ পাওয়া গেল, দরজার ক্যোঁচকোঁচ আওয়াজ হল, ভারাভা দাদু উঠোনে বেরিয়ে এলেন। আমাদের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে তিনি বললেন:

'আমি মিনিটখানেকের জন্যে দোকানে যাচ্ছি। এর মধ্যে কোন রকম অসভ্যতা যদি তোরা এখানে করিস তাহলে মজা টের পাবি।'

'না, না, আমরা কিছু করছি না। আমরা কেবল একটু নদীতে যাব, একটু চান করতে যাব। বড্ড গরম পড়েছে...' অনুনয়ের সুরে বলল রবিন্‌সন।

'পড়া করতে হবে, ওসব চান-টান নয়। ফেল করা ছেলে!' খেঁকিয়ে উঠলেন দাদু, তারপর ককাতে ককাতে ঢালটা পেরোলেন।

আমি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে রবিন্‌সনের দিকে তাকালাম।

'ও কিছু নয়, যাওয়া যাবে,' নীচু স্বরে বলল সে। 'ঐ 'এক মিনিট' আমার জানা আছে। দোকানের সামনে সালিভোন দাদুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, ঘণ্টা তিনেক কথা চলবে, তার কম নয়। বীট কাটার কাজ সারতে আমাকে সাহায্য কর্, শেষ করেই যাওয়া যাবে।'

আমরা দুজনে মিলে চটপট বীট কাটা সারলাম। শুয়োরকে খাবার দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

নৌকোয় চেপে জলার জঙ্গলে আমাদের যাবার মধ্যে অদ্ভুত কিছু না থাকলেও (কতবারই না আমরা মাছ ধরতে গেছি, স্রেফ নৌকোয় চেপে বেড়িয়েছি) এখন আমরা বারবার পিছু ফিরে তাকিয়ে দেখতে দেখতে গোপনে নদীর দিকে চললাম। কোন ভালো নৌকো আমরা নিলাম না। যদিও তীরে সে ধরনের নৌকো বাঁধা ছিল এবং সেগুলো নিতেও আমাদের কোন বাধা ছিল না — এখানে আমার বাবার নৌকোও ছিল, তাছাড়া ভারাভা দাদুর নিজেরই ত তিন-তিনটে (একটা শালতি আর দুটো চেপটা নৌকো)। আমরা জামাকাপড় খুলে সাঁতার কেটে গিয়ে উঠলাম অন্য দিকে, বালুচরে, যেখানে লাল উইলো ঝোপের বড় ঘেরটার ওপাশে পড়ে ছিল বহু ব্যবহারে পুরনো চটির মতো জরাজীর্ণ সেই বেওয়ারিশ চেপটা নৌকোটা, যেটা দিয়ে ডুবোজাহাজ বানানোর পরিকল্পনা আমাদের মাথায় ছিল, যদিও শেষ পর্যন্ত আমাদের পক্ষে তা করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। তাছাড়া তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে পরীক্ষার ঠিক আগে আগে আমরা ওটার গায়ে কেমন

আলকাতরা মাখাই, আর নৌকোটায় জল ঢুকলেও সেটা কিন্তু ডুবত না: জল সেঁচতে ভুলে না গেলে ওটায় চেপে কোথাও যাবার কোন বাধা নেই। সেখানে নৌকোর নীচেই ছিল একটা লম্বা ফাটা দাঁড়; ওটা আমরা অনেক আগেই ভারাভা দাদুর কাছ থেকে 'ধার নিই'। দাদুর নজরেও পড়ে নি — ওর চালাঘরের ভেতরে শালতি ডিঙি — এরকম নানা নৌকোর জন্য লম্বা-বেঁটে নানা আকারের কয়েক ডজন দাঁড় আর বৈঠা গড়াগড়ি যাচ্ছে। আমাদের এই চেপটা তলিওয়ালা নৌকোগুলোয় চেপে লোকে কী ভাবে যাতায়াত করে জান কি? চালাতে হয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। নৌকোর পেছনের দিকে কিংবা সামনের দিকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একবার এপাশ থেকে আরেকবার ওপাশ থেকে দাঁড় ঠেলতে হয়। এই কারণেই দাঁড়টা হয় লম্বা। এই ভাবে নৌকো বাইতে এলেম দরকার। এলেম না থাকলে ডিগবাজী খেয়ে উলটে পড়বে! — কাঁকড়াদের খাদ্য হবে। তবে আমি আর রবিন্‌সন একেবারে ছোটবেলা থেকে দাঁড় ঠেলতে ওস্তাদ, আমাদের ভয়ের কোন কারণ ছিল না।

'সেঁউতিটা নিতে ভুলিস না, নইলে কিন্তু চুমুক দিয়ে জল তুলতে হবে। দেখছিস ত, এত করে জল ঢুকছে, পুরনো গামবুট আর কি,' জ্যাভা বলল।

আমরা লগি ঠেলে এগিয়ে চললাম।

ছোট একটা দ্বীপের পাশ দিয়ে ঘুরে গিয়ে আমরা পড়লাম নলখাগড়ার বনে। সংকীর্ণ জায়গার ওপর দিয়ে চলতে হচ্ছে। দাঁড় বাইছে রবিন্‌সন — আমি যদিও বেশ ভালোই বাইতে পারি, তবু ও পারে আরও ভালো। বাইছে নিঃশব্দে, সন্তর্পণে — দুপাশে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। জলধারা সংকীর্ণ, অনবরত বাঁক। যতটা দরকার তার চেয়ে জোরে দাঁড় ঠেললেই নৌকোর মাথাটা গোত্তা খেয়ে ঢুকে পড়ে নলখাগড়ার ঝোপের মধ্যে। তখন ফের পেছনে দাঁড় ঠেলে তাকে সেখান থেকে বার কর্ — মহা হাঙ্গামা! রবিন্‌সন ভালোই দাঁড় বাইছে — একবারও নলখাগড়ার ভেতরে নৌকো ঢুকে পড়ে নি।

আমি নৌকোর মাথার দিকে শুয়ে শুয়ে জলের দিকে চেয়ে থাকি। টলটলে জল, একেবারে তলা অবধি দেখা যাচ্ছে: শাপলার শেকড়, শেওলা, জলে ডোবা ডালপালা, এমন কি শেওলার মাঝখানে মাছদেরও নড়েচড়ে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে। চমৎকার!

5–1068

আমরা ক্রমেই জলার জঙ্গলের গভীরে প্রবেশ করছি। এমন সময় একটা বাঁক নিতেই সামনে পড়ল প্রশস্ত জলধারা। জলের বুকে তরঙ্গের রেখামাত্র নেই। সাদা আর হলুদ রঙের শাপলা জাতীয় ফুল ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সেইসব ছবির মতো, যা আমাদের বাজারে বিক্রি হতে দেখা যায়। কেবল জলরাশির মাঝখানে রাজহাঁসের বদলে সাঁতার কাটছে দুটি পানকৌড়ি। আমাদের দেখামাত্র উধাও। এত তাড়াতাড়ি জলে ডুব দিল যে মনে হল আদৌ ওখানে কোন পাখি ছিল না। তারপর তাকাতেই দেখা গেল বিশ মিটারখানেক দূরে ভুস করে ভেসে উঠল, যেন ওরা নয়, অন্য কোন জুটি।

আবার আমাদের পথে পড়ল আঁকাবাঁকা জলধারা।

সাঁই-সাঁই সন্-সন্ আওয়াজ তুলে উড়ে গেল হাঁসের দল।

শিকারের মরসুম এখনও শুরু হয় নি, তাই হাঁসগুলোর মনে এখনও ভয়ভীতি ঢোকে নি, তারা নিঃশঙ্কচিত্তে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ছে।

'ওঃ, বন্দুক যদি থাকত এখন!' রবিন্‌সন বলল।

'হ্যাঁ-অ্যা-অ্যা,' আমি টেনে টেনে বললাম।

সাধে কি আর লোকে বলে যে এই জলার জঙ্গলগুলো হল শিকারীদের স্বর্গরাজ্য! মরসুমের শুরুতে যে কত শিকারী এখানে এসে জুটবে তা মনে মনে কল্পনা করতে পারি। আর কিয়েভের যারা হরদম আসে তারা ত আসবেই। সেই যে লিকলিকে লোকটা, চশমাধারী — ওলেগ, যার নিজের 'ভোলগা' গাড়ি আছে — সেও আসবে। আসবে গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারার সিদরেঙ্কো। আসবে চোয়ালের হাড় বার করা আগল (ওটা নাকি ওর সত্যিকারের পদবী), যার মাথায় আছে সামান্য চুল; আর যার মাথায় একেবারেই চুল নেই সেই টাকমাথা, মোটাসোটা বাতিউক। ওরা সবাই কোন না কোন বিদ্যার পণ্ডিত উপাধিধারী।

অন্যদের ক্ষেত্রে যাই হোক না কেন, কিয়েভের পণ্ডিত উপাধিধারীরা এবারেও নির্ঘাত আসবে এবং আবারও সম্ভবত এসে উঠবে ভারাভা দাদুর কাছে। কার কাছে উঠতে হয় তা ওদের জানা আছে। সন্ধ্যা থেকে তারা সাবেকী শিকারী ঐতিহ্য অনুযায়ী ভোদ্‌কা পান করবে আর শিকারের নানা কাহিনী বলবে, গান গাইবে আর একে অন্যকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করবে। ভোর বেলায় দাদু ওদের জাগিয়ে দিলে ওরা তড়িঘড়ি ওদের শিকারের সাজসরঞ্জাম জড়ো করতে করতে

মাথার ব্যথায় ভুরু কোঁচকাবে, সকালের ঠান্ডা হাওয়ায় সামান্য হিহি করে কাঁপবে আর ককাবে। আর বাতিউক ত বরাবরই মোটে উঠতে চায় না। টুপিতে মুখ ঢেকে সে ঘুমজড়ানো ভাঙা ভাঙা স্বরে বিড়বিড় করে বলে:

'শুয়ে পড়, শুয়ে পড়! অমন দুদ্দাড় করে উঠে পড়লে কেন? বাইরে এখনও রাতের অন্ধকার। শুতে না শুতেই কিনা...' সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ঘড় শব্দে সে নাক ডাকাতে শুরু করে।

তারা অনেকক্ষণ ধরে তাকে ধাক্কাধাক্কি করতে থাকে, সে এলোপাতাড়ি লাথি ছোঁড়ে আর বলে: 'তোমরা চলে যাও, আমি তোমাদের নাগাল ধরব 'খন।' অবশেষে গালাগাল দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। ওরা সকলে মিলে জলার জঙ্গলে যাত্রা করে। দাদু যান শালতিতে আর ওরা চেপটা ডিঙি নৌকোয়। দাদুকে কেবলই থেমে থেমে অপেক্ষা করতে হয় ওদের জন্য; কেননা ওদের নৌকো ত চলে না; জলের ওপর এঁকেবেঁকে একবার এদিকে আরেকবার ওদিকে ছিটকে সরে যায়: বাঁ দিক থেকে বায় ত নৌকো ডান দিকে ভেসে যায়, ডান দিক থেকে বায় ত ভেসে যায় বাঁ দিকে — ক্রমাগতই এমন কান্ড। এদিকে দাদুর শালতি তরতর করে এগিয়ে চলেছে। ওঃ, শালতি বটে ভারাভা দাদুর! পালকের মতো হালকা, জলের বুকে যেন পাখির মতো উড়াল দিয়ে যায়, যেন ডুবন্ত ডানাওয়ালা নতুন স্টীমলঞ্চ। তবে ওর ওপর বসে থাকা দাদু ছাড়া খুব কম লোকের পক্ষেই সম্ভব। বড্ড টলমলে, ছটফটে শালতি। ঐ নৌকোয় চেপে যাওয়া যেন দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটার মতো — সব সময় ব্যালেন্স রাখতে হয়।

গত বছরের আগের বছর শিকার মরসুম শুরু হওয়ার দিনে আমাদের এখানে শিকারী এসে জোটে অসংখ্য। সব নৌকো সঙ্গে সঙ্গে এরা ওরা নিয়ে নেয়।

কিয়েভের শিকারীরা দেরি করে ফেলে — তারা আসে রাতে। নৌকো তাদের কপালে জুটল না। একমাত্র সম্বল দাদুর ঐ শালতিটি। কী উপায়?

'দুজনে মিলে এই শালতিতে চেপে যাবার কথা ভাবাই যায় না — ডুবে যাবে,' দাদু বললেন। 'নইলে এক এক করে জায়গায় নিয়ে যাওয়া যেত।'

'কিন্তু একজন একজন করে পার হতে বাধা কী?' আগল বলল।

'ঠিক কথা,' দাদু শান্তস্বরে বললেন। 'কিন্তু ওপার থেকে নৌকোটা ফেরত পাঠাবে কে শুনি?'

'হুম্, তা বটে,' ভাবগভীর ভঙ্গিতে গাঁক-গাঁক করে বলল আগল।

'আচ্ছা, এই ছেলেদের কাজে লাগালে কেমন হয়?' ওলেগ বলল (আমরা তখন ঠিক ওখানেই দাঁড়িয়ে ছিলাম)।

'হুঁঃ, এই ছেলেগুলোও ডুবুক আর কি!' রাগতস্বরে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন দাদু।

'আরে না, না! এ আর এমন কী!' আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল। 'আমরা যে একেবারে হালকা। পালা করে পার করব। আর যদি উলটে যাইও, আপনি ত জানেনই আমরা কেমন সাঁতার কাটি! মাছের মতো!'

'আচ্ছা, চেষ্টা করেই দেখা যাক,' দাদু রাজী হয়ে গেলেন। 'তবে হ্যাঁ, ওহে ছেলেরা, জামাকাপড় খুলে ফেল; কেননা সম্ভবত চুবুনি খেতে হবে।'

যেহেতু আমি প্রথম উৎসাহ দেখিয়েছিলাম, সেই হেতু প্রথম নৌকো বাইতে হল আমাকে। ওলেগকে পার করতে হয়। কিন্তু পার করা যাকে বলে তা হয়ে উঠল না, কেননা নৌকোটা পাড় থেকে ছাড়ারও অবকাশ পেলাম না, ওখানেই আমরা উলটে পড়ে গেলাম। ওলেগ সবে বসেছে, বসে নিজেকে গুছিয়ে নিতে যাচ্ছিল, এমন সময় আমরা উলটে পড়লাম। তীর ঘেঁষে এই জায়গাটায় জল যদিও নেহাৎই অগভীর ছিল তবু ওলেগ কেমন করে যেন ডুব-জলে নাকানি-চুবানি খেয়ে বসল।

'নিকুচি করেছি এই ঝরঝরে গামলাটার! নৌকোর কি ছিরি!' গালাগাল দিতে দিতে সে তীরে উঠল।

বন্ধুরা হাসতে লাগল, আর সিদরেঙ্কো একেকটি শব্দ কেটে কেটে উচ্চারণ করে বলল:

'কী ছট-ফটে রে বা-বা! এক জায়-গায় বসেও থাকতে পারে না! যেন হুল ফুট-ছে! এক্ষুনি আমি যাব, তুই যখন পারছিসই না।'

এই বলে সে শালতিতে উঠল।

'ঐ প্যাণ্টসুদ্ধই বসে পড়ুন, স্রেফ নৌকোর খোলে বসে পড়ুন,' দাদু পরামর্শ দিলেন।

কিন্তু শালতির খোলে ছিল জল, সিদরেঙ্কোর ইচ্ছে ছিল না প্যাণ্ট ভিজোয়।

'এতে লাভের মধ্যে কোমরে বাত ধরবে,' এই বলে নৌকোর দুই কানার ওপর আড়াআড়ি একটা তক্তা ফেলে সে তার ওপর গিয়ে বসল।

আমরা যতক্ষণ ঠিকমতো বসার আয়োজন করছিলাম ততক্ষণ দাদু শালতিটাকে চেপে ধরে রাখলেন, তারপর আমাদের ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিলেন তীর থেকে দূরে। আমি সাবধানে দাঁড় বাইতে লাগলাম, আমরা চলতে শুরু করলাম। সিদরেঙ্কো বসে রইল সিধে হয়ে, যেন ক্লাসে ডেস্কের সামনে বসে রয়েছে একটি ছাত্র। দুহাতে বন্দুকটা ধরে সে এমন ভাবে টাল সামলাচ্ছিল যে দেখে মনে হচ্ছিল বুঝি দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটছে সার্কাসের কোন খেলোয়াড়।

'বেশ বসে আছে, আমরা পেঁছে যাব,' আমি মনে মনে ভাবলাম। আমরা ঠিক মাঝনদীতে, এমন সময় আমাদের মাথার ওপর দিয়ে আওয়াজ করতে করতে বেশ নীচু হয়ে উড়ে গেল তিনটে বুনো হাঁস। সিদরেঙ্কো হঠাৎ নড়েচড়ে উঠল, বন্দুক ওঠাল (সে ছিল তুখোড় শিকারী), কিন্তু গুলি ছোঁড়ার অবকাশ পেল না — আমরা ভারসাম্য হারিয়ে ফেললাম। শালতিটা ক্রমেই এক পাশে কাত হতে লাগল।

'সামাল, সামাল!' আমি চেঁচিয়ে বললাম। 'আমরা কিন্তু উলটে পড়ে যাচ্ছি!'

এদিকে সিদরেঙ্কো হাত দিয়ে জল দাবড়ে চলেছে।

আরে, জলের ওপর হাতে ভর দিয়ে কি সামলানো যায়! ঝপাং!

শেষ যে দৃশ্যটি আমি দেখলাম তা হল এই যে নতুন একজোড়া গামবুট শূন্যে ঝলকে উঠল, আর জলরাশি এসে গ্রাস করল আমাদের। জলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি ভেসে উঠে উলটে পড়া শালতিটা আঁকড়ে ধরলাম।

কয়েক সেকেন্ড বাদে জলের ভেতর থেকে ভেসে উঠল সিদরেঙ্কোর মাথা, তার চোখমুখ দেখা যাচ্ছিল না: ভিজে চুলের রাশিতে চিবুক পর্যন্ত সবটা ঢাকা পড়ে গেছে।

'বন্দুক!' তারস্বরে এই কথা বলেই সে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল জলের ভেতরে — ফাতনায় মাছ ঠোকর মারলে যেমন অবস্থা হয়।

তারপর আবার ভুস করে ভেসে উঠে সঙ্গে সঙ্গে বলল:

'বন্দুক!'

আবার ডুব দিল জলে।

'আরে, তোমাদের ব্যাপার কী?' মজা পেয়ে সকলে তীর থেকে চেঁচাতে লাগল।

'মনে হচ্ছে ওঁর বন্দুক ডুবে গেছে!' জবাবে আমি চেঁচিয়ে বললাম।

এই সময় সিদরেঙ্কো শেষ বারের ডুব ছেড়ে উঠে বিরক্তির সঙ্গে থুতু ফেলে করুণ কণ্ঠে বলল:

'গেল! ওটা যে অমূল্য রত্ন ছিল!..'

আমরা দুজনে কষ্টেসৃষ্টে তীরে পেঁছুলাম — আমি শালতি আর দাঁড় সামনে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেলাম, আর সিদরেঙ্কো... আমার ত ভয় হচ্ছিল শোকে দুঃখে নিজেই না ডুবে যায়। সাঁতার কাটতে কাটতে কাতরাতে থাকে:

'হা ভগবান! অমন বন্দুকটা! অমন বন্দুকটা!'

তীরে আসার পর দাদু ওকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন:

'ও কিছু না, বার করা যাবে! এই ছেলেরা এখন ডুব দেবে, বার করবে।'

আমি আর জাভা সাঁতরে ঐ জায়গাটায় গেলাম। কতই না ডুব দিলাম, কিন্তু কিছুই বার করতে পারলাম না। তলাটা পাঁকাল, বন্দুক কোথায় পাঁকের ভেতরে গিয়ে সেঁধিয়েছে — খুঁজে পাওয়া ভার।

আমরা যতক্ষণ ডুব দিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছিলাম ততক্ষণ সিদরেঙ্কোকে দাদু সান্ত্বনা দিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু যখন আমরা খালি হাতে ফিরলাম তখন দাদু তার ওপর এমন চটে গেলেন যেন সিদরেঙ্কো তার নিজের বন্দুক ত জলে খোয়ায় নি, খুইয়েছে দাদুর বন্দুক:

'নড়াচড়া করতে গেলেন কেন শুনি? চুপচাপ বসে থাকা উচিত ছিল। আপনাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে — যান! তা ত হবে না, ওনার চাই হাঁস। প্রথমেই ওনার চাই। এখনও কেউ গুলি ছুঁড়ল না, অথচ দেখ, উনি সঙ্গে সঙ্গে চুলবুলিয়ে উঠলেন। এমন একটা দামী জিনিস জলে ডুবিয়ে দিলেন। অমন লোকের হাতে কি আর বিশ্বাস করে বন্দুক দেওয়া যায়! বন্দুক কিসের, আপনার উচিত খেলার পিস্তল থেকে গুলি ছোঁড়া!'

সিদরেঙ্কো কাচুমাচু হয়ে চুপ করে রইল, সে নিজের দোষ স্খালনের চেষ্টা করল না, স্কুলের ছাত্রকে যেমন ধমকায়, দাদু যে তাকে (হাজার হোক, সে হল একজন বড় ডিগ্রীধারী লোক) সেই ভাবে বকাবকি করছেন সেজন্য রাগও করল না। শিকারের সময় দাদু প্রায়ই চটে গিয়ে গালিগালাজ করতেন, ওদের নিয়ে হাসিঠাট্টা করতেন, কিন্তু তাতে ওরা কখনও রাগ করত না। রাগ করলে ওদেরই লোকসান। জলার জঙ্গল ছিল ভারাভা দাদুর হাতের নখদর্পণে।

যুদ্ধের সময় তিনি এখানে গেরিলাদের পথপ্রদর্শকের কাজ করেছেন, সে সময় ত তাঁর নামই হয়ে গিয়েছিল 'কর্ণধার'। শিকারীরা সকলেই জানত যে দাদুর সঙ্গে শিকারে বেরোলে শিকার না নিয়ে কেউ কখনও ফিরে আসে না।

আর এ বছরও কিয়েভের শিকারীরা অবশ্যই ভারাভা দাদুর কাছে আসবে। এটা ঘটনা...

'তোর কী মনে হয়, কোন বন্দুক যদি জলের নীচে, পাঁকের ভেতরে দুবছর ধরে পড়ে থাকে, তাহলে কি সেটা নষ্ট হয়ে গেছে বলে ধরা যায়?' জলের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম। 'নাকি জল থেকে উঠিয়ে এনে সাফ করে ওটা দিয়ে আবার গুলি ছোঁড়া যেতে পারে?'

'পাঁকের নীচে হাজার বছর পড়ে থাকতে পারে, তাতেও কিছু হবে না। মাটির নীচে, জলের তলে, মোট কথা জিনিসপত্র যদি টিকে না থাকত, তাহলে প্রত্নতত্ত্ববিদরা কী করত শুনি? বেকার হয়ে বসে থাকত।'

'ঐ বন্দুকটা তুলতে পারলে হত। অমন জিনিস যে সচরাচর মেলে না। ওটা দিয়ে চ্যাম্পিয়নরা নানা প্রতিযোগিতায় গুলি ছুঁড়েছে। অমনিই ত আর লোকটা অমন শোক করে নি।'

'কোন বন্দুকই তুই অবশ্য বার করতে পারবি না; কেননা ওটা এত দূরে তলিয়ে গেছে যে বার করতে গেলে গোটা নদী শুষে ফেলা দরকার। তিন শ' বছর পরে প্রত্নতত্ত্ববিদরা খুঁজে পেলেও পেতে পারে। কিন্তু জানবেও না যে ওটা আমাদের চোখের সামনে জলে তলিয়ে যায় আর আমরা ডুব দিয়ে ওটার খোঁজ করেছিলাম — উঠিয়ে আনার কথা ভেবেছিলাম।'

'তাছাড়া কেউ জানবেও না যে তুই নির্জন দ্বীপে পালিয়ে গিয়ে সেখানে আঠাশ বছর দুমাস উনিশ দিন কাটিয়েছিলি। দ্বীপটাই হয়ত তখন আর থাকবে না।'

'দ্বীপ ঠিকই থাকবে, চিন্তা করবি না।'

আমরা আবার প্রশস্ত জলধারার মধ্যে প্রবেশ করলাম। জায়গাটা বেশ বড়, জলের ওপর দিয়ে ফেনাভাঙা ঢেউ পর্যন্ত খেলে যাচ্ছিল (কেননা ঠিক এই সময় বাতাস বইতে থাকে) যেন সত্যিকারের সমুদ্র। আমরা এই নিয়ে পাঁচটা এরকম জলধারা পেরোলাম। ছোট ছোট দ্বীপও আমরা পেরিয়ে গেলাম প্রায় ডজনখানেক। প্রতি বারই আমি জিজ্ঞেস করি: 'এটা কেমন মনে হয়?.. না কি এটা?.. বেশ ভালো নির্জন দ্বীপ যে। আর কী চাই তোর?' কিন্তু রবিন্‌সন চলে নিজের মতে, সবগুলো দ্বীপ সে বাতিল করে দিল নানা কারণ দেখিয়ে। কোনটা খুবই ছোট বেড়ানোর মতো জায়গা নেই। কোনটায় বা তীরে নলখাগড়ার ঝোপ বড় ঘন হয়ে গেছে — জলের ধারে যাওয়া কঠিন। কোনটার ওপর গাছপালা নেই — আগুন জ্বালানোর জন্য কাঠ মিলবে কোথা থেকে। এমনি নানা সব অজুহাত।

অবশেষে আমাদের সামনে দেখা দিল্ একটা নতুন দ্বীপ। যেন নিবিড় সবুজের ঢিবি: লাল উইলোর ঝোপ, পুসি-উইলো, কোথাও কোথাও বা পপ্‌লার। তীরভূমি নলখাগড়ার ঝোপে পুরোপুরি ঢাকা নয় — জলের দিকে যাওয়া চলে। তিন দিক থেকে পরিষ্কার জলের ধারা দ্বীপটাকে ধুয়ে দিচ্ছে।

'এটাতে চলবে বলে মনে হচ্ছে,' রবিন্‌সন বলল। 'আয় নৌকো ভিড়ানো যাক।'

'আয়!' আমি উল্লসিত হয়ে বললাম, কেননা খুঁজতে খুঁজতে আমি বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলাম।

আমরা নৌকো ভিড়ালাম।

দ্বীপটা ছিল চমৎকার। রবিন্‌সন যেমন ভেবেছিল যেন সেই কাজের জন্যই বিশেষভাবে তৈরি। গাছপালা অনেক, আর শুকনো ডালপালা এত যে আঠাশ বছর দিব্যি কুলিয়ে যাবে। নলখাগড়ার ঝোপঝাড়ের মধ্যে ত এখনই শোনা যাচ্ছে হাঁসরা প্যাঁক-প্যাঁক করছে। তার মানে শিকার প্রচুর আছে। তীরের ধার ঘেঁষে প্রশস্ত জলধারায় খেলে বেড়াচ্ছে মাছের দল — নিজেরাই ঝোলে পড়ার জন্য মুখিয়ে আছে। দ্বীপের মাঝখানে ফাঁকা জায়গা — ডাংগুলি ত কোন্ ছাড়, ফুটবলই খেলা যায়। ফাঁকা মাঠের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক বুড়ো উইলো, শাখাপ্রশাখা দিয়ে মাটি ঝাঁট দিচ্ছে। কুটির ছাড়াই বৃষ্টির হাত থেকে গা বাঁচানো যায়। তবে কুটির অবশ্যই দরকার।

'কুঁড়েঘর বানাতে তোকে আমি সাহায্য করব 'খন,' আমি বললাম, 'জানিসই ত আমি কেমন কুঁড়েঘর বানাই।'

কথাটা ঠিকই। গাঁয়ে ছেলেদের মধ্যে কেউই আমার চেয়ে ভালো কুঁড়েঘর বানাতে পারে না। এ বিদ্যাটা বাবা আমাকে শিখিয়েছেন। বাবা ছুতোরমিস্ত্রী, নির্মাণকর্মী, গাঁয়ের অর্ধেক বাড়িই তাঁর তৈরি।

রবিন্‌সনের মুখের ওপর সন্দেহের ছায়া দেখা গেল:

'রবিন্‌সন কিন্তু নিজেই সব করত; কেননা সে নির্জন দ্বীপে গিয়ে পড়েছিল একা।'

'আরে, সে হল বইয়ের রবিন্‌সন ক্রুসো, আর তুই হলি আরেক রবিন্‌সন,' আমি আপত্তি তুলে বললাম। 'কথায় কথায় যে তার নকল করতে হবে কে এমন দিব্যি দিয়েছে?'

আমার ইচ্ছে হল যতটা পারা যায় বন্ধুকে সাহায্য করা। রবিন্‌সনও কোন তর্ক করল না। আমিও তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে কাঠের বাঁটওয়ালা বড় পেন্সিলকাটা ছুরি বার করে ঝোপঝাড়ের সরু সরু লম্বা ডাঁটা কাটতে লেগে গেলাম। ছুরিটা আমার বড় প্রিয় ছিল, ওটাকে কখনও আমি কাছছাড়া করতাম না। সব সময়

পকেটে থাকতে থাকতে তার বাঁটটা ঘষায় ঘষায় এমন চকচকে হয়ে গিয়েছিল যে মনে হত যেন পালিশ করা।

রবিন্‌সন এ কাজে আমার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিয়ে আজ্ঞাবহ হয়ে আমাকে সাহায্য করতে লাগল, সে ঝোপঝাড়ের লম্বা লম্বা ডাঁটা বয়ে আনল, কুঁড়েঘরের জন্য জায়গা সাফ করল, কাঠামোর জন্য খুঁটির গোড়া সরু করে কাটল — মোট কথা জোগানদারের যাবতীয় কাজ সে করল।

কিছুক্ষণ বাদে পুরনো উইলোর নীচে খাড়া করা হল চমৎকার প্রশস্ত একটা কুঁড়েঘর, দারুণ মজবুত (কোন ঝড়ঝঞ্ঝা, বজ্রপাতে ভয়ের কিছু নেই), আর এত আরামের যে আমার নিজেরই ইচ্ছে হচ্ছিল ওতে বাস করার। আমি আমার নিজের কাজে বেশ সন্তুষ্ট।

'পুরো আঠাশ বছর বড় রকমের মেরামতি ছাড়া টিকে থাকবে — গ্যারাণ্টি!' দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বললাম আমি।

একমাত্র তখনই আমাদের মনে পড়ে গেল দাদু হয়ত এতক্ষণে দোকান থেকে ফিরে এসেছেন। আমরা তাড়াতাড়ি ফিরতি পথ ধরলাম। শেষকালে তীরে পেঁছে নৌকোটা লুকিয়ে রেখে আমরা ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ির দিকে ছুটলাম।

হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসার পর দেখা গেল দাদু তখনও আসেন নি। রবিন্‌সন ঠিকই বলেছে: ভারাভা দাদুর 'এক মিনিট' কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত প্রসারিত হওয়ার উপযোগী গুণ ধারণ করে।

'তাহলে? দাদু যখন নেই তখন দরকারী সমস্ত জিনিসপত্র এখনই জড়ো করা যেতে পারে,' রবিন্‌সন বলল। 'আজ সব যোগাড়-যন্তর করে রেখে দেব, বয়ে নিয়ে নৌকোয় রেখে আসব, আর কাল...'

'তার মানে তুই কালই যাবি বলে ঠিক করলি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আর গড়িমসি করা কেন? কয়েক দিন বাদে মা এসে যাবে — তখন আরও কঠিন হয়ে পড়বে।'

রবিন্‌সন চিন্তিতভাবে থুতনিতে হাত ঠেকিয়ে ঘরের ভেতরে পায়চারি করতে করতে হিসাব করে দেখতে লাগল কী কী সঙ্গে নেওয়া যায়।

'প্রথমেই নিতে হয় চামচ,' এই বলে সে খাবারঘরের আলমারী থেকে একটা কাঠের হাতা বার করে নিয়ে কোমরে গুঁজল। 'নুন ত অবশ্যই, নুন ছাড়া মারা

যাব,' বলতে বলতে একটা নেকড়ার ওপর আধ প্যাকেটখানেক নুন ঢেলে নিল। 'রুটি!' টেবিলের ওপর যে বাসি রুটির পিঠটা ছিল সেদিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল। 'বড় কম...'

এই রুটি আনতেই দাদুর দোকানে যাওয়া।

'আমি তোকে এনে দেব। রুটি দেব, টোস্টও দেব। আমাদের আছে,' আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম।

'চা?' এক প্যাকেট চা হাতে নাড়াচাড়া করতে করতে সে বলল। 'যাক গে। তাহলে কেটলিও নিতে হয়। আমাদের আবার কেটলি ঐ একটাই।'

'টর্চটা ভুলবি না। কাজে লাগবে,' আমি মনে করিয়ে দিলাম।

'টর্চ ত অবশ্যই নেব। টর্চ ছাড়া চলবে না।'

ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে এগিয়ে এসে সে চৌকাঠের কোনা থেকে কুড়ুল হাতে তুলে নিয়ে বলল:

'কুড়ুল। দরকার ছিল অন্তত দুটো। রবিন্‌সনের ছিল মোট বারোটা কুড়ুল।'

'লোকটা কী রে? — ওগুলো নিয়ে ভোজবাজি খেলত নাকি?' আমি অবাক হয়ে বললাম। 'অতগুলোতে তার কিসের দরকার ছিল? কী আজব লোক রে বাপু তোর রবিন্‌সন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তুই খুব বুদ্ধিমান ত!' আমাদের রবিন্‌সন তার প্রেরণাদাতার প্রতি কটাক্ষে অপমানিত হয়ে বলল। 'বরং চুপ করে থাক! তুই ত আর নির্জন দ্বীপে কখনও বাস করিস নি!'

এমন সময় দরজার পাল্লা খুলে গেল, চৌকাঠে দাদুর আবির্ভাব ঘটল। কুড়ুল হাতে রবিন্‌সন একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেল।

'আচ্ছা!' শান্তস্বরে বললেন দাদু। 'আসবাবপত্র টুকরো টুকরো করে কাটার তাল বুঝি? রাখলি কুড়ুলটা ঠিক জায়গায়!'

'না না, আমি কিছুই করছিলাম না,' আমতা আমতা করে বলল রবিন্‌সন। 'আমি... আমি... ওকে দেখাতে যাচ্ছিলাম আমাদের কুড়ুলটা কত ভালো। ও বলে কিনা ওদেরটা আরও ভালো... আমাদেরটাই বেশি ভালো, ঠিক বলি নি দাদু?'

দাদু কোন জবাব দিলেন না, আমরা ঘর থেকে সটকে পড়লাম।

'ওঃ, আরেকটু হলেই ধরা পড়ে গিয়েছিলাম আর কি!' গোলাবাড়ির পেছনে

আসার পর স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বলল রবিন্‌সন। 'আচ্ছা, এটা কী রকম ব্যাপার যে আমরা ওঁর পায়ের শব্দই শুনতে পেলাম না!'

ব্যাপারটা সত্যিই অদ্ভুত। তার মানে আমরা নিজেদের চিন্তায় বড়ই বিভোর হয়ে ছিলাম। কেননা দাদুর পায়ের শব্দ অনেক দূর থেকে শোনা যায়। দাদু চলেন স্কী করার ভঙ্গিতে, মাটি থেকে পা ওঠে না — ছর্‌-র ছর্‌-র আওয়াজ হয়। মনে হয় কোন রকমে পা বদল করছেন, এই বুঝি পড়ে যান। কিন্তু শিকারের সময় যদি তোমরা একবার তাঁকে দেখতে! বরফে ঢাকা রাস্তা নয়, অমনি পথের ওপর দিয়েই পা ঘষটে ঘষটে খরগোসের পিছু ধাওয়া করে পঞ্চাশ কিলোমিটার খানেক চলে যাওয়া তাঁর পক্ষে কিছুই নয়।

আমি আর রবিন্‌সন গোলাবাড়ির পেছনে বসে বসে জল্পনা-কল্পনা করি কী ভাবে প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিস নৌকোয় বয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। অবশেষে আমরা একটা বোঝাপড়ায় এলাম। রবিন্‌সন একটা দুটো করে জিনিস ঘর থেকে বার করে এনে গোলাবাড়ির পেছনে লম্বা আগাছার ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রাখবে। অন্ধকার হলেই আমি (যাতে রবিন্‌সন দাদুর চোখের সামনেই থাকে, তার সম্পর্কে কোন সন্দেহের উদ্রেক না হয়) সব জিনিস নৌকোয় বয়ে নিয়ে যাব। আর কাল...

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নির্জন দ্বীপে রবিন্‌সনের অবতরণ

পরদিন সকাল। রোদ ঝলমলে, সুরেলা, কলকণ্ঠ মোরগ সুর তুলেছে, হাঁসরা প্যাঁক-প্যাঁক করছে, গোরুগুলো হাম্বা রবে ডাকছে, পাড়ার মেয়ে-বৌরা কুয়ার ধারে বালতির ঝনঝন ঢং ঢং আওয়াজ তুলছে।

আমি বেড়ার ধারে নীচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখছি আমার বন্ধুর বাড়ির আঙিনায় কী ঘটছে।

প্রাথমিক কাজ সাফল্যের সঙ্গে সারা হয়েছে। রবিন্‌সনের যাবতীয় সম্পত্তি এখন নৌকোয়। সম্পত্তির মধ্যে আছে ছররা বন্দুক, ছিপ, টর্চলাইট, হাতা, শীতকালের জন্য স্কেট, কুড়ুল (দুর্ভাগ্যবশত একটা, তাও আবার হাতল ছাড়া— তবে তাতে কিছু আসে যায় না, দ্বীপে হাতল বানিয়ে লাগিয়ে নেওয়া যাবে), এবং আরও অনেক অনেক জিনিস। মাছের টোপ হিশেবে মাটি খুঁড়ে অনেক পোকামাকড় বার করে একটা টিনের কৌটোয় দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া বস্তাভর্তি খাবারদাবার। এমন কি দুটো পিরামিডন ট্যাবলেট (অসুখবিসুখ হলে কাজে লাগতে পারে)। অতএব সব প্রস্তুত।

এখন একটি জিনিসই বাকি — দাদুর কাছ থেকে অন্য কোথাও যাবার অনুমতি নেওয়া।

দাদু একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর বসে চেঁছে চেঁছে পিচফর্কের ডান্ডা তৈরি করছেন। রবিন্‌সন তাঁর চারপাশে ঘুরঘুর করছে আর ঘ্যানঘ্যান করে চলেছে:

'দাদু!'

'উঁ?'

'আমি তাহলে পেস্‌কিতে হান্না মাসীর বাড়ি যাই।'

'সরে যা।'

'দাদু!'

'উঁ?'

'তাহলে আমি যাই?'

'সরে যা, বললাম যে। যা, বরং পড়া তৈরি কর্‌ গে।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর আবার বলল:

'দাদু!'

'উঁ?'

'আপনার সঙ্গে আমার একঘেয়ে লাগে।'

'তা তোকে আনন্দ দেবার জন্যে আমাকে কী করতে হবে শুনি? মাথায় ভর দিয়ে খাড়া হতে হবে নাকি?'

'আমি হান্না মাসীর কাছে যাব। ওখানে যে ইরা আছে। কত কাল ওকে দেখি নি...'

'ইরা যখন বাড়িতে, তখন তার সঙ্গে কেবলই ঝগড়াঝাঁটি, আর এখন দেখ, দরদ একেবারে উথলে উঠল...'

'আপনার জন্যে আমি বাড়ির তৈরি গুঁড়ো তামাক এনে দেব। হান্না মাসীর বাড়ির তামাক যে কীরকম তা আপনি জানেনেই।'

'আমার নিজেরই আছে, কোন অংশে খারাপ নয়। সরে যা বলছি।'

আবার চুপচাপ।

'দাদু!'

'উঁ?'

'তাহলে যাই? অ্যাঁ?'

'কী নাছোড়বান্দা রে বাবা! পড়া তৈরির কী হবে শুনি?'

'আমি ত বই নেব, ওখানে পড়া তৈরি করব। হান্না মাসীর কাছে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন।'

আমি নিশ্বাস বন্ধ করে ভাবতে লাগলাম: 'ওঃ, আমাদের কালে পালিয়ে নির্জন দ্বীপে যাওয়া কতই না কঠিন!'

রবিন্‌সন অনেকক্ষণ ঘ্যানঘ্যান করল। অবশেষে দাদুর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তিনি বললেন:

'ওঃ, ছেলে ত নয়, বিচ্ছু! জ্বালিয়ে খেলে যা। যাবি ত যা, দূর হ আমার চোখের সামনে থেকে! মাত্র তিন দিনের জন্যে, তার বেশি নয়। আর হান্না মাসীর কাছ থেকে যদি শুনি তুই পড়াশুনো করিস নি, তাহলে এই লাঠিটা দেখছিস ত — টের পাবি। গোল্লাখাওয়া ছেলে!'

রবিন্‌সন আর কালবিলম্ব না করে একলাফে ঘরের ভেতরে ঢুকে (এর মধ্যে দাদু আবার মত পালটে না ফেলেন) ব্যাকরণ বইটা বাগিয়ে নিয়ে একেবারে দেউড়ির বাইরে। তারপর হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে মুখ ফেরাল, খানিকক্ষণ একঠায় দাঁড়িয়ে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল:

'প্রণাম জানাই দাদু! আপনি ভালো... আমি সব সময়ই জানতাম যে আপনি ভালো...'

'যা যা!' দাদু গাঁক-গাঁক করে বললেন। তাঁর কি আর জানা ছিল যে রবিন্‌সন আঠাশ বছর দুমাস উনিশ দিনের জন্য তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে!

রাস্তায় আমি আমার বন্ধুর সঙ্গে মিললাম।

আমরা চুপচাপ নদী পর্যন্ত পেঁছলাম, চুপচাপ নৌকোয় গিয়ে বসলাম এবং চুপচাপ জলার জঙ্গলের উদ্দেশে যাত্রা করলাম।

একটি কথাও উচ্চারণ না করে আমরা দ্বীপে গিয়ে পেঁছলাম।

জমকাল নীরবতার মধ্যে আমরা সমস্ত জিনিসপত্র এনে তুললাম জঙ্গলের ভেতরকার ফাঁকা জায়গায় তৈরি কুঁড়েঘরে।

অবশেষে শেষবারের মতো আমরা দুজনে নৌকোর পাশে তীরে দাঁড়িয়ে রইলাম। মাথা নীচু করে জুতোর ডগা দিয়ে মাটি খোঁচাতে থাকি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলি। বিদায় নিতে হয়, কিন্তু এমন ক্ষেত্রে কী বলতে হয়, আমাদের জানা নেই। এক-আধদিনের জন্য নয়, এক-আধ মাসের জন্য নয়, এমন কি এক-আধ বছরের জন্যও নয়, আমরা যে বিদায় নিতে চলেছি পুরো আঠাশ বছর দুমাস উনিশ দিনের জন্য! দুনিয়ায় আজ অবধি আর কেউ এত দীর্ঘ সময়ের জন্য বিদায় নেয় নি।

'কী হল, আর অপেক্ষা করিস কেন? নৌকোর বাঁধন খুলে যাত্রা কর্!' ধৈর্য ধরতে না পেরে অবশেষে বলল রবিন্সন।

'তোর কি তাড়া আছে নাকি?' আমি বললাম।

'না তা নয়, সে রকম কিছু অবশ্য আমার নেই, তবে মোট কথা... তোকে যে বাড়ি ফিরতে হবে। ছেলেরা হয়ত মাঠে ফুটবল খেলছে।'

'তা হবেও বা!' আমি তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত নাড়ালাম। অর্থাৎ বক্তব্যটা হল এই যে ওসব ফুটবল বা ছেলেটেলে আমার দরকার নেই। এদিকে মনে মনে ভাবি: 'তাহলে কি রবিন্সন সত্যি সত্যিই আর কখনও ফুটবল খেলতে পারবে না? আহা বেচারি!' ওর জন্য এত দুঃখ হচ্ছিল আমার! কী চমৎকার গোলকীপারই না ছিল! কালে সত্যিকারের লেভ ইয়াশিন হতে পারত।

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে পকেটে হাত দিয়ে বার করলাম আমার পেন্সিলকাটা ছুরি।

'নে,' আমি বললাম, 'তোর কাজে লাগবে। জ্যানিস ত কেমন ছুরি এটা। ক্ষুরের মতো। এমন ছুরি আর কারও নেই... তোরটা কেমন যেন ভাঙ্গাচোরা।'

রবিন্সন পুলকে একেবারে লাল হয়ে গেল। এই ছুরিটা বহুকাল তার

ঈর্ষার বস্তু ছিল, কয়েকবার সে এটার বদলে অন্য জিনিসও আমাকে দিতে চেয়েছে, কিন্তু আমিই বদল করতে চাই নি। এখন ও যখন ফুটবল আর কখনও খেলবে না এবং একা একা বাস করবে, তখন ওর কাছেই থাক গে।

আমি আরও একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে অন্য পকেটে হাত দিয়ে দেশলাইয়ের বাক্স বার করলাম। সেটার ভেতরে ছিল কিয়েভ থেকে উপহার পাওয়া একপ্রস্ত বড়শি। চমৎকার বড়শি। মাছ শিকারীর কাছে পরম সম্পদ বিশেষ। জলের ওপরের ভাগে যারা ঘুরে বেড়ায় সেই পুঁটিজাতীয় মাছের জন্য ছোট ছোট বড়শি; ব্রিম, পার্চ, কই ইত্যাদির জন্য আরেকটু বড়; রুই-কাতলার জন্য আরও বড়; আর সবচেয়ে বড় — তিনফলা বড়শি — বোয়াল এবং অন্যান্য মৎস্যগোত্রীয় জন্তুদের জন্য।

'মাছ ধরিস,' আমি বললাম, 'যত খুশি। মাছের ব্যাপারে এখন তুই নিশ্চিন্ত হতে পারিস। কেবল বুঝলি কিনা, আমি যদি তোর কাছে কখনও আসি, আমাকে ধরতে দিস। এই বড়শিগুলোতে আমি বড় অভ্যস্ত।'

কেন আমি একথা বললাম আমি নিজেও জানি না। এই বড়শিগুলো দিয়ে আজ অবধি একবারও মাছ ধরি নি। যাই বল না কেন, আমার সম্ভবত ওগুলোর জন্য আফশোস হচ্ছিল। এমন কি ছুরিটার চেয়েও বেশি। রবিন্‌সন তা উপলব্ধি করে বলল:

'আরে, এসব আবার কেন? কোন দরকার নেই। আমার আছে ত।'

কিন্তু বললে কী হবে, দেশলাইয়ের বাক্সটা থেকে সে কিছুতেই তার মুগ্ধ চোখের দৃষ্টি সরিয়ে নিতে পারছিল না। সাধ্য কার এমন উপহার ঠেলে সরিয়ে দেয়! না, দুঃখ হলেও বড়শির জন্য কিন্তু আমার দুঃখ হচ্ছিল না।

এই নির্জন দ্বীপে রবিন্‌সন থেকে যাবে একা, একেবারে একা, সালিভোন দাদুর মুখের ভেতরকার একটা দাঁতের মতো। কেউই তাকে আর দেখতে পাবে না। এমন কি তাকে চিঠি লেখাও যাবে না! হুঁ, যাবে না ত বটেই। ওর যে কোন ঠিকানা নেই। দুনিয়ায় সব লোকেরই ঠিকানা থাকে, কিন্তু ওর নেই। হঠাৎ এই চিন্তাটা আমাকে উতলা করে তুলল।

'শোন রে,' আমি বললাম, 'এমন চলতে পারে না। ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে এখন তোর ঠিকানা নেই। কোন ঠিকানাই নেই।'

'তাতে হল কী?'

'হল কী মানে? — বলিস কী রে! ঠিকানা নেই, বুঝতে পারছিস! তার মানে অনেকটা দাঁড়াচ্ছে এই যে তুই আদৌ এ জগতে বাস করিস না।'

'তা আমি কী করতে পারি বল্?' হকচকিয়ে গিয়ে রবিন্সন বলল।

'আর দেরি না করে দ্বীপটার একটা নাম দেওয়া উচিত। নাম থাকলে ঠিকানাও থাকবে।'

'আয়, নাম দেওয়া যাক। আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। কী নাম হবে?'

'আমি তার কী জানি? পৃথিবীতে নানা নামের দ্বীপ হয়ে থাকে। এই ধর্ যেমন সাখালিন দ্বীপ, মাদাগাস্কার দ্বীপ, তাইমির দ্বীপ। না, ওটা বোধ হয় দ্বীপ নয়, উপদ্বীপ। যাই হোক, ওরকম একটা কিছু।'

'তাহলে মাদাগাস্কারই হোক। খাসা নাম। আমার পছন্দ।'

'আরে, মাদাগাস্কার আছে যে। এমন একটা নাম দরকার যে নামে অন্য কোন দ্বীপ নেই।'

রবিন্সন ভাবিত হয়ে পড়ল। বিড়বিড় করে ঠোঁট নাড়ল, সম্ভবত নামের খোঁজ করার সময় মনে মনে আওড়াতে গিয়ে। শেষকালে বলল:

'তাহলে বলি শোন্, নাম হোক 'ফের পরীক্ষা'। ফের পরীক্ষার দরুনই আমাকে এখানে আসতে হল, তাই ঐ নামেই দ্বীপটার নাম হোক। এমন নাম আর নেই — বাজী রাখতে পারি।'

আমি তর্ক করলাম না। এই ভাবে পৃথিবীর মানচিত্রে (যদিও এখন অবধি আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ এ সম্পর্কে জানে না) দেখা দিল নতুন ভৌগোলিক নাম — 'ফের পরীক্ষা' দ্বীপ। কে বলতে পারে, অনেক বছর পরে কোন এক সময় স্কুলের ছেলেমেয়েরা তাদের পাঠ্যবইয়ে পড়বে না: ''ফের পরীক্ষা' দ্বীপ। প্রসিদ্ধ এই কারণে যে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র রবিন্সন ভাসিলিয়েভিচ রেন্ নিঃসঙ্গ অবস্থায় এই দ্বীপে প্রায় ত্রিশ বৎসর অতিবাহিত করেন।' আর কোন এক অলস ছাত্র হয়ত এটা না জানার দরুন গোল্লাও পেয়ে যেতে পারে!

আমার মেজাজ খানিকটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। বিদায় নেওয়াটা তাই অত বিষণ্ণ ঠেকল না।

'মন খারাপ করিস নে রবিন্সন, সব ভালোয় ভালোয় কাটবে,' উৎফুল্ল হয়ে

6–1068

বললাম আমি। 'এমন দ্বীপে আঠাশ বছর কেন, এক শ' বছর কাটিয়ে দেওয়া যায়। মাছ যদি টোপ খায় তাহলেই হল।'

'আমারও তাই মনে হয়।'

'বিদায়!'

'বিদায়!'

আমি নৌকোয় চেপে দাঁড় দিয়ে নৌকোটাকে তীর থেকে দূরে ঠেলা মারলাম।

মানবজাতির সঙ্গে রবিন্‌সনের শেষ সম্পর্ক ছিন্ন হল। ও একা রয়ে গেল নির্জন দ্বীপে। এখন সে যদি বাড়ি ফিরে যেতেও চায়, তাহলে বাইরের কারও সাহায্য ছাড়া তা পারবে না; কেননা ওর নৌকো নেই। আর নৌকো ছাড়া জলার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা অসম্ভব — ডুবে মারা যাবে। আমি ওকে আমাদের ডুবোজাহাজটাকে রেখে দিতে বলেছিলাম (পারাপারের জন্য ত আমরা যে কোন নৌকোই ব্যবহার করতে পারতাম), কিন্তু ও স্রেফ না করে দিল। 'ব্যাপারটার তাহলে কোন গুরুত্ব থাকবে না,' ও বলল। 'এটা হবে নিছক একটা ভ্রমণ: একঘেয়ে লাগল — ফিরে এলাম। সত্যিকারের রবিন্‌সনের কোন যানবাহন থাকলে কি আর সে একা একা দ্বীপে বসে থাকত? না না, হওয়া চাই সত্যিকারের মতো। কোন নৌকো-টৌকো নয়, ফেরার কোন উপায়ই থাকবে না।'

বীর বটে আমাদের এই রবিন্‌সন!

অষ্টম পরিচ্ছেদ

'ফের পরীক্ষা' দ্বীপে প্রথম দিন। রবিন্‌সনের জবানীতে বন্ধু ও সহপাঠী পাভেলকে কথিত বিবরণ

তুই যখন তীর থেকে দূরে সরে গেলি এবং শেষ পর্যন্ত যখন অদৃশ্য হয়ে গেলি নলখাগড়ার ঝোপের আড়ালে, জলের ওপর রয়ে গেল কেবল কতকগুলো রেখা তখন হঠাৎ এমন একটা নিস্তব্ধতা নেমে এলো যে তেমনটা আমি জীবনে

কখনও উপলব্ধি করি নি (এমন কি ছররা বন্দুক থেকে প্রথম গুলি ছোঁড়ার পর আমার কানে যখন তালা ধরে যায় তখনও না)। আমি নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকি পাথরের মূর্তির মতো। নিস্তব্ধতা, কী দারুণ নিস্তব্ধতা!

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেবে কূল পাই না কী করা উচিত। কোন তাড়াহুড়ো নেই, কিছু করারও নেই। ঠায় দাঁড়িয়ে থাক, বসে থাক, ডিগবাজী খাও — সব সমান। দেখার কেউ নেই, কারও কোন মাথাব্যথা নেই যে দেখতে আসবে।

আমার খারাপ লাগতে লাগল। আর সবচেয়ে বড় কথা হল এই বিশ্রী চিন্তাটা যে এখান থেকে নিজে নিজে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। চিৎকার কর, গাছের গায়ে মাথা কুটে মর — কিছুতেই কিছু হবার নয়। জানি না আমি কী করতাম, কিন্তু হঠাৎ অনুভব করলাম যে খিদে পেয়েছে। তোর নিশ্চয়ই মনে আছে যে আমি এত উদ্বেগ বোধ করি আর তাড়াহুড়ো করি যে বাড়িতে ভালোমতো সকালের খাওয়া খেতে পারি নি। সঙ্গে সঙ্গে আমার হুঁশ হল। আমি ঠিক করলাম খাবারের যে রসদ আছে তাতে আপাতত হাত দেব না — কে জানে পরে আরও কত কী হতে পারে? মনে মনে ঠিক করলাম যত পারা যায় মাছ ধরব। একটা জুতসই জায়গা বেছে নিয়ে ছিপের সুতোর পাক খুললাম, টোপ গেঁথে ছিপ ফেললাম। অপেক্ষা করে থাকি। বসে বসে ফাতনার দিকে তাকাই আর অপেক্ষা করি। অপেক্ষা করছি ত করছিই। ফাতনার নড়াচড়ার কোন লক্ষণ দেখি না। টোপে ঠোকর পড়ছে না। পোকাগুলোর ওপর দারুণ বিরক্ত হয়ে আমি শেষকালে বদলে অন্য পোকা গাঁথলাম, বারবার জায়গা বদল করলাম — টোপে আর ঠোকর পড়ে না। এদিকে খিদে আমাকে ক্রমেই কাবু করে ফেলছে। বসে বসে ঢোক গিলি আর ফিসফিস করে বলি: 'ঠোকরাও গো মাছের পো'রা! ঠোকরাও না গো! আমার যে খিদে পেয়েছে।' এদিকে ফাতনা যেন তক্তায় আঁটা পেরেকের মতো, জল থেকে স্রেফ খাড়া হয়ে আছে ত আছেই। মাছ নেই। জলের নীচে আমার খাবার কিলবিল করছে, কিন্তু কিছুতেই হাতানোর উপায় নেই।

আমি নার্ভাস হয়ে পড়ি, অনবরত ছিপ টানি, কিন্তু ঐ টানাই সার — বড়শিতে কেবল ঐ গাঁথা টোপটাই ওঠে। আরে, শুধু পোকা খেলেও ত বুঝতাম। ছ্যাঃ!

নিজেই অবশ্য বুঝি মাছ ধরার উপযুক্ত সময় এটা নয়, জানি যে মাছে টোপ গেলে হয় খুব ভোরে নয়ত সন্ধ্যার দিকে — কিন্তু তাতে মনে কোন সান্ত্বনা পাই

না। সন্ধে অবধি অপেক্ষা করা তাই বলে চলে না — পেটে টান পড়েছে, মারা যাবার দশা। শেষকালে হল এই যে বড়শিটা একটা গোঁজে বেধে যেতে ছিপের সুতো ছিঁড়ে গেল। আমার ভালো বড়শিগুলোর একটা, মানে যেগুলো তুই উপহার দিয়েছিলি তারই একটা খোয়া গেল। আমি রেগে গেলাম, বিরক্ত হয়ে খাবারের থলির দিকে এগোলাম — আর সহ্য করতে পারলাম না। এমন সর্বগ্রাসী খিদে পেয়ে বসেছিল যে সঙ্গে সঙ্গে অর্ধেক রসদ উড়িয়ে দিলাম। চিত হয়ে ফাঁকা জায়গাটার ওপর শুয়ে পড়লাম, ঝিমোতে ঝিমোতে নিজের অজানতেই কখন যেন ঘুমিয়ে পড়লাম। সম্ভবত অনেকক্ষণই ঘুমিয়েছিলাম, ঘুম যখন ভাঙল তখন অনুভব করলাম গা পোড়াচ্ছে। রোদের প্রচণ্ড তাপ। হাত দিয়ে মুখ ছুঁতে দেখি দুই গাল আগুনের মতো জ্বলছে। রোদে আমি পুড়ে ঝাঁই হয়ে গেছি। গিয়ে জলে চোখমুখ ধুলাম — জ্বালা করছে। ভিজে মাটির প্রলেপ লাগালাম — তাও জ্বলছে। মনে পড়ে গেল ননী অথবা টক দুধ দিয়ে ধোয়া দরকার। কোথায় আর পাব এখন ননী! তখনই আমি প্রথম টের পেলাম যে নির্জন দ্বীপ — নির্জন দ্বীপই, এ আমাদের 'উজল ঊষা' যৌথখামার নয়, যেখানে ননীর বন্যা বয়ে যায়। অথচ আমার এখন দরকার মাত্র এক চামচ, এমন কি আধ চামচ হলেও চলে। ওঃ, কী জ্বালাই যে করছে! আমি গিয়ে ঢুকলাম কুঁড়েঘরের মধ্যে। ভেতরটা অন্ধকার, ঠাণ্ডা। খানিকটা শুয়ে রইলাম। জ্বালা ধরলে কী হবে, বেঁচে থাকা দরকার যে। আঠাশ বছর ত আর কুঁড়েঘরে শুয়ে কাটিয়ে দেওয়া যায় না। বেরিয়ে এলাম, কুড়ুল আর তোর ছুরিটা নিয়ে চললাম কুড়ুলের হাতল বানাতে। একটা ভালোমতো শুকনো ডাল পেয়ে সেটা কেটে হাতল বানালাম, ওটাকে চাঁছাছোলা করতে লাগলাম, এমন সময় আঙুলে চোঁচ ঢুকে গেল। ওঃ, সে যা ব্যথা! — নখের ঠিক

তলাটায়। সঙ্গে সঙ্গে আঙুল মুখে পুরলাম। চুষি কিন্তু চুষে বার করতে পারি না, দাঁত দিয়ে চাপ দিলেও বের হয় না। ছুঁচ থাকলে হত, ছুঁচ থাকলে তৎক্ষণাৎ বার করে ফেলা যেত। কিন্তু কোথায় আর পাব ছুঁচ? ছুঁচের জন্য গাঁয়ে ছোটা দরকার। 'ছুটে যাও না, যাচ্ছ না কেন?' নিজেই নিজেকে জিজ্ঞেস করি।

একটা অক্ষম আক্রোশের বশে আমি প্রায় কেঁদেই ফেললাম। ছুঁচের মতো এমন একটা দরকারী জিনিস কিনা ভুলে গেলাম! বড়শি নিয়ে তাই দিয়ে খুঁটতে শুরু করলাম। কিন্তু ভয় হয় — খুঁটি সাবধানে। বড়শির আগাটা যে আবার খাঁজকাটা: একবার ভেতরে ঢুকে গেলে হল, চোঁচ ত চোঁচ, বড়শি বেঁধা আঙুল নিয়ে ঘুরতে হবে। ওঃ, জেরবার হয়ে গেলাম। গলদ্‌ঘর্ম হলাম। অথচ চোঁচ বার করা গেল না — ডগাটা রয়েই গেল। এর পর অনেকক্ষণ ব্যথা করতে থাকে। ভালো বলতে হবে যে পেকে ওঠে নি।

সূর্য অস্তগামী, আবার খিদেটা আমাকে জানান দিল। রসদের থলিটার দিকে তাকাতেও ভয় হচ্ছিল — জানতাম যে ওটার কাছাকাছি গেলে আগামী কাল মাটি কামড়াতে হবে। মাছ, একমাত্র মাছই ক্ষুধার তাড়না থেকে আমাকে বাঁচাতে পারে।

আমি আবার ছিপ ফেললাম। এবারে কিন্তু আমার কপাল খুলে গেল। ওঃ পাভেল, জানিস, কী খুশিই না আমি হলাম যখন শেষ অবধি তোলা গেল প্রথম শিকার — একটা পুঁটি মাছ! মাছটা ছিল ছোট, এক আঙুল সমান, কিন্তু আমার কাছে তার দাম ছিল সেই আধ মিটার লম্বা পাইক মাছের চেয়ে বেশি, যেটা তুই আর আমি মিলে গত গরমকালে ধরেছিলাম। আমি এই খুলে পুঁটি মাছটাকে চুমু পর্যন্ত খেলাম। তারপর ধরা পড়ল বাটা তপসে এমনি আরও মাছ। আমি এমনই মেতে ছিলাম যে লক্ষই করি নি পোকামাকড়ের কৌটোটা কখন উলটে পড়ে গেছে। যখন নজরে পড়ল ততক্ষণে পোকামাকড়গুলো এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়েছে। আমি একেবারে লাফিয়ে উঠলাম। সর্বনাশ! পোকামাকড় ছাড়া ত মাছই ধরা যাবে না! আমি সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু গেড়ে বসে তীরে হামা দিতে দিতে ওগুলো জড়ো করতে লেগে গেলাম। কিন্তু বেশির ভাগই ততক্ষণে মাটির নীচে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে, গা ঢাকা দিয়েছে। তাছাড়া অন্ধকারও হয়ে আসছিল। কোন রকমে কৌটোর চারভাগের এক ভাগ সংগ্রহ করা গেল... মাছ আর আমি ধরলাম না, মনে মনে ঠিক করলাম টোপের পোকা সাশ্রয় করতে হবে।

ধ্বনি জ্বালালাম, চুনোপুঁটি যা ধরা পড়েছিল সেগুলিকে সাফ করে পুরনো ডেকচিতে মাছের সুপ রান্না করতে লেগে গেলাম। সেদ্ধ করতে করতে দেখি সর্বক্ষণ জল ঢেলে যেতে হচ্ছে। আর ডেকচির তলায় কেমন যেন ফ্যাঁসফোঁস আওয়াজ হচ্ছে। ভালোমতো লক্ষ করে দেখি — হা ভগবান, আমার ডেকচির ফুটো দিয়ে জল চুঁইয়ে পড়েই ত এই কান্ড! হায় হায়, কী করে আগে আমার নজর এড়িয়ে গেল যে ওটাতে ফুটো আছে! শোকে-দুঃখে আমি প্রায় কেঁদেই ফেললাম। এখন আমার কী উপায়! এমন ডেকচিতে কেবল কাদামাটিই ছানা যায়, মাছের সুপ রান্না করার বাসন এটা নয়। ডেকচি ত নয়, ঝাঁঝরি। অথচ আর কোন ডেকচি আমার কাছে নেই, এখন পাইই বা কোথা থেকে? আমি যে নির্জন দ্বীপের অধিবাসী।

রবিন্‌সন ক্রুসোর আর কী? যা যা দরকার সেসবই জাহাজডুবির পর সমুদ্রের তীরে তার কাছে এসে পড়ে। সব, এক কথায় সব, এমন কি টাকাও।

এক ডজন কুড়ুল চাই তোমার? — এই নাও এক ডজন কুড়ুল। রেশমী জামা চাই?— এই নাও রেশমী জামা... আর আমার বেলায়? একটা ছোটে ডেকচিও যদি জুটত! অন্তত এই এওটুকুন একটা। কিসের কী! এখানে এই জলার জঙ্গলে জাহাজডুবির আশা! সে গুড়ে বালি! একশ’ বছর অপেক্ষা করলেও না! মাত্র একবারই এখানে সত্যিকারের জাহাজডুবি হয়েছিল। সেই তখন, যখন কিয়েভের শিকারী সিদরেঙ্কোর বন্দুক জলে ডুবে যায়; আর তাতে আমার লাভই বা কী? আমার নিজেরই বন্দুক আছে। না, জাহাজডুবির আশায় থাকলে আমার চলবে না।

মুখ বিকৃত করে আধাসেদ্ধ মাছের সুপ চুমুক দিয়ে খেলাম, আধাকাঁচা মাছ চিবিয়ে খেলাম, তারপর বসে থাকি।

ইতিমধ্যে পুরো অন্ধকার হয়ে এসেছে। আকাশে তারা পর্যন্ত দেখা যায় না — মেঘে ঢাকা আকাশ। কেবল নিভন্ত ধুনিতে ধিকি-ধিকি কাঠকয়লা জ্বলছে। পেটের ভেতরটা ঠান্ডায় সিরসির করছে আর সেখান থেকে হৃৎপিণ্ডের দিকে ঠেলে উঠে আসছে কেমন যেন একটা হড়হড়ে, বিশ্রী রকমের ভয়-ভয় ভাব। কিছু একটা করা দরকার, মনটা অন্য দিকে ফেরানো দরকার। আমি কুঁড়েঘরে গিয়ে ঢুকলাম,হাতড়ে হাতড়ে টর্চলাইটটা বার করে জ্বালালাম। আমার ব্যাকরণের খাতাটা

খংজে বার করলাম (তুই ত জানিসই আমি ব্যাকরণের খাতা আর বই সঙ্গে নিয়েছিলাম যাতে দাদ্ন ভাবেন আমি মাসীর ওখানে ব্যাকরণের পড়া তৈরি করব), থলির ভেতর থেকে হাতড়ে বার করলাম পেন্সিল… তুই নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাচ্ছিস এই ভেবে যে আমি পড়া তৈরি করতে যাচ্ছি নাকি? মোটেই না! তুই জেনে রাখ যে রবিন্‌সন ক্রুসো দ্বীপে ডায়রী রাখত, যা যা ঘটনা ঘটত সেগুলো সে লিখে রাখত। আমিই বা তার চেয়ে কোন্‌ অংশে খারাপ? তার মতো আমিও ত নির্জন দ্বীপে গিয়ে পড়েছি। আর নির্জন দ্বীপে ডায়রী ছাড়া চলে না।

তবে আগাগোড়া সমস্ত কিছু লেখা — তুই ত জানিসই — আমার পোষায় না। আমি লেখক নই। তার চেয়েও বড় কথা হল এই লেখার জন্যই ফের পরীক্ষায় বসার কথা আমার। আমি ঠিক করলাম নেহাৎ ঘটনা — ভালো ও মন্দ ঘটনা — সংক্ষেপে লিখে রাখব। খাতার মাঝামাঝি একটা লম্বা লাইন টেনে আমি বাঁ ও ডান — দুভাগে ভাগ করলাম। বাঁ পাশে ওপরের দিকে লিখলাম 'এড্‌ভেঞ্চার' (এটা আমার জন্য, তুই ত জানিসই যে এর জন্যই আমি দ্বীপে এসেছি, এড্‌ভেঞ্চার ছাড়া আমার জীবন — জীবনই নয়, বিশেষত দ্বীপে)। ডান পাশের অর্ধেকে মাথার ওপর লিখলাম 'অপ্রীতিকর ঘটনা' (কী আর করা যাবে? এগুলোকে এড়ানোর উপায় নেই)।

আমি অনেকক্ষণ ভাবলাম, অনেকক্ষণ ধরে পেন্সিল কামড়ালাম, শেষকালে লিখলাম। ব্যাপারটা দাঁড়াল এই রকম:

এড্‌ভেঞ্চার

১। মাছ ধরে খেলাম।

অপ্রীতিকর ঘটনা

১। রোদের তাপে চামড়ায় ফোস্‌কা পড়ে গেল।

২। নখের নীচে চোঁচ ঢুকে গেল।

৩। বড়শি খোয়া গেল (সবচেয়ে ভালো বড়শিগুলোর একটা)।

৪। প্রায় অর্ধেক থলির রসদ খেয়ে ফেললাম।

৫। প্রায় সবগুলো পোকা পালিয়ে গেল।

৬। ডেকচি থেকে জল চুইয়ে পড়ছে, কিসে যে মাছের সুপ রান্না করব জানি না (হাতের আঁজলায় নাকি?)।

সুতরাং দেখতেই পাচ্ছিস, এড্ভেঞ্চার সবে একটা, একেবারেই ছোট, ঐ পুঁটি মাছটার মতো (তাও এড্ভেঞ্চার বলে লিখেছি নেহাৎই নিজের উদারতাবশত)। আর অপ্রীতিকর ঘটনা ছয়-ছয়টা, সবগুলোই আবার ইয়া ইয়া, যেন অনেকটা হাঙ্গর।

এসবই আমি লিখলাম কনুই দিয়ে হাঁটুর ওপর খাতা চেপে ধরে আর কানের ওপর টর্চটা অবিরাম ঝরাক-ঝরাক শব্দে টিপতে টিপতে, কেননা ধুনি ইতিমধ্যে নিভে গেছে, ওটাকে নতুন করে জ্বালানোর ইচ্ছে আমার হল না (তবে এমন ভেবে বসিস না যে শুকনো ডালপালার জন্য ঘুটঘুটে অন্ধকার ঝোপের ভেতরে যেতে হবে বলে)।

তোর টর্চলাইটটা বাস্তবিকই অফুরন্ত। ওটার জন্য তোকে ধন্যবাদ। কিন্তু এই ঝরাক-ঝরাক আওয়াজ... ঝরাক-ঝরাক করলি ত আলো আছে। না করলে — নেই। আমি তাই ঝরাক-ঝরাক শব্দে টিপে চলি। একমাত্র ঐ আওয়াজটার কথা মনে হতেই এর পর আধঘণ্টা ধরে আমার মাথার ভেতরটা ঝাঁঝাঁ করতে থাকে। হাত অবশ হয়ে গেল। লিখে ফেলার পর আমি ভাবলাম এই বুঝি সব — দিন শেষ হয়ে গেছে, আর কিছু ঘটবে না, আর কোন ঘটনা নেই। তখনও আমি জানতাম না যে আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে এড্ভেঞ্চারের মতো এড্ভেঞ্চার — হাঙ্গর ত কোন্ ছাড়, তিমির সমান বিরাট।

আমার ঘুম আসছিল না — দিনের বেলায় জোর ঘুমিয়েছি। আমি আমার কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে এসে দুহাতে হাঁটুজোড়া জড়িয়ে ধরে বসলাম, এদিকে মাথার ভেতরে কিলবিল করতে থাকে যত রাজ্যের চিন্তা — আমাদের গ্রাম, স্কুল, তোর কথা (এখন ওখানে তুই কী করছিস — নির্ঘাত অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিস)...

মেঘের আড়াল থেকে উঁকি মারল এক ফালি চাঁদ, যেন কসাকের তলোয়ার — ম্যাটমেটে রুপোলি আলো এসে পড়ল চওড়া জলধারার ওপর। মাথার ওপর অদৃশ্য হাঁসের দল ডানার সাঁই-সাঁই আওয়াজ তুলছিল — সর্বত্র শান্ত। বাতাস নেই, এমন কি নলখাগড়ার ঝাড় সব সময় সরসর করে — তারাও চুপচাপ, নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করছে না। আমি জলধারার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আপন মনে ভাবতে থাকি।

এমন সময় জলস্রোতের ওপর ছায়া পড়ল, বেশ লম্বা সেই ছায়াটা। নলখাগড়ার

ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো একটা শালতি — কোন শব্দ নেই, একবারও ছলাত্ আওয়াজ উঠল না, যেন এক প্রেতমূর্তি। এটাই ছিল সবচেয়ে ভয়ংকর (যেন স্বপ্ন দেখছি)। শালতিতে লম্বা কে একজন সোজা দাঁড়িয়ে আছে আর লম্বা দাঁড় দিয়ে নৌকো বাইছে। আমি চোখ পিটপিট করলাম — জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছি না ত!.. না!. শালতিটা ভেসে আসছে সোজা দ্বীপের দিকে। তার আকার বাড়ছে ত বাড়ছেই, যেমন দেখা যায় সিনেমার পর্দায়; তীরের একেবারে কাছাকাছি এসে সেটা বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল উপকূলের ঝোপঝাড়ের আড়ালে।

আমার বুকটা ধুকপুক করে উঠল। কে এ? জলের কোন অপদেবতা? বুনো ভূত? পিশাচ? আরে, এ আমার কী হল? কেবল অশিক্ষিত বুড়িরাই ত এই সব আজেবাজে ভূতপ্রেত ইত্যাদিতে বিশ্বাস করে! আর আমি? — আমি বিশ্বাস করি রেডিও, টেলিভিশন, মহাজাগতিক রকেট! না, বাজে ব্যাপার, ভয় পাবার কোন কারণ নেই!.. এমন সময় আমার মনে পড়ে গেল গুনেকাকে... সেই যে সেই হাবাগোবা, ছিটগ্রস্ত গুনেকা, দুবছর আগে যে বেপাত্তা হয়ে যায়, জলার জঙ্গলে উধাও হয়ে যায়... গুনেকা! আর গুনেকা হলেই বা কী? এমনও ত হতে পারে যে সেও আমারই মতো জলার জঙ্গলে কোন এক নির্জন দ্বীপে বাস করছে! গুনেকা! আরে, ও যে বদ্ধ উন্মাদ, ওর কোন বোধশক্তি নেই। আমাকে দেখে সে কোন পিশাচ-টিশাচ ভেবে বসলেই হয়েছে (সুস্থ, স্বাভাবিক একটা ছোকরা রাতের বেলায় জলার জঙ্গলে কী করতে? — এ প্রশ্ন মনে উঠতে পারে), গলা টিপে মেরে ফেলবে। গলা টিপে মেরে ফেলবে — কিছুই প্রমাণ করা যাবে না ওর কাছে। চেঁচাও, কান্নাকাটি কর, অনুনয়-বিনয় কর — কোন লাভ নেই... আমার পিঠের ওপর যেন কিলবিল করছে পোকামাকড় — কেমন যেন ভিজে ভিজে, পিছলে আর ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। মনে হল কেউ বুঝি আমার গলায় ফাঁস লাগিয়ে কসে টানছে — কণ্ঠনালীতে চাপ পড়ছে, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

আমি আড়ষ্ট হয়ে কান পেতে রইলাম। আরও ভালো করে যাতে শুনতে পাই তার জন্য হৃৎপিণ্ডও যেন থেমে গেল। ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে শোনা গেল ছপছপ আওয়াজ, কী যেন ঝপাং করে গিয়ে পড়ল জলে — মনে হল কাউকে বুঝি নৌকো থেকে জলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল। হয়ত বা গুনেকা কাউকে নৌকো করে নিয়ে এসে জলে ডুবিয়ে দিল... এবারে আমার পালা।

আমি আর ঠায় বসে থাকতে পারলাম না। আড়ষ্ট পায়ে অন্ধকারের মধ্যে গুটি গুটি এগিয়ে গেলাম কুঁড়েঘরের দিকে। যেতে যেতে হঠাৎ কার গায়ে যেন সজোরে ধাক্কা খেলাম... বিশাল আকৃতির কোন একটা লোক সাঁড়াশির মতো শক্ত হাতে খপ করে আমার কাঁধ চেপে ধরল। আমি পায়ের চাট মারলাম, ছিটকে পড়ে গেলাম। কে যেন ধপ করে আমার ওপর এসে পড়ল, আমার মুখে আঁচড় দিল আর...

রবিন্সনের বিবরণ এখানে থেমে যায়, কেননা এই সময় পাভেল উত্তেজিত হয়ে ওঠে, রবিন্সনের কথার মাঝখানে বাধা দেয়, আর শুরু হয়ে যায় এমন ধরনের কথাবার্তা যা পাঠকের বোধগম্য হবে না যতক্ষণ না সে জানতে পারছে ঐ দিন এবং ঐ রাতে পাভেলের অবস্থাটা কী হয়েছিল।

নবম পরিচ্ছেদ

ঐ দিন ঐ রাতের ঘটনা পাভেলের জবানীতে

রবিন্সনকে দ্বীপে রেখে এসে আমি ত বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। নৌকো বয়ে অর্ধেক পথ যেতে না যেতেই ঘটে গেল একটা এড্ভেঞ্চার। তাকিয়ে দেখি, নৌকোয় যেন বড় বেশি জল — প্রায় আধ নৌকো। অথচ ঢেউ নেই আর নৌকোও এর মধ্যে কাত হয়ে কানায় করে জল ওঠায় নি। কী ব্যাপার? খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে নজরে পড়ে গেল তলায়, ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় একটা ফুটো — এমনই ফুটো যে তিনটে আঙুল সেখানে ঢোকানো যায় — আর সেখান থেকেই গলগল করে, এমন কি কলকল শব্দে জল ঢুকছে। কোন এক সময় এই ফুটোটা নিয়েই আমাদের সবচেয়ে বেশি বেগ পেতে হয়েছিল, আমরা বার্চ গাছের গোঁজ পুঁতি, পুটিং লাগাই। এখন ছিটকে গেছে সেই গোঁজটা, কে জানে কোথায়; এদিকে জল গলগল করে ঢুকছে সেই নল ও চৌবাচ্চার অঙ্কের মতো — 'একটি নল দিয়া ভিতরে প্রবেশ করে অপর একটি নল দিয়া বাহিরে যায়'। কেবল তফাতটা হল এই যে এখানে শুধু 'ভিতরেই প্রবেশ করে'। আর এ অঙ্কের উত্তর

একটাই এবং সেটা আমার পক্ষে অত্যন্ত অপ্রীতিকর। পাঁচ মিনিটও যেতে না যেতে জল কানায় কানায় ভরে উঠবে আর ... নৌকো ছাড়া সাঁতরে গ্রামে পেঁছনো সম্ভব নয় — অনেকটা দূর। তাছাড়া শাপলার ডাঁটা আর শেওলা এত বেশি যে চোখের পলকে হাত-পা জড়িয়ে যাবে, আমার আমি বলতে জলের ওপর খানিকটু ভুড়ভুড়ি ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। আমার ভেতরের সর্বাঙ্গ হিম হয়ে গেল, থরথর করে কেঁপে উঠল আর শরীরের বাইরে দেখা দিল ঘাম। 'তাহলে কি এখানেই শেষ?' আমি ভাবলাম। 'কিন্তু আমি যে সবে ক্লাস সিক্সে উঠলাম! আমি বাঁচতে চাই। আমি বড় হয়ে উঠতে চাই। আমি চাই বৈমানিক হতে... আর চাই গ্রেবেনিউচকাকে বিয়ে করতে (অবশ্য অন্য কারও সন্ধান যদি না পাই)।' না, মরা কোনক্রমেই চলবে না। শিগগির কোন একটা দ্বীপে গিয়ে ভিড়াতে হয়, ফুটো বন্ধ করে জল ছেঁচে বার করতে হয়। আমি দাঁড়ে চাপ দিলাম। সর্বত্র নলখাগড়ার দুর্ভেদ্য ঝাড় — জমির দেখা নেই। এদিকে জল ক্রমেই বেড়ে চলছে — এখন আমার হাঁটুর নীচে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। আমি মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিকে খুঁজতে থাকি কোথাও ডাঙা দেখা যায় কিনা, জমি আছে কিনা। অবশেষে একটা ছোট দ্বীপ দেখতে পেয়ে প্রাণপণে এগিয়ে চললাম সেই দিকে। ভিড়ালাম একেবারে ঠিক সময়, কেননা নৌকো বলতে তখন অবশিষ্ট আছে জলের ওপরে দুই সেণ্টিমিটার খানেক

অংশ — নৌকোর পাশের রেখাগুলো দিয়ে তৈরি একটা ফ্রেম মাত্র ভাসছে — মাঝে জল, বাইরেও জল, জলের স্তর দু' জায়গায়ই সমান। আর আমি সেই ফ্রেমের মধ্যে বাঁধানো একটা পোর্ট্রেট। আরেকটু হলেই আমার পোর্ট্রেটটা কাউকে আর দেখতে হত না। আমি লাফ দিয়ে নেমে পড়ে নৌকো টানতে শুরু করলাম — জল ত ফেলা দরকার। টানছি ত টানছিই, কিন্তু টেনে নড়ায় সাধ্যি কার? যেন তলায় পেরেক ঠুকে আটকে রাখা হয়েছে। কী করা যায়? সত্যিই কি তাহলে কখনও টেনে তুলতে পারব না? দাঁড়াচ্ছে কী তাহলে? দাঁড়াচ্ছে এই যে আমিও এক নির্জন দ্বীপে এসে পড়েছি। বলে কী! না না, অমন সাধ আমার নেই। আমি বাড়ি যেতে চাই। আমি ত ছাই সাথেও কিছু নিই নি। জামার নীচে কিছুই নেই। এমন কি পকেটে ছুরিও নেই। আমার কোন প্রস্তুতি নেই। প্রস্তুতি ছিল রবিন্‌সনের। ওর সব আছে। খাবারদাবার আছে পুরো এক থলি, টর্চলাইট আছে, এমন কি বন্দুকও আছে, ছিপ আর টোপের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। দ্বীপও সে বেছে নিয়েছে ভালো। আর এটা? — এটা কি কোন দ্বীপ হল? দ্বীপ ত নয়, যেন একটা ঘুঁটে। যেমন আকারে, তেমনি গুণেও। না আছে গাছপালার চিহ্ন, না ঝোপঝাড়। এমন কি সত্যিকারের ডাঙা বলতে যা বোঝায় তাও নেই। বসার মতো জায়গা নেই। পূতিগন্ধময় আস্ত কাদার ডেলা। এতে বাস করা চলে কেবল সারসের মতো, একটা ঠ্যাঙ গুটিয়ে। কিন্তু আমি সারস নই। আমি হলাম পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠেছি। এই দ্বীপে বাস করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এখানে আমি মারা যাব। ওগো, কে কোথায় আছ? বাঁচাও!

ধুত্তোর! এখানে কি আর ডেকে ডেকে কারও সাড়া পাওয়া যাবে? কেবল ব্যাঙের গ্যাঙর-গ্যাঙ... ওগো আমার পাভেল ভায়া, নিজেকে নিজে যদি উদ্ধার করতে পার, এখানে তোমাকে কেউ সাহায্য করতে আসছে না! উদ্ধার পেতে হবে, পেতেই হবে।

নৌকোর চারপাশে আমি কাদা ভেঙে ছপর ছপর করে ঘুরি, নাক সিঁটকাই, কী করতে হবে ভেবে কূল পাই না। চেষ্টা করলাম নৌকোর ভেতর থেকে জল ছেঁচে বার করার। কিন্তু বার করবটা কোথায়? ছেঁদা দিয়ে ত আবার এসে জমবেই। সেটা হবে নদী ছেঁচারই সামিল। আচ্ছা, কোন কিছু দিয়ে ছেঁদাটা গুঁজে বন্ধ করলে কেমন হয়? আইডিয়া বটে! দ্বীপটার ওপর একই ধরনের ঘাস বড় হয়ে উঠেছে,

তারই এক গোছা ছিঁড়ে এনে হাতড়ে হাতড়ে ছেঁদাটা বার করে সেখানে গুঁজে দিলাম। আবার জল ছেঁচতে শুরু করলাম। ওঃ! কাজ এগিয়ে চলল! একটু একটু করে হলেও এগোতে লাগল। এক সেণ্টিমিটার এক সেণ্টিমিটার করে নৌকোর গা জলের ভেতর থেকে জেগে উঠতে লাগল। এখন তীরেও টেনে তোলা যেতে পারে।

কাঁকিয়ে কুঁথিয়ে টান মারলাম। টেনে নড়ালামও। উঠেছে! এবারে নৌকোটাকে কাত করা দরকার। যেটুকু জল আর ছেঁচে তোলা যায় নি সেটা গড়িয়ে ফেলে দিতে হবে। এই ত, এই ত! ওঃ কঠিন বটে! চোখে সরষে ফুল দেখতে লাগলাম। আরেকটু, আরও একটু! এই ত চাই! ওফ্! শেষকালে হল তাহলে! সাবাস পাভেল! ছেলে বটে! ও হো হো হো! আমার আত্মহারা আনন্দের প্রকাশ শত কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলল জলার জঙ্গলের ভেতরে। এবারে বাবা ভালো করে ছেঁদাটা বন্ধ কর যাতে আবার কিছু না ঘটে।

দ্বীপটাকে বিদায় জানিয়ে আমি যাত্রা করলাম। চিরকালের জন্য জনশূন্য হয়ে থাকাই ওর কপালের লিখন দেখা যাচ্ছে। গ্রামে পেঁছুনোর পথে আর কোন ঘটনা ঘটল না। কেবল পথে বারবার উঁকি মেরে দেখতে লাগলাম ফুটোটা দিয়ে জল ঢুকছে কিনা, কয়েক বার নৌকো থামালাম পরীক্ষা করে দেখার জন্য। খানিকটা জল অবশ্য চুইয়ে চুইয়ে ঢুকছিল, কিন্তু সেটা আশঙ্কাজনক নয়।

পেঁছুনোর সঙ্গে সঙ্গে আমি নৌকো মেরামতির কাজে লেগে গেলাম। দুপুরের খাবারের সময় পর্যন্ত এই নিয়ে ব্যস্ত রইলাম, অবশেষে সবগুলো ফুটো ফের ঠেসে বন্ধ করলাম, ভালোমতো আলকাতরা মাখালাম।

যতক্ষণ কাজে ব্যস্ত ছিলাম ততক্ষণ কিছু বোধ করি নি, কিন্তু কাজ শেষ করে দুপুরের খাবারের পর যখন রাস্তায় বেরোলাম, যখন গেটের বাইরে উঁচু পপলার গাছটার দিকে আমার চোখ পড়ল তখন বুকের ভেতরটা এমন মোচড় দিয়ে উঠল যে আমি প্রায় কেঁদেই ফেললাম; কেননা এই পপলার গাছটার পাশেই রোজ সকালে রবিন্‌সনের সঙ্গে আমার দেখা হত, তারপর সেই সন্ধ্যা অবধি আমাদের আর ছাড়াছাড়ি নেই। পাড়াটা, গোটা গাঁটা, গোটা দুনিয়া আমার কাছে এমনই ফাঁকা মনে হল, যেন এক নির্জন দ্বীপ। লোকজন থেকেও নেই, কেননা তাদের মধ্যে নেই আমার প্রাণের বন্ধুটি। আমি এলোমেলো গাঁয়ে ঘুরে সময় কাটাই, দিশে

করতে পারি না। প্রতিটি জায়গা, প্রতিটি ঝোপ আর গাছ মনে করিয়ে দেয় ওর কথা। এই ত এখানে আমরা সব সময় ডাংগুলি খেলতাম... গোল্ডফিঞ্চ পাখি ধরার সময় লুকোতাম এই ঝোপগুলোর মধ্যে... এই গাছটার গা বেয়ে ওপরে ওঠার প্রতিযোগিতা হত। তোর মনে পড়ে সে দিনের কথা, যখন আমার পায়ের নীচের ডাল ভেঙে যেতে আমি দুই ঠ্যাং ঊর্ধ্বে তুলে মরা ডালে ঝুলতে লাগলাম, তারপর পড়লাম সোজা মাথায় গোত্তা খেয়ে, ভাবলাম মাথাটা বুঝি আমার দু' কাঁধের মাঝখানে সেঁধিয়েই গেল — নিশ্বাস নিতে পারছিলাম না!.. আর হ্যাঁ, তুই কিন্তু হাসিস নি, তুই আমার জন্য কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যবস্থা করলি। তুই কি মনে করিস আমি তা ভুলে যাব!..

আর চীনের মহাপ্রাচীরের দিকেও তাকাতে পারি না। ওখানে, প্রাচীরের ওপাশে আছে আমাদের দুজনেরই পরম শত্রু — কুনিশ। এখন একাই আমাকে তার ওপর নজর রাখতে হবে, তার স্বরূপ প্রকাশ করতে হবে। ইস্, এমন একটা ইণ্টারেস্টিং কাজ একা একা করতে কী খারাপই যে লাগে!

আর ঐ যে নদীর ওপর ঝুঁকে আছে উইলো গাছটা। এখন কি আর ছেলেদের মধ্যে এমন কাউকে পাওয়া যাবে যে ওখান থেকে জলে ঝাঁপ দেবে? না, পাওয়া যাবে না। তোর ঐ রেকর্ড কোন কালে কেউ ভাঙতে পারবে না। ওঃ, আমার প্রাণের বন্ধু রে, এমন আরও কত রেকর্ডই না তুই করতে পারতিস!

ভর সন্ধে পর্যন্ত আমি একা একা আমাদের স্মৃতিবিজড়িত জায়গাগুলোতে ঘুরে বেড়ালাম।

অবশেষে ঘুমোতে গেলাম।

শুয়ে থাকি, ঘুম আর আসে না। আমি ভাবতে থাকি। জানলার বাইরে অন্ধকার — সূচীভেদ্য অন্ধকার। আকাশে একটা তারাও নেই — মেঘ ছেয়ে আছে।

ঐ নির্জন দ্বীপে আমার বন্ধু রবিন্সন এখন কী করছে? ঘুমোচ্ছে নাকি?.. চারপাশে কেউ নেই। ধুনির আগুন নিভু নিভু, চারপাশ থেকে এগিয়ে আসছে উদ্ভট কালো কালো থমথমে অন্ধকার... এদিকে ও একা, কথা বলার মতো কোন সঙ্গী নেই, কেবল শুনছে নিজের হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি।

আচ্ছা, ওর যদি কিছু হয়ে থাকে? চিৎকার কর, সাহায্যের জন্য ডাকাডাকি

কর, কোন জনপ্রাণী যে শুনতে পাবে না, কেবল ড্যাবরা চোখ ব্যাঙরা জবাবে উদাসীনভাবে গ্যাঙর-গ্যাঙ করবে, হাঁসেরা নলখাগড়ার ঝোপের মধ্যে প্যাঁক-প্যাঁক করবে, আর প্রতিধ্বনি শতকণ্ঠ হয়ে গড়াতে গড়াতে চলবে — চলবে জলার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে, কিন্তু লোকালয় অবধি কোনমতে পেঁছুবে না, হারিয়ে যাবে নলখাগড়ার ঘন ঝোপঝাড়ের ভেতরে। কে ওকে সাহায্য করবে?

আমি শুয়ে থাকি, আমার সর্বাঙ্গ টানটান হয়ে ওঠে, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। হঠাৎ কানে এলো দূরে, বহু দূরে কোথায় যেন বেজে উঠল তীক্ষ্ন কণ্ঠের করুণ আর্তনাদ: 'আ-আ-আ-আ!' দূরের ছোট স্টেশন থেকে রেলের ইঞ্জিনের হুইসিল, না সত্যিকারের কণ্ঠস্বর — বোঝার উপায় নেই... কিন্তু আমার কেন জানি দৃঢ় বিশ্বাস হল যে বন্ধু বিপদে পড়েছে। কেউ জানে না, কেউই জানে না ও কোথায়। আমি ছাড়া। আর ওখানে যাবার পথও কেউ খুঁজে পাবে না। আমি ছাড়া। ওকে সাহায্যও কেউ করবে না। আমি ছাড়া...

না, বন্ধু যখন বিপদগ্রস্ত তখন আমি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারি না।

'মা, আমি উঠোনে ঘুমোতে যাই,' আমি বললাম। 'খড়ের ওপর। বড় গুমোট।'

'যা,' ঘুম জড়ানো স্বরে মা বললেন। 'তবে কম্বলটা নিয়ে যা, ভালোমতো গা ঢাকিস।'

আমি কম্বল নিয়ে ঘর থেকে বেরোই। সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে পড়লাম ঘন জমাট অন্ধকারের মধ্যে, এমন কি চটচটে অন্ধকারের মধ্যেই বলা যেতে পারে। চলি

অন্ধের মতো প্রায় হাতড়ে হাতড়ে। গেট খুলতে গিয়ে হঠাৎ ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ করে ফেলার ঝামেলা এড়ানোর জন্য গুড়ি মেরে বাগানে গিয়ে সেখান থেকে বেড়া ডিঙোলাম। গাঁয়ের ভেতর দিয়ে চলি, মনে হয় যেন চলেছি বনের ভেতর দিয়ে — এমনই ঘুটঘুটে অন্ধকার আর নিস্তব্ধতা। কেবল একটা জায়গায় মিটিমিটি বাতি জ্বলছে। গ্রাম সোভিয়েতের সামনে ল্যাম্পপোস্টে জ্বলছে বাতি। বাতাসে ওটাকে দোলাচ্ছে, আর তার ফলে মাটির ওপর দোল খাচ্ছে বাতি থেকে ঠিকরে পড়া আলোর গোল ছাপটা, ঠিক যেন দোলনা। এর পর আবার অন্ধকার। আমি দুবার হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গেলাম। এই ত নদী। এখানে তবু খানিকটা আলো আছে। জল মৃদু ঝলকাচ্ছে। আমি নৌকোয় চেপে বসি, কম্বলটাকে সাবধানে নৌকোর মাথার দিকে রাখি, যাতে ভিজে না যায় (কেন যে ওটাকে নিতে গেলাম নিজেই জানি না), তারপর নৌকো ছেড়ে দিলাম। হাতদুটো যেন আমার নয়। যন্ত্রচালিতের মতো দাঁড় বয়ে চলেছি — দাঁড়ের অস্তিত্ব আমি উপলব্ধি করতে পারছি না। আর আমার গাটা পুরোপুরি যেন আমার নয়: কেমন যেন কাঠের মতো। যেন এ সমস্ত বাস্তবে ঘটছে না, ঘটছে কোন একটা ঘোরের মধ্যে।

পথ গোলমাল না করে ফেললেই হল, হারিয়ে না ফেললেই হল!.. প্রথম প্রশস্ত জলধারাটা। তারপর সঙ্কীর্ণ জলধারা। এবারে দ্বিতীয় প্রশস্ত জলধারা। এখন যেতে হবে ডাইনে... ঐ হল সেই পচা দ্বীপটা যেখানে আরেকটু হলেই আমাকে চিরকালের জন্য থেকে যেতে হচ্ছিল। ঠিক আছে। ঠিক পথেই চলছি। মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ উঁকি মারল, কেবল জলার জঙ্গলে নয়, আমার মনের মধ্যেও সঙ্গে সঙ্গে আলোর বন্যা খেলে গেল, আনন্দের ধারা বয়ে গেল। আরেকটু, আরও একটু... এই ত কাছে চলে এসেছি। জলের এই সরু ফালিটা পেরোলে একটা বাঁক — মনে হল আমি যেন একটা সরু ছোট রাস্তা থেকে বেরিয়ে এলাম বিশাল চত্বরে। প্রশস্ত মসৃণ জলধারার বুকে প্রতিফলিত হচ্ছে বাঁকা চাঁদ আর চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত রুপোলি কোঁকড়া মেঘের রাশি; হঠাৎই দ্বীপের বিশাল শ্যামলিমাপুঞ্জকে আমার মনে হল যেন নিঃসীম সমুদ্রের বুকে রূপকথার প্রকান্ড এক পাহাড়, সেই পাহাড়টা আছে অনেক অনেক দূরে, দিগন্তে, আর আমি নিজে ছোট একটা কীট। আমার মনে হল আমি যেন পাহাড়ের ঢালের ওপর দেখতে পাচ্ছি আশ্চর্য শহর, শহরের গির্জা, প্রাসাদ, প্রাসাদের উঁচু উঁচু মিনার

(সেগ্নলো আসলে হল উইলোর অপ্র্ব জড়ানো শাখাপ্রশাখা) আর ঘোড়সওয়ারের দল, যারা ঘোড়া ছ্নটিয়ে চলেছে আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথে; এমন কি শ্নতে পাচ্ছি ঘোড়ার খ্নরের খটখট আওয়াজ (আসলে নিস্তব্ধতার জন্য আমার কানের ভেতর ভোঁ-ভোঁ করছে)।

কখন কখন কল্পনায় কীই না দেখা যায়!

কিন্তু হঠাৎ সজ্ঞানে আমি যা দেখতে পেলাম তা আরও বেশি অবিশ্বাস্য ও অকল্পনীয়। আমি দেখতে পেলাম নদীর তীর ঘে'ষে একটা প্রকাণ্ড ছাইরঙা ম্নর্তি — যেন গালিভার হানা দিয়েছে লিলিপ্নটদের দেশে। আকস্মিকতায় আমি চমকে উঠলাম। এটা কে? রবিন্সন নাকি? কিন্তু ওর ত নৌকো নেই। কোন জেলে-টেলে? কিন্তু জেলেরা কখনও জলার জঙ্গলের এতটা গভীরে যায় না, তাও আবার রাতের বেলায়। গাঁয়ে বসেই দিব্যি মাছ ধরা যায়...

কোন বদ লোক? জলদস্য্?.. আমার হৃৎপিণ্ডটা গড়াতে গড়াতে কোথায় যেন নীচে নেমে গেল... ইতিমধ্যে নৌকোটা উপকূলের নলখাগড়া ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমার বড় ইচ্ছে হচ্ছিল নৌকোর ম্নখ ঘ্নরিয়ে দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে চলে যাই। কিন্তু আমি নিজেকে সামলে নিলাম। ওখানে, দ্বীপে আমার বন্ধ্ন রয়ে গেছে সম্প্র্ণ একা। আমি ত তাকেই সাহায্য করতে চলেছি। এমনও ত হতে পারে যে ঠিক এই ম্নহ্নর্তেই আমার সাহায্য তার সবচেয়ে বেশি দরকার! আমার ত নৌকো আছে। যে অজানা লোকটাকে আমি এইমাত্র দেখতে পেলাম সে যদি বাস্তবিকই বিপজ্জনক দ্নর্বৃত্ত হয়ে থাকে এবং আমার বন্ধ্নর অনিষ্ট করতে চায়, তাহলে আমি বন্ধ্নকে বাঁচাব আর আমরা নৌকোয় করে পালিয়ে যেতে পারব। শিগগির, শিগগির! আমি প্রাণপণে দাঁড় ঠেলে নৌকো চালিয়ে দিলাম তীরের দিকে। নৌকো ভিড়িয়ে নেমে পড়লাম, সন্তর্পণে গ্নড়ি মেরে চলতে লাগলাম দ্বীপের গভীরে। রবিন্সন সম্ভবত ক্নড়েঘরে — খ্নব সম্ভব ঘ্নমোচ্ছে, ঘ্নণাক্ষরেও কোন সন্দেহ তার মনে উ'কি দিচ্ছে না — আওয়াজের লেশমাত্র শোনা যায় না। ওকে ডাকতে যাওয়া বিপজ্জনক -- সঙ্গে সঙ্গে অজানা লোকটার মনোযোগ এই দিকে পড়ে যাবে।

ওঃ, কী অন্ধকার, কী ঝোপজঙ্গল! কিছ্নই দেখা যায় না... আচমকা নলখাগড়ার ঝোপের আড়ালে, যেখানে অজানা লোকটা ছিল, সেখানে জলের মধ্যে কী যেন

7-1068

ঝপাং করে পড়ল। আমার হৃৎস্পন্দন থেমে গেল। এটা কী?.. কী এটা... ওঃ! আচ্ছা, ব্যাপারটা... ব্যাপারটা যদি এমন হয় যে ঐ লোকটা আমার বন্ধুকে জলে ডুবিয়ে মারল! আমার সর্বাঙ্গে ঠাণ্ডা ঘামের স্রোত বয়ে গেল। এক মিনিট যায়... দু' মিনিট যায়। আমি জমাট অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকি সামনের দিকে দুহাত মেলে, নড়তে চড়তে পারি না। এমন সময়... হঠাৎ আমার হাতের সঙ্গে কে যেন ধাক্কা খেল। বিশাল আকারের, ভালুকের মতো। আমার হাতদুটো আপনাআপনি চেপে এসে তার বুক খামচে ধরল। পর মুহূর্তেই আমি পায়ে একটা প্রচণ্ড আঘাত টের পেলাম, হুমড়ি খেয়ে মাটিতে গিয়ে পড়লাম। কেন জানি না, চিত হয়ে পেছনে না পড়ে পড়লাম গিয়ে সামনে, তার ওপরে। সম্ভবত লোকটা আমাকে ঘা মেরে নিজের গায়ের ওপর ফেলে দেয় (সাম্বো কায়দার কুস্তিতে এই প্রণালী আছে বটে, আমি আর রবিন্‌সন এটা জানি)। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, ক্ষিপ্ত হয়ে ছাড়ানোর চেষ্টায় বেজায় হাত-পা ছুঁড়তে লাগলাম। নরম একটা কিসের গায়ে যেন — মনে হয় মুখই হবে — আঁচড়ে দিলাম, সর্বশক্তিতে ঝটকা মেরে ছাড়িয়ে নিয়ে, পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে ছুট দিলাম। ঘন জঙ্গল ভেদ করে ডালপালা ভেঙে, গাছের গায়ে গুঁতো আর হোঁচট খেতে খেতে আমি ছুটলাম। কিন্তু আঁচড়ের বা আঘাতের কোন যন্ত্রণা আমি টের পাচ্ছিলাম না। ছুটতে ছুটতেই লাফিয়ে উঠে পড়লাম নৌকোয়, দাঁড়টা খপ করে ধরে দাঁড় টেনে তীর থেকে নৌকো সরিয়ে নিতে লাগলাম।

এমন মরিয়া হয়ে আর কখনও আমি নৌকো চালাই নি — নৌকো উড়ে চলল রকেটের মতো। সর্বক্ষণ আমি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পিছু ফিরে তাকাই — আমার পেছন পেছন তাড়া করে আসছে কিনা। না, পিছু ধাওয়া চোখে পড়ছে না... গ্রামের কাছে তীরে এসে যখন নৌকো ভিড়ালাম একমাত্র তখনই আমি প্রকৃতিস্থ হলাম। উত্তেজনায়, ক্লান্তিতে আর আতঙ্কে আমি সারাটা সময় থরথর করে কাঁপছিলাম। কিন্তু ক্লান্তি সত্ত্বেও গাঁয়ের ভেতর দিয়ে আমি সাধারণভাবে পা না চালিয়ে প্রায় সারা রাস্তাই দৌড় দিলাম — পুরোপুরি নিরাপদ বোধ করলাম একমাত্র নিজেদের বাড়ির উঠোনে আসার পর। কম্বলের ভিজে প্রান্তটা (ওটাকে আমি ভিজিয়েই ফেলেছিলাম) আমার পিঠের ওপর আছাড় খাচ্ছিল, যেন আমাকে তাড়া দিয়ে চলেছে... একটা কাঠের গুঁড়ির মতো আমি চালাঘরের পাশে খড়ের

গাদার ওপর ধপ করে গিয়ে পড়লাম, কোন রকম নড়াচড়া না করে অচৈতন্যের মতো শুয়ে রইলাম — আমার সংবিৎ ফিরে আসছিল! এইমাত্র যে অভিজ্ঞতা হয়ে গেল, মাথার ভেতরে একের পর এক খেলে যেতে লাগল তার ছবি। কী ঘটল?.. কে ঐ লোকটা?.. রবিন্‌সন কি তাহলে সত্যি সত্যিই মারা গেল? কী করা যায়?.. বাবাকে জাগিয়ে সব বলে লোকজন জড়ো করে ওখানে গেলে কেমন হয়?.. আচ্ছা, রবিন্‌সন যদি মারা না গিয়ে থাকে? অজানা লোকটির সঙ্গে আমার লড়াইয়ের ফলে (এই লড়াইয়ের কথা ভেবে এখন গর্বে আমার বুক প্রায় ফুলে আসছে) সে যদি জেগে গিয়ে দুর্বৃত্তের কবল থেকে নিরাপদে পলায়নের সুযোগ পায়? কিন্তু একথা আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি না। আর তা-ই যদি হয়ে থাকে, তাহলে আমি লোকজন নিয়ে আসার অর্থ হবে রবিন্‌সনের গোপন রহস্য ফাঁস হয়ে যাওয়া আর আমি হয়ে দাঁড়াব বিশ্বাসঘাতক... না না, তা চলবে না! বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কিছুতেই করা যাবে না! আর যাই হোক না কেন বিশ্বাসঘাতকতা আমার দ্বারা কক্ষণও হবে না। তাহলে আমার কী করা উচিত? কী করব আমি?.. আমি অনেকক্ষণ ভেবে ভেবে কষ্ট পেলাম, কিন্তু ভেবে কিছুই বার করতে পারলাম না। অবশেষে ক্লান্তি আর নিদ্রা আমাকে গ্রাস করে বসল, আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

নৈশ অভিযানটি ছিল এমনই অবিশ্বাস্য যে সকালে আমি যখন জেগে উঠলাম তখন মনে হল ওটা স্বপ্ন নয় ত?..

অবশেষে মা আমার কাছে এগিয়ে এসে ঝুঁকে পড়ে বললেন:

‘কী রে, উঠোনে ঘুমটা কেমন হল?.. আরে, তোর কম্বলটা ভিজে কেন রে? রাতে কি বৃষ্টি হয়েছিল? নাকি তুই...’ বলে, মা মুচকি হাসলেন।

‘আরে না না, কী যে বল!.. আমি... আমি... আসলে আমার জলতেষ্টা পেয়েছিল, জলের মগ থেকে অসাবধানে জল পড়ে গেছে।’

ভালো বলতে হবে যে মা’র দুধ দুইতে যাবার তাড়া ছিল, তাই আর জেরা করলেন না।

নৈশ অভিযান আদ্যোপান্ত আমি মনে করতে পারলাম। কিন্তু এবারে কেন যেন তা ততটা ভয়ঙ্কর মনে হল না যতটা মনে হয়েছিল রাতের বেলায়। কারণ হয়ত এই যে সকালটা ছিল রোদ ঝলমলে ও খুশিতে ভরা, আর তোমরা ত জানই যে

7*

রাতের সমস্ত আতঙ্ক ভোর বেলায় উধাও হয়ে যায়। রাতে সবকিছু ভয়ঙ্কর মনে হওয়ার কারণ হল অন্ধকার ও নিস্তব্ধতা, আর লোকে তখন নিদ্রা যায়। কিন্তু সকালে সূর্য কিরণ দেয়, পাখিরা কলরব করে, মেয়েরা কুয়োর পারে বালতির ঝনঝন আওয়াজ তোলে, সর্বত্র গিজগিজ করছে লোক। ভোর বেলায় মরাও বোধ হয় তেমন ভয়ের নয়। আমার মেজাজ প্রফুল্ল, আমি উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভরপুর। দ্বীপে, এখুনি দ্বীপে যেতে হয়! জানা দরকার ও কেমন আছে, বেঁচে আছে কিনা...

চটপট হাতমুখ ধুয়ে আমি ছুটে গেলাম গোয়ালঘরে। মা তখনও দুধ দোয়াচ্ছিলেন।

'মা!' আমি চেঁচিয়ে বললাম। 'আমাকে দুধ দাও, জলদি দাও, আমার তাড়া আছে।'

'কোথায় চললি তুই? দাঁড়া, এখুনি সকালের খাবার খাব।'

'না না, আমি পরে খাব 'খন। এখন খিদে পায় নি। কেবল দুধ হলেই হবে। ছেলেদের সঙ্গে কথা বলে রেখেছি, মাছ ধরতে যাব।'

'অন্তত রুটি ত নিবি।'

এক চুমুকে এক গেলাস দুধ খেয়ে নিয়ে বড় এক টুকরো রুটি কেটে নিলাম — সেটা শার্টের নীচে, বুকের কাছে গুঁজে নিয়ে আমি পড়িমরি করে ছুটে বেরোলাম রাস্তায়। গেটের বাইরে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এসে সোজা ভারাভা দাদুর গায়ের ওপর গিয়ে পড়লাম — আরেকটু হলেই তাঁকে মাটিতে ফেলে দিয়েছিলাম আর কি! দাদু একটু টলেও উঠলেন।

'ধুত্তোর!' দাদু রাগে গজগজ করে বললেন। 'ইস্, কী ছুটটাই লাগিয়েছে, যেন তাড়া খাওয়া খরগোস।'

'মাফ করবেন!.. নমস্কার, দাদু!'

'হয়েছে। ঊর্ধ্বশ্বাসে চলেছিস কোথায় শুনি? লোকজনকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিচ্ছিস।'

'আমি এই একটু নদীর ধারে যাচ্ছি, ছেলেদের সঙ্গে মাছ ধরার কথা হয়েছে কিনা।'

'বেশি ঘুম হয়ে গেছে বুঝি?' এবারে সমবেদনা ও ভর্ৎসনা মেশানো সুরে দাদু জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ! তাই ত ছুটতে হচ্ছে! মাফ করবেন!' এদিকে নিজে মনে মনে ভাবি: ওঃ, আপনি জানেন না, কোথায় ছুটেছি তার বিন্দুবিসর্গও জানেন না। যদি জানতেন তাহলে কথা বলতেন অন্য সুরে।'

দশম পরিচ্ছেদ

খাঁটি জলদস্যু

উত্তেজিত হয়ে আমি নৌকো চালিয়ে চললাম দ্বীপের দিকে। যত কাছাকাছি আসতে থাকি ততই প্রবল হয়ে ওঠে বুকের স্পন্দন: বেঁচে আছে, না নেই, বেঁচে আছে না নেই...

হঠাৎ — এ কী কান্ড!.. আমি দেখতে পেলাম রবিন্সনকে। দিব্যি জলজ্যান্ত, ঝোপের ভেতর থেকে মাথা গলিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তীরে। আমাকে দেখে উল্লসিত হয়ে হাসল। কেবল তার নাকের ছাল ওঠা আর ডান দিকের গাল বরাবর চলে গেছে সদ্য আঁচড় লাগার তেরছা দাগ। কিন্তু রবিন্সনের মতো এমন বীরপুরুষের গালের ওপর আঁচড় আর কী এমন জিনিস? নেহাৎই তুচ্ছ। তীরে নৌকো ভিড়ানোর পর আমার ইচ্ছে হচ্ছিল আনন্দে ছুটে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরি, কিন্তু আমি নিজেকে সামলে নিলাম। কেবল তার কাঁধে ঠেলা দিয়ে বললাম:

'কী রে? কেমন চলছে তোর এখানে?'

'তেমন কিছুই নয়,' আমার পেটের ওপর সে চাপড় মারল এবং পরক্ষণেই গালে হাত ঠেকিয়ে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে যোগ করল: 'জানিস এখানে যা কান্ড হয়েছিল না...'

'কী ব্যাপার?' যেন ব্যাপারটা কিছুই নয় এবং কোন রকম সন্দেহও আমার মনের মধ্যে নেই, এমন ভাব করে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'যাক গে, তোকে বললেও তুই বিশ্বাস করবি নে, ভাববি মিছে কথা বলছি...'

'ব্যাপারটা কী, বলই না!'

'রাতে জলদস্যুরা আমার ওপর হামলা করেছিল। এই হল তোর ব্যাপার! মারামারি বাধল আমার সঙ্গে। এমন মারামারি আমি জীবনেও করি নি! ভাবলাম মারাই যাব। এই যে এই দ্যাখ না...' বলে সে আঙুলের খোঁচা দিয়ে গালের আঁচড়টা দেখাল, তারপর গায়ের জামা উঠিয়ে পাঁজরার ওপরে কালশিটে দেখাল।

'তারপর? তারপর?' আমি অধীর হয়ে জিজ্ঞেস করলাম। 'এটা কী ভাবে হল?'

'দাঁড়া। আমি সব এক এক করে তোকে বলছি...' এই বলে রবিন্‌সন আমাকে যে বিবরণ দিতে শুরু করল তা তোমাদের আর জানতে বাকি নেই।

অবশেষে সে যখন অপরিচিত লোকটার সঙ্গে তার লড়াইয়ের বর্ণনার অবতারণা করল — কী ভাবে সেই লোকটা রবিন্‌সনকে ল্যাং মারল, তারপর কী ভাবে তার ওপর গিয়ে পড়ল এবং আঁচড় দিতে শুরু করল এই বর্ণনা যখন দিতে শুরু করল, তখন আমার পেটের ভেতরটায় হঠাৎ যেন কেমন একটা হাসি মোচড় দিয়ে উঠল, গলার ভেতরে সুড়সুড়ি খেলে গেল আর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো চাপা হিহি হাসি।

রবিন্‌সন মনে মনে আহত হয়ে অনুযোগের সুরে বলল:

'তুই কী রে? — বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেল নাকি তোর? তোর কাছে অবশ্য হাসির মনে হচ্ছে। একবার চেষ্টা করলে টেরটা পেতিস।'

'আচ্ছা, ঐ মারামারির ঘটনাটা ঠিক ঠিক আবার বল দেখি আগাগোড়া,' আমি ওকে বললাম।

রবিন্‌সন আগাগোড়া আবার বলল। আমি মাথা ঝাঁকালাম, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম:

'ঐ লোকটা আর কেউই নয় — আমি।'

নতুন গেটের সামনে ভেড়ার যেমন অবস্থা হয় তেমনি ভাবে রবিন্‌সন একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর চুপচাপ বুড়ো আঙুলটা তুলে আমার নাকের সামনে বাড়িয়ে ধরে বলল:

'কাঁচকলা!'

ওর কাঁচকলার জবাবে আমিও কাঁচকলা দেখিয়ে আবার বললাম:

'ওটা আমিই, আর কেউ নয়... এই দ্যাখ।' আমি প্যাণ্ট গুটিয়ে তুলে হাঁটুর নীচে পায়ের ওপর বিশাল এক জখমের চিহ্ন দেখালাম। 'এ হল তোর কাজ।'

সে রাতে যা যা ঘটেছিল আদ্যোপান্ত আমি ওকে বললাম। রবিন্‌সন শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

'তার মানে... তার মানে..., দেখা যাচ্ছে লড়াইটা হয়েছিল তোর সঙ্গে আমার?.. অথচ আমার কেন যেন মনে হল ইয়া তাগড়াই কে যেন...'

'তুই কি ভাবছিস আমারও তেমন মনে হয় নি। যেন একটা দৈত্যবিশেষ!'

আমরা এ ওর দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলাম।

'চমৎকার!'

'যা বলেছিস!'

'আমি তোকে চিনতে পারলাম না কেন?'

'আর আমি?'

'আরে, মুখ দিয়ে একটা কথাও যদি বার করতিস!'

'আর তুই? — মুখে যে একেবারে ছিপি এ'টে রেখেছিলি।'

'ভড়কে গিয়ে।'

''ভড়কে গিয়ে'!'

'তার মানে অচেনা লোকটা নৌকো থেকে নামে নি?'

'নামে নি।'

'তাহলে পরে সে গেল কোথায়?'

'কোথাও হাওয়া হয়ে গেছে। চলে গেছে। আমি ভয়ে তড়াক করে গাছে গিয়ে উঠলাম — বানরের মতো সারা রাত, ভোরের আলো ফোটা অবধি গাছের ডালে বসে রইলাম। চোখের পাতাও বন্ধ করতে পারলাম না। ভোরের আলো ফুটে ওঠামাত্রই নীচে নেমে এলাম, খানিকটা ঘুমিয়ে নিলাম।'

'আচ্ছা, লোকটা এসেছিল কেন, তোর কী মনে হয়?'

'আমি তার কী জানি? অন্তত আমার কাছে ত অতিথি হয়ে আসে নি।'

'আচ্ছা তুই কি শুনেছিলি জলের মধ্যে ঝপাং করে কিছু একটা পড়ার শব্দ?'

'শ্নেছি, অবশ্যই শ্নেছি। আমার পেটের ভেতরটা পর্যন্ত চিঁচিঁ করে ওঠে।'

'হয়ত খ্নি তার শিকার জলে ডুবিয়ে দিল। আবার এমনও হতে পারে যে চোর কোন গ্প্তধন ল্কিয়ে রেখে দিল... অ্যাঁ, কী বলিস?'

'কে বলতে পারে? চল্ উঁকি মেরে দেখা যাক, ওখানে কী হচ্ছে।'

'তুই কি এখনও দেখিস নি?'

'ফুরসত পাই না। সবে যাব বলে ঠিক করেছি — এমন সময় তুই এলি। তাছাড়া পাড় থেকে স্বিধে হবে না — ওখানে নলখাগড়ার ঝোপ বড় ঘন। নৌকোয় যাওয়া চাই।'

আমরা নৌকোয় বসলাম, দ্বীপটাকে ঘ্রে যেতে যেতে চলে এলাম সেই জায়গাটায় যেখানে রাতে অচেনা লোকটিকে দেখা গিয়েছিল। যদিও তখন সকাল এবং স্র্য কিরণ দিচ্ছিল, তব্ উদ্বেগে আমাদের ব্ক দ্রদ্র করতে লাগল — আমরা জানতাম না ওখানে, নলখাগড়ার ঝোপের ওধারে আমাদের জন্য কী অপেক্ষা করছে। যদি সত্যি সত্যি ভয়ঙ্কর কিছ্ হয়ে থাকে তাহলে?.. আমি নৌকো বাইছিলাম আর নৌকোর মাথার দিকে রবিন্সন বসে বসে সামনের দিকে নজর রাখছিল। নৌকো ধীরে ধীরে তীরের লাগোয়া নলখাগড়ার ঝোপ ঘ্রে যাচ্ছিল। নলখাগড়ার আড়াল থাকার দর্ন আমি কিছ্ই দেখতে পাচ্ছিলাম না, এমন সময় রবিন্সন চিৎকার করে উঠল:

'ও!.. এখন সব পরিষ্কার!'

আমি জোরে চাপ দিয়ে দাঁড় ফেললাম, ম্হ্তের্র মধ্যে নিজের চোখেই দেখতে পেলাম: কালো জলের ওপর বিশাল বিন্দ্রেখার মতো সাদা ঝকঝক করছে মস্তবড় মাছধরা জালের কাঠিগ্লি।

‘এই হল ব্যাপার! এই জিনিসটাই তাহলে ঝপাং করে জলে পড়েছিল! তুই ঠিকই বলেছিস রবিন্‌সন। ওটা ছিল জলদস্যু। আসল জলদস্যু। বেআইনী শিকারী।’

আমরা জানতাম, ভালো করেই জানতাম কাকে বলে বেআইনী শিকারী। বেআইনী শিকারী আসলে শিকারী নয়, জেলেও নয়, সে হল বদমাশ, খুনে। আমার মনে আছে একবার শীতকালে ভারাভা দাদু স্লেজে করে বয়ে আনেন মারাত্মক আহত একটা বলগা হরিণের বাচ্চাকে। কোন এক বেআইনী শিকারী তাকে গুলি করে, কিন্তু লোকজন দেখে পালিয়ে যায়। বলগা হরিণের বাচ্চাটা স্থির হয়ে পড়ে ছিল, কেবল তার ঠোঁটজোড়া কাঁপছিল, যেন কিছু বলতে চাইছে, আর চোখদুটোর দৃষ্টিতে ছিল মর্মান্তিক বিষণ্ণতার ছাপ, মনে হচ্ছিল এক্ষুনি কে'দে ফেলবে। এখনও আমি দেখতে পাচ্ছি সেই চোখদুটো। ভারাভা দাদুর শত চেষ্টা সত্ত্বেও হরিণের বাচ্চাটাকে বাঁচানো গেল না।

আমরা বেআইনী শিকারীদের দুচক্ষে দেখতে পারতাম না। বড় জাল দিয়ে মাছ ধরা ছিল বেআইনী। এটাকে মাছধরা খেলা বলা যায় না। এ হল হিংস্র, দস্যুর পন্থায় মাছ উচ্ছেদ করা। এটা আমরা ভালোভাবেই জানতাম।

‘কী হল? কী বলবি এখন?’ রবিন্‌সন জিজ্ঞেস করল। ‘লোকটা কে হতে পারে?’

‘জানি না। এমন কি সম্ভব যে আমাদের গাঁয়ের কেউ?’

‘সে যাই হোক না কেন, বেআইনী শিকারী ত বটে। এটা হল ঘটনা। কী করা এখন?’

‘জানি না। গাঁয়ে গিয়ে জানান উচিত কী? সময় পাব না। লোকটা জাল গুটাতে এলো বলে। রাতে জাল ফেলেছে, এদিকে খুব ভোরেও যখন আসে নি, তখন যে কোন সময় আসতে পারে। তাতে কোন সন্দেহ নেই। হয়ত ও এখানেই কোথাও, নলখাগড়ার ঝোপের পেছনে নৌকো চালিয়ে এগিয়ে আসছে।’

‘তাহলে আমাদের চোখের ওপর ও এই কাজ করবে, আর আমরা ওকে ছেড়ে দেব?’

‘কী করতে পারবি তুই ওর, শুনি? মাছ তুলতে বাধা দিবি, তাহলে ত

বেড়ালছানার মতো জলে ডুবিয়েই আমাদের মেরে ফেলে দেবে। কেউ জানতেও পারবে না। শুনতে পাবে না, দেখতেও পাবে না।'

'তুই একটা ভীতু খরগোস!'

'তুই বড় বীরপুরুষ কিনা! সারা রাত গাছের ডালে বসে কাটালি, দাঁড়ে বসা মুরগীর মতো।'

'সে ত বটেই, তুই যদি অমন টালবাহানা করতে থাকিস, তাহলে লোকটা এসে পড়বে, আর আমরা কিছুই করার ফুরসত পাব না।'

'কী করার ফুরসত তুই পেতে চাস, শুনি?'

'খালি 'কী' আর 'কী'!.. আয় অন্তত মাছ তুলে ছেড়ে দিই, যাতে ওর ভাগ্যে না জোটে।'

'আর যদি ও হঠাৎ এসে পড়ে?'

'আরে, তুই দেখছি কারাফোলকার মতো! কেবল 'যদি' আর 'যদি'! যদি কেবল কথা কাটাকাটি করি, তাহলে অবশ্যই এসে পড়বে আর... তুই যে কী!' রবিন্‌সন নৌকোর ধারের ওপর দিয়ে কাত হয়ে ঝুলে পড়ল, জালের প্রান্তটা নৌকোয় টেনে আনল। সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের আলোয় ঝকঝক করে উঠল, ছটফট করতে

লাগল থালার মতো গোল গোল বিরাট আকারের রুই-কাতলা। 'কী হল, হাত লাগা!' ও বলল।

আমি তাড়াতাড়ি সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলাম... এত মাছ আর এত বড় বড় মাছ আমি জীবনে দেখি নি। আমরা সেগুলোকে বেছে বেছে তুলে নিয়ে নৌকো থেকে বেশ কিছু দূরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগলাম, যাতে আবার জালে গিয়ে না পড়ে। আমরা তাড়াহুড়ো করছিলাম, বারবার চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম, ভয় হচ্ছিল জালের মালিক যে কোন মুহূর্তে এসে

হাজির হতে পারে। কৈ জাতীয় মাছের ধারাল পাখনা ফুটে আমাদের হাত রক্তাক্ত হয়ে গেল, পাইক মাছের কানকোয় আমাদের আঙুল কেটে গেল। কিন্তু সে দিকে মনোযোগ দেবার সময় ছিল না। একটা পাইক মাছ... ওঃ, সে কি পাইক মাছ! আমরা ওটাকে কষ্টেসৃষ্টে জাল থেকে টেনে তুললাম। যেন একটা বাছুর! লম্বায় এক মিটারের বেশি হবে। পুরো এক মিনিট ওটার ওপর থেকে আমরা মুগ্ধ চোখের দৃষ্টি সরাতে পারলাম না। হাজার হোক আমরা জেলে ছিলাম। জীবনে অমন পাইক মাছ হাতে ধরার সুযোগ আমাদের হয় নি। হয়ত আর কখনও হবেও না। আমরা দুজনে একসঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, ভারে হাঁসফাঁস করতে করতে আমরা ঝপাং করে ওটাকে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। বিদায়বেলায় মাছটা এমন লেজের ঝাপটা দিল যে আরেকটু হলেই আমাদের নৌকো উলটে যেত।

জাল ছাড়িয়ে মাছ বার করা ক্রমেই দুরূহ হয়ে পড়ল। আমরা হয়রান হয়ে গেলাম। অথচ মাছ তোলা হয়েছে মাত্র অর্ধেক।

আমি শেষ পর্যন্ত নাক সিটকে বললাম:

'একটা কথা বলি শোন, ছুরি দিয়ে জাল কেটে ফ্যাল্! মরুক গে ছাই, বেআইনী শিকারীর জাল! ওটার জন্যে মায়া কিসের?'

'ঠিক বলেছিস!' এই বলে রবিন্‌সন পকেট থেকে ক্ষুরের মতো ধারাল সেই ছুরিটা বার করল, যেটা আগে আমার ছিল। এবারে কাজ দিব্যি চলতে লাগল।

অবশেষে শেষ মাছটিকেও মুক্ত করা গেল। আমরা জালটা ফের জলে ছুঁড়ে দিলাম। রবিন্‌সন বলল:

'ব্যস, এই বারে বেড়ে মজা!'

আমাদের ভাগ্য ভালো বলতে হবে, খুবই ভালো বলতে হবে। নৌকোটা পাড়ে উঠিয়ে ঝোপঝাড়ের মধ্যে আড়াল করে রেখেছি, এমন সময় এইমাত্র আমরা যেখানে ছিলাম সেখানে কণ্ঠস্বর শোনা গেল। গোড়ায় আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম না কী নিয়ে কথা হচ্ছে। কেবল বুঝতে পারছিলাম যে একটি কণ্ঠস্বর পুরুষের, অন্যটি নারীকণ্ঠ। তারপর আমরা সন্তর্পণে একেবারে নলখাগড়ার জঙ্গলে গিয়ে ঢুকলাম, এমন কি জলে নামলাম — নেমে কান পাতলাম।

'যাঃ বাবা! কিছুই নেই দেখছি,' বিড়বিড় করে বলল পুরুষকণ্ঠটি।

'তার কারণ হল জালটা তুমি ঐ রকমই ফেলেছিলে! ক্যাবলাকান্ত!' নারীকণ্ঠ বিরক্তি ভরে খনখন করে উঠল।

'আরে, বরাবর যেমন ফেলি তেমনই ত ফেলেছিলাম! একই জায়গায়। সব সময় এই এত মাছ পাওয়া যেত, আর আজ কিনা...'

'ওঃ, দেখ দেখ, জালটা দেখছি ছেঁড়া!'

'বল কী! আরে তাই ত! এখানে... আবার এখানেও দেখছি... এ কী কাণ্ড?'

'কাণ্ডটা এই যে তুমি ওটা ছিঁড়ে ফেলেছ, অকর্মার ঢেঁকি! কতবার বলেছি একটু বুঝেশুনে! এই জালটার জন্যে কী পরিমাণ টাকাই না দিতে হয়েছে! এখন বোঝ! আমার টাকাগুলো গচ্চা গেল। হায়, আমার কী হবে? এমন সোয়ামি নিয়ে আমার নাকালের একশেষ! এই দেখ, দেখ, কী হাল হয়েছে জালটার! হা ভগবান!'

'কিন্তু আমার কোন দোষ নেই, ভগবানের দিব্যি, আমার দোষ নেই। জাল আমি ছিঁড়ি নি। গতকাল আস্ত ছিল। মাইরি বলছি!'

আমরা কোন সাড়াশব্দ করলাম না, নলখাগড়ার ঝোপের আড়ালে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

'ক্‌নিশ আর তার বৌ!' রবিন্‌সন এমন ফিসফিসিয়ে বলল যে শোনা গেল কি গেল না।

আমি নিঃশব্দে মাথা নাড়লাম। অনেক আগেই গলার স্বর চিনতে পেরেছি, আর যেটুকু সন্দেহ ছিল এই 'মাইরি বলছি'-তে তাও ঘুচে গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

আকস্মিক আগন্তুকের দল: ইগর, ভালকা এবং অন্যান্যরা

আমি ঠিক জানি না সীমান্তরক্ষীরা যখন ওত পেতে পড়ে থেকে স্পাইদের কথাবার্তা শোনে তখন তাদের উপলব্ধিটা কেমন হয়, তবে আমার মনে হয় আমরা যেন অনেকটা সেই রকমই বোধ করছিলাম। আমরা বিশ্বসংসারের সব কথা ভুলে গেলাম। আমাদের তখন একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হল একটি শব্দও যেন না ফসকায় আর আমরা যেন ধরা পড়ে না যাই।

ক্‌নিশ-গিন্নি রাগে, বিরক্তিতে ঝঙ্কার দিয়ে বলল:

'এখন! এখন আমি লোকেদের বলব কী? কাল সন্ধেবেলায়ই আসবে যে। কিয়েভ থেকে মোটরসাইকেল ছুটিয়ে আসা — চাট্টিখানি কথা নাকি! তাছাড়া টাকাও যাবে... আজ সারা রাত বসে বসে জাল মেরামত করবে। কাল সন্ধেবেলায় যেন জাল ফেলা হয়। আমি বলে কয়ে রাত কাটাতে রাজী করব 'খন। এখন আধ পাঁইট কেনার জন্যে ছুটতে হবে... ওঃ, এই ছিল আমার কপালে! দাঁড়াও মজা টের পাবে! এই আধ পাঁইটের জন্যে তুমি আমার কাছ থেকে ছাড় পাবে না! এ হল আমার আধ পাঁইট চোখের জল! এর জন্যে তোমাকে অনেক খেসারত দিতে হবে, পাষণ্ড!'

ক্‌নিশ কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'হয়েছে হয়েছে, এবারে যাওয়া যাক। ঢিমে তেতালার বহর দেখ! মরে গেল নাকি?'

এগুলোই ছিল আমাদের শোনা শেষ কথা। নলখাগড়ার আড়ালের দরুন কনিশদের আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম না, তাই আরও কয়েক মিনিট বেশ কষ্ট করে কান পেতে শোনার পর আমরা নিশ্চিত হলাম যে ওরা এবারে চলে গেছে।

'হুম্! এবারে সব পরিষ্কার,' অবশেষে রবিন্সন বলল।

'আর তুই ভাবলি কিনা স্পাই।'

'তাতে কি আছে? স্পাই হতেও বাধা নেই। মানুষ ত নয়, ইতর জন্তু।'

'হ্যাঁ, এখন বোঝা গেল — পার্কের সেই দর কষাকষি, মোটরসাইকেলে সেই পেল্লাই-চেহারার লোকগুলো আর বাকি সব। কী পাজী! ও ত এই ভাবে সব মাছ মেরে ফেলবে!'

'এবারে কী করা যায়? কাল ও আবার জাল ফেলবে আর যদি...'

রবিন্সনের কথা শেষ হল না। হঠাৎ প্রশস্ত জলধারার বুক থেকে ভেসে এল সুরেলা গলার গান:

সূর্য যেন চিরকাল থাকে,
চিরকাল পাই যেন মাকে।
চিরকাল আকাশ আমার,
চিরকাল আমি রহি আর!

ছেলেমেয়েদের গলা — ফুর্তির আভাস পাওয়া যাচ্ছে সুরে। মনে হচ্ছিল যেন জল আর বিলের ওপর দিয়ে নলখাগড়ার ঝোপ ভেদ করে সোজা পা ফেলে ফেলে হেঁটে আসছে আমুদে পাইওনীয়ার বাহিনী। আমরা দুজনে আশ্চর্য হয়ে মুখ চাওয়া-চাউয়ি করলাম। এ কী ব্যাপার? তারপর তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠে ছুটলাম তীরের দিকে — যেখান থেকে প্রশস্ত জলধারাটা চোখে পড়ে। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না — নলখাগড়ার ঝোপ ব্যাঘাত সৃষ্টি করছিল।

'হয়েছে, আয় গাছে চড়ি!' রবিন্সন হাঁক দিল।

আমরা দুজনে তাড়াতাড়ি চড়ে বসলাম সেই পুরনো উইলো গাছটায়, যেটার নীচে ছিল কুটির। ওই গাছটা ছিল দ্বীপের সবচেয়ে উঁচু গাছ। ওখান থেকে আমরা দেখতে পেলাম: সংকীর্ণ জলধারার ভেতর থেকে প্রশস্ত জলধারার বুকে রাজহাঁসের মতো ভাসতে ভাসতে বেরিয়ে আসছে কয়েকটা সাদা নৌকো। সাদা গেঞ্জি গায়ে, সাদা পানামা টুপি মাথায় নৌকোগুলোতে বসে আছে পাইওনীয়াররা। প্রথম নৌকোয় সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সুঠাম গড়নের এক লম্বা ছোকরা, তার গায়ে গেঞ্জি ছিল না, পরনে ছিল সাদা প্যাণ্ট। এই ছেলেটি সম্ভবত পাইওনীয়ার দলের নেতা। তার তামাটে চামড়ার নীচে ফুটে উঠছিল শক্তিশালী পেশীর আভাস।

দেখতে দেখতে গান শেষ হয়ে গেল, দলনেতা তখন উচ্চকণ্ঠে বলল:

'বন্ধুরা, আমি বলি কি, এই দ্বীপটায় থামা যাক। আপনার কি মনে হয়, কমরেড কর্ণধার?' চোয়ালের হাড় বার করা ছোটখাটো চেহারার যেই ছোকরাটা নৌকোর পেছন দিকে ভুরু কুঁচকে বসে ছিল তার দিকে ঝুঁকে পড়ে সে বলল।

'তা আর বলতে!' ছেলেটা গম্ভীরভাবে জবাব দিল।

সবাই কেন জানি হেসে উঠল।

'তাহলে দ্বীপের দিকে চালান কর্ণধার!' দলনেতাও তার উপযুক্ত সুরে তাকে বলল।

'তা আর বলতে!' ছেলেটা এবারেও বলল।

এবারেও সবাই হেসে উঠল। কিন্তু কর্ণধারের ওপর এর কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। সে তার কোঁচকান ভুরু তুলে দৃক্‌পাত অবধি করল না।

একের পর এক নৌকো এসে তীরে ভিড়ল। মুহূর্তের মধ্যে দ্বীপটি পরিণত হল পাইওনীয়ার ক্যাম্পে: হাসি, চিৎকার চেঁচামেচি, ছুটোছুটি। কেউ কেউ বল খেলতে লাগল, কেউ কেউ ততক্ষণে জলে দাপাদাপি করতে লাগল, কেউ বা জাল দিয়ে প্রজাপতি ধরতে লেগে গেল।

আমরা গাছের ওপর বসে বসে ভেবে কূল পাচ্ছিলাম না কী করা যায় — দেখা দেব, নাকি দেব না। অবশ্য বেশিক্ষণ দ্বিধার মধ্যে থাকার অবকাশ আমাদের হল না। সারসের মতো দেখতে একটা ঢ্যাঙা মেয়ে হঠাৎ কুঁড়েঘরটা দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল:

'আরে দেখ, দেখ! এখানে কে যেন থাকে!'

সবাই ছুটে এলো। দলনেতাও এলো... ক্যামেরা কাঁধে, রোদে পোড়া একটা চালাকচতুর গোছের ছেলে কুঁড়েঘরের ভেতরে ঢুকে গেল, পরক্ষণেই বেরিয়ে এলো সেই ইলেকট্রিক টর্চটা হাতে নিয়ে, যেটা আমি রবিন্‌সনের জন্য কিয়েভ থেকে এনেছিলাম।

'টর্চ,' ছেলেটা ওদের বুঝিয়ে বলল, 'যান্ত্রিক। চুম্বকে চলে। এই হাতলটায় চাপ দিলেই কারেণ্ট বেরোয়।'

এই বলে সে দেখানোর জন্য ঝিকির-ঝিকির আওয়াজ বার করতে লাগল। রবিন্‌সন অস্থির হয়ে গাছের ডালে ছটফট করতে লাগল।

সারসের মতো দেখতে মেয়েটাও কুঁড়েঘরে ঢুকল, সেখান থেকে সে বার করে আনল বন্দুক।

'দেখ দেখ, সত্যিকারের, শিকার করার...'

'এই সাবধান, সাবধান, বলা যায় না হয়ত গুলি ভরা। হঠাৎ যদি গুলি বেরিয়ে আসে!' একটা মেয়ে কাঁইমাই করে বলল।

রবিন্‌সন আর সহ্য করতে পারল না, সে বলে উঠল:

'খবরদার, ধরবে না বলছি!'

সবাই সঙ্গে সঙ্গে মাথা উঠাল। লুকিয়ে থাকার আর কোন অর্থ হয় না। আমরা গাছ থেকে নেমে পড়লাম। তৎক্ষণাৎ পাইওনীয়াররা ঘিরে ধরল আমাদের।

'কে তোমরা?'

'এখানে কী করছ?'

'এটা কি তোমাদের কুঁড়ে?'

'বন্দুকটাও কি তোমাদের?'

'তোমরা কি শিকারী?'

'তোমরা কি এখানে থাক?'

আমি ভেবাচেকা খেয়ে রবিন্‌সনের দিকে তাকালাম।

রবিন্‌সন ভুরু কুঁচকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল।

'আরে, ওরা হয়ত এখানে নেহাৎই মাছটাছ ধরে...'

'নাকি বাড়ি থেকে পালিয়েছে?'

'নাকি রেড ইণ্ডিয়ান রেড ইণ্ডিয়ান খেলছে সিটন-টম্সনের সেই 'খুদে জংলীদের' মতো? মনে আছে?'

'নাকি রবিন্সন-রবিন্সন... তাই না?'

আমি একেবারে অসহায়ের মতো রবিন্সনের দিকে তাকালাম। আমার বন্ধুটি লজ্জায় গাঢ় লাল হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ সে বলে ফেলল:

'আমরা কোন খেলাই খেলছি না... আমাদের ওপর একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এসে পড়েছে। আমরা বেআইনী শিকারী ধরার কাজে আছি।'

'কী? কী?'

'বাহবা!'

'কে তোমাদের দায়িত্ব দিয়েছে, শুনি?'

'কেউ দায়িত্ব দিতে যাবে এমন কোন কথা আছে নাকি?' অবজ্ঞাভরে দাবড়ানি দিয়ে বলল রবিন্সন। 'আমরা নিজেরাই তার ওপর নজর রেখেছি, নিজেরাই ধরব।'

পাইওনীয়াররা রীতিমতো আগ্রহের সঙ্গে তার দিকে তাকাচ্ছে লক্ষ করে রবিন্সনের সাহস আরও বেড়ে গেল। সে বলল:

'খবরদার, বন্দুক নামিয়ে রাখ বলছি। টর্চটা দাও।'

বন্দুক আর টর্চ ওরা তৎক্ষণাৎ যথাস্থানে রেখে দিল।

'যাই হোক, বেআইনী শিকারীকে তোমরা বার করলে কী করে শুনি? আর তাকে তোমরা ধরবেই বা কী করে?' ক্যামেরা কাঁধে, রোদে পোড়া ছোকরাটা বলল।

'তোমাদের বন্দুকও কি এর জন্যে? ধরার জন্যে?' সারসের মতো দেখতে মেয়েটা জিজ্ঞেস করল।

আমি দেখলাম কথাবার্তার মোড় অন্য দিকে ঘুরানো দরকার।

'আর তোমাদের কী — অভিযান নাকি?' আমি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলাম। 'নাকি অমনি বেড়াতে বেরিয়েছ? মোটের ওপর, এসেছ কোন্ জায়গা থেকে?'

'আমরা কিয়েভ থেকে। খুদে পথসন্ধানীর দল। গেরিলা যুদ্ধের জায়গাগুলো আমরা বার করতে বেরিয়েছিলাম' — ক্যামেরা কাঁধে ছেলেটা উৎসাহের সঙ্গে বলল।

'তা আর বলতে!' কর্ণধার তার সমর্থনে বলল।

'আমরা এখন বাড়ি ফিরছি। তিন সপ্তাহ পথে পথে ছিলাম,' সারসের মতো দেখতে মেয়েটা বলল।

'বাড়িয়ে বলিস না, ভালকা! তিন সপ্তাহ নয়, উনিশ দিন। আজ হল গিয়ে বিশে,' কথাবার্তার মধ্যে নাক গলাল চশমা চোখে নাকচোখা একটা মেয়ে।

'আমাদের এই জলার জঙ্গলে তোমরা পথ হারানোর ভয় কর না? জান এগুলো কেমন?'

'আমাদের যে ম্যাপ আর কম্পাস আছে। ভয়ের কী আছে?'

'শোন্ ইগর!' ক্যামেরা কাঁধে ছোকরার উদ্দেশে বলল ওদের দলনেতা। 'একটা ব্যাপার জেনে নেওয়া দরকার। ছেলেরা যদি সত্যি সত্যিই বেআইনী শিকারীকে ধরার মতলব করে থাকে, তাহলে এখানে আমরা থাকলে ওদের হয়ত অসুবিধা হতে পারে। আমরা সংখ্যায় অনেক, আমরা হুল্লোড়ে — লোকটা ভয় পেয়ে গা ঢাকা দিতে পারে। তোমরা কোন লজ্জা না করে বলে ফেল — যদি তা-ই হয় তাহলে আমরা অন্য জায়গায় গিয়ে উঠতে পারি। আমাদের আর কী!'

আমি আর রবিন্‌সন মুখ চাওয়া-চাউয়ি করলাম।

'আরে, তাতে কী আছে? থেকে যাও তোমরা,' রবিন্‌সন বলল। 'লোকটা রাতের আগে আসবে না, তাও আবার আজ নয় আগামীকাল। তাই আগামীকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমাদের থাকার কোন বাধা নেই।'

'দেখো কিন্তু,' এই বলে পাইওনীয়ারদের উদ্দেশে দলনেতা বলল: 'তা-ই যদি হয়, তাহলে খাবারদাবার বার করে নিয়ে এসো, ক্যাম্পফায়ার জ্বালানো যাক — সকালের খাবার তৈরি করব।'

'তা আর বলতে!' ভারিক্কি চালে বলল চোয়ালের হাড় বার করা ছোটখাটো গড়নের কর্ণধারটি।

পাইওনীয়াররা তৎক্ষণাৎ সোরগোল তুলে নৌকোগুলোর দিকে ছুটে গেল।

'আর ইগর, তুই ক্যাম্পফায়ারের বন্দোবস্ত কর,' দলনেতা বলল। 'এ কাজে তুই ওস্তাদ।'

'চল, আমি দেখিয়ে দিই কোথায় শুকনো ডালপালা আছে,' কর্তৃত্বের ভঙ্গিতে প্রস্তাব দিল রবিন্‌সন।

আমরা তিনজনে চললাম দ্বীপের গভীরে। আমরা চলতে থাকি এবং সচরাচর

পরিচয়ের শুরুতে যেমন হয়ে থাকে — হতবুদ্ধি হয়ে চুপ করে থাকি — কী যে বলা যায় জানি না।

এমন সময় ইগর মুখ না খুলে (আমরা স্পষ্ট দেখলাম) না গমগম, না ঘর্ঘর — কেমন যেন একটা আওয়াজ বার করল। সঙ্গে সঙ্গে তার ভেতরের কোন্ জায়গা থেকে যেন বেজে উঠল বাজনা। জ্যাজ্... আমরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে চোখ বড় বড় করে ইগরের দিকে তাকালাম: কী কান্ড রে বাবা!

ও হাসতে হাসতে কাঁধের পেছন থেকে সামনের দিকে টেনে নিয়ে এলো সেই জিনিসটা যেটাকে আমরা ক্যামেরা ভেবেছিলাম।

'রেডিও। পোর্টেবল। ট্র্যানজিস্টর ... সেমিকন্ডাক্টরে কাজ করে। ক্যামেরার খাপের মধ্যে পুরেছি আর কি, কেননা অন্য কোন খাপ ছিল না। এতে বেশ সুবিধেও হয়েছে। পিঠে ঝোলানো যায়।'

'এই ব্যাপার! তার মানে এটা হল ছোট্ট ট্র্যানজিস্টর রেডিও।' আমরা চট করে ধরতেই পারি নি! এরকম রেডিও যে দুনিয়ায় আছে তা আমরা জানতাম। আমি কিয়েভে দেখেছি, তাছাড়া আমাদের গাঁয়ের দোকানেও এক সময় বিক্রি হয়েছিল। এর নাম হল 'ট্যুরিস্ট'।

'বেড়ে জিনিস,' সংবিৎ ফিরে পেয়ে পিঠ চাপড়ানোর সুরে বলল রবিন্সন। 'এর জন্যে কত দিতে হয়েছে?'

'কত দিতে হয়েছে মানে?'

'বলি, কত দামে কিনলে?'

'কোন দামই দিতে হয় নি। নিজে বানিয়েছি।'

'কী? কী?' রবিন্সন যেন শুনতে পায় নি এমন ভঙ্গিতে কানের পাশে হাতের তালু রেখে মুখ বিকৃত করে জিজ্ঞেস করল।

আমি হিহি করে হাসলাম।

'বললাম যে নিজে বানিয়েছি,' ইগর গম্ভীর স্বরে বলল।

আমি আরও একবার হিহি করে হাসলাম।

'বটে,' বাঁকা হাসি হাসল রবিন্‌সন। 'হ্‌ঃ, বললেই হল। আরে, আমি যে জিজ্ঞেস করছি, কত দিতে হয়েছে? আমাদের গাঁয়ের দোকানে 'ট্যুরিস্ট' বিক্রি হয়েছিল। প'য়ত্রিশ রুবল। সুন্দর, ঝিনুকের মতো রঙ। আর এটা? এটার দাম কত?'

'কী আজব ছেলে রে বাবা! বিশ্বাস হচ্ছে না... তা, না করলে আর কী করতে পারি?..'

ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো দলনেতা:

'কী নিয়ে তোমাদের এত তর্কাতর্কি চলছে?'

'আরে না, ও কিছু নয়...' রবিন্‌সন কোন আমল না দেওয়াই সমীচীন বোধ করল, তারপর কী মনে করে যেন দলনেতার ওপর নীচ থেকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে আচমকা শ্লেষের সুরে জিজ্ঞেস করল: 'আচ্ছা বলুন দেখি, আপনাদের সব পাইওনীয়ারই কি এমন ওস্তাদ... নাকি কেবল এইটিই?'

'কেন, কী হয়েছে?'

'না, কিছু না... ও বলছিল কিনা যে এই রেডিওটা ও নিজে বানিয়েছে। কখন হয়ত শুনব ঐ যে ঐ মেয়েটা — নিজে নিজে সত্যিকারের মোটরগাড়ি বানিয়েছে, আর ঐ 'তা আর বলতে' কর্ণধারটি মহাকাশ ঘুরে এসেছে!'

'মহাকাশ আর মোটরগাড়ির কথা আমি বলতে পারছি না, তবে রেডিওটা কিন্তু সত্যি সত্যিই ও নিজে বানিয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই। ও আমাদের বাহাদুর ছেলে! আজ তিন বছর হল রেডিওচক্রে আছে। আকাদেমিশিয়ান হবে।'

দলনেতা কথাগুলি বলল গম্ভীরভাবে, ঠাট্টার কোন লক্ষণ তাতে ছিল না। তাকে বিশ্বাস না করে উপায় ছিল না। রবিন্‌সন তৎক্ষণাৎ বেজার হয়ে গেল, চুপসে গেল ফুটবল খেলার পাম্পখোলা বলের মতো। চোখে যে পরিহাসের ফুলকি দেখা দিয়েছিল তা নিভে গেল, ঠোঁটের প্রান্তদুটো ঝুলে পড়ল। আমিও অবাক। আমার কেন যেন চিরকাল ধারণা ছিল যে আদর্শ ও দৃষ্টান্তস্থানীয় যে-সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী জাহাজ ও এরোপ্লেনের চালু মডেল বানায়, সরু করাত দিয়ে প্লাইউড কেটে নানা

ধরনের নকশা করা তাক-টাক বানায় এবং প্রদর্শনীর উপযুক্ত এমন সব জিনিস বানায় যা দেখে মাস্টারমশাইরা আর মা-বাবারা হাঁ হয়ে যান — সেই 'প্রতিভাধররা' সবাই নির্ঘাত রোগাপটকা, লম্বা নাকওয়ালা, চশমাচোখে। আর তারা খানিকটা অদ্ভুত ধরনের না হয়ে যায় না। বরাবরই আমার এমন ধারণা ছিল। অথচ আমাদের সামনে যাকে দেখছি সে হল বড়ি-বসানো নাক এক সাধারণ ছোকরা — রোদে পোড়া, শরীরের পেশীগুলো পুরুষ্টু, দেখেশুনে মনে হয় ব্যায়ামবীর। শান্ত ল্যাবরেটরিতে কোন রেডিওর জট পাকানো ভেতরের অংশ নিয়ে নিবিষ্ট হয়ে পড়ে থাকার চেয়ে বরং খেলার মাঠে খেলোয়াড়দের হুল্লোড়ে দঙ্গলের মধ্যে এই ছেলেটাকে বেশি মানায়।

আমরা বিভ্রান্ত ও হতবুদ্ধি হয়ে চুপ করে রইলাম।

দলনেতা মনোযোগ দিয়ে আমাদের দিকে তাকাল তারপর কৃত্রিম রাগের সঙ্গে বলল:

'আরে ভাই, বকবক করে গুচ্ছের কতকগুলো সময় নষ্ট করলে দেখছি, শুকনো ডালপালার ত কোন পাত্তা দেখছি না। এদিকে লোকজন যে খিদেয় মরে যাচ্ছে। জলদি, চটপট হাত চালাও দেখি!'

এর ফলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে আড়ষ্ট ভাব কাটিয়ে উঠলাম। আমরা তাড়াতাড়ি (এমন কি বেশ বাড়াবাড়ি রকমেরই তাড়াতাড়ি) ছুটে গেলাম শুকনো ডালপালা যোগাড় করতে।

এক মিনিট বাদেই ফাঁকা জায়গাটাতে বয়ে আনলাম বড় বড় খাদা ভরা শুকনো ডালপালা। বিশেষ করে উৎসাহের পরিচয় দিল রবিন্‌সন। সে এমন এক বিশাল বোঝা বয়ে নিয়ে এলো যে আমার ভয় হচ্ছিল ওর পেট ফেটে না যায়।

সারসের মতো দেখতে ভালকা নামে মেয়েটি তা দেখে উল্লসিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল:

'ওঃ-হো-হো!'

বোঝার ভার না এই 'ওঃ-হো-হো' — কোনটা যে রবিন্‌সনের লাল হয়ে যাবার বেশি কারণ তা আমি বলতে পারি না। মোটের ওপর, ও কেন যেন ঘন ঘন ঐ ভালকার দিকেই তাকাচ্ছিল। চেয়ে দেখার আর লোক পেল না!

একেবারেই বদখত! রোগাপটকা, ড্যাবরা চোখ, লম্বা লম্বা ঠ্যাঙ্! গ্রেবেনিউটকার থেকে একশ গুণ খারাপ!

ফাঁকা জায়গাটায় দাঁড়িয়ে সকলে দেখতে লাগল ইগরের আগুন জ্বালানোর কৌশল। বোঝ কাণ্ড! শহরের ছেলে হলে কী হবে, দিব্যি পারে ত!

দেখতে দেখতে ঝোপঝাড়ের মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটায় বিশাল অগ্নিকুণ্ডের লকলকে জিহ্বা আকাশকে লেহন করতে চলল।

'আচ্ছা, আজ জাউ রান্না করার পালা কার?' দলনেতা জিজ্ঞেস করল।

'সাশকোর!' বলল ভালকা।

'সাশকোর, সাশকোর! ঠিক কথা!' চতুর্দিক থেকে রব উঠল, সকলে তাকাল কর্ণধারের দিকে।

'তোর পালা?' দলনেতা জিজ্ঞেস করল।

'তা আর বলতে!' সে বলল।

'তাহলে বলতে হবে আজ আমাদের ভাগ্য ভালো,' দলনেতার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

'ভাগ্য ভালো, ভাগ্য ভালো! মাছের সুপ! সাশকো, মাছের সুপ কিন্তু চাইই!'

'মাছের সুপ!' বহুকণ্ঠের মিলিত ধ্বনি উঠল।

'তা আর বলতে,' সাশকো মাথা নাড়ল। এই প্রথম তাকে হাসতে দেখা গেল।

এখন সকলে একসঙ্গে মিলে ক্যাম্পফায়ারের সামনে দাঁড়াতে বিশেষ করে চোখে পড়ল যে সাশকো খুবই ছোট গড়নের, সবার চেয়ে খাটো। নিজেকে বেশ ভারিক্কি দেখানোর উদ্দেশ্যেই হয়ত সে অমন গম্ভীর হয়ে ভুরু কুঁচকে থাকত। তাছাড়া আরও দেখা গেল যে সকলেই তাকে ভালোবাসে, আর তার এই 'তা আর বলতে' নিয়ে ওরা ইয়ার্কি করলেও সেটা গায়ে মাথার মতো ত নয়ই বরং মধুরই।

সাশকো সকালের খাবার তৈরির কাজে লেগে গেল। ভালকা এবং অন্যান্য মেয়েরা তাকে সাহায্য করতে লাগল, আলুর খোসা ছাড়াল, মাছ কেটেকুটে সাফ করল। ওদের একটা নৌকোর পেছন দিকে বাঁধা একটা জাল জলে ডোবানো ছিল — সেটার ভেতর থেকে মাছ বার করা হল। বাদবাকি পাইওনীয়ারেরা যে যার মনে দ্বীপের এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল। আপনাআপনিই কী করে যেন আমরা ইগরের পাশাপাশি এসে পড়লাম। ইগর একটা গুঁড়ির ওপর বসে ছুরি দিয়ে একটা

লাঠি ছুলছিল — দেখে মনে হয় কিছু একটা বানানোর মতলব করছে। আমি আর রবিন্‌সন গুঁড়িটার পাশে উটকো হয়ে বসে ছিলাম হাঁটুর ভেতরে চিবুক গুঁজে আর অন্যমনস্কভাবে মাটি ঘাঁটছিলাম। তারপর রবিন্‌সন গলা খাঁকারি দিল এবং ভুরু কুঁচকে (বিব্রত ভাবটাকে চাপা দেবার উদ্দেশ্যে) ভাঙা গলায় বলল:

'রেডিওটা একবার দেখতে দাও না... দেখতে পারি কি?'

ইগর সঙ্গে সঙ্গে ছুরি আর লাঠিটা একপাশে সরিয়ে রেখে দিল।

'নয় কেন?.. একশ' বার। এই যে।'

সে খাপটা খুলল:

'এই যে টিউনিং, এটা রেঞ্জ আর এ হল ভলিউম,' এই বলে সে কোথায় কী ঘোরাতে হয় দেখিয়ে দিল।

রবিন্‌সন রেডিওর ওপর ঝুঁকে পড়ল। আমিও মাথা বাড়ালাম। রবিন্‌সন কনুই দিয়ে ধাক্কা মেরে আমাকে বলল:

'সোজাসুজি ওটার ওপর নিশ্বাস ফেলিস না। ভাপে ঘেমে গিয়ে নষ্ট হয়ে যাবে।'

ইগর হেসে বলল:

'আরে না, ওতে নষ্ট হবে না।'

রবিন্‌সন রেডিওটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ নব্ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চুপচাপ দূর দূর দেশের কণ্ঠস্বর শুনল।

'হুঁ... দামী জিনিস,' অবশেষে রবিন্‌সন বলল, তারপর যোগ করল: 'আচ্ছা, ফিজিক্সে তোমার নিশ্চয়ই খুব ভালো নম্বর, অ্যাঁ?'

'ভালোই,' খুব সহজ সুরে, কোন বড়াই না করে জবাব দিল ইগর।

'আচ্ছা, কখনও কোন বিষয়ে ফেল্ তুমি করেছ?' রবিন্‌সন আশান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করল। 'অন্তত এই ধর না কেন গানে, ছবি আঁকায়, কন্ডাক্টে? নাকি সবেতেই ভালো ভালো নম্বর?'

'হ্যাঁ ভালোই বলতে হয়,' ইগর যেন ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলল। 'আমাদের এই দলে যারা আছে তারা সবাই পড়াশুনায় ভালো। আগে থাকতেই ঠিক ছিল যে একমাত্র তারাই যেতে পারবে।'

রবিন্‌সন চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

এমন সময় ঝোপের ভেতর থেকে উ'কি মারল ভালকা। মেয়েরা সম্ভবত ইতিমধ্যে তাদের কাজ সেরে ফেলেছে। ভালকাকে আমি দেখতে পেলাম, ইগর ছিল তার দিকে পিঠ করে — ওকে কিন্তু দেখা গেল না। ভালকা নিঃশব্দে গ‍্ড়ি মেরে তার দিকে এগিয়ে এলো, আমি ম‍্খ খোলারও অবকাশ পেলাম না, সে এক ধাক্কায় ইগরকে গ‍ু'ড়ি থেকে ফেলে দিল। ইগর আগে থাকতে মোটেই টের পায় নি, তাই বলাই বাহ‍্ল্য উলটে মাথা নীচু করে ছিটকে গিয়ে পড়ল ঘাসের ওপর।

'মহিলাদের সব সময় জায়গা ছেড়ে দিতে হয়,' ভালকা গ‍ু'ড়িটার ওপর চেপে বসতে বসতে বলল।

ইগর উঠে পড়ল, জবাবে সে কেবল হাসল।

আমি আর রবিন্‌সন অবাক হয়ে ম‍্খ চাওয়া-চাউয়ি করলাম।

'আচ্ছা কাণ্ড! একটা ব‍্দ্ধিমান ছেলে — ব্যায়ামবীর, যে নিজে রেডিও বানিয়েছে তাকে কিনা কোথাকার কে এক লম্বা ঠ্যাঙওয়ালা বদখত মেয়ে এসে মাটিতে ছ‍ু'ড়ে ফেলে দিল — যেন কোন ছেলে ত নয়, একটা আল‍্র বস্তা! আর ছেলেটা কিনা শ‍্ধ‍্ হাসল...'

হ‍ু'ঃ, আমার সঙ্গে কেউ এমন লাগতে এলে মজাটা টের পাইয়ে দিতাম না! — এমন কি গ্রেবেনিউচকা হলেও। তাকে আমি এমন মজাটা টের পাইয়ে দিতাম, দশবার ডিগবাজী খাইয়ে ছাড়তাম!

কিন্তু আরে, আরে, রবিন্‌সনের এ কী হাল!

'এই যে, এদিকে দেখি!' রেডিওটার দিকে নির্লজ্জের মতো হাত বাড়িয়ে ভালকা বলল।

আর রবিন্‌সন, একটা মর্দা ছেলে কিনা বিনা প্রতিবাদে দিব্যি দিয়ে দিচ্ছে রেডিওটা। কোন মানে হয়? আরে, এটা কি ওর রেডিও নাকি? ও খবরদারি করার কে?

এই টগবগে আস্ফালনগ‍্লি অবশ্য কেবল আমি মনে মনেই আন্দোলন করছিলাম। আমি চুপ করে থাকি। এটা ত আর আমার রেডিও নয়, আমার কাছ থেকে কাড়ছেও না।

ভালকা রেডিওর টিউনিং ঠিক করতে লাগল পাখির মতো মাথাটা এক পাশে

কাত করে আকাশের দিকে তাকিয়ে। একটা টানা টানা সুর ধরতে পেরে হঠাৎ সোল্লাসে বলে উঠল:

'আরে! আরে!'

আমরা অবাক হয়ে তার দিকে তাকালাম — অমন চেঁচায় কেন আবার?

ভাবালু দৃষ্টিতে প্রশস্ত জলধারার দিকে তাকিয়ে বাজনা শুনতে শুনতে সে নীচু গলায় বলল:

''মরাল সরোবর'*)... অ্যাডাজিও...'

আমি মুখ বাঁকালাম। কী সব জিনিসই ছাড়ছে! এমন সব কথা বলে যার মাথামুণ্ডু বোঝার উপায় নেই।

এদিকে রবিন্‌সন বেশ গুরুগম্ভীর ভাব করে ভুরু কুঁচকে বলল:

'না, এটা মোটেই মরাল সরোবর নয়, এ হল পাতিহাঁসদের সরোবর। আমাদের

---

*) চিহ্নিত স্থানগুলির জন্য টীকা-টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

এখানে মরাল-টরাল দেখা যায় না, তবে হ্যাঁ, পাতিহাঁসের কোন সীমা-সংখ্যা নেই!'

একথায় ভালকা হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠে বলল:

'ওঃ-হো-হো, তোমরা আমাকে ধর গো! ও মা গো, আর পারি না! কী আজব ছেলে রে বাবা! আমি কি আর এই সরোবরের কথা বলছি? আমি বলছি সুরকার চাইকোভ্‌স্কির 'মরাল সরোবর' ব্যালের বাজনার কথা। এখন রেডিওতে ঐ বাজনাটাই বাজছে।'

রবিন্‌সনের চেহারাটা দেখতে এমন হল যেন ফুটন্ত জলে তার মুখ পুড়ে গেছে। ওর শরীরের যত রক্ত ছিল সব এসে জমা হল মুখে।

'আমি যেন আর জানি না,' রাগে গরগর করে সে বলল। 'খুবই ভালো জানি এই নামকরা ব্যালেটা। আর আমাদের এই জলার কথা যেটা বললাম সেটা ঐ অমনি। মজা করার জন্যে... হাসানোর জন্যে।'

আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। যে-লোক নির্লজ্জের মতো মিথ্যে বলে তার চোখে চোখে তাকাতে পারি না। এই রবিন্‌সনটা 'মরাল সরোবর'-টরোবর কিছু জানে না; কেননা ওর সুরজ্ঞান ছিল যাচ্ছেতাই। ও গান গাইতে প্যারত কেবল আমার সঙ্গে। সুর মিলিয়ে গাইত আর কি। কিন্তু ওর নিজের কোন গলা ছিল না — তার গলায় সব গানেরই হত এক সুর। ভালকার ওপর আমার রাগ হচ্ছিল এই কারণে যে তারই জন্য আমার বন্ধুকে নির্লজ্জের মতো মিথ্যে বলতে হল। মোট কথা, পেয়েছে কী? — এমনভাবে আমাদের পিছে লাগতে এলো কেন?..

এমন সময় যেন আমার মনের কথাটা শুনতে পেয়েই ভালকা ঝট করে রেডিও বন্ধ করে দিয়ে বলল:

'আমার ওপর তোমরা রাগ করলে নাকি ভাই? আমি তোমাদের কাছে এলাম, এসে পেছনে লাগছি — এর জন্যে রাগ করছ, তাই না? আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি... তোমরা রাগ করো না। আমি কেবল তোমাদের সঙ্গে একটু আলাপ করতে এসেছিলাম...'

কথাগুলো সে এমন সহজভাবে বলল যে আমি অস্বস্তি বোধ করলাম। না আমি, না রবিন্‌সন — আমরা কেউই কোন জবাব খুঁজে পেলাম না।

ভালকা উঠে দাঁড়াল, রবিন্‌সনের হাতে রেডিওটা গুঁজে দিয়ে ক্যাম্পফায়ারের দিকে ছুটে গেল।

'আচ্ছা খামখেয়ালি ত... তাই না?' বিভ্রান্ত হয়ে দুকাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল রবিন্‌সন।

'ও চমৎকার মেয়ে', হঠাৎ লাল হয়ে গিয়ে বলল ইগর। 'ওর সঙ্গে আমাদের সবারই ভাব... আরে কী হল? রেডিও খুলছ না কেন? লজ্জা করার কিছু নেই, খোল খোল। সবে ব্যাটারী পালটেছি।'

আমি মনোযোগ দিয়ে তার দিকে তাকাতে বুঝতে পারলাম যে সে ইচ্ছে করে কথাবার্তার মোড় ঘুরিয়ে নিচ্ছে যাতে ভালকার প্রসঙ্গ আর না ওঠে। ওর অবস্থাটা আমি বেশ বুঝতে পারলাম। আমিও অস্বস্তি বোধ করতাম যদি গ্রেবেনিউচকা সম্পর্কে কেউ কোন কথা বলত।

আরও কতক্ষণ আমরা পাড়ে, গুঁড়িটার পাশে কাটালাম মনে নেই। অবশেষে শোনা গেল দলনেতার গলা:

'ইগর, আর এই ছেলেরা, তোমরাও শিগগির চল! মাছের সুপ তৈরি!'

'চল!' ইগর বলল।

আমি সেই সকালে এক গেলাস দুধ খেয়েছিলাম, তারপর থেকে কুটোটিও মুখে পড়ে নি; অতএব, বলাই বাহুল্য, ইগরের প্রস্তাবটা আমার ভালো লাগল। আমার মনে হয় রবিন্‌সনেরও খিদে কম পায় নি।

কিন্তু সে হঠাৎ ইগরকে বলে বসল:

'তুমি যাও, আমরা এখানে একটু বসে থাকি। তোমাদের আসার ঠিক একটু আগেই আমরা ভালোমতো খেয়ে নিয়েছি।'

আমি চোখ পিটপিট করতে লাগলাম, আমার মুখ হাঁ হয়ে গেল, তবে আমি চুপ করে রইলাম।

'আরে, এ আবার একটা কথা হল! চল, চল! অমন মাছের সুপ জীবনে খাও নি, বাজী ফেলে বলতে পারি!' ইগর অনুনয় করে বলল।

রবিন্‌সন কিন্তু তার গোঁ ধরে রইল, রাজী হল না। আমি ঢোক গিলে ওকে সমর্থন করে যেতে লাগলাম।

অবশেষে ইগর হাল ছেড়ে দিল।

'আরে ধ্ৎ, কী যে কর! দাঁড়াও আমাদের নেতাকে তোমাদের পেছনে লাগিয়ে দিচ্ছি!' এই বলে সে ছুটে গেল ক্যাম্পফায়ারের দিকে।

এক মিনিট বাদে কিন্তু ওদের দলনেতার জায়গায় এলো লম্বা ঠ্যাঙওয়ালা ভালকা। সে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ওপর ঝাঁঝিয়ে উঠল:

'এসব কী ব্যাপার শুনি? চল, জলদি বলছি সুপ খেতে! তোমরা যদি আমাকে নেমন্তন্ন করতে তাহলে কি আমি 'না' বলতে পারতাম! বলি, তোমরা নেমন্তন্ন করলে কি আমি 'না' করতাম! চল, চটপট!'

আমি এই দেখে পরম পুলকিত হলাম যে এমন গোঁয়ার গোবিন্দের মতো গোঁ ধরে থেকে ইগরের কথায় রাজী না হলেও এখন রবিন্‌সন হঠাৎই এক কথায় হার মেনে সুড়সুড় করে গুটিগুটি মেয়েটার পেছন পেছন চলল। এবারেও কেন যেন আবার আমার মনে পড়ে গেল গ্রেবৌনিউচকাকে।

আমি স্রেফ দারুণ ক্ষুধার্ত ছিলাম বলেই হোক, নাকি মাছের সুপটা সত্যি সত্যিই বিশেষ সুস্বাদু ছিল বলে হোক — আমার কিন্তু মনে হল যে বাস্তবিকই অমন জিনিস আমি জীবনে খাই নি। মাছের সুপের ভালোমন্দ বোঝার ক্ষমতা আমার ছিল। আমাদের এই জেলে পল্লীতে লোকে মাছের সুপ বানাতে জানত, আমি নিজেও কয়েক বার বানিয়েছি।

কিন্তু অমন সুস্বাদু কদাচিৎ হয়ে থাকে। পরিতৃপ্তিতে সকলে ঠোঁট দিয়ে চুকচুক আওয়াজ করে, তারিফ করে কর্ণধার সাশকোকে। এদিকে সে তার চিরাচরিত অভ্যাসবশত ভুরু কুঁচকে বসে ছিল একটা হাতা নিয়ে ডেকচির পাশে, মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করে যাচ্ছিল কার আরও চাই।

সকালের খাবার তৈরির পালা সাশকোর, একথা শুনে সকলে কেন যে অমন উল্লসিত হয়ে উঠেছিল এতক্ষণে আমার তা বোধগম্য হল। সাশকো ছিল ওদের স্বীকৃত রাঁধুনি।

দেখতে দেখতে পেট পুরে খাওয়ার পর সকলে বিশ্রাম করার জন্য ক্যাম্পফায়ারের চারধারে ঘাসের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে পড়ল। কে যেন প্রথমে নীচু গলায় গান ধরল, কেউ কেউ তার সঙ্গে গলা মেলাল, দেখতে দেখতে গানের সুর উঁচুতে উঠে, জোরাল হয়ে প্রশস্ত জলধারার ওপর পাখনা মেলল — এমন কি নলখাগড়ার ঝোপও যেন সামান্য মাথা নোয়াল।

গর-জায়, কা-ত-রায় — প্র-শস্ত নীপা-আ-আর!
হু-হু ব-হে — ক্রু-দ্ধ-অ-অ প-ব-ন...

ঘাসের ওপর শুয়ে শুয়ে অতলস্পর্শী নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে সমবেত কণ্ঠে গান গাইতে কী ভালোই না লাগছিল! মনে হচ্ছিল সমগ্র ধরণী, বিশ্বচরাচর যেন সেই গান শুনছে।

দলনেতা চুপচাপ উঠে নৌকোর দিকে চলে গেল, ফিরে এলো অ্যাকর্ডিয়ান নিয়ে। এবারে গানের সুর আরও জোরাল, আরও মধুর হয়ে উঠল।

'গরজায় কাতরায়' শেষ হওয়ার পর দলনেতা বলল:

'এবারে হোক আমাদের পাইওনীয়ারদের গান — 'ধ্বনির আলোয় উড়ে যাক রাতের আঁধার'। ধর সাশকো।'

'তা আর বলতে', সাশকো জবাবে বলল, সে গলা খাঁকারি দিল, অ্যাকর্ডিয়ানের আরম্ভের বাজনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগল।

ওর গলা যে এত পরিষ্কার, আর সুরেলা এবং এমন উঁচু পর্দায় খেলতে পারে তা আমি ভাবতেই পারি নি। 'এই খাপছাড়া ধরনের কর্ণধার — 'তা আর বলতে' সাশকোর কান্ডটা দেখ! কেবল নামকরা রাঁধুনিই নয়, গায়কও হেলাফেলার নয়!'

ধ্বনির আলোয়
উড়ে যাক রাতের আঁধার,
আমরা পাইওনীয়ার —
শ্রমিকের সন্তান...
নবযুগ ভাই
সমুখে আগত ঐ।
আমাদের আহ্বান হবে
'সদা থেকো প্রস্তুত সবে!'

আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল গানে।

আমরা গান গাইলাম দেড় ঘণ্টা, কিংবা তারও খানিকটা বেশি হবে। ইউক্রেনের লোকগীতি, বিপ্লবী গান, কমসমোলের পুরনো গান, আধুনিক গান, সিনেমার গান — কোনটাই বাদ গেল না।

তারপর ইগর বলল:

'আচ্ছা, এবারে ভালকার নাচ হোক...'

'এবারে শুরু হবে মুখ বাঁকানো, ন্যাকামি, আর ওকে সবাই পীড়াপীড়ি করতে থাকবে,' আমি মনে মনে ভাবলাম। কিন্তু সেসবের ধারে কাছে না গিয়ে ও বলল:

'এতে আর কী আছে? বললেই নাচি।'

এমন সময় আমি লক্ষ করলাম যে রবিন্সন কেন যেন লাল হয়ে গেল এবং নিজের জায়গা থেকে না নড়েই উদ্বেগের সঙ্গে উসখুস করতে লাগল। এর আগেও যখন সকলে গান গাইছিল, তখনই আমি অবশ্য লক্ষ করেছি যে আমার বন্ধুটি সর্বক্ষণ ভালকার দিকে তাকিয়ে আছে, আর দৈবাৎ ভালকার সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে যাওয়ামাত্র দৃষ্টি সরিয়ে নিচ্ছে।

'ইউক্রেনের কাজাচোক নাচ!' এই বলে দলনেতা অ্যাকর্ডিয়ানে সুর বাজাতে শুরু করল।

ভালকা নাচতে শুরু করল। রবিন্সন আমার কানের কাছে এত ঘন-ঘন ফোঁস-ফোঁস নিশ্বাস ছাড়তে লাগল যে মনে হল ও নিজেই যেন নাচছে।

ভালকার নাচ শেষ হতে সবাই যখন হাততালি দিল তখন রবিন্সন কিন্তু হাততালি দিল না, কেন যেন ভুরু কুঁচকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

তারপর চশমা-চোখে মেয়েটা মায়াকোভ্স্কির কবিতা পড়ল। পড়ল ভালোই, তবে বড্ড বেশি চেঁচাল — এত জোরে চেঁচাল যে মনে হল সারা গাঁয়ে শোনা যাচ্ছে।

মোটের ওপর, শৌখিন শিল্পীদলের একটা আকস্মিক বিচিত্রানুষ্ঠান হয়ে গেল। এর পর স্নানের পালা। ইগর ক্রল্-স্ট্রোকে সাঁতার কাটল, কর্ণধার সাশকো ব্রেস্ট-স্ট্রোকে, ভালকা মোটামুটি (অবশ্য মেয়েলি কায়দায় — মাথা ওপরে তুলে নাক দিয়ে ঘন ঘন নিশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে)। তবে উইলো গাছ থেকে জলে ঝাঁপ দেবার ক্ষমতা ওদের কারোরই ছিল না। এখানেই আমার বন্ধু দেখিয়ে দিল ভাসিউকোভ্কার ছেলে কাকে বলে। ও তরতর করে মগডালে উঠে গিয়ে ডালের ওপর বানরের মতো দোল খেয়ে এমন এক লাফ দিল — প্রায় এক মিনিট ধরে উড়তে উড়তে গিয়ে পড়ল প্রায় মাঝ জলে। সকলে একেবারে হাঁ হয়ে গেল।

দলনেতা বলল:

'সাবাস! তুমি ভালো খেলোয়াড় হতে পারবে। তোমার উচিত ডাইভিং-এর বিভাগে যাওয়া। সাবাস!'

আমিও উৎসাহে মেতে উঠলাম, আমার দেখানোর ইচ্ছে হল যে আমিও কম যাই না। দুহাতে থুতু ফেলে আমি উইলো গাছে গিয়ে চড়লাম। কিন্তু আমার ভাগ্য মন্দ। বড়ই মন্দ বলতে হবে। খোঁচা লেগে আমার জাঙ্গিয়া গেল ফেড়ে — এমনই ফেড়ে গেল যে কী বলব! — পাশ বরাবর একেবারে নীচ পর্যন্ত (এমন কি ইলাস্টিকটাও ছিঁড়ে গেল)। লজ্জায় ও দুঃখে কাঁদো কাঁদো হয়ে অগৌরবের বোঝা মাথায় নিয়ে আমি নীচে নেমে এলাম। এতে কিন্তু কেউই আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করল না। বরং উলটে আমাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল:

'ও কিছু নয়, অমন হয়ে থাকে। যে কারোরই হতে পারে!'

মেয়েরা হুড়োহুড়ি করে এগিয়ে এসে আমার জাঙ্গিয়া সেলাই করে দিতে চাইল। আমি স্রেফ 'না' করে দিলাম। তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখ — তুমি জাঙ্গিয়া ছাড়া বসে থাকবে, আর মেয়েরা ততক্ষণে রিফু করবে তোমার জাঙ্গিয়া! এর চেয়ে ডুবে মরাও ভালো! আমি ছুঁচ সুতো নিয়ে কুটিরে গিয়ে ঢুকলাম। সেখানে আধা-অন্ধকারের মধ্যে আমি অনেকক্ষণ ধরে ঢোক গিলে চোখের জল চাপতে চাপতে, আনাড়ি হাতে ছুঁচ চালাতে গিয়ে আঙুলে ছুঁচ ফুটিয়ে একাকার কাণ্ড করে ফেললাম। হঠাৎ আমার চোখ গিয়ে পড়ল কুটিরের এক কোনায় পাতার আড়ালে সামান্য ঢাকা পড়া একটা বইয়ের ওপর। আমার কৌতূহল হল, ওটা টেনে নিলাম। ব্যাকরণ বই। প্রথমে অবাক হয়ে গেলাম, পরে মনে পড়ে গেল যে রবিন্‌সন দাদুকে ফাঁকি দেবার জন্য বইটা সঙ্গে নিয়েছিল।

ব্যাকরণ বইয়ের ভেতরে গোঁজা ছিল একটা খাতা। খাতাটা খুললাম (আমার এই কৌতূহলের জন্য বন্ধু যেন আমাকে ক্ষমা করে!)। প্রথম পৃষ্ঠায় শুরু

হয়েছে 'রবিন্‌সনের ডায়রী'। তাতে যে কী ছিল তা ইতিপূর্বেই তোমাদের জানা হয়ে গেছে: প্রথম দিনের 'এড্‌ভেঞ্চার' ও 'অপ্রীতিকর ঘটনা'। আমার জানতে আগ্রহ হল 'অতঃপর কী?' পৃষ্ঠা ওলটালাম আর ওলটাতেই আমার চোখ ছানাবড়া। এর পর ছিল অনুশীলনী। প্রায় অর্ধেক খাতা ব্যাকরণের অনুশীলনী লিখে ভর্তি করা — ক্রিয়াপদ, বিশেষ্য, বিশেষণ, এমন কি বিভক্তি ও প্রত্যয়ের ওপর!

অনুশীলনীগুলি লেখা হয়েছে ডায়রীরই মতো — পেন্সিল দিয়ে।

এসবই যে লেখা হয়েছে এখানে, এই দ্বীপে আসার পর, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বটে, এই ব্যাপার!

যে রবিন্‌সন নির্জন দ্বীপে আঠাশ বছর দুমাস উনিশ দিন বাস করবে বলে মনে মনে স্থির করেছে সে কিনা শরৎকালে ফের পরীক্ষায় বসার জন্য তৈরি হচ্ছিল!

ওরে শয়তান! তলে তলে এত! তোর এত অহঙ্কার বলে, সর্দারি আর কর্তৃত্বের এমন ভয়ঙ্কর অহঙ্কার বলে তুই স্বীকার করতে চাইছিস না যে মন দিয়ে ফের পরীক্ষার পড়া তৈরি করছিল, দ্বীপে পালিয়ে এসে সেখানে ব্যাকরণ মুখস্থ করতে লেগে গেছিস। এখন বোঝা যাচ্ছে কেন তুই বেছে বেছে দ্বীপের এই নামটাই বার করেছিস... দাঁড়া দেখাচ্ছি! দাঁড়া না! মজা টের পাবি 'খন!..

তবে হ্যাঁ, 'দেখানো', 'মজা টের পাওয়ানো' — এসব কথাই বা কেন? আমি কি আর ওকে কিছু বলতে যাচ্ছি? আমি কি ওর শত্রু? আমি কি চাই যে ও ফেল করে, আরেক বছর একই ক্লাসে থেকে যায়?

আরে না, না! মোটেই না! আমি ওকে কিছুই বলব না; একটি কথাও না, ঘুণাক্ষরেও না! ও মনে মনে এটাই জানুক যে আমি কোন রকম আঁচ পর্যন্ত করতে পারি নি! ভাবুক, তাই ভাবুক! ব্যাকরণ বই আর খাতাটা আমি চটপট যথাস্থানে রাখলাম, পাতা দিয়ে ঢেকে দিলাম — যেন ছুঁইই নি।

আমার এই আবিষ্কারের ফলে তৎক্ষণাৎ হালকা আর ফুর্তি ফুর্তি ভাব অনুভব করছিলাম — যেন বৃষ্টির পর ঝলমলে রোদ্দুর দেখা দিয়েছে। নিজের

লজ্জা ও অপমানের কথাটা আমার মনে আদৌ ঠাঁই পেল না। প্রফুল্ল মনে জাঙ্গিয়া রিফু করার কাজ সেরে কুঁড়েঘর থেকে যখন বেরিয়ে এলাম তখন আমি সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। আমার মেজাজের পরিবর্তন সকলেরই চোখে পড়ল, এখন ওরা তাই ভরসা পেয়ে হাসতে শুরু করল।

রবিন্সন বলল:

'জাঙ্গিয়া বলে কথা! জাঙ্গিয়া ছাড়া মানুষ মানুষই নয়, জাঙ্গিয়ার ভেতরেই আছে মানুষ, সে মানুষ আবার হাসেও,' এই বলে সে ভালকার দিকে তাকিয়ে হাসল। সে আজ নিজেকে রসিক বলে জাহির করতে চায়।

ওর এই রসিকতা স্থূল হলেও আমি রাগ করলাম না। আমি উদারতাবশত ওকে ক্ষমা করে দিলাম।

'আচ্ছা, এবারে 'যাত্রা হল শুরু,' 'যাত্রা হল শুরু'' — গেয়ে উঠল দলনেতা।

পাইওনীয়ারদের মধ্যে চাঞ্চল্য পড়ে গেল।

আমাদের কাছে ব্যাপারটা এতই আকস্মিক ছিল যে আমি আর রবিন্সন হকচকিয়ে গেলাম।

'কী হল, তোমরা এখুনই চললে নাকি?' আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো।

'চললাম,' দলনেতা বলল। 'অমনিতেই আমাদের দেরি হয়ে গেছে। তোমাদের দ্বীপে থামব বলে আগে থেকে ঠিক ছিল না। আমরা নদীর পাড়ে, খড়ের গাদার পাশে গোরু চরানোর মাঠে রাত কাটাই। কিন্তু সকাল বেলায় লোকে ওখানে চরানোর জন্যে গোরুবাছুরের পাল নিয়ে আসে। আমাদের মেয়েরা অমনিতে জঙ্গীস্বভাবের হলে কী হবে, শিঙওয়ালা বড় বড় জন্তুদের সঙ্গে তাদের তেমন ভাব নেই। তাই তাড়াতাড়ি আমাদের ঘাঁটি পালটাতে হল। সকালের খাবার অবসর পর্যন্ত পাওয়া গেল না... অথচ আজকের মধ্যে আমাদের আন্দ্রিউশভ্কা অবধি যেতে হবে। সন্ধের আগে আগে পৌঁছুতে পারব, কী বল তোমরা?'

'অনায়াসে... অমন নৌকোয় — অবশ্যই,' আমি দৃঢ়স্বরে বললাম।

রবিন্সন বেজার হয়ে চুপ করে রইল।

ইগর, ভালকা, কর্ণধার সাশকো এবং অন্যান্য পাইওনীয়াররা আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বলল:

'চললাম!'

'আসি!'

'তোমাদের ভালো হোক!'

আমরা একে একে সকলের সঙ্গে করমর্দন করলাম। এদিকে ভালকা রবিন্‌সনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল:

'বড় দুঃখের কথা যে আমাদের এখুনেই চলে যেতে হচ্ছে... তোমরা তোমাদের বেআইনী শিকারীকে ধরবে কী করে, আমরা জানতেও পারব না। বড় আগ্রহ ছিল জানার!..'

কথাগুলি সে বলল আন্তরিক দুঃখের সঙ্গে, আমি লক্ষ করলাম আবার আরক্তিম হয়ে উঠল রবিন্‌সন।

'আচ্ছা শোন, এক কাজ করা যায়! তোমরা আমাদের চিঠি লিখো! আমি ঠিকানা দিচ্ছি তোমাদের — বুঝলে?' ভালকা বলল।

'চিঠি লিখো!'

'অবশ্যই লিখো!'

'অবশ্যই লিখো কিন্তু।'

'লিখো! লিখো!' চারদিক থেকে চিৎকার উঠল।

'তা আর বলতে!' কর্ণধার সাশকো সংক্ষেপে বলল।

ভালকা ততক্ষণে নোটবইয়ের পাতায় ঠিকানা লিখতে লাগল।

'এই নাও,' ঠিকানা লেখা কাগজটা রবিন্‌সনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সে বলল। 'দেখো, হারিও না কিন্তু!'

রবিন্‌সন কোন জবাব না দিয়ে নীরবে ঠিকানাটা জামার তলায় ঢুকিয়ে রেখে দিল।

পাইওনীয়াররা তাদের নৌকোয় উঠে বসল।

'বিদায় উপলক্ষে গান শুনিয়ে দেওয়া যাক ওদের!' চেঁচিয়ে বলল ভালকা। 'সাশকো, গান ধর্!'

ওরা গান ধরল।

আমরা অনেকক্ষণ তীরে দাঁড়িয়ে রইলাম। ওরা অনেকক্ষণ হল দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে, কিন্তু তখনও জলার জঙ্গলের ওপর দিয়ে ভেসে আসছে ওদের গান।

মৈত্রীর গান গাই, আমরা তরুণ,
আমরা তরুণ, আমরা তরুণ!
সাধ্য কার, কণ্ঠরোধ করে, সাধ্য কার নাশ করে এরে,
সাধ্য কার, সাধ্য কার নাশ করে এরে!..

...এরপর রবিন্‌সন চুপচাপ জঙ্গলের ভেতরকার ফাঁকা জায়গাটায় ঘাসের ওপর শুয়ে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমিও শুয়ে শুয়ে তাকিয়ে রইলাম। আকাশ এমনই বস্তু যে তার দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকা যায়। তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবা যায়। রবিন্‌সন কী ভাবছিল আমি জানি না, কিন্তু আমি মোটেই আশ্চর্য হলাম না যখন সে হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠল:

'হ্যাঁ, এখন হল কারিগরিবিদ্যার জয়। জিনিসটা মোটের ওপর, অবশ্যই... দারুণ! শোনা যায় বোতামে — রেডিও, সিগারেটকেসে — টেলিভিশন। আর ক্যামেরা — সে ত নখের তলাতেই লুকিয়ে রাখা যায়!'

'আর ঐ যে সেগুলো, সেগুলো ট্র্যানজিস্টরে না সেমিকণ্ডাক্টরে কিসে যেন কাজ করে!' ওকে একথা বলার পর আমি লজ্জায় লাল হয়ে গেলাম।

আমাকে মেরে ফেল আর কেটে ফেল, কাকে বলে ট্র্যানজিস্টর, কাকে সেমিকণ্ডাক্টর সে সম্পর্কে ছিটেফোঁটা জ্ঞানও যদি আমার থাকত! আর রবিন্‌সনেরও অবশ্য সেই একই দশা। আমরা কিছুই জানতাম না। কিছু-না-জানার দলে আমরা... অথচ ইগর জানে।

জানে বৈকি, যখন নিজে রেডিও বানিয়েছে, এই যাকে বলে ট্র্যানজিস্টর, সেই ট্র্যানজিস্টর রেডিও বানিয়েছে...

রবিন্‌সন আরও একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে হঠাৎ বলল:

'ওঃ, কী ভালোই না হত ট্র্যানজিস্টর রেডিওর মতো কোন কিছু বানাতে পারলে! বিশেষ ধরনের একটা কিছু বানাতে পারলে! অসাধারণ আর সাড়া জাগানো কিছু! এই ধর্... যেমন... যেমন, দূর থেকে গোরুদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ। রেডিওর সাহায্যে। দুই শিঙের মাঝখানে বাঁধা থাকবে অ্যান্টেনা। কানের ভেতরে বসানো থাকবে ছোট্ট একটা রিসিভার যন্ত্র (অবশ্যই

ট্র্যানজিস্টরযন্ত্র)... এরকম গোরু চরানোর একটা মজা আছে। সালিভোন দাদুর তরমুজ ক্ষেতে দিব্যি বসে আছিস, ওঃ, কী তরমুজই না সেখানে! বসে বসে আরামসে তরমুজ খাচ্ছিস। তারপর পকেট-টেলিভিশনের দিকে তাকিয়ে দেখলি— তোর মান্‌কা যৌথখামারের জোয়ারের ক্ষেতের ভেতরে ঢুকে গেছে। তবে রে হতভাগা! কিন্তু তাই বলে তুই সোরগোল তুলবি না, জায়গা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে পড়িমরি করে সেখানে ছুটবি না। তুই নিশ্চিন্তে বোতাম টিপবি আর মাইক্রোফোনে বলবি: 'মান্‌কা-আ-আ! ফিরে যা বলছি রে পাজী কোথাকার! গেলি!' মান্‌কাও সঙ্গে সঙ্গে যেন পিঠে চাবুকের বাড়ি খেয়ে তড়াক করে পিছিয়ে গেল। আর তুইও চালিয়ে গেলি তরমুজ খাওয়া... কী দারুণ, বল্ দেখি!'

'ওঃ দারুণ বলে দারুণ! অমন জিনিস করতে পারলে আর দেখতে হত না!' আনন্দে আর কোন ভাষা খুঁজে না পেয়ে আমি বললাম।

রবিন্‌সন একটা হৃদয়বিদারক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল:

'আরে, এই দ্বীপে কি আর ট্র্যানজিস্টর-ফ্র্যানজিস্টরের মতো কিছু করার উপায় আছে...'

আমি ওর কথার খেই ধরে বললাম:

'তা যা বলেছিস! ঠিকই বলেছিস। এই বিতিকিচ্ছিরি দ্বীপটা কারই বা দরকার, শুনি? চল্, বাড়ি চল্। কী বলিস?'

রবিন্‌সন সঙ্গে সঙ্গে ভুরু কোঁচকাল, আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল:

'তুই কি মনে করিস আমার মনের জোর নেই? অ্যাঁ? আমাকে কিনে নিবি ভেবেছিস? সেটি চলছে না!'

'তুই নিজেই ত বললি,' আমি আহত স্বরে জবাব দিলাম।

'কিছুই বলি নি আমি... একবার যখন এই দ্বীপে থাকব বলে ঠিক করেছি ব্যস্, তার পরে আর কোন কথা নেই! ওসব কথা আমাকে বলতে আসবি না...'

একটা উদ্বেগজনক নীরবতা নেমে এলো। এমন নীরবতা দেখা যায় তখনই যখন বন্ধুরা অনুভব করে যে তাদের মাঝখানে কী যেন একটা লুকোচুরি চলছে।

অবশেষে রবিন্‌সন বলল:

'কী করে ক্‌নিশকে ধরা যায় তুই বরং এই নিয়ে ভাবলেও পারতিস।'

আমি আশ্চর্য হয়ে ওর দিকে তাকালাম।

পাইওনীয়ারদের কাছে যখন সে বেআইনী শিকারী ধরার কথা বলে তখন তার মধ্যে সবই ঠিক ছিল: আসলে ত আর তাদের কাছে 'ফের পরীক্ষা' দ্বীপ সম্পর্কে সত্যি কথা বলা যায় না!

কিন্তু এখন... ও কি সত্যি সত্যিই এতটা গুরুত্ব দিচ্ছে নাকি?

'তুই কি — বাস্তবিকই ওকে ধরবি বলে ভাবছিস নাকি?'

'তাছাড়া কী? তুই কি চাস এই জানোয়ারটা অত সহজে পার পেয়ে যায়?'

'তুই বলিস কি রে? খেপেছিস নাকি? ও যে আমাদের স্রেফ ডুবিয়ে মেরে ফেলবে! আমরা, টুঁ শব্দটি করার সুযোগ পাব না।'

'ডুবিয়ে মারবে? তাহলে বন্দুক আছে কী করতে? তুই কি মনে করিস এর জন্যে পুরোদস্তুর ফৌজ আনতেই হবে? আরে ভাই, বন্দুক একটা হেলাফেলা জিনিস নয়। যাকে বলে আগ্নেয়াস্ত্র। গুড়ুম্ — আর দেখতে হবে না, কোন ট্যাঁ ফোঁ নয়। বুঝলি?'

'তুই কি ওকে গুলি করবি ভাবছিস নাকি?' আঁতকে উঠে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'আরে ধুৎ! — সঙ্গে সঙ্গে গুলি করতে যাব কেন? তা করব না, কিন্তু... যদি... মানে, মোটের ওপর বন্দুক দিয়ে অন্তত ভড়কানোও ত যায়। ভয়ে একেবারে কেঁচো হয়ে যাবে...'

'অবশ্যই, অবশ্যই,' আমি চটপট সায় দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বললাম: 'তবে জানিস কি, আমার এখন বাড়ি ফেরা দরকার। দেখছিস ত সূর্য অস্ত যেতে বসেছে। ভয় হচ্ছে মা'র কাছে বকুনি না খাই।'

'আমি কি তোকে ধরে রেখেছি নাকি? যা না,' অসন্তুষ্ট হয়ে বলল রবিন্‌সন। 'তবে কাল ক্‌নিশ আসবে। এদিকে... আমি জানি না... তোর যা খুশি... আমি অবশ্য নিজেই পারি... তুই যখন ভয় পাচ্ছিস... ঠিক আছে।'

'আরে না না, কী যে বলিস?' আমি বললাম। 'কাল আমি আসব। না এসে কি পারি?'

'ভালো হয় যদি সন্ধে নাগাদ আসিস, আর রাতটা যদি কাটাতে পারিস,'

রবিন্‌সন এবার আপসের সুরে বলল। 'ও কাল রাতেই জাল ফেলবে আর খুব ভোরে মাছ ওঠাতে আসবে।'

'রাত কাটানো অবশ্য কঠিন হবে। সে যাই হোক না কেন, কিছু একটা ভেবে বার করা যাবে। কিছু যদি না করা যায় ত পালিয়ে চলে আসব! যদি অবশ্য দৈবাৎ ঘুমিয়ে না পড়ি।'

'মাথার নীচে কাঠের গুঁড়ি রাখিস, কিংবা জামার নীচে ভাঁটুই রাখিস, তাহলে আর ঘুমোতে হবে না।'

'চিন্তা করিস না, সব ভালোয় ভালোয় হয়ে যাবে।'

ওকে চাঙ্গা করার জন্য এই কথাগুলি বলে আমি নৌকোয় চেপে বসলাম।

রবিন্‌সনের মুখ বিষণ্ণ ও কালো হয়ে গেল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে আবার একা একা দ্বীপে থাকার তেমন একটা ইচ্ছে তার ছিল না।

সে হাঁটুজলে নেমে অনেকক্ষণ নৌকোর চারদিকে ঘুরে ঘুরে নৌকোর পাশগুলো হাতড়ে দেখতে দেখতে বলল:

'এই যে এখানে ফেঁসো লাগানো দরকার, এখানে আলকাতরা মাখানো দরকার, তবে মোটের ওপর এই তক্তাটা পালটেই ফেলতে হয়...'

আরও কিছু বলার ইচ্ছে তার ছিল; সে কানের পেছনটা চুলকাল, নাক টানল, শেষে বলল:

'শোন্ রে... তোকে বলি... অন্তত একটা কড়মড়ে যদি নিয়ে আসতিস। বড্ড ইচ্ছে করছে, মরার আগে লোকের যেমন সাধ হয়... তা নয় ত কেবল মাছ আর মাছ...'

আমাদের তল্লাটে এক ধরনের বিস্কুটের নাম এই 'কড়মড়ে' — গাঁয়ের দোকানে বিক্রি হয়। কাঠের মতো শুকনো ঝমঝমে আর শক্ত এই বিস্কুট দাঁতে চিবুতে গেলে কড়মড় আওয়াজ ওঠে।

এরকম একটা কড়মড়ে সারা দিন ধরে খাওয়া যেত। হয়ত এই কারণেই তা আমাদের এত ভালো লাগত।

'ঠিক আছে, নিয়ে আসব, বলছিস যখন অবশ্যই আনব,' এই বলে আমি নৌকো ঠেলে তীর থেকে দূরে সরে গেলাম।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

স্বপনে ও জাগরণে

'খাওয়াদাওয়া না করে সারা দিন কোথায় টো-টো করে ঘুরে বেড়ানো হচ্ছিল শুনি?' মা'র সঙ্গে দেখা হতেই বকুনি খেলাম। 'দেখ দেখি, চোখমুখ বসে গেছে।'

'কী যে বল মা, আমি পেট ভরে মাছের সুপ খেয়েছি। ওঃ, কী দারুণ খেতে হয়েছিল না! সাশকো নামে একটা ছেলে অ্যায়সা ওস্তাদ! — কোন রাঁধুনিই তার কাছে পাত্তা পায় না...' হঠাৎ আমার মুখ ফসকে এমন বেসামাল হয়ে বেরিয়ে এলো যে পাছে আরও কিছু বেরিয়ে পড়ে সেই ভয়ে আমি কোন রকমে মুখ বন্ধ করার অবকাশ পেলাম।

মা তা লক্ষ করে সন্দেহের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন: 'কোন্ সাশকোর কথা বলছিস রে?'

'আরে ঐ যে গো... সাশকো ইউরচিশিন,' আমি তখন উদ্ধার লাভের চেষ্টায় বানিয়ে বলতে শুরু করলাম। 'ঐ যে জান যে যাঁতাকলের পাশে থাকে, মিখাইলো কাকার ছেলে।'

এদিকে মনে মনে ভাবি: 'মা যদি ওকে দিনের বেলায় গ্রামে দেখে থাকেন তাহলে? তাহলেই চিত্তির!..' না, চলে গেল! মা কিছু বললেন না; তার মানে, দেখেন নি।

'মাছে টোপ খেল কেমন, ভালো ত?' স্নিগ্ধ হাসি হেসে মা জিজ্ঞেস করলেন।

'ওঃ! সাঙ্ঘাতিক! ইয়া ইয়া সব ধরা পড়েছিল,' মিথ্যে কথা বলতে আমার মুখ আরক্তিম হয়ে উঠল না। 'ভেবেছিলাম তোমাদের জন্যে নিয়ে আসব, কিন্তু সবটাই রান্না করা হয়ে গেল। আফশোসের কথা। তবে এর পরে ঠিক নিয়ে আসব... আমরা কাল রাতের বেলায় যাব বলে ঠিক করেছি, বড় জলধারায়। যেতে দেবে ত?'

'দেখা যাবে, দেখা যাবে। এখন যা দেখি কাঠ ফাড় গিয়ে, আমার সব লকড়ি ফুরিয়ে গেছে।'

সব ভালোয় ভালোয় কেটে যাওয়াতে আমার আনন্দ হল, আমি লকড়ি ফাড়তে চললাম।

একেবারে সন্ধে অবধি আমি লাট্টুর মতো মা'র আশেপাশে পাক খেতে লাগলাম — কখনও জল আনি, কখনও ঘর ঝাঁট দিই... এত ভালো ছেলে আর হয় না। কী আর করা যাবে — কাল রাতে যাতে ছাড়েন সেটা দেখতে হবে ত! রবিন্‌সন ওখানে অপেক্ষা করবে যে...

আমি এত ছুটোছুটি করেছিলাম যে সন্ধ্যা বেলায় শোবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম, যেন ধপ করে গিয়ে পড়লাম একটা চোরা-গর্তের মধ্যে।

স্বপ্নে আমি যা দেখলাম তা কল্পনারও অতীত। স্বপ্ন ত নয় যেন স্রেফ সিনেমার ছবি। স্বপ্নটা সারা জীবন আমার মনে থাকবে।

'ফের পরীক্ষা' দ্বীপের তীরে আমি দাঁড়িয়ে আছি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি প্রশস্ত জলধারার ওপর দিয়ে ভেসে আসছে একটা জাহাজ, সাদা রঙের বিশাল জাহাজ, সমুদ্রের জাহাজ (অমন জাহাজ আমি কেবল সিনেমায়ই দেখেছি); তিন ডেকওয়ালা, সেখানে আছে সুইমিংপুল, রেস্তোরাঁ আর ভলিবল খেলার মাঠ। চিমনিটা আকারে আমাদের বাড়ির সমান। আমি দেখি আর অবাক হয়ে যাই: সংকীর্ণ জলধারার ভেতর দিয়ে, নলখাগড়ার ঝোপঝাড় ভেদ করে ওটা ভেসে এলো কী করে? কিন্তু যতদূর পারা যায় আশ্চর্য হওয়ার অবকাশ পেতে না পেতেই আমি দেখতে পেলাম জাহাজ থেকে ঝোলানো-সিঁড়ি নেমে এলো আর সেই সিঁড়ি বয়ে তীরে নেমে আসছে... গ্রেবেনিউচকা।

আমার কাছে এগিয়ে এসে বলল:

'নমস্কার! দ্বীপে জার্মান পাইওনীয়ার প্রতিনিধিদল এসেছে। আপনি দোভাষী হবেন।'

আমি বিমূঢ় হয়ে গিয়ে তার দিকে তাকাই, আমার বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল: 'তোর মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? আমাকে 'আপনি' বলছিস যে!' কিন্তু তা না বলে আমি কেন যেন ভদ্রতা করে জবাবে বললাম:

'বড়ই খুশির কথা। তবে কিনা, আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই, আপনি অবশ্য নিশ্চয়ই জানেন যে স্কুলে আমি জার্মান পড়ি না, আমি পড়ি ইংরেজি, তাই জার্মান ভাষা তেমন গড়গড়িয়ে বলতে পারি না। জার্মান ভাষায় আমি জানি

সাকুল্যে তিনটি শব্দ: 'ডেড় টিশ (উহা একটি টেবিল), ডেড় শ্‌টুল (উহা একটি চেয়ার) আর ডেড় ব্‌লিয়াইশ্‌টিফ্‌ট (উহা একটি পেন্সিল)।'

'তাতে কোন অসুবিধে হবে না,' গ্রেবেনিউচকা বলল, 'দিব্যি চলে যাবে। অতিথিদের অভ্যর্থনা জানান। এই হল অতিথিরা।'

আমি তাকালাম, দেখতে পেলাম যে ঝোলানো সিঁড়ি বেয়ে নামছে ইগর, কর্ণধার সাশকো আর ভালকা।

'বটে! তার মানে এরা হল জার্মান পাইওনীয়ার, আমাদের পাইওনীয়ার নয়।'

আমরা দ্বীপের ওপর দিয়ে যেতে যেতে চলে আসি কুঁড়েঘরের কাছাকাছি। কুঁড়েঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে রবিন্‌সন।

'পরিচয় করিয়ে দিই। 'ফের পরীক্ষা' দ্বীপের বড়লাট শ্রীযুক্ত রবিন্‌সন,' আমি বললাম — আমার মনে হল যেন খাঁটি জার্মান ভাষায়ই বললাম; কিন্তু কথাটা বলেই নিজে মনে মনে ভাবলাম: 'ওকে আমি বড়লাট আখ্যা দিতে গেলাম কী করতে? ও কি পুঁজিবাদী নাকি? ও যে আমাদের, সোভিয়েত রবিন্‌সন। বলা উচিত ছিল: 'গ্রাম সোভিয়েতের সভাপতি।' কিন্তু এখানে গ্রাম সোভিয়েত আসবে কোত্থেকে? — এটা ত নির্জন দ্বীপ, আর রবিন্‌সন এখানে একা, একেশ্বর!'

ইতিমধ্যে রবিন্‌সন বলল:

'আসতে আজ্ঞা হোক!'

আমরা কুঁড়েঘরের ভেতরে প্রবেশ করলাম।

প্রবেশ করতে মনে হল কুঁড়েঘর ত নয়, যেন বিরাট একটা আলো ঝলমলে ঘর, সেখানে সবকিছুই সাদা — হাসপাতালের মতো। মাঝখানে, সাদা টেবিলের ওপর রাখা আছে নিকেলের ঝকঝকে ডেকচি।

রবিন্‌সন ওদের বলল:

'ট্র্যানজিসটর-ডেকচি। আপনাআপনিই রান্না হয়ে যায়, আগুন ছাড়াই।'

'বোঝ কাণ্ড! রবিন্‌সনটা দেখাল বটে! শেষ অবধি ভেবে ভেবে ঠিক বার করে ফেলেছে ওটা... ঐ ট্র্যানজিসটরের ব্যাপারটা। অথচ বলছিল কিনা দ্বীপে মাথা খাটিয়ে কিছু বার করার উপায় নেই।

'ডেড় শ্‌টুল?' ভালকা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল।

'ডেড় ব্লিয়াইশ্‌টিফ্‌ট,' আমি জবাব দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে নিজেই অবাক হয়ে যাই এই ভেবে যে দিব্যি দাঁড়াচ্ছে। ভালকা আসলে জিজ্ঞেস করেছিল: 'শুনুন, আপনারা আপনাদের বেআইনী শিকারীকে ধরতে পেরেছেন কি?' জবাবে আমি বললাম: 'অবশ্যই ধরেছি। সব ঠিক আছে। চিন্তা করবেন না।'

কী চমৎকার এই জার্মান ভাষা! একটা শব্দ বলতেই সব বোঝা গেল। পরের বছর স্কুলে বলে কয়ে জার্মান ভাষার গ্রুপে ভর্তি হতে হবে। হতেই হবে। ওতে ভালো ফল করা আর এমন একটা কি! এবারে আমি বুঝতে পারলাম· ভালকা, ইগর, সাশকো — ওরা সবাই কেন ভালো ছাত্র-ছাত্রী।

এমন সময় গ্রেবেনিউচকা আমার সামনে এগিয়ে এসে বলল:

'মহিলাদের জন্যে সব সময় জায়গা ছেড়ে দিতে হয়!' বলেই সে সর্বশক্তিতে আমার বুকে ধাক্কা মারে।

'তা আর বলতে!' শোনা যায় কর্ণধার সাশকোর গলা।

আমি উড়ি, উড়ি, উড়তে উড়তে গিয়ে পড়ি কোথায় যেন কোন্‌ এক খাদের মধ্যে। ধপাস্‌ — সঙ্গে সঙ্গে আমি জেগে উঠলাম। শুয়ে আছি মেঝেতে। কাঁধ ব্যথা করছে। তার মানে, ঘুমের মধ্যে আমি খাট থেকে পড়ে গেছি।

কী বিদঘুটে স্বপ্নই না দেখলাম!

অনেক বেলা হয়ে গেছে। মা-বাবা কাজে চলে গেছেন। টেবিলের ওপর কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল আমার সকালের খাবার আর পড়ে ছিল একটা চিরকুট, যাতে মা গেরস্থালির এটা-ওটা টুকিটাকি কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন আমাকে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে গতকালের আচরণ থেকে মা'র এই ধারণা হয়েছে যে এতে আমি পরম পরিতৃপ্তি পেয়ে থাকি। আমি চোখ মুখ কোঁচকালাম। ভালো হওয়া বড় সোজা কাজ নয়।

দুপুর অবধি আমি কাজে ব্যস্ত রইলাম। তারপর চীনের মহাপ্রাচীরের পর্যবেক্ষণ ঘাঁটির ওপর চড়ে বসলাম বেআইনী শিকারীদের ওখানে কী কান্ডকারখানা হচ্ছে দেখার উদ্দেশ্যে।

ক্‌নিশদের উঠোনে কোন সাড়াশব্দ নেই। ক্‌নিশ-গিন্নি সম্ভবত বাজারে গেছে, আর ক্‌নিশ... ক্‌নিশ নাশপাতি গাছের তলায় শুয়ে ছিল, ঘুমোচ্ছিল। খুব সম্ভব সারা রাত ধরে জাল রিফু করার পর এখন ঘুমের ঘাটতিটা পুরিয়ে নিচ্ছে।

সে হাত দিয়ে রোদ থেকে মুখ আড়াল করে চিত হয়ে শুয়ে ছিল। তার লোমশ হাত আর চওড়া আঙুলগুলোর ওপর যখন আমার দৃষ্টি পড়ল তখন আমার এমনও মনে হল যেন তার আঙুলের আগায় হিংস্র নখর লাগানো। এমন লম্বা, লোমশ আর ভয়ঙ্কর চেহারার এই লোকটাকে যে আমরা কী করে পাকড়াও করব আমার মাথায় ঢুকল না। আমি দেয়াল থেকে নেমে রাস্তায় গেলাম খানিকটা ঘোরাঘুরি করার জন্য। পথে রেন্‌দের বাড়ির উঠোনে উঁকি মারলাম। ভারাভা দাদু রোয়াকে বসে কাস্তেতে শান দিচ্ছিলেন।

'ওঃ দাদু, আপনার প্রিয় নাতিটি যে এখন কোথায় তার কিছুই আপনি জানেন না,' আমি মনে মনে ভাবলাম। 'জানলে এমন নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারতেন না। আজ রাতে মোটেই বলা যায় না ওর ভাগ্যে কী আছে! সত্যিকারের সামরিক অপারেশন। হয়ত গুলিই ছুঁড়তে হবে!'

কিন্তু ভারাভা দাদু মাথা পর্যন্ত ওঠালেন না। উনি যাতে আমাকে দেখতে না পান (বলা যায় না দেখতে পেলেই যদি এটা-সেটা প্রশ্ন শুরু করে দেন) তার জন্য আমি পা টিপে টিপে নিঃশব্দে খোলা গেটের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চললাম। আমার বুকের ভেতরটা অস্থির অস্থির করছিল। হাজার হোক বেআইনী শিকারীকে পাকড়াও করা ছেলেখেলা নয়। এটা কোন ছোট ছেলের মনগড়া ব্যাপার নয়, সত্যিকারের গুরুতর ব্যাপার। বড়দের বললেই বোধ হয় ভালো হত, তাহলে তাদের সঙ্গে... কিন্তু তার অর্থ হবে দ্বীপের গোপন রহস্য ফাঁস করে দেওয়া, রবিন্‌সনকে ধরিয়ে দেওয়া। এর অর্থ বেইমানী, বিশ্বাসঘাতকতা। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা আমি করতে পারব না। কোনমতেই না! না! আর যা বলবে করতে পারি, যে কোন বিপদের মুখোমুখি হতে পারি, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা — কক্ষণও নয়!

'কি রে, ফের অমন মুখ গোমড়া করে চলছিস যে? আবার বুঝি কিছু একটা কান্ড বাধিয়ে মা'র কাছ থেকে উত্তম-মধ্যম খেয়েছিস?' হঠাৎ কানে এলো। মাথা তুলতে দেখতে পেলাম কুয়োর সামনে বালতি আর বাঁক নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গ্রেবেনিউচকা আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। 'তুই একা কেন রে? তোর ফেল করা সঙ্গীটা গেল কোথায়? ঝগড়া করেছিস নাকি?'

'তোর তাতে কী রে মুখপুড়ী?' — এ ধরনের রূঢ় ও অবজ্ঞাজনক কিছু

একটা হয়ত ওকে বলা উচিত ছিল, কিন্তু অমন বলার ইচ্ছে আমার হল না, তাই আমি স্রেফ বললাম:

'ও পেস্‌কিতে মাসীর কাছে গেছে।'

'আর তুই বেচারি কে'দে কে'দে বেড়াচ্ছিস।'

এরকম ক্ষেত্রে আমার অবশ্যই বলা উচিত ছিল: 'তুই নিজেই একটা কাঁদুনে। নিজের নাকের জল মোছ গে,' কিন্তু এবারেও আমি নিজেকে সামলে নিয়ে অকপটে স্বীকার করলাম:

'কাঁদছি না, মন খারাপ লাগছে।'

আমার কাছ থেকে আমার স্বভাববিরুদ্ধ বিনীত উত্তর পেয়ে গ্রেবেনিউচকা সম্ভবত অবাক হয়ে যায়, বিচলিত হয়ে পড়ে। সে সমবেদনার দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল:

'তা তুই স্কুলের মাঠে আসিস না কেন? আমরা ওখানে সব সময় ভলিবল খেলি।'

'আ-চ্-ছা...' আমি তেমন কোন উৎসাহ না দেখিয়ে টেনে টেনে বললাম।

আর হঠাৎই আমার বড় ইচ্ছে হল ওকে দ্বীপের কথা, বেআইনী শিকারী সম্পর্কে, ক্‌নিশ সম্পর্কে, পাইওনীয়ারদের সম্পর্কে, এমন কি আজ আমি যে স্বপ্ন দেখেছিলাম সেটার কথাও বলি। কিন্তু কোন রকমে চেপে গেলাম। এটা যদি কেবল আমার গোপন রহস্য হত, তাহলে সম্ভবত আমি বলতাম। কিন্তু রবিন্‌সন! রবিন্‌সন কখনও ওর জন্য আমাকে ক্ষমা করবে না। কখনও কখনও বিশ্বস্ত বন্ধু হওয়া যে কত কঠিন!

আমি এও ভাবলাম: 'আচ্ছা, গ্রেবেনিউচকা কি কাজাচোক নাচ নাচতে পারে?' তারপর কেন যেন মনে মনে সিদ্ধান্ত করলাম হয়ত বা পারেও...

আমরা যতক্ষণ কথা বলছিলাম ততক্ষণে সে ই'দারার ভেতরে বালতি নামিয়ে দিয়েছে, এবারে দুহাতে চরকি-কলের হাতল ঘুরাতে ঘুরাতে বালতিটা তুলতে লাগল। আমি প্রথমে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম তারপর: 'ধুত্তোর! রবিন্‌সন ত আর দেখতে আসছে না!' — মনে মনে এই ভেবে বললাম:

'দেখি, তোকে সাহায্য করি!'

ও কোন জবাব না দিয়ে হাতলটা ধরে রইল, আমরা দুজনে মিলে ঘোরাতে

লাগলাম। আমরা এত উৎসাহে ঘোরাতে লাগলাম যে বালতিটা ই'দারার দেয়ালের গায়ে ঠোক্কর খেতে লাগল, অবিরাম শোনা যেতে লাগল জল ছলকানোর ছলাৎ ছলাৎ। যখন আমরা টেনে তুললাম তখন জল অবশিষ্ট ছিল মোটে আধ-বালতি। আমরা দুজনে মুখ চাওয়া-চাউয়ি করে হেসে উঠলাম।

'আয় আবার ফেলা যাক।'

এই ভাবে দুজনে মিলে চরকি-কল ঘোরাতে আমার বেশ মজা লাগছিল। আমরা একে অন্যকে ঠেলা দিতে লাগলাম, একবার আমাদের কপালে ঠোকাঠুকি পর্যন্ত লেগে গেল। আমরা সব সময় হাসছিলাম। বালতি যখন ভরতি হয়ে গেল তখন খারাপই লাগছিল।

গ্রেবেনিউচকা বালতিদুটোকে বাঁকে আটকে কাঁধে তুলে নিয়ে দোল খেতে খেতে চলল। আমার মনের গভীরে কোথায় যেন নড়াচড়া করে উঠল এই ভাবনা: ওকে অন্তত বাড়ির ফটক অবধি নিয়ে যেতে সাহায্য করা দরকার... কিন্তু ওটা আর আমার সাধ্যে কুলাল না। আমি কেবল চুপচাপ ওকে দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম, দুনিয়ায় কোন কিছুর লোভেই আমি নির্জন দ্বীপে বাস করতে যাচ্ছি না। এমন কি 'অর্লিওনক' সাইকেল উপহার দিলেও নয়।

'এই রে!' হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল। 'রবিন্‌সন যে কড়মড়ে আনতে বলেছিল! এদিকে দোকান শিগগিরই বন্ধ হয়ে যাবে।'

আর এই সময় আমার মাথায় যেন লাঠির বাড়ি পড়ল — মনে পড়ে গেল: 'আরে! আমার যে একটা পয়সাও নেই! অথচ কড়মড়ে — একশ গ্রামের দাম নয় কোপেক। কী করা যায়? মা বা বাবা ফিরে আসতে আসতে দোকানই বন্ধ হয়ে যাবে।'

গ্রেবেনিউচকা তখন তাদের বাড়ির ফটকের ভেতরে ঢুকছিল।

'এই, শোন্ শোন্!' আমি ওকে চেঁচিয়ে ডাকলাম।

আকস্মিকতার ফলে গ্রেবেনিউচকা চমকে উঠতে তার বালতি থেকে খানিকটা জল ছলকে পড়ে গেল।

'দাঁড়া, একটু দাঁড়া!' বলতে বলতে আমি তার দিকে ছুটে এলাম। 'আমাকে

ন'টা কোপেক ধার দিবি? মা ডেয়ারী থেকে এলেই আমি তোকে ফেরত দিয়ে দেব।'

'কী দরকার রে?' সে আমার দিকে ধূর্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল। 'সিগারেট কিনবি বুঝি?'

'ধেৎ, সিগারেট হতে যাবে কেন? বড্ড দরকার রে... রাতের বেলায় মাছ ধরতে যাচ্ছি। বঁড়শি কিনতে হবে, দোকান আবার এর মধ্যে বন্ধ হয়ে যাবে। মাইরি বলছি, ফেরত দিয়ে দেব। ধার দে।'

'কিন্তু নয় ত আমার নেই, গোটা একটা আধুলি আছে আমার। মা বই কিনতে দিয়েছে। ওঃ, কী দারুণ বইই না বিক্রি হচ্ছে! — 'কন্‌টিকি অভিযান'। ভেলায় চেপে সাগর পাড়ি দেওয়ার বর্ণনা।'

'আমি বাকি খুচরোটা তোকে এনে দিচ্ছি। এক্ষুনি।'

'দাঁড়া, আমি নিয়ে আসি।'

সংক্ষেপে বলতে গেলে, কড়মড়ে আমি কিনলাম। গ্রেবোনিউচকাকে খুচরো এনে দিলাম, আর মা বাড়ি ফিরতে ধারটাও শোধ করে দিলাম। সবই ভালোয় ভালোয় হয়ে গেল। মা'র কাছ থেকে নয় কোপেক বার করার জন্য বেশি পীড়াপীড়িও করতে হল না। সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিলেন। রাতে যাবার অনুমতিও দিলেন। ভালো হয়ে থাকলে, মা'র আদেশ পালন করলে এটাই হয় লাভ! তাছাড়া খাবারদাবারও দিয়ে দিলেন এক থলি বোঝাই — যেন আমি এক মাসের জন্য ভ্রমণে বেরোচ্ছি।

সূর্য অস্ত যেতে আমি জলার জঙ্গলের দিকে যাত্রা করলাম। পথে বার-বারান্দা থেকে বেশ লম্বা মোটা একটা রশিও তুলে নিলাম — ওটা দিয়ে মা কোন এক সময় বাছুর বেঁধে রাখতেন। 'কে জানে বাপু? হয়ত বা বাঁধতেও হতে পারে...' মনে মনে এই কথা ভাবতেই আমার পেটের ভেতরে একটা অস্বাস্তিকর সিরসিরে ভাব অনুভব করলাম।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

'হাত তোল!'

রবিন্‌সন ছিপ হাতে তীরের কাছাকাছি কোমর জলে খাড়া ছিল। খাড়া ছিল সম্ভবত অনেকক্ষণ যাবত, কেননা ইতিমধ্যে সে নীলচে হয়ে গেছে, দাঁতে দাঁত লেগে ঠকঠক করে কাঁপছে।

'আমি ভাবলাম তুই বুঝি আর এলিই না,' রাগে বিড়বিড় করে বলল রবিন্‌সন, কিন্তু আমি দেখতে পেলাম সে তার খুশির হাসি চেপে রাখছে। সম্ভবত তার ভয় হচ্ছিল যে আমি আসব না।

রবিন্‌সন জল থেকে উঠে এসে ওঠ-বস করতে করতে নিজের দুহাতে পিঠ জড়িয়ে ধরে চাপড়াতে লাগল, গাড়োয়ানরা হিমের মধ্যে যেমন করে তেমনি ভাবে গা গরম করতে লেগে গেল। পরে জিজ্ঞেস করল:

'তারপর, ওখানকার সব খবর-টবর কী?.. নতুন কোন খবর আছে?.. আমার দাদুর খবর কী? এখনও থানায় খবর দেয় নি ত?'

'কী যে বলিস! দিব্যি বসে বসে পরম নিশ্চিন্তে কাস্তে শানাচ্ছে। তোকে নিয়ে মোটেই ভাবছে না।'

রবিন্‌সন ভুরু কোঁচকাল, আমি বুঝতে পারলাম এটা শোনা তার কাছে প্রীতিকর নয়। তার সম্ভবত মনে হচ্ছিল যে অনেক অনেক কাল হল সে এই দ্বীপে আছে, অথচ তার অনুপস্থিতি কিনা কারও নজরেই এলো না!

'এটাই ত নিয়ম। ভালো। দেখতে দেখতে সবাই বেমালুম ভুলে যাবে যে আমি বলে কেউ একটা ছিল... সব ঠিক হয়ে যাবে,' স্ফূর্তির ভাব দেখিয়ে সে বলল, কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে শোনা যাচ্ছিল বিষণ্ণতা ও বেদনা। কেই বা চায় যে সকলে তাকে ভুলে যাক!

আমি পকেট থেকে কড়মড়ের মোড়কটা বার করে ওর দিকে বাড়িয়ে দিলাম।

'আরে এনেছিস! ওঃ, কী যে বলব তোকে! ওঃ, কী ইচ্ছেই যে করছিল খেতে!' সঙ্গে সঙ্গে সে বিস্কুটের গায়ে কড়মড় শব্দে দাঁত বসিয়ে দিল।

'তা তুই কী করলি? গতকাল আর আজ সারা দিন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'কী আর করব? ছিপ ফেলে মাছ ধরলাম আর এই অমনি অমনি...'

'আর ডায়রী তুই লিখিস কি?'

'ন্-না, লিখি না,' কড়মড়ে চিবোতে চিবোতে সে হালকা সুরে বলল। 'ছেড়ে দিয়েছি। এ যে পড়া তৈরি করারই সামিল! এর জন্যেই কি আমি নির্জন দ্বীপে পাড়ি দিলাম?'

আমি কোন জবাব দিলাম না: এদিকে আমি ত জানিই ওর ডায়রীতে কী আছে।

'শোন্, আয় ডাংগুলি খেলা যাক। কত দিন যে খেলি নি!' হঠাৎ রবিন্সন বলল।

'এ আর কী আছে? খেলা যেতে পারে,' আমি রাজী হয়ে গেলাম।

বুড়ো পাতিহাঁসের দল, ড্যাবডেবে-চোখ ব্যাঙের, চটপটে নলখাগড়া এবং জলার জঙ্গলের আর সব বাসিন্দা সম্ভবত জীবনে এই প্রথম শুনতে পেল ডাংগুলি খেলার খটাখট আওয়াজ আর চিৎকার চেঁচামেচি।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসা পর্যন্ত আমরা খেললাম। খেলা ছাড়লাম একমাত্র তখনই যখন ডাংগুলির ডান্ডা ও গুলি কোনটাই আর চোখে পড়ে না।

আমরা যখন খেলছিলাম তখনই অন্ধকার যত ঘনিয়ে আসতে লাগল ততই বেশি করে দুশ্চিন্তা আমার ওপর এসে ভর করল। আমি অবশ্য চেষ্টা করলাম রবিন্সনের কাছ থেকে আমার মনের এই অবস্থা গোপন রাখতে, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে বিশ্রী রকম একটা অনুভূতি ভেতরে ভেতরে আমাকে যন্ত্রণা দিতে লাগল। আর যখন পুরোপুরি অন্ধকার নেমে এলো ততক্ষণে আমার অবস্থা হয়ে দাঁড়াল যাকে বলে সঙ্গীন: আমি কোন রকমে নিজেকে সংযত রাখছিলাম যাতে দাঁতে দাঁত লেগে না যায়...

'এই ত এবারে সব চুপচাপ, আর কোন সাড়াশব্দ নেই এবারে। শিগগিরই ও আসবে, জাল ফেলবে, আর তখনই...' রবিন্সন ফিসফিস করে বলল। এই 'তখনই' কথাটাই কিন্তু আমাকে সবচেয়ে বেশি ভয় পাইয়ে দিল।

রাতটাও যেন আমাদের ভোগান্তির জন্যই আবার হয়ে এলো মেঘে ঢাকা, আকাশে একটিও তারা নেই।

'প্ল্যানটা হল এই রকম,' রবিন্সন ফিসফিসিয়ে বলল। 'আমরা নৌকো থেকে

ওকে প্যাকড়াও করব। আমি বসব নৌকোর পেছন দিকে বন্দুক হাতে, আর তুই বসবি সামনের দিকে টর্চ হাতে। আমি বলব: 'হাত তোল!' এই সময় তুই টর্চ জেবলে আলো ফেলবি, চিৎকার করে বলবি: 'কমরেড ভালিগুরা, ডান দিকে চলে আসুন, নিকোলাই পাভলভিচ, আপনি চলে আসুন বাঁ দিকে...' যাতে ওর মনে হয় যে আমরা সংখ্যায় অনেক। সত্যিকারের সীমান্তরক্ষীরাও এমন করে থাকে স্পাই ধরার সময়।'

'আর... আর তারপর, ওকে ধরার পর আমরা কী করব?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'কী করব মানে?.. মিলিশিয়ার হাতে দিয়ে দেব। কমরেড ভালিগুরার হাতে দিয়ে দেব।'

'তার মানে তুই তোর দ্বীপ ছেড়ে দিবি, রবিন্সন আর হবি না? সব গোপন রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে যে...'

ওঃ, কী কুক্ষণেই এই কথাটা আমি বলতে গেলাম!

'না, কোনমতেই নয়!' রবিন্সন চাপা গলায় স্পষ্টাস্পষ্টি বলল। 'আমি দ্বীপে থেকে যাব। তুই ওকে মিলিশিয়ার কাছে নিয়ে যাবি।'

আমার অবস্থা রীতিমতো কাহিল।

'আরে তা কেন... সে কী করে হবে?.. কী যে বলিস?..' আমি আমতা-আমতা করে বললাম।

'ভারী আমার কাজ! কমরেড ভালিগুরার কাছে নিয়ে যাবি — ব্যস্।'

'কিন্তু ভালিগুরা যে তখনও ঘুমিয়ে থাকবে,' আমি কাঁদো কাঁদো হয়ে বলি। 'এই ডাকাতটাকে নিয়ে আমি একা রাতে সামাল দেব কী করে? ও যে আমাকে গলা টিপে মেরেই ফেলবে।'

'ভয় পাস নে। আমি তোকে বন্দুক দেব। পরে ফেরত নিয়ে আসবি।'

'দ্-দরকার নেই! দ্-দিস্ না!' এবারে আমি চাপা গলায় সাফ কথাটা ওকে বলে দিলাম। 'আমার ভ্-ভয় করছে। ক্নিশের চেয়ে আমার বেশি ভয় বন্দুককে। বলা যায় না, যদি হঠাৎ গুলি করে বসি, ওকে খুন করেই ফেলি, তাহলে ত নির্ঘাত আমাকে গুলি করে মেরে ফেলার সাজা হবে...'

আমি এবারে বেশ বুঝতে পারলাম যে রবিন্সনের প্ল্যান-ট্যান কিছুই ছিল

না। সে কেবল ভেবে রেখেছিল ঐ মুহূর্তটা অবধি, যখন বলবে: 'হাত তোল!' আর কুনিশ নৌকোর মধ্যে টাল খেতে খেতে হাত তুলে দাঁড়িয়ে পড়বে। দেখা যাচ্ছে এর পর আর সবই করতে হবে আমাকে। সেটি হচ্ছে না!

'না, তা চলবে না! যাই বলিস না কেন, আমি একা কুনিশকে নিয়ে যাচ্ছি না...'

'আচ্ছা আচ্ছা, হয়েছে! অত ঘ্যানঘ্যান করার কী আছে রে বাবা! গাঁ পর্যন্ত দুজনে মিলে নিয়ে যাব, তারপর আমি ফিরে আসব। জানতাম না যে তুই এত ভীতু!'

আমার লজ্জা করতে লাগল। রবিন্‌সনের সাহস আমার চেয়ে অনেক বেশি। ওঃ, মনের কী জোর, দেখ! আমি ঠিক করলাম, না নিজেকে সংযত রাখতে হবে।

কয়েক মিনিট আমরা চুপচাপ। এমন সময় শুনতে পেলাম একটা মৃদু সরসর আওয়াজ। তারপর — ঝপাং!.. আর তারপর ছলাত-ছলাত!.. আমরা আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। সন্দেহ নেই যে কুনিশ জাল ফেলছিল।

আমরা দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। অবশেষে নেমে এলো সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা। কুনিশ চলে গেল। আমরা আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। নিস্তব্ধতা। সাড়াশব্দ নেই। কুনিশ নেই।

'আচ্ছা, এবারে নৌকোয় চেপে বসা যাক, ওত পাততে হবে,' রবিন্‌সন ফিসফিসিয়ে বলল।

ও বন্দুকে গুলি ভরল, টর্চটা আমাকে দিল। আমরা নৌকোয় চেপে বসে তীর ঘেঁষে চললাম।

'এই ত আছে!' আমি ফিসফিস করে বললাম। আমি নৌকোর সামনের দিকে বসেছিলাম, তাই প্রথম দেখতে পেলাম জলের ওপর সাদা সাদা ভেসে আছে মাছ ধরার জালের কাঠি।

আমরা নৌকো ঠেলে নিয়ে জালের কাঠিগুলির ঠিক মুখোমুখি নলখাগড়ার ঝোপের মধ্যে রাখলাম। লুকিয়ে রইলাম। এখন আমাদের কাজ হল একটাই — অপেক্ষা করা, বহুক্ষণ অপেক্ষা করা, এমন কি হয়ত বা সারা রাত, ভোরের আলো না ফোটা পর্যন্ত, যতক্ষণ না কুনিশ মাছ তুলতে আসছে।

'ঘুমোনো চলবে না। এক মিনিটের জন্যেও নয়। ঢুলুনি শুরু হয়ে গেলে আর দেখতে হবে না — ঘুমে কাদা হয়ে যাব, তখন আমাদের সব ভেস্তে যাবে,' রবিন্‌সন বলল।

'ঠিকই বলেছিস,' আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম। এখনই আমার ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল।

দুচোখ বিস্ফারিত করে আমি নিরীক্ষণ করতে লাগলাম অন্ধকারের মধ্যে, যেখানে আকাশের পটভূমিকায় নলখাগড়ার ঝোপের দেহরেখা কোনমতে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল; কিন্তু চোখ আপনাআপনিই বুজে আসছিল, থেকে থেকে জলে হাত চুবিয়ে নিয়ে চোখ রগড়াতে হচ্ছিল।

ঘুম যখন পায় তখন না ঘুমিয়ে থাকার চেয়ে কঠিন সম্ভবত আর কিছুই নেই। আধাঘুমন্ত অবস্থায় অন্ধকারের মধ্যে অপেক্ষা করে থাকার ক্লান্তিকর মুহূর্তগুলির চেয়ে দীর্ঘ সময়ও সম্ভবত আর হয় না।

'ঘুমোস নে, তাহলে কিন্তু ফসকে যাবে,' নৌকোর পেছন দিক থেকে ফিসফিসিয়ে বলে অদৃশ্য রবিন্‌সন।

ও যদি জানত ঠিক এই ফসকানোর কী ইচ্ছেই না হচ্ছে আমার! কিন্তু ওর সঙ্গে, অমন ঝানু লোকের সঙ্গে থাকলে ফসকানোর কি আর উপায় আছে! আচ্ছা, ও কি সত্যি সত্যিই ভয় পায় না?

কল্পনায় আমি দেখতে পাই ভয়ঙ্কর দৃশ্য: কুনিশ দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বৈঠা দিয়ে আমার মাথায় দড়াম করে বাড়ি মারল, আমি নৌকো থেকে পড়ে গিয়ে জলে হাবুডুবু খাই, আমার হাত-পা শেওলায় জড়িয়ে যায়... সত্যি কথা বলতে গেলে কি, নিশ্বাস নিতে পর্যন্ত কষ্ট হচ্ছে আমার। এই ঝামেলার মধ্যে যাবার কোন্ দরকার ছিল বাপু! বাস্তবিকই, কী যে ঘটতে পারে কে জানে! আচ্ছা, এইমাত্র আমি যেমন ভাবলাম তেমন যদি ঘটে!.. আমাদের লাশ যদি লোকে খুঁজে পায় তাহলে ভালো বলতে হবে। তখন জাঁকজমক করে আমাদের কবর দেওয়া হবে, বাজনা বাজবে, লোকে সভা করে বক্তৃতা দেবে। এই উপলক্ষে এসে জমায়েত হবে গোটা স্কুল, গ্রামের সবাই। সকলেই কাঁদবে। আর গ্রেবেনিউচকা চোখের জলের বন্যায় গাল ভাসিয়ে দিয়ে বলবে: 'আমি যে আগের দিনই ওকে দেখেছিলাম! ও ছিল ভালো ছেলে, বড় ভদ্র — কুয়ো থেকে জল তুলতে আমাকে সাহায্য

করেছিল। আমি ওকে নয় কোপেক ধারও দিয়েছিলাম। জানলে আমি ওকে গোটা আধ্‌‌‌লিটা একেবারেই দিয়ে দিতাম। কী ভালো ছেলেই না ছিল!'

নিজের জন্য আমার এত কষ্ট হতে লাগল, নিজেকে আমার এমন হতভাগ্য মনে হল যে আমার গলার ভেতরে দলা পাকিয়ে কী যেন একটা ঠেলে উঠতে থাকে।

কিন্তু রবিন্‌সন এসবের কিছুই বোঝে না। সে আবার পেছন দিক থেকে ফিসফিস করে:

'ঘুমোস নে!'

এদিকে আমি শোচনীয় কণ্ঠে ফিসফিসিয়ে জবাব দিই:

'না না, ঘুমোচ্ছি না, ঘুমোচ্ছি না, কী যে বলিস!'

সময় কেটে যেতে থাকে।

অন্ধকারে চোখ অভ্যস্ত হয়ে আসার দরুনই হোক বা অন্ধকার ক্রমে ফিকে হয়ে আসার দরুনই হোক, নলখাগড়ার ঝোপঝাড় এখন অনেক ভালো চোখে পড়ছে, জল চিকচিক করছে আর আকাশে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা যাচ্ছে। ভোরের আলো ফুটে উঠল নাকি?.. আমার যেন মনে হচ্ছে যে আমরা দুজন অনাদি অনন্তকাল বসে আছি।

এমন সময় মনে হল কেউ যেন ধারাল কিছু একটা আমার বুকে বিঁধিয়ে দিল। অন্ধকারের ভেতর থেকে ভুস্‌ করে বেরিয়ে এলো একটা নৌকো। নৌকোটা ভেসে আসছিল সোজা আমাদের দিকে। কাছে, ক্রমেই কাছে চলে আসছে। নৌকোর ভেতরে একটা ভয়ঙ্কর মূর্তি বসে বসে ঝপাঝপ দাঁড় ফেলছে। কুনিশ!

আমার হৃৎপিণ্ড যেন একটা সূক্ষ্ম সুতোয় ঝুলছে — ছিঁড়ে পড়ে গেল বলে। আমি দুহাতে নৌকোর সামনের দিকটা জড়িয়ে ধরলাম, কোন রকম নড়াচড়া করি না।

এই সময় সজোরে বন্দুকের ঘোড়া ধরে টানার খুট্‌ আওয়াজ তুলে বিদ্‌ঘুটে ভাঙা ভাঙা হেঁড়ে গলায় সর্বশক্তিতে চেঁচিয়ে উঠল রবিন্‌সন:

'হাত তোল!'

আমি টর্চের কথা ভুলে গেলাম, আমাকে যে চেঁচাতে হবে সে কথা ভুলে গিয়ে আতঙ্কিত হয়ে হাউমাউ করে বললাম:

'ও মিলিশিয়াচাচা এই হেথা! ও মিলিশিয়াচাচা ওই হোথা!'

আর নিজের কণ্ঠস্বরেই ভয় পেয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলাম।

'হাত তোল! হাত তোল!' দ্রুত উচ্চারণ করল রবিন্‌সন, কিন্তু এবারে আর তার কণ্ঠস্বর তেমন হেঁড়ে শোনাল না। শেষ অবধি সেও ভেবাচেকা খেয়ে চুপ করে গেল।

কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা, তারপর...

'অ্যা?' যেন ভালোমতো শুনতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করল 'ভয়ঙ্কর মূর্তিটি'। সঙ্গে সঙ্গে... আমাদের নৌকোর পাটাতনের ওপর ঠক করে কিসের যেন একটা আঘাতের শব্দ হল — রবিন্‌সনের হাত থেকে বন্দুক পড়ে গেল। আর আমি ঘটনার আকস্মিকতায় আকাশজোড়া হাঁ করলাম। মাত্র তখনই টর্চের কথা মনে হয়ে যেতে আমি হাতলে চাপ দিয়ে আলো বার করতে লাগলাম।

আমাদের সামনে... ভারাভা দাদু।

'দাদু, আপনি?' হতভম্ব হয়ে মিনমিনে গলায় শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করল রবিন্‌সন।

'হ্যাঁ আমি, আমি,' দাদু আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বললেন।

'চিনতে পারিস নি, না? তোদের ব্যাপার-স্যাপার কী শুনি? নাতি বুঝি শেষকালে ডাকাতের দলে ভিড়েছে? অ্যাঁ? লোকজনের দিকে বন্দুক তাক করা? বিদ্যের বেলায় ত ঠনঠন, তাই বুঝি ডাকাতের দলে ভিড়েছিস?..'

'কী যে বলেন দাদু?' রবিন্‌সন চিঁচিঁ করে বলল। 'এমন কথা বলবেন না। ডাকাত-টাকাতের কথা কেন? একবার চেয়েই দেখুন না। অ্যাই পাভেল, আলোটা জ্বালা ত।'

আমি টর্চটা চেপে ঝিকঝিক আওয়াজ তুললাম। আমি এখন সারা রাত ঝিকঝিক করে টর্চ টিপে যেতে রাজী আছি — এতই উল্লসিত হয়ে পড়েছিলাম ভারাভা দাদুকে দেখতে পেয়ে। আমি তাকে স্রেফ চুমো খেতে রাজী। কোথায় গেল আমার আতঙ্ক — যেন গোরুতে জিভ দিয়ে চেটে সাফ করে দিয়েছে। ভারাভা দাদু যখন আছেন তখন দুনিয়ায় কাউকে আমি ডরাই না। আমি টর্চের আলো জালের কাঠিগুলির উপর ফেললাম।

'বটে,' দাদু বললেন, 'দেখতে পাচ্ছি। জাল। তার মানে তোরা ডাকাত নোস, তোরা হলি বেআইনী শিকারী... আনন্দের কথা!.. ঐ একই হল, কেবল এ-পিঠ আর ও-পিঠ।'

'কী যে বলেন দাদু! এটা আমাদের কাজ নয়, আমাদের জাল নয় এটা। কুনিশের কাজ। আমরা ওর ওপর নজর রেখেছি, ওকে পাকড়াও করতে চাই।'

'আচ্ছা, এই তাহলে ব্যাপার! কুনিশ? তোদের ভুল হয় নি ত?'

'আরে না না, আমাদের স্বচক্ষে দেখা!' এবারে আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। 'ওকে জাল ফেলতে দেখেছি, একবার জাল থেকে মাছ তোলার জন্যে কুনিশরা... কর্তা-গিন্নি দুজনে এসেছিল তাও দেখেছি।'

'তাহলে অবশ্য অন্য ব্যাপার। তোদের সাবাস বলতে হবে। তবে এখনই ওর অপেক্ষা করে কাজ নেই। ও আসবে সকালের দিকে, তিনটে-চারটে নাগাদ। এখন বারোটাও নয়।'

'বলেন কি!' আমি অবাক।

'তোদের কি মনে হল এর মধ্যে রাতই কেটে গেছে? অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছিস নাকি তোরা?'

'সেই সন্ধ্যার অন্ধকার থেকে।'

'আহা বেচারিরা! ঘুমোস নি। তাহলে তোরা শুয়ে পড়। আমি পাহারা দেব 'খন, এই যখন ব্যাপার। পরে তোদের জাগিয়ে দেব।'

'কী যে বলেন? — আমার মোটেই ঘুম পাচ্ছে না,' বড়াই করে বলল রবিন্‌সন।

'আমারও,' বাধ্য হয়ে আমিও বললাম।

'দেখিস কিন্তু,' দাদু নির্বিকার কণ্ঠে এই কথা বলে সাবধানে নিজের শালতিটা আমাদের নৌকোর পাশে নলখাগড়ার ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঠেলে আনতে লাগলেন।

আমরা চুপ করে রইলাম। রবিন্‌সন স্পষ্টই ভয়ে ভয়ে অপেক্ষা করছিল কখন দাদু জিজ্ঞেসাবাদ শুরু করে দেন। কিন্তু দাদু কোন কথাবার্তা না বলে নিজের শালতিটাকে নলখাগড়ার ঝোপের মধ্যে আড়াল করে রাখলেন। এরকম ক্ষেত্রে সর্বদাই নিজে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কিছু জিজ্ঞেস করা ভালো। রবিন্‌সনও তাই শেষ পর্যন্ত ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল:

'আপনি এখানে কী করে এলেন, দাদু?'

'ডুবে মরার জন্যে এসেছি। শোকে দুঃখে। আমার ন্যাতিটা যে উচ্ছন্নে গেল!'

'না না দাদু, ঠাট্টা না করে বলুনই না।'

'হুঃ, তোর সঙ্গে ঠাট্টা করতে আমার বয়েই গেছে!'

'বলুনই না দাদু,' রবিন্‌সন ঘ্যানঘ্যান করতে লাগল।

'তুই যে আমাকে গুচ্ছের মিথ্যে কথা বললি, তোকেই বা আমি সত্যি বলতে যাব কোন্ দুঃখে?'

'না, মানে আমি...' রবিন্‌সন থতমত খেয়ে বলল। কীই বা তার বলার আছে?

'এঃ-হে-হে,' দাদু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বিষণ্ণ স্বরে বললেন। 'কোন্ চুলোয় আর আমার যাবার আছে? তোকেই খুঁজতে বেরিয়ে ছিলাম রে আহাম্মক!.. আজ দিনের বেলায় নিজের বন্দুকটা সাফ করতে গিয়েছিলাম। রবিবার ত শিকারের মরসুম শুরু হতে যাচ্ছে। ঠিক করলাম, তোরটাও সাফ করা যাক। মনে মনে ভাবলাম, ফেল করা ছেলে বটে, তবু দুঃখ হয় বৈকি! — তোকে শিকারী বানাতেই হবে। খোঁজ করতে গিয়ে দেখি তোর বন্দুকটা নেই। এদিক-ওদিক, বাড়ির সর্বত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম — নেই। ভাবলাম তাহলে কি চুরি হয়ে গেল? তারপর দেখি কার্তুজও প্রায় অর্ধেক নেই। আরে মুর্খ, ওগুলো যে আমার গোনা থাকে। মনে মনে আন্দাজ করতে লাগলাম কোথায় যেতে পারে। তায় আবার চেয়ে দেখি

যে তুলো ঠাসা কোর্তাটা পরে তুই আমার সঙ্গে শিকারে যেতিস সেটাও নেই... যাই হোক শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম ব্যাপারটা যাচাই করে দেখতে হয়। যেতে হল সেই পেস্‌কিতে, তোর হান্না মাসীর কাছে... এই বুঝি আমার বুড়ো পাদুটোর ওপর তোর দরদের নমুনা! যেতে সাত কিলোমিটার, আসতে সাত। সেখানে যথারীতি তোর সন্ধান পাওয়া গেল না। হান্নাকে কিছু বললাম না, পাছে চিন্তিত হয়ে পড়ে। ভাবলাম, হতভাগা ছোঁড়াটা নির্ঘাত জলার জঙ্গলে গেছে, আর কোথাও হতে পারে না। ছোটবেলায় একবার আমি নিজেই পালিয়ে গিয়েছিলাম। পেস্‌কি থেকে যখন ফিরে এলাম ততক্ষণে সন্ধে হয়ে এসেছে। সকাল অবধি তালাস স্থগিত রাখা দরকার, কিন্তু মনে কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না। হাজার হোক জলার জঙ্গল — ছেলেখেলা নয়। বহু ফাশিস্তের সমাধি হয়েছে ওখানে। ভাবলাম, বাড়িতে বসে না থেকে বরং খুঁজতেই বের হই। বেরিয়ে পড়লাম। শেষকালে এই ত...'

দাদু হয়ত দারুণ গালাগাল করবেন, এমন কি কানও মলে দিতে পারেন — সচরাচর যেমন করে থাকেন — এসবই আমাদের কাছে ছিল প্রত্যাশিত। কিন্তু দাদু যে এমন সাধারণভাবে, সরল মনে কথা বলবেন, তা অবশ্যই আমাদের ধারণার বাইরে ছিল।

আমরা চুপ করে গেলাম, কোন কথা বলতে পারলাম না।

'ওঃ, তুই কি মনে করিস আমি মরার আগে দেখে যাব না মানুষ হওয়ার সম্ভাবনা তোর আছে কিনা?' দাদুর কণ্ঠস্বরে বেদনার আভাস।

'অমন কথা বলবেন না দাদু, আপনি মরবেন না,' ভয় পেয়ে গিয়ে চিঁচিঁ করে বলল রবিন্‌সন।

'তুই কি ভাবলি দাদু চিরকাল বেঁচে থাকবে?.. নব্বই ত ছুঁই ছুঁই! আর দেরি নেই — মাথা নীচের দিকে করে ঝপাং করে গিয়ে পড়ব কবরে। আর বেশি দিন অপেক্ষা করতে হবে না...'

'এমনও ত হতে পারে যে আমি আপনার চেয়ে আগে মরব। মনে আছে, আমার পায়ে কী রকম ফোঁড়া হয়েছিল, একশ চার ডিগ্রী জ্বর উঠেছিল... তাই, আর বলবেন না।'

'আরে ছেলে, একটা নিয়ম ত আছে: কমবয়সীরা মরতে পারে, কিন্তু

বুড়োদের মরতেই হবে... এটাই রীতি। তাই বলি কি, এ ব্যাপারে পাল্লা দিয়ে কাজ নেই। দিতে হয়, অন্য কোন ব্যাপারে দিস।'

নীরবতা নেমে এলো। বোঝা গেল দাদুর কথাগুলি আমার বন্ধুকে খুবই ব্যথিত ও আলোড়িত করে তুলেছে। আমারও অবশ্য সেই অবস্থা। দাদুকে এরকম অবস্থায় এর আগে আর কখনও দেখি নি। চিরকাল বকবক করেন, গালাগাল করেন, এমন কি মাথার পেছনে চড়চাপড়ও মারেন, আর আজ কিনা... না, এর চেয়ে কানমলা খাওয়াও ভালো...

'দাদু,' করুণস্বরে বলল রবিন্‌সন 'মাকে বলবেন না কিন্তু। আপনার পায়ে পড়ি। বলবেন না ত?'

'বলার আর কী আছে? বললে কি সে খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠবে?'

'আমি ব্যাকরণ পড়া তৈরি করছি, সত্যি বলছি পড়া তৈরি করছি। আমি ফের পরীক্ষা দেব, দিয়ে প্যাশ করব।'

'দেখা যাবে 'খন... এবারে শুয়ে পড় দেখি তোরা, একটু ঘুমিয়ে নে। নইলে ঠিক দরকারের সময়টায় কেঁচো হয়ে পড়ে থাকবি। আরও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।'

'আর আপনি? বরং আপনি একটু ঘুমোন। আমরা পাহারায় থাকব।'

'হয়েছে, হয়েছে!' গজগজ করে বললেন দাদু। এ হল দাদুর সেই অভ্যস্ত 'হয়েছে, হয়েছে'। এটা শোনার পর আমাদের মন অনেকটা হালকা হয়ে গেল।

রবিন্‌সন আর তর্কাতর্কি না করে বাধ্য ছেলের মতো শোয়ার তোড়জোড় করল। বলাই বাহুল্য, আমিও।

মাথাটা রাখতে না রাখতে নিদ্রা এসে আমার ওপর ভর করল।

মনে হল যেন এক মিনিটও ঘুমোই নি, এমন সময় কে যেন আমার কাঁধ স্পর্শ করল। আমি চোখ খুললাম আর সঙ্গে সঙ্গে আমার ঠোঁটের ওপর অনুভব করলাম দাদুর কড়াপড়া আঙুলের ছোঁয়া। তক্ষুনি বুঝে নিলাম যে চুপচাপ থাকা দরকার।

ইতিমধ্যে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে, ভোরের আগের মুহূর্তের ছায়া ছায়া অন্ধকারের মধ্যে আমি দেখতে পেলাম রবিন্‌সন নৌকোর পেছন দিকে বসে বসে ঘুমজড়ানো চোখে পিটপিট করে তাকাচ্ছে। আমি সন্তর্পণে

মাথা তুলে প্রশস্ত জলধারার দিকে তাকালাম। কুনিশ নৌকোয় বসে বসে জাল থেকে মাছ তুলছিল। কুনিশ-গিন্নি ছিল না। নৌকোর পাটাতনের নীচে বিশাল বিশাল রুই-কাতলা মৃগেল ভিজে জবজবে অবস্থায় ছটফট করছিল। প্রচুর মাছ ধরা পড়েছে!

'চল্ রে ছোঁড়ারা,' ফিসফিস করে বলে দাদু জোরে কেশে উঠলেন: 'খক্-খক্!'

কুনিশ চমকে উঠল, সে জড়সড় হয়ে মাথাটা দুই কাঁধের মাঝখানে টেনে নিল।

দাদু ধীরেসুস্থে সন্তর্পণে নিজের শালতি নলখাগড়ার ঝোপ থেকে বার করে আনলেন, আমরাও চললাম তার পেছন পেছন।

'মঙ্গলময় ভগবান সহায় হোন মানুষের,' কুনিশের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে শান্তস্বরে দাদু বললেন।

'হি-হি... ন্-নমস্কার,' বোকার মতো দাঁত বার করে বলল কুনিশ। 'ওঃ, কী ভয়টাই না পাইয়ে দিয়েছিলেন দাদু! আমি ত ভাবলাম কী না কী — ভগবানই জানেন। হি-হি।'

'মাছ ধরছ?' আগের মতোই শান্তস্বরে বললেন দাদু।

'হুঁ...' কুনিশ তার জায়গায় দাঁড়িয়ে উসখুস করতে করতে বলল। 'দেখুন, কত! একেই বলে শিকার! এমন কি নিজেও আশা করি নি... এই যে এখানেও পাওয়া যাবে। ঠিক আপনার কথাই আমি ভাবছিলাম। ভাবলাম দাদুকে অবশ্যই সবচেয়ে ভালো ভালো মাছ দিয়ে আসব। তা ভালোই হল দেখা হয়ে গিয়ে। নিন না যেটা যেটা আপনার খুশি। এই যে এই পাইক মাছটা, এই মৃগেলগুলো আর এই এটা... কোথায় তুলে দেব বলুন?'

কুনিশ সবচেয়ে বড় পাইক মাছ তুলে নিয়ে ততক্ষণে ঝুঁকে পড়েছে দাদুর শালতির ভেতরে ছুঁড়ে দেবার উদ্দেশ্যে, কিন্তু দাদু ঝট করে ধাক্কা দিয়ে তার হাতটা সরিয়ে দিতে মাছ ঝপাং করে গিয়ে পড়ল জলে — চারদিকে উড়ে পড়ল কেবল জলের ছাঁট।

'পাততাড়ি গুটিয়ে চল হে,' দাদু কঠিন স্বরে বললেন।

'কোথায়? কী হল? কী যে তামাসা করেন... হি-হি,' আবার দাঁত বার করল কুনিশ।

'পাততাড়ি গুটিয়ে চল, বললাম কী!' দাদু আবার বললেন।

'কী বলছেন, কী আপনি? এসব কেন? আপনি কি সত্যি সত্যিই বলছেন? আরে দাঁড়ান, দাঁড়ান... আপনি যদি বলেন মাছের অর্ধেক বখরা আপনাকে দিতে পারি। গেলাসের ব্যবস্থাও করব আপনার জন্যে। ছেলেদের মিঠাই কিনে দেব।'

'এঃ, তুই কিনা আবার মানুষ! কী করতে তুই এই দুনিয়ায় বেঁচে আছিস জানি না। কেবল হাওয়া বিষোচ্ছিস আর খাবার জিনিস নষ্ট করছিস... চল্, চল্!'

আমরা চুপচাপ নৌকোয় বসে বসে কেবল দেখে যাচ্ছিলাম। কী আশ্চর্য! দাদু যে মোটেই ভয় পাচ্ছেন না দেখছি! বন্দুক-টন্দুক কিছুই ত সঙ্গে নেই! এদিকে কুনিশ — সে ত ইয়া তাগড়াই! একবার ঠেলা মারলেই দাদুর দফা-রফা হয়ে যাবে, জলের ওপর বুড়বুড়ির মতো। কিন্তু কুনিশের অবস্থা তখন মার খাওয়া কুকুরের মতো। এমন কি মনে হচ্ছিল ওর যেন লেজ আছে আর সেই লেজ সে গুটিয়ে রেখেছে। আর চোখের দৃষ্টিও একদম কুকুরের মতো। সে চটপট জাল গুটিয়ে নিতে নিতে কোন কথা না বলে এমনভাবে দাদুর দিকে তাকাচ্ছিল যেন একটা কুকুরছানা দুষ্কর্ম করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে।

কিন্তু দাদু কোন দয়ামায়া দেখালেন না। কুনিশের জাল গুটানো হয়ে যেতে তিনি রুক্ষস্বরে হুকুম দিলেন:

'আগে আগে চল্!'

কুনিশ বিনীতভাবে আগে চলল, তার পেছন পেছন দাদু, আর দাদুর পেছনে আমরা।

আমরা দ্বীপ থেকে সরে যেতে না যেতেই কুনিশ কিঁউ-কিঁউ করে বলল:

'ছেড়ে দিন দাদু! আপনার পায়ে পড়ি, ছেড়ে দিন!'

তার গলার স্বরও হয়ে উঠল একেবারে কাঁদো কাঁদো। এমন কি বিশ্বাস হচ্ছিল না যে কথাগুলি বলছে এক জোয়ান মর্দা, যে এক নিশ্বাসে আধ পাঁইট মেথিলেটেড স্পিরিট গিলে ফেলতে পারে। আমি আশ্চর্য হয়ে তার দিকে

তাকাচ্ছিলাম। এই নাকি ডাকাত, এই নাকি দস্যু। এদিকে আমি কিনা ভয় পাচ্ছিলাম — আতঙ্কে প্রায় মরতে বসেছিলাম।

সারাটা পথ কনিশ ঘ্যানঘ্যান করতে লাগল:

'সবার চেয়ে আপনারই কিনা বেশি ঠেকা পড়ে গেল দাদু? ছেড়ে দিন... আমি আপনার কোন কিছু চুরি করেছি নাকি? কেন আপনি অমন করছেন বলুন ত?.. ছেড়ে দিন... আপনার হাতে-পায়ে ধরছি... দয়া করুন... ছেড়ে দিন।'

দাদু চুপ করে রইলেন, যেন শুনতেই পান নি।

এই ভাবে আমরা একেবারে গ্রাম অবধি গেলাম।

'আচ্ছা, এবারে মাছগুলো জালে ফেলে কাঁধে তুলে নাও, তারপর চল!' দাদু হুকুম দিলেন।

কনিশ হুকুম মেনে নিল। আমি কেবল আশ্চর্য হয়ে গেলাম এই ভেবে যে সবটাই হয়ে গেল এত সহজে — গুলিবর্ষণ বা সংঘর্ষ ছাড়াই। ওকে বাঁধতে পর্যন্ত হল না। এমন একটা শক্তি দাদুর ছিল যাকে অবজ্ঞা করার সাধ্য কনিশের ছিল না।

এর পরের ব্যাপারটি হল আরও সহজ। আমরা মিলিশিয়াম্যান কমরেড ভালিগুরার কাছে এসে তাকে জাগালাম। তিনি ঘুমজড়ানো চোখে স্লিপার পায়ে গলিয়ে, তবে মিলিশিয়ার আঁটো জামা, আঁটো প্যান্ট, এমন কি টুপিও পরে বেরিয়ে এলেন।

তাকিয়ে বললেন:

'আচ্ছা, বোঝা গেল। ঘরে আসুন।'

আমরা ঘরে ঢুকলাম। কমরেড ভালিগুরা টেবিলের ধারে বসে এজাহার লিখতে লাগলেন। লিখলেন অনেকক্ষণ ধরে, লিখতে লিখতে প্রায়ই থেমে গিয়ে মাথাটা একপাশে হেলিয়ে আড়চোখে লেখা বিষয়টার ওপর চোখ বুলাচ্ছিলেন, ওটা আরেকবার পড়ে নিচ্ছিলেন। শেষকালে বললেন:

'সাক্ষীরা, দয়া করে সই করুন। এই যে এখানে,' এই বলে আমাদের দিকে তাকিয়ে তিনি আঙুলের খোঁচা দিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন।

আমি আর রবিন্‌সন লজ্জায় লাল হয়ে গেলাম। জীবনে কখনও সই করার সুযোগ আমাদের হয় নি।

'নে, নে,' দাদু নিজে সই করার পর কলমটা আমার হাতে দিয়ে বললেন।

আমি বাঁকা বাঁকা অক্ষরে হিজিবিজি করে নিজের নাম লিখে কলমটা রবিন্‌সনকে দিলাম। সে চটপট সই করল, এমন কি নামের শেষে জবর একটা টানও মারল — হুবহু বড়দের মতো। সঙ্গে সঙ্গে আমার আক্ষেপ হল এই ভেবে যে আমি নিজে ওটা করি নি — নিজের ছেলেমানুষী সইয়ের জন্য আমার লজ্জাই হচ্ছিল।

কমরেড ভালিগুরা হাসলেন, এমন কি রবিন্‌সনের কাঁধে চাপড় মেরে বললেন:

'সাবাস। বেশ সই কর ত...'

তারপর বললেন:

'সবাইকে ধন্যবাদ।'

এই বলে পর পর সকলের সঙ্গে — দাদুর সঙ্গে এবং আমাদের সঙ্গেও করমর্দন করলেন।

আমরা চলে এলাম।

ক্‌নিশ রয়ে গেল।

আমি চলতে চলতে ভাবতে লাগলাম:

'যাক বাপু, সব শেষ হল। যাই বল না, কী বীরপুরুষই না আমরা! সত্যিকারের বেআইনী শিকারীকে ধরেছি। অবশ্য পুরোপুরি নিজেরা, এমন বলা ঠিক হবে না, তবে আমাদের বাদ দিয়ে যে কিছুই হত না সেটা ঠিক।

আমাদের এতদিনের মনোবাসনা এবারে পূর্ণ হল। আমরা গোটা গাঁয়ের, হয়ত বা জেলার, এমন কি মহকুমারও বীরপুরুষ বনে যেতে পারি। আমাদের কীর্তিকাহিনী খবরের কাগজে আর রেডিওতেও প্রচারিত হতে পারে। আর টেলিভিশনে — সেখানেই বা নয় কেন? আর গ্রেবেনিউচকা জ্বলজ্বলে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে, আমার সঙ্গে যে তার পরিচয় আছে এই ভেবে সে নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করবে। এদিকে কারাফোলকা হিংসায় জ্বলেপুড়ে, তার ভালো নম্বরের চাপে চাপা নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে এক কোনায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদবে... লোকে কেবলই এ ওকে ফিসফিস করে বলবে: 'ঐ যে ঐ ছেলেদুটো... ওরাই হল গিয়ে সেই দুই বীরপুরুষ!'

কিন্তু... দুর্ভাগ্যবশত, এসব কিছুই হবার নয়; কেননা রবিন্‌সনের ইচ্ছে নয় কেউ জেনে ফেলে দ্বীপের কথা, কী ভাবে সে রবিন্‌সন হল ইত্যাদি নানা ঘটনা। আর এই কারণেই কোন কিছু বলার উপায় নেই। সে দাদুকে এবং কমরেড ভালিগুরাকেও অনুনয় করে বলেছে এগুলি যেন গোপন থাকে।

সুতরাং আবার সেই অপরিচয়ের আড়ালে।

এঃ-হে-হে!

ঐদিনই সন্ধ্যাবেলা রবিন্‌সন 'ফের পরীক্ষা' নির্জন দ্বীপ থেকে চিরকালের জন্য উঠে এলো 'মূল ভূখণ্ডে'।

অর্কেস্ট্রা বাজল না, সাংবাদিকরা ক্লিক-ক্লিক করে ছবি তুলল না, বীরপুরুষকে দেখার জন্য হাজার হাজার লোকের জনতা ফুলের তোড়া হাতে তীরে এসে ভিড় জমাল না।

সব চুপচাপ।

কেবল থেকে থেকে গাঁয়ে কুকুরগুলি ঘেউ-ঘেউ করছিল আর নলখাগড়ার ঝোপঝাড়ে গ্যাঙর-গ্যাঙর করছিল ব্যাঙেরা।

শেষ পরিচ্ছেদ

উপসংহার

গ্রীষ্মকাল কেটে গেল, দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল নিশ্চিন্ত ছুটির দিনগুলি। আবার স্কুলের ডেস্ক, আবার প্রতি পঁয়তাল্লিশ মিনিট অন্তর অন্তর পিরিয়ড শেষ হওয়ার ঘণ্টা, আবারও: 'যে যে বাড়ির কাজ করে আনো নি হাত তোল!' 'বোর্ডে এসো!' 'ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাও!..' প্রাত্যহিক স্কুল জীবন, আগেকার পঞ্চম শ্রেণীর, এখনকার ষষ্ঠ শ্রেণীর 'খ' বিভাগের।

আমি জানলার পাশে আমার অভ্যস্ত জায়গায় বসে থাকি, বসে বসে দেখি, উঠোনময় ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে স্কুলের পাহারাদার কুকুরটা, আমার মনে পড়ে যায় গত গ্রীষ্মকালের সমস্ত ঘটনা: দ্বীপ, ক্নিশ, অনুসন্ধানকারী পাইওনীয়ারদের দল...

আর এবারেও — এই প্রথমবার নয়, মনে মনে ভাবি: 'আচ্ছা রবিন্সন কি সত্যি সত্যিই দৈবক্রমে ঠিক সেই দ্বীপটাতে গিয়ে উঠেছিল, যেখানে ক্নিশ বেআইনী মাছ শিকার করত? বেশ একটা অদ্ভুত আর সৌভাগ্যজনক যোগাযোগ বলতে হয়!'

এ ব্যাপারে ইতিমধ্যে আমি ওকে জিজ্ঞেসও করেছিলাম। কিন্তু ও স্বীকার করে না, মুচকি হাসে। তাহলেও কেন জানি না, আমার দৃঢ়বিশ্বাস এই যে ওটা দৈবক্রমে হয় নি। খুব সম্ভব আমি যখন কিয়েভে ছিলাম তখন ও ক্নিশের গতিবিধির ওপর নজর রাখে আর তখনই হয়ত দ্বীপে 'পলায়নের' মতলবটা তার মাথায় আসে। এই না হলে আমাদের রবিন্সন! ধূর্ত আর কাকে বলে!

আচমকা আমার চিন্তাজাল ছিঁড়ে যায় আমাদের দিদিমণি গালিনা সিদরভনার কণ্ঠস্বরে:

'রেন্, বোর্ডে এসো!'

আমি অনুভব করলাম আমার ডান কনুইটা তড়াক করে ওপরে লাফিয়ে উঠল — আমার পাশের আসন থেকে ডেস্কের ঢাকনাটা ওপরে তুলে উঠে দাঁড়াল পাশের ছেলেটি, আমারই বন্ধু রবিন্সন। হ্যাঁ, তবে আর বলছি কী?

ফের পরীক্ষা দিয়ে (তোমরা মনে কর কী!) সে পাশ করেছে, ক্লাস সিক্সে প্রমোশন পেয়েছে।

ওঃ, দ্বীপ থেকে ফেরার পর বড় উৎকণ্ঠার মধ্যে কেটেছে সেই দিনগুলি!

গোড়ার দিকে আমি কেবল রেন্‌দের জানলার নীচে ঘুরঘুর করে সকলকে ধমকধামক দিতাম। কুকুর পলকানকে ধমক দিয়ে বলি ঘেউঘেউ না করতে। 'অবদানকে' বলি হাম্বাহাম্বা না করতে, শুয়োর মানিউনিয়াকে ধমক দিয়ে বলি যেন ঘোঁতঘোঁত না করে। নজর রাখতাম কেউ যেন আমার বন্ধুর পড়া তৈরিতে ব্যাঘাত না করে।

পরে আমি ওকে বুঝিয়ে বললাম যে দুজনে মিলে তৈরি করা ভালো, তাছাড়া আমার নিজেরও খুবই দরকার, কেননা আমি কিছুই জানি না।

প্রথমে সে বেঁকে বসল, বলল: 'তোকে আর আমার জন্যে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে না!' কিন্তু আমি বললাম: 'বুঝলাম, তার মানে তুই আমার চেয়েও ভালো হতে চাস। নিজেই সব জানতে চাস, আর আমি গণ্ডমূর্খ হয়ে থাকি, এই বুঝি তোর মনের ইচ্ছে? এটা ভালো কাজ নয়, বন্ধুর কাজ হচ্ছে না!' ফলে সে বাধ্য হয়ে রাজী হল।

সারা আগস্ট মাস জুড়ে আমরা দুজনে মিলে পড়া তৈরি করলাম। এমন কথা বলব না যে কাজটা ছিল রীতিমতো লোভনীয়, ফুটবল খেলা, ডাংগুলি খেলা কিংবা মাছ ধরার চেয়েও লোভনীয়... কিন্তু বন্ধুর জন্য কেবল লোভনীয় কাজই করতে হবে এমন কথা কে বলেছে!

রবিন্‌সন যখন ফের পরীক্ষায় বসল তখন আমিও তার সঙ্গে গেলাম। শ্রুতলিপিও আমরা দুজনে মিলে লিখলাম। গালিনা সিদরভনা সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেললেন কেন আমি এসেছি। তিনি বললেন: 'বোস, তুইও লেখ, এতে তোর লাভই হবে।' তোমাদের বলব কী, আমি রবিন্‌সনের চেয়েও খারাপ লিখলাম। ওর লেখায় ছিল দুটো ভুল, আর আমার — তিনটে। সাধে কি আর ও নির্জন দ্বীপে ব্যাকরণ বই সঙ্গে নিয়েছিল! তাছাড়া আমি যখন কিয়েভে ছিলাম তখন ও কেবল বীট আর আলুই ছাড়ায় নি।

এখন দেখ, ও ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে দিব্যি লিখে যাচ্ছে কঠিন কঠিন শব্দ। একটাও ভুল করছে না।

প্রসঙ্গত, আমি জানি যে ওর 'রবিন্‌সন ক্রুসো' বইটার ভেতরে একটা ঠিকানা লেখা কাগজ আছে।

কাজে লাগানোর কথা না ভাবলে কেউ কি আর অমনি অমনি ঠিকানা রেখে দেয়?

সুতরাং আমার বন্ধুর পক্ষে, বলা যেতে পারে, ব্যাকরণ অবশ্যপ্রয়োজনীয়ও বটে। পড়াশুনায় ভালো কোন মেয়েকে ত আর অশিক্ষিতের মতো ভুলে ভরা চিঠি লেখা যায় না! তার চেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরাও ভালো...

'সাবাস রেন্‌, যা জায়গায় গিয়ে বোস!' গালিনা সিদরভনা বলেন।

আমার বন্ধুটি গর্বভরে, ধীরেসুস্থে তার জায়গার দিকে চলল।

জায়গায় বসে সে কয়েক মিনিট চুপচাপ থেকে দিদিমণির প্রশংসাবাণীর মর্ম উপলব্ধি করতে লাগল।

তারপর আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে ফিসফিসিয়ে বলল:

'তাহলে পরীক্ষা করে দেখা যাক — কী বলিস?'

'দেখা যাক,' আমি বললাম।

আমরা ঝুঁকে পড়ে ডেস্কের নীচে মাথা গলালাম। রবিন্‌সন তার জামার তলা থেকে বার করল মিঠাইয়ের খালি চেপটা টিনের কৌটো। কৌটোটার ভেতর থেকে বেরিয়ে আছে নানা ধরনের স্ক্রু, খাঁজ আর তার। এটা হল আমাদের একটা আবিষ্কার — বোতাম খোলার কল।

এর আনুষ্ঠানিক নামকরণ এখনও হয় নি, তবে আপাতত প্রাথমিকভাবে নাম দেওয়া হয়েছে ছুযন্তর (ছুমন্তর নয়, ছুযন্তর, কেননা যে-কোন নতুন আবিষ্কারের নিজস্ব একটা নাম থাকা উচিত)। ছুযন্তর চালানোর পদ্ধতিটা খুবই সহজ: বোতামে লাগিয়ে কলটায় টিপ দিলেই হল। কেবল প্রথমে দম দিতে হয়। রবিন্‌সন ওটাকে নিয়ে এই বারে দম দিতে থাকে।

এটা অবশ্য তোমাদের সেই ট্র্যানজিস্টর নয়, সেমিকন্ডাক্টরও নয়, তবু...

'কড়-র-র!' হঠাৎ গোটা ক্লাসকে সচকিত করে আওয়াজ তুলে সপাটে স্প্রিংটা বেরিয়ে পড়ে কৌটো থেকে। আমাদের সামনের সারিতে কারাফোলকা বসে ছিল; স্প্রিংটা নীচ থেকে এসে আঘাত করল তাকে।

'উঃ-হু-হু!' হাউমাউ করে উঠল কারাফোলকা।

11–1068

'উঃ, কী হাঁদা রে বাবা!' আমি ফিসফিস করে বলি আমার বন্ধুকে।

কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে। আকাশ থেকে যেন আমাদের মাথার ওপর বাজ পড়ল — শোনা গেল দিদিমণি গালিনা সিদরভনার ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর:

'জাভ্‌গরোদ্‌নি আর রেন্‌, ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাও!'

আমরা লজ্জায়-অপমানে চিংড়িমাছের মতো লাল হয়ে গিয়ে ডেস্কের নীচ থেকে বেরিয়ে এসে গুটি গুটি দরজার দিকে রওনা দিলাম।

স্কুলের নতুন বছর শুরু হয়ে গেল।

ঘড়ি নিয়ে ঘোরাঘুরি

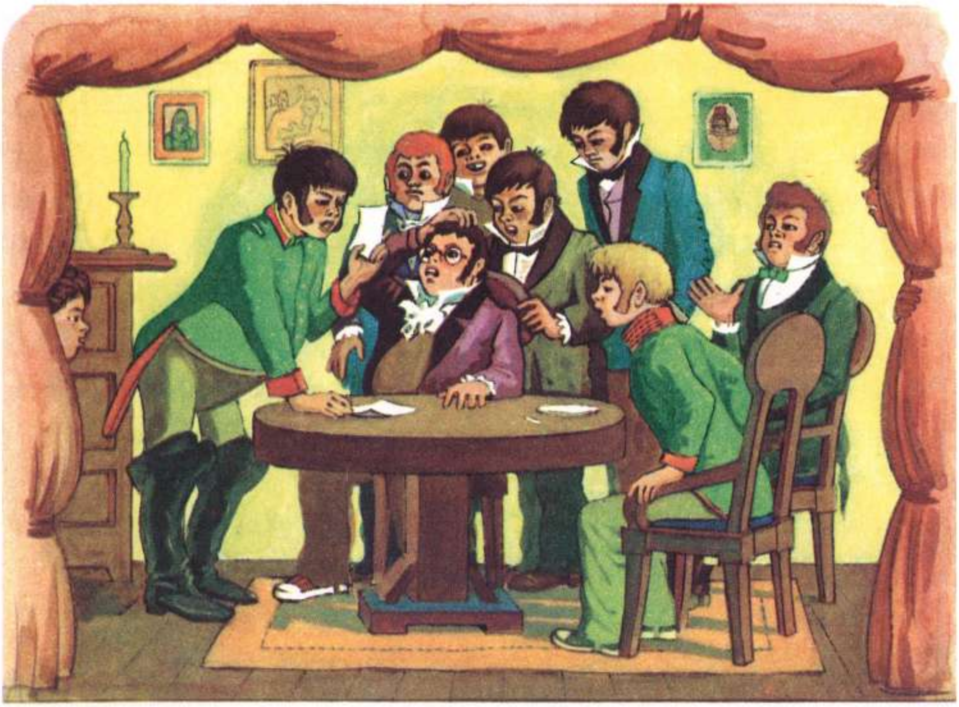

প্রথম পরিচ্ছেদ

'এঃ!' বললাম আমি আর জাভা

আমি জুলপিজোড়া ঠিকঠাক করে নিয়ে পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে মঞ্চের পর্দার ফুটো দিয়ে উঁকি মেরে দেখি। আমার বুকটা ধড়ফড় করে ওঠে, আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়ে যায়।

আমিই প্রথম যে ফুটো দিয়ে দেখছি এমন নয়। আমার আগে সম্ভবত শেচপকিন, স্তানিস্লাভস্কি, তারাপুন্‌কা, শ্‌তেপসেল্‌ — এরা সবাই — সকল কালের এবং সকল জাতির হাজার হাজার অভিনেতা এরকমই ফুটো দিয়ে উঁকি মেরে দেখেছেন। সম্ভবত তখনও ঠিক এমনই নিশ্চিন্তমনে, খুশিতে ভরপুর

দর্শকসাধারণ হল্-এ আসন গ্রহণ করেছেন, আর মঞ্চে যারা থাকত তাদের প্রাণপাখিও এমনি ভাবে খাঁচাছাড়া হওয়ার উপক্রম হত। বিশেষত যদি প্রথম অভিনয়-রজনী হয়ে থাকে।

আমাদেরও আজ প্রথম অভিনয়-রজনী।

'এই একটু সরে যা দেখি! আমাকে দেখতে দে!'

কার যেন তপ্ত গাল আমার মাথাটাকে জোর করে ঠেলে ফুটো থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। এ হল স্তেপা কারাফোলকা। অন্য সময় হলে আমি হয়ত এরকম বেহায়াপনা সহ্য করতাম না, হয়ত বা ওর ঘাড়ে একটা রদ্দাই কষে দিতাম... কিন্তু এখন আমার আর সে উৎসাহ নেই। আমার সমস্ত উৎসাহ খরচ হয়ে যাচ্ছে উৎকণ্ঠার পেছনে।

সাধারণ অবস্থায় লোকে প্রথমে নিশ্বাস নেয়, তারপরে নিশ্বাস ছাড়ে। কিন্তু লোকে যখন উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে, আমার মনে হয় তখন সে কেবল নিশ্বাস ছাড়ে। কোথা থেকে যে তার ফুসফুসে এত হাওয়া এসে জমা হয়, জানি না।

আমি মঞ্চের ওপর পায়চারি করি আর নিশ্বাস ছাড়ি।

তোমরা হয়ত ভাবছ আমি একাই পায়চারি করছি আর নিশ্বাস ছাড়ছি? মোটেই না! ঐ যে, শুনতে পাচ্ছ না? 'হু-হু... হা-হা...' অভিনেতারা সবাই পায়চারি করতে করতে নিশ্বাস ছাড়ছে। মনে হচ্ছে তার ফলে মঞ্চে যেন এলোমেলো বাতাস বইছে, মঞ্চের সজ্জা দুলে উঠছে, পর্দা নড়ছে, মেঝে থেকে উড়ছে ধুলো। আমাদের গাঁয়ের এই ক্লাব বাড়িটা ইটের তৈরি না হয়ে যদি রবারের তৈরি হত, তাহলে হয়ত উৎসবের বেলুনের মতো ফুলে উঠত, শুধু তা-ই নয়, অনেক আগে ফেটেই যেত। আমরা সবাই মঞ্চের সজ্জা-টজ্জা সমেত, সমস্ত দর্শকসুদ্ধ হয়ত মহাকাশেই উড়ে যেতাম।

দর্শক! ওঃ, এই দর্শকদের কথা আর কী বলব! ওদের মাথায় বাজ পড়ে না কেন! এই কিছুক্ষণ আগেও এরা ছিল এত ভালো, এত দরদী মানুষ, যারা সাহায্য করতে, উৎসাহ দিতে, সমবেদনা প্রকাশ করতে সদাপ্রস্তুত ছিল। নিকোলাই পাভলভিচ, ভারাভা দাদু, সালিভোন দাদু, ক্লাবের পরিচালক আন্দ্রেই কেকালো, হান্না মাসী, মারুসিয়া দিদিমা, বাবা, মা। ওঁরা তোমার জন্য দরকার হলে জলে বা আগুনে যেখানে বল ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত!

অথচ এখন? এখন গর্ভধারিণী মাও মা নন — একজন দর্শক।

এদিকে পর্দার এই পাশে এমন একটি জনপ্রাণীও নেই যে উৎকণ্ঠা বোধ না করছে। আমাদের শিল্পপরিচালিকা, সাহিত্যের দিদিমণি গালিনা সিদরভনা থেকে শুরু করে ক্লাস থ্রির নাকী গলার সেই ছেলেটি — পেতিয়া পাশকো, যার কাজ হল দড়ি ধরে টেনে মঞ্চের পর্দা সরানো — সে পর্যন্ত। সবাই উদ্বিগ্ন। তবে সকলের চেয়ে বেশি অবশ্য আমরা: আমি আর জাভা। উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ আমাদের ছিল; কেননা আমরাই ত এই গণ্ডগোলটা পাকিয়েছি — এই থিয়েটারের ভাবনাটা আমাদেরই মাথা থেকে বের হয়।

আমাদের এই ভাসিউকোভ্‌কা আর্ট থিয়েটারে আমি আর জাভা, আমরা হলাম মস্কো আর্ট থিয়েটারের*⁾ স্তানিস্লাভস্কি ও নেমিরভিচ-দানচেঙ্কোর মতো।

'কী বলিস? বলিস কী?' উত্তেজিত হয়ে দুহাত ছুঁড়ে গত শরতকালে বলেছিল জাভা। 'জানিস কেমন থিয়েটারের ধুম লাগিয়ে দেওয়া যায়! গোটা পাড়া জুড়ে... সত্যিকারের মস্কো আর্ট থিয়েটার হবে! তবে ওটা হল মস্কো আর্ট থিয়েটার, আর আমাদেরটা হবে ভাসিউকোভ্‌কা আর্ট থিয়েটার। এমন একটা কী? অনুষ্ঠান-সফরে যেতে পারব... এই যে দ্যাখ না মস্কো আর্ট থিয়েটার এই কিছু দিন আগে ফিরল আমেরিকা থেকে। খারাপ নাকি?'

আমাকে বোঝানোর কোন দরকারই ছিল না। আমি ত তখন নাট্যজগতের একজন হর্তাকর্তা — নেমিরভিচ-দানচেঙ্কো! বুঝিয়ে রাজী করানো দরকার আমাদের দিদিমণি গালিনা সিদরভনা আর স্কুল কর্তৃপক্ষকে। তবে, প্রসঙ্গত বলতে হয়, দিদিমণিকে আর বুঝিয়ে বলতে হল না, তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গিয়ে আমাদের সমর্থন করে বললেন:

'সাবাস ছেলেরা! এই ত চাই! আমার অনেক কাল হল ইচ্ছে ছিল নাট্যচক্র গড়ে তোলা, কিন্তু কিছুতেই আর সে কাজে হাত দেওয়া হয়ে উঠছে না। তোমরা তাহলে উদ্যোগী হয়ে যারা যারা যোগ দিতে চায় তাদের নামের একটা লিস্টি করে ফেল। তোমাদের দুজনের বেশ উৎসাহ আছে — তোমরা হবে নাট্যচক্রের মনিটর।'

ঐ দিন আমাদের হাবভাব হয়ে গেল দারুণ ভারিক্কি। এমন কি আমরা একবারও হুপহাপ করি নি, কাউকে ল্যাঙ মারি নি। বেশ গুরুগম্ভীর চালে

আমরা ক্লাসে ক্লাসে ঘুরে লিস্টি তৈরি করলাম — ইয়া লম্বা — আড়াই মিটারের। গোড়ার দিকে নাম লেখায় প্রায় গোটা স্কুল (ভালো বলতে হবে যে সচরাচর যেমন হয়ে থাকে, পরে শতকরা নব্বই জনই বাতিল হয়ে গেল)। এই লিস্টি নিয়ে আমরা এত হিমসিম খেয়ে গিয়েছিলাম যে শেষের দিকে সকলের নাম তোলার প্রবৃত্তি আমাদের ছিল না। কোলিয়া কাগারলিৎস্কিকে জাভা বলল:

'হুঃ, তোরও বুঝি সাধ হয়েছে! সাত চড়ে মুখে রা বেরোয় না! তোর মুখ থেকে ত কোথাও কোন কথা শোনা যায় না। স্টেজ থেকে শোনাই যাবে না তোর গলা!'

তবে কাগারলিৎস্কিকে লজ্জায় লাল হয়ে যেতে দেখে জাভার দয়া হল।

'যাক গে, এক্সট্রা হিশেবে চলবে... জনতার ভূমিকায়...' এই বলে সে ওর নাম লিখে নিল।

চক্রের প্রথম বৈঠকে নাটক বাছা হল। অনেকক্ষণ ধরে বাছাবাছি চলল। ডজন কয়েক নাটক ঘাঁটাঘাঁটি করা হল। শেক্সপিয়ারের ট্র্যাজিডি 'ওথেলো' থেকে শুরু করে কর্ণেইচুকের 'প্লাতন ক্রেচেত' নাটক পর্যন্ত কোনটাই বাদ গেল না। সবগুলোই প্রেম নিয়ে, এদিকে গালিনা সিদরভনা বলেছেন যে ঐ জিনিসটা আমাদের বয়সোপযোগী নয়। আমরা ততক্ষণে হতাশ হয়ে পড়েছি, আমাদের মনে হতে লাগল সব নাটকই বুঝি প্রেম নিয়ে। তাহলে উপায়? হান্না গ্রেবেনিউচকা বা ঐ রকম কাউকে সকলের সামনে স্টেজের ওপর চুমো খাওয়া— তা কী করে সম্ভব! তার চেয়ে আমি বরং ছাগলকে চুমো খাব!

অবশেষে গালিনা সিদরভনা বললেন:

'ইনস্পেক্টর জেনারেল' মঞ্চস্থ করা যাক। প্রথমত, এটা প্রেম নিয়ে নয়। দ্বিতীয়ত, শিগগিরই পাঠ্যসূচী অনুযায়ী গোগলের রচনা আমাদের পড়তে হবে, সুতরাং ব্যাপারটা আমাদের পক্ষে বেশ ভালোই হবে। তৃতীয়ত, 'ইনস্পেক্টর জেনারেল' অমনিতেই বেশ মজার আর ভালো জিনিস। তাছাড়া ভূমিকাও অনেক আছে, সকলেরই জায়গা হবে।'

আমরাও সঙ্গে সঙ্গে 'ইনস্পেক্টর জেনারেল' পড়ে ফেললাম। হ্যাঁ, কমেডি বটে! ঠিকমতো নামাতে পারলে হাসতে হাসতে সবার পেটে খিল ধরে যাবে!

ভূমিকা ভাগ করে দেওয়া হতে লাগল। এখানেই কিন্তু দেখা দিল বাধা। আমি আর জাভা ভাসিউকোভ্‌কা আর্ট থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা, সুতরাং সম্পূর্ণ সঙ্গত কারণেই আমাদের ইচ্ছে ছিল প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করার। পরন্তু ভূমিকাদুটো হওয়া চাই একই রকম। কিন্তু প্রধান ভূমিকা ছিল একটাই — খ্‌লেস্তাকভ। আমি মনে মনে ভেবে দেখলাম ওটা ঠিক আমারই উপযোগী। খ্‌লেস্তাকভের বর্ণনা প্রসঙ্গে স্বয়ং গোগল লিখেছেন: 'রোগা-পাতলা, মাথায় বুদ্ধিসুদ্ধি বলতে কিছু নেই... কোন একটা ভাবনার উপর স্থায়ী মনোনিবেশের ক্ষমতা তার নেই...' অতএব আর বলতে!

কিন্তু জাভা বলল:

'ফুঃ!.. একবার ভালো করে আয়নায় নিজের চেহারাটা দ্যাখ, তাহলেই বুঝতে পারবি খ্‌লেস্তাকভের সঙ্গে কেমন তোর মিল — যেমন শুয়োরে আর ঘোড়ায়। দুটো হাত, দুটো পা আর মাথা — এটুকুই যা মিল। খ্‌লেস্তাকভ — যাকে বলে আগুন! সে হল গিয়ে... দারুণ!'

এই বলে সে উঠে দাঁড়িয়ে নাক উঁচিয়ে নিচের ঠোঁট ফোলাল।

'হাঃ!' আমি বললাম। 'তোরা সবাই একবার দ্যাখ ওকে! ওঃ, হেসে বাঁচি নে!.. খ্‌লেস্তাকভ! খ্‌লেস্তাকভ ত নয়, কোথাকার এক কাকতাড়ুয়া! কুমীর-টুমির গোছের!.. আ ছাড়্‌! জামা ছাড়্‌ বলছি! নইলে এমন ঝাড় ঝাড়ব না!..'

খ্‌লেস্তাকভের ভূমিকা গালিনা সিদরভনা দিলেন কোলিয়া কাগারলিৎস্কিকে।

অন্যান্য ভূমিকা নিয়েও অসুবিধা দেখা দিল। নগরপাল স্‌কভোজনিক-দ্‌মুখানভ্‌স্কি — একজন, বিচারপতি লিয়াপকিন-তিয়াপকিন — একজন, তত্ত্বাবধায়ক 'স্ট্রবেরি' — সেও একজন, আবার... সে যাই হোক না কেন, 'ইনস্পেক্টর জেনারেল' এক অসাধারণ নাটক। আর গোগল অসাধারণ লেখক। আমি আর জাভা যে 'ইনস্পেক্টর জেনারেলে' নামব একথা জেনেই যেন তিনি এঁকেছিলেন দুটি ভূমিকা — দব্‌চিনস্কি আর বব্‌চিনস্কি। হুবহু এক রকমের। ঠিক আমাদেরই জন্য। যাতে আমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া না করি। ভূমিকাদুটো অবশ্য মুখ্য-টুখ্য মোটেই নয়। কিন্তু ভেবে দেখ, দব্‌চিনস্কি বব্‌চিনস্কি না থাকলে গোটা নাটকটা হয়ে যেত ওলট-পালট। নাটক আদৌ হত না। কাগারলিৎস্কিকে নামতে হত না খ্‌লেস্তাকভের ভূমিকায়; কেননা দব্‌চিনস্কি

বব্‌চিনস্কির মাথায়ই ত প্রথম খেলে যে খ্‌লেস্তাকভ হল ইনস্পেক্টর জেনারেল। বোঝ তাহলে!

আমি আর জাভা এটা ব্‌ঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মধ্যে আপস করে নিলাম।

নাটকের মহলা শ্‌র্‌ হয়ে গেল।

নিজেদের নাট্যপ্রতিভা সম্পর্কে আমার আর জাভার মনে কেন যেন কোন সন্দেহ ছিল না। আর যাই হোক না কেন, নানা রকম ঠাট্টা-ইয়ার্কি আর মস্করা করার ব্যাপারে আমরা ওস্তাদ ছিলাম। এ ত কিছ্‌ই নয়! সারা গাঁয়ে আমাদের নামডাক।

'ওঃ, নাটুকে আর কাকে বলে!' সালিভোন দাদ্‌ ত সরাসরিই আমাদের বলতেন।

আর এ ব্যাপারে তিনি বোঝেন-শোনেন। অনেক কাল আগে কোন এক সময়, যখন আর্মিতে কাজ করতেন তখন সালিভোন দাদ্‌ অর্কেস্ট্রায় বাজাতেন। হেলিকন-বাস নামে বিশাল বিউগল বাজাতেন। পেল্লায় শাম্‌কের মতো দেখতে ঐ বিউগল এখনও পড়ে আছে বাড়ির চিলেকোঠায়। ছ্‌টিছাটা পরবের দিনে সালিভোন দাদ্‌ তৃতীয় পাত্র 'চড়ানোর' পর কখনও কখনও 'আসর বসান' — তাঁর বিউগলে ফ্‌ঁ দেন। ব্‌ড়িরা তাই শ্‌নে ক্রুশচিহ্ন আঁকতে আঁকতে বলে: 'মহাপ্রলয়ের ভেরী বাজছে।' কিন্তু দাদ্‌র বাজনা সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে আমাদের কুকুরদের। প্রতিটি 'আসরের' পর তারা উল্লাসে গভীর রাত অবধি ডাকাডাকি করে। এহেন সালিভোন দাদ্‌ যখন আমাদের নাটুকে বলেছেন তখন আর সন্দেহের কোন অবকাশই থাকতে পারে না।

অথচ মহলার সময় আমাদের কী যে হল! আমরা নিজেরাই নিজেদের চিনতে পারি না। এ যেন আমরা নই, যেন কোথাকার দ্‌ই জড়পিন্ড, দ্‌টো ঘ্‌র্ঘ্‌রে পোকা, হাবিজাবি জিনিসে ভরা দ্‌টি বস্তা। তখনই আমরা ব্‌ঝতে পারলাম যে নিজের মাথায় যা আসে তাই বলা, ঠাট্টাতামাসা করা এবং ঢং করা (যেমন আমার বাবা বলেন) এক জিনিস, আর সম্প্‌র্ণ আরেক জিনিস হল নিজের কথা নয়, অন্য কারও লেখা কথা উচ্চারণ করা, অর্থাৎ থিয়েটারে পার্ট করা।

আমাদের ম্‌খে কথা আসছিল না। আমরা যেন ম্‌খে রবার চিবোচ্ছি।

আমাদের বিশ্রী লাগছিল। মুখের ভেতরে একটা তেতো তেতো ভাব, পেটের ভেতরটা ঠান্ডায় শিরশির করছে।

'ও কিছু নয়,' ফুর্তির ভাব দেখিয়ে বলল জাভা। 'স্টেজে আমরা দেখিয়ে দেব। ওখানে যা দেখাব না! ওঃ এমন দেখান দেখাব!'

'কচু দেখাবি,' আমি হতাশ হয়ে বিড়বিড় করে বললাম।

'তুই একটা যা-তা দেখছি! মিছিমিছি ভয় পাচ্ছিস! মহলার সময় বড় বড় অভিনেতারাও খারাপ করেছেন... তুই ত জানিসই... মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ কী বলেছেন? লেগে থাক!'

আমি সমস্ত শক্তি দিয়ে লেগে রইলাম। আরও ধন্যবাদ দিতে হয় গোগলকে এই জন্য যে তিনি আমাদের, অর্থাৎ বব্‌চিনস্কি দব্‌চিনস্কির মুখে খুব একটা বেশি কথা দেন নি। যা আছে তাই নিয়েই আমরা সামলাতে পারছিলাম না।

যে কোন পড়া তৈরির চেয়েও ব্যাপারটা খারাপ ছিল। সাহিত্যের ক্লাসে কবিতা মুখস্থ করাই আমাদের পক্ষে যন্ত্রণাবিশেষ। কবিতায় অন্তত ছন্দ আঁকড়ে ধরে মনে রাখা যায়। কিন্তু এ হল গদ্য। এখানে আঁকড়ে ধরার মতো কিছু নেই। পার্টটা যেখানে লেখা আছে সেই কাগজটার দিকে যতক্ষণ তাকাচ্ছ ততক্ষণ কথাগুলি তবু দঙ্গল বেঁধে কেমন যেন লেগে থাকে। কিন্তু কাগজটা লুকিয়ে ফেললেই তারা সব কে কোথায় ছুটে পালায় — চুল্লির ভেতরকার আরসোলার দলের মতো। কিন্তু স্টেজে ত আর কাগজ নিয়ে নামা যায় না! অভিনেতারা যদি বক্তৃতামঞ্চের বক্তাদের মতো কাগজ হাতে অভিনয় করতে নামে, তাহলে সেটা নাটক হবে না, হবে সম্মেলন। আমরা ত আর সম্মেলন ডাকি নি!

'জাভা,' আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম; 'যাই বলিস না কেন, আয় পার্ট মুখস্থ করা যাক। দেখেছিস কারাফোলকাটা কেমন মুখস্থবিদ্যা ছাড়ছে! আর গ্রেবেনিউচকা! — ও ত এর জন্য দুবার সিনেমায়ই গেল না।'

'কী বললি? আমি করতে যাব মুখস্থ? মরে গেলেও না!.. মুখস্থবিদ্যা! — ওটা হল বোকাদের জন্যে। কিন্তু তুই-আমি দুজনেই হলাম গিয়ে চালাক-চতুর ছেলে। আয়, বরং আমাদের থিয়েটারের প্রতীকচিহ্নটা কেমন হবে তাই নিয়ে ভাবা যাক। মস্কো আর্ট থিয়েটারের পর্দার গায়ে আছে সিন্ধুচিল, আমরা করতে পারি

পাতিহাঁস কিংবা রাজহাঁস, নয়ত রঙবেরঙের পালকওয়ালা মোরগ... তোর কী মনে হয়?'

'জানি না।'

'যাক গে, এ বিষয়ে পরে ভাবা যাবে 'খন, সময় আছে... এখন চল্ রে, নদীর ধারে যাওয়া যাক, ওখানে আমি খেঁকশিয়ালের গর্ত দেখতে পেয়েছি। ঐ কটা-লেজের জানোয়ারটাকে খেদানো যাক, কী বলিস?'

আমি পায়ে পায়ে জাভাকে অনুসরণ করলাম।

* * *

এক দিন যায়, দুদিন যায়...

এক সপ্তাহ বাদে আমি বললাম:

'জাভা, আয় ভাই, কথাগুলো মুখস্থ করা যাক! আমি আমার পার্টের ছিটেফোঁটাও জানি না।'

'মরুক গে!' জাভা কোন আমল দিল না। 'নেহাৎ তেমন হলে প্রম্প্টার ত আছেই। জানিসই ত ওর কী ক্ষমতা!'

কথাটা ঠিকই। আমাদের প্রম্প্টারটি সত্যি সত্যিই নামজাদা। কুজ্মা বারিলো। স্কুলে পড়া প্রম্প্ট করার ব্যাপারে তুখোড়। শেষ বেঞ্চ থেকে প্রম্প্ট করলেও মনে হয় যেন একেবারে কানের কাছে ফিসফিস করে বলছে।

গ্রামের সকলে এত অধীর হয়ে আমাদের নাটকের প্রথম প্রদর্শনীর অপেক্ষা করছিল যে মনে হচ্ছিল আমরা বুঝি শহরের সেরা থিয়েটার দল। বিশেষ করে সালিভোন দাদু মহলা দেখে যাবার পর। তিনি ঘটনাক্রমে মহলার সময় এসে পড়েছিলেন (ক্লাবে চেয়ার মেরামত করছিলেন, এমন সময় আমরাও হাজির)। গোড়ার দিকে সালিভোন দাদু আমাদের দিকে কোন মনোযোগ না দিয়ে আপন মনে হাতুড়ি ঠুকে ঠুকে কাজ করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল ঠকঠক আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে — দাদু কান পেতে শুনছেন। নগরপাল — কারাফোলকা মঞ্চে দাঁড়িয়ে বালিশ দিয়ে তৈরি ভুঁড়ি বাগিয়ে ভাঙা ভাঙা হেঁড়ে গলায় (কী

করে যে এটা ও পারল কে জানে!) পুলিশ-কর্মচারীকে (ভাসিয়া দেরকাচকে) বলছে:

'...পুলিশ ইনস্পেক্টর বাটনসাহেব... লোকটা ঢ্যাঙা আছে, তা লোকহিতকর কাজের জন্যে দাঁড়িয়ে থাক না গিয়ে ব্রিজের ওপর। আর হ্যাঁ, মুচির বাড়ির সামনে যে পুরনো বেড়াটা আছে সেটা যেন চটপট ভেঙে ফেলে খড়ের চালা বসিয়ে নিশানা দিয়ে দেওয়া হয় যাতে দেখে মনে হয় প্ল্যানমাফিক কিছু একটা করা হয়েছে। ভাঙাচোরা যত বেশি হবে ততই বেশি করে বোঝাবে নগর কর্তৃপক্ষের কর্মতৎপরতা। ওঃ হো, হা ভগবান! ভুলেই গিয়েছিলাম যে ঐ বেড়াটার কাছে আবার যত রাজ্যের আবর্জনা বোঝাই একগাদা ঠেলাগাড়ি পড়ে রয়েছে। কী জঘন্য শহর রে বাবা: কোথাও কোন মূর্তি-টুর্তি বসাতে যাবে কি, কিংবা নিছকই বেড়া — কে জানে কোথা থেকে এসে জোটে যত জঞ্জাল!..'

নাটকে ঠিক এই জায়গায় লেখা ছিল 'দীর্ঘশ্বাসমোচন'। কারাফোলকা ঠিক ঠিক নিয়মমতো দীর্ঘশ্বাস ফেলল, কথায় ছেদ দিল। দেখা যাচ্ছে সালিভোন দাদু অনেকক্ষণ হল কিছু একটা বলার জন্য উসখুস করছিলেন, তাই এই ছেদের সুযোগ নিতে তিনি আর দেরি করলেন না।

'ব্যাটা হারামজাদা!' গোটা হলঘর কাঁপিয়ে গাঁক-গাঁক করে বলে উঠলেন দাদু। 'একেই বলে ওস্তাদ!' (ওস্তাদ কথাটা দাদু কেন যেন গালাগালির অর্থে ব্যবহার করতেন।) 'চোখে ধুলো দিতে ওস্তাদ ব্যাটা শয়তান! হুবহু আমাদের আগেকার সভাপতি প্রিপিখাতির মতন! সেও অমনি কান্ডকারখানা করত, যখনই জেলাসদর থেকে কোন ওপরওয়ালা আসার কথা শোনা যেত... নাটকে ঠিকই বলেছে! ধন্যি নাটকের লেখক! জীবন সম্পর্কে জানেশোনে...'

সেই দিন সারা গ্রামে কথা ছড়িয়ে পড়ল আগামী অভিনয় সম্পর্কে। 'হুঁ-হুঁ-হুঁ... ইনস্পেক্টর জেনারেল!.. ও-হো-হো... খ্লেস্তাকভ! হে-হে-হে... নাটক!' — আনাচে-কানাচে সর্বত্র কেবল শোনা যায়। এমন কি গাঁয়ের সকলের চেয়ে প্রাচীন দিদিমারা, যাঁরা জীবনে এমন শব্দ মুখে আনেন নি, তাঁরা পর্যন্ত: 'ইনস্পেক্টর জেনারেল'... বলেই কেবল হাসি আর হাসি! আর কানে সামান্য কালা গারবুজিখা দিদিমা ত তাঁর প্রবীণা বান্ধবীমহলে গুজবই ছড়িয়ে দিলেন যে নাট্যকার ওসব গোগল-টোগল কেউ নয়, আসলে সে হল আঞ্চলিক সংবাদপত্রের

সংবাদদাতা কমরেড কুরোচ্‌কা। কোন এক সময় লোকটা আমাদের গাঁয়ে এসেছিল; আর এসবই লেখা হয়েছে আমাদের আগেকার সভাপতি প্রিপিখাতিকে নিয়ে। আর যেহেতু প্রিপিখাতি বর্তমানে সদরের সংস্কৃতি দপ্তরে ইনস্পেক্টরের পদে কাজ করছে সেই হেতু কুরোচ্‌কা গোটা জিনিসটা অমন ঢাকাঢুকি দিয়ে লিখেছে এবং নিজের নাম না দিয়ে ব্যবহার করেছে ছদ্মনাম — 'গোগল'। যৌথখামারের বর্তমান সভাপতিমশাই ইভান ইভানভিচ এই সমস্ত জনরব শুনে দারুণ হাসেন, তিনি খোশমেজাজে সাজসজ্জা ও পোশাকের জন্য আমাদের যথেষ্ট টাকাকড়ি দিয়ে দেন। এটা ছিল সত্যিকারের সৌভাগ্য। মঞ্চসজ্জার ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করেন ড্রইং টীচার আনাতোলি দ্মিত্রিয়েভিচ, আর পোশাক সেলাই করে গোটা একদল মেয়ে। সারা শীতকাল ধরে, একেবারে বসন্তকাল অবধি আমরা নাটকের জন্য তৈরি হতে লাগলাম। শেষকালে...

এই সন্ধ্যায় কোন চোর যদি আমাদের গাঁয়ে হানা দিত, তাহলে সে আত্মগোপন না করে নিশ্চিন্তে তার যা যা খুশি লোকজনের ঘর থেকে বার করে এনে ধীরেসুস্থে গাড়িতে তুলতে পারত। কোন বাড়িতে কোন জনপ্রাণী ছিল না। এমন কি কুকুররাও ছুটে আসে ক্লাবের দিকে, জড়ো হয়ে বসিয়ে দেয় তাদের সারমেয় আসর।

বলব আর কী! যাঁর সম্পর্কে সালিভোন দাদু বলতেন 'দ্বিতীয় জন্ম নিতে চলেছেন,' শিগগিরই তাঁর আবার দাঁত গজাবে এবং তিনি কখনই মরবেন না, একশ সাত বছর বয়সের সেই বুড়ি ত্রিন্দিচ্‌কা, আমাদের পশুপ্রযুক্তিবিদ ইভান স্ভিরিদভিচের ঠাকুমার ঠাকুমা, যাঁর কাছে কিয়েভ থেকে পর্যন্ত লোক এসেছিল তাঁর দীর্ঘায়ু হওয়ার কারণ জানতে চেয়ে*, সেই ত্রিন্দিচ্‌কা, যিনি আজ তিরিশ বছর হল বাড়ির ত্রিসীমানা থেকে বেরোন না, যিনি কেবল ক্লাবে

---

* আমি আর জাভা কিন্তু কারণ ঠিকই জানতাম: তিনি সোমরাজ লতা — দেবতরু খান, আমরা নিজের চোখে দেখেছি। আমরা ঐ সোমরাজ লতা খাওয়ার চেষ্টা করি, কিন্তু দ্বিতীয় দিন ছেড়ে দিতে বাধ্য হই — তেতো; হয়ত যখন বয়স হবে তখন... নইলে আমাদের মোটেই দরকার নেই এমন তেতো, বিস্বাদ দীর্ঘজীবনের (লেখকের মন্তব্য)।

কেন — সিনেমায় পর্যন্ত কস্মিনকালে যান নি — গির্জায় ত আজকাল আর যানই নি, তিনিও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে আসেন আমাদের নাটক দেখতে।

'কেমন! বলি নি!' সমস্ত হলঘর ফাটিয়ে সোল্লাসে গাঁক-গাঁক করে উঠলেন সালিভোন দাদু। 'এর মধ্যেই পাঠ নিতে বেরিয়েছেন। শিগগির নাচও শুরু করবেন...'

এর জবাবে ত্রিন্‌দিচ্‌কা দিদিমা কোন কথা না বলে ক্রাচ দিয়ে সালিভোন দাদুর ঘাড়ে বাড়ি মারতে সকলে হো-হো করে হেসে উঠল।

আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও...

'ক্রিং! ক্রিং! কি-র্‌-রিং!' তৃতীয় ঘণ্টার আওয়াজ বুকে এসে কেটে বসল।

হল-এর আলো নিভে গেল।

'যাও, যাও, সরে যাও দেখি!' প্রথম দৃশ্যে আমাদের (যাদের থাকার কথা নয় তাদের) উদ্দেশে চাপা গলায় বললেন গালিনা সিদরভনা।

পর্দা কড়কড় শব্দে সরে গেল (ওটার অবস্থা লোহার শেকলে বাঁধা কুকুরের মতো, মরচেধরা তারের ওপর দিয়ে সরে যাচ্ছে)।

ব্যস!

শুরু হয়ে গেল!

এবারে আর নিস্তার নেই।

'ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছি এই সংবাদ জ্ঞাপন করার জন্যে যে...' ততক্ষণে শোনা যাচ্ছে নগরপালের ভূমিকায় অবতীর্ণ স্তেপা কারাফোলকার কণ্ঠস্বর।

কাজ শুরু হয়ে গেল।

আমি চোখ কুঁচকে দাঁড়িয়ে থাকি উইংসের আড়ালে আর বুকের ওপর মুঠো করে হাত রেখে নিজের মনে ফিসফিস করে বলি: 'সব ভালোয় ভালোয় হবে! ভালোয় ভালোয় হবে! ভালোয় ভালোয় হবে!' যেন মন্ত্র জপছি।

এঃ, কী মুর্খই না আমি — একটা প্রার্থনাও জানি না! অথচ দিদিমা আমাকে শিখিয়েছিলেন! যদিও আমি পাইওনীয়ার... ওসব বিশ্বাস-টিশ্বাসও অবশ্য করি না, কিন্তু এখন বেশ কাজে লাগত! ঠিক এমনই অবস্থা আমার হয়েছিল যখন আমি প্রথমবার সাহস করে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলাম উইলো

গাছের মগডাল থেকে। গাছের ডালে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে তাকাতে আমার মনে হল যেন হৃৎপিণ্ডটা ধড়াস্ করে বুক থেকে ঠেলে বেরিয়ে এলো, আর এখনই ওটা উড়ে গিয়ে পড়বে জলে; এদিকে আমি উইলো গাছ আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছি ত আছিই, কিছুতেই নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারছি না। মাথা ঘুরছে, পেটের ভেতরটা গুলিয়ে উঠছে... কিন্তু এখন আমার জন্য যা অপেক্ষা করছে তার তুলনায় এসবই ছিল ছেলেখেলা। সব যাতে ভালোয় ভালোয় হয়ে যায় শুধু এর জন্য আমি এখন উইলো গাছ থেকে কেন, টেলিভিশন টাওয়ার থেকেও সানন্দে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত...

'হা-হা-হা-হা!' হল-এর সকলে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। ওঃ দিচ্ছে বটে কারাফোলকা! মহলার সময়ই অবশ্যই বেশ মজার করে তুলতে পেরেছিল ও।

'ভয়ের কিছু নেই, শান্ত হ, শান্ত হ! সব ভালোয় ভালোয় হবে, ভালোয় ভালোয় হবে! এই ত এবারে দর্শকরা আবার হেসে উঠবে...'

'হা-হা-হা-হা!'

'এই ত, অথচ আমি কেমন বোকা, ভয় পাচ্ছি!'

আমাদের মঞ্চে প্রবেশের সময় ক্রমেই এগিয়ে আসছে... এই ত এখুনি, সময় এই হল বলে... কারাফোলকা যেই বলবে... এই ত!

'এমনভাবে অপেক্ষা করা যে দরজা খুলে যেতেই দড়াম্ করে গিয়ে পড়তে হবে...'

আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন ধড়ফড় করে উঠল, আমি শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে ছুটে এসে জাভার সঙ্গে মিলে লাফিয়ে মঞ্চে এসে পড়লাম।

'অসাধারণ ঘটনা!' মরিয়া হয়ে গাঁক-গাঁক করে বলল জাভা।

'অপ্রত্যাশিত সংবাদ!' ঠিক সেই ভাবেই আমিও গাঁক-গাঁক করলাম।

'কী? কী ব্যাপার?' মঞ্চে যারা যারা ছিল তারা সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। দাঁড়াল বেশ ভালো। হল-এর লোকজন রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে।

'অদৃষ্টপূর্ব ব্যাপার' — আবার আমি চেঁচাই, 'হোটেলে এসে দেখি...'

'পিওতর ইভানভিচের সঙ্গে হোটেলে এসে দেখি...' আমার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে জাভা বলল।

হল-এ টুঁ শব্দটি নেই।

'এই ত চাই! সাবাস! সাবাস বলতে হবে আমাদের!' আমার মাথায় ঝলক দিয়ে গেল এই ভাবনাটা। বিজয়ীর দৃষ্টিতে হল-ঘরের ওপর চোখ বুলিয়ে নিই, দেখি ডজন ডজন চোখের দৃষ্টি আমার ওপর...

'এঃ!' জাভাকে বাধা দিয়ে আমি বললাম। আমি ভালোই জানতাম যে এই মুহূর্তে আমাকে 'এঃ' বলতে হবে। কিন্তু এর পর... হঠাৎ আমার কানের ভেতরে কে যেন করে উঠল 'ফড়্-র ফড়্-র!' আর আমার মাথার ভেতর থেকে সবকিছু যেন অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগল 'ফড়্-র ফড়্-র!' — বিলকুল ফাঁকা। যেন ছ্যাঁদা হয়ে গেছে। একটা কথাও পাওয়া যাচ্ছে না। দব্‌চিন্‌স্কির পার্টের কেন, মোটের ওপর, একবর্ণ কথাও নয় — যেন আমি একটা বাছুর, মানুষের ভাষা আমার জানা নেই। কেবল এই 'এঃ'-টাই মাথায় রয়ে গেছে আর ফাঁপা আওয়াজ তুলে গড়াতে গড়াতে মাথার খুলিতে ঠকঠক ঘা মারছে।

'এঃ!' আবার আমি বললাম, বলে তাকালাম জাভার দিকে।

এদিকে সেও তাকায় আমার দিকে। আমি তখন আঁচ করলাম যে ওরও মাথা থেকে সবকিছু — ফড়্-র ফড়্-র! — বিলকুল ফাঁকা।

আমরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাউয়ি করি।

'এঃ!' আমি চেঁচিয়ে বললাম।

'এঃ!' জবাবে বলল জাভা।

আবার আমাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়... হল-এ হাসির ফোয়ারা ওঠে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, লোকের ধারণা, আমরা যেমন দরকার তেমনি পার্ট করে যাচ্ছি।

ঐ ত ব্রিন্‌দিচ্‌কা দিদিমার ফোকলা মুখ হাসিতে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। তাঁর থুতনি কাঁপছে আর হাসির চোটে তাঁর মুখটা হয়ে এসেছে চেপটা (কতকাল যে হাসেন নি!)।

'হা-হা! হি-হি! হো-হো!' হল-এ হুল্লোড় উঠল।

প্রম্প্‌টারের কামরা থেকে কুজ্‌মা মাথা বার করে মস্ত হাঁ করে গুছিয়ে গুছিয়ে প্রম্প্‌ট করে যায় আমাদের কী বলতে হবে। এমনভাবে বলছে যে বধিরেরও বোধ হয় বুঝতে বাকি থাকে না। ইতিমধ্যে নগরপাল — কারাফোলকাও প্রম্প্‌ট করছে, পোস্টমাস্টার — সাশকা গুজ্‌ও। প্রথম সারির লোকজন ততক্ষণে

ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছে, এমন কি দর্শকদের ভেতর থেকে কে একজন কুজ্‌মার প্রম্প্‌ট করা কথাগুলি শুনতে পেয়ে নিজেই প্রম্প্‌ট করতে শুরু করে দিয়েছে।

আমার কানে যাচ্ছে ছাড়াছাড়া কতকগুলি শব্দ, কিন্তু সেগুলি এদিক-ওদিক ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে অবাধ্য ভেড়ার দলের মতো। আর আমি একটা জবুথবু-বনে-যাওয়া মেষপালকের মতো সেগুলিকে একসঙ্গে জড়ো করতে পারছি না। সেই সময় যদি কেউ আমাকে আমার নাম জিজ্ঞেস করত, তাহলে হয়ত তাও বলতে পারতাম না।

এদিকে পেছনের সারিগুলিতে লোকে তখনও হো-হো করে হাসছে এই ভেবে যে নাটকে বুঝি অমনই আছে। হাসি ভেদ করে শোনা গেল কার যেন উচ্চকণ্ঠের চিৎকার: 'বাহবা! সাবাস, সাবাস!'

না, এটা বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে!

আমি আর সহ্য করতে পারলাম না।

আমি জায়গা থেকে ছুট দিই, দৌড়ানোর মুখে দৃশ্যসজ্জার কোন একটা অংশ আমার পায়ে বেধে পড়ে যায়, আমি মঞ্চ থেকে উড়ে গিয়ে বাইরে পড়ি।

আমি পথঘাট ঠাহর না করে লক্ষ্যহীনভাবে নির্জন গ্রামের ওপর দিয়ে ছুটতে থাকি, বাতাস শনশন আওয়াজ তোলে আমার জুলপির ভেতরে।

কেবল যখন শহরের বাইরে, নদীর পাড়ের ওপরে উইলো ঝাড়ের মধ্যে এসে পড়লাম তখনই আমি ধপ করে ঘাসের ওপর পড়ে গিয়ে গড়াগড়ি খেতে লাগলাম, গোঙালাম; লজ্জায়-অপমানে, শোকে-দুঃখে মাটি চিবুলাম। আর যখন কয়েক মিনিট বাদে হতাশার প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠলাম তখন দেখতে পেলাম আমার পাশে গড়াগড়ি খাচ্ছে, গোঙাচ্ছে আর মাটি চিবুচ্ছে... আর কে? — আমারই বন্ধু জাভা — বব্‌চিন্‌স্কি।

আমরা একটি কথাও বললাম না। আমরা কেবল চোখ চাওয়া-চাউয়ি করলাম। ওঃ আমরা কী কাণ্ড করলাম! আমরা কেবল নিজেরাই ডুবলাম না, গোটা গাঁয়ের নাম ডোবালাম, আমরা ব্যকি সকলকেও পথে বসিয়ে দিয়েছি। এমন একটা নাটক কিনা ঝুলিয়ে দিলাম!.. তোমরা ত জানই বব্‌চিন্‌স্কি দব্‌চিন্‌স্কি মুখ্য চরিত্র না হলেও এই অসাধারণ নাটকটি এমনভাবে লেখা যে ওদের ছাড়া কোন ট্যাঁফোঁ চলবে না। এই যে আমরা এখন পালিয়ে এলাম তার ফলে সব বানচাল

হয়ে গেল। কেলেঙ্কারি... আতঙ্কের কথা... আরে, নগরপাল — কারাফোলকা আর অন্য সব আমলারা ত জানতেই পারছে না যে হোটেলে বাস করছে খ্লেস্তাকভ — কাগারলিৎস্কি, যাকে কিনা ইনস্পেক্টর জেনারেল বলে ধরা যেতে পারে। এটা বলার কথা আমাদের — দব্চিন্স্কি বব্চিন্স্কির। আমরা ছাড়া এ কাজ আর কেউ করতে পারে না। কেউ না! প্রতিভাবান কারাফোলকা কী করা যায় বুঝতে না পেরে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্টেজে। অন্য সব অভিনেতারাও দাঁড়িয়ে আছে থ হয়ে। আর মঞ্চের পেছনে যন্ত্রণা ভোগ করছে আমাদের সবচেয়ে প্রতিভাবান অভিনেতা কোলিয়া কাগারলিৎস্কি — মঞ্চে একবার নাক গলানোর পর্যন্ত সুযোগ সে পেল না। আঃ, মহলায় খ্লেস্তাকভের পার্টটা কী জবর সে করেছিল! কোথা থেকে যে এসব ওর আসে!.. অথচ আগে ও ছিল এত শান্তশিষ্ট, নজরেই আসত না... আমরা ওকে একটা ছেলে বলেই গণ্য করতাম না। গাছ থেকে জলে ঝাঁপ দেওয়া নয়, গুলতি দিয়ে জানলার শার্সি ভাঙা নয়... বইয়ের ভেতরে মুখ গুঁজে আপন মনে চুপচাপ বসে থাকে নাশপাতিগাছের তলায়। অথচ স্টেজে এমন দেখান দেখাল যে হাঁ হয়ে যেতে হয়। কিন্তু এখন সে জিনিস কেউই দেখতে পাবে না।

আর আমাদের পশুপ্রযুক্তিবিদ ত্রিন্দিচ্কার সেই বিখ্যাত প্র-প্রপিতামহীটি, যিনি হয়ত তাঁর জীবনের একশ বছরের মধ্যে এই প্রথম সংস্কৃতিজগতে চিত্তবিনোদনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন তিনি পায়ে পায়ে বাড়ি ফিরে চললেন চুল্লির ওপরে ঝিঁঝিঁর ডাক শোনার জন্য। অসন্তুষ্ট দর্শকসাধারণ মুখ বেজার করে যে যার বাড়ি চলে যাচ্ছে। যতরকম চোখা চোখা বাক্যবাণ ছেড়ে তারা গালাগাল করছে এই খামখেয়ালি, অপদার্থ থিয়েটারটিকে, যাকে খুব বেশি পরিমাণে নির্ভর করতে হয় অতি ওঁছা দুই অভিনেতার ওপর।

এদিকে সেই দুই অভিনেতা যখন ঘাসের ওপর শুয়ে শুয়ে আকাশের দিকে চেয়ে আছে, আকাশের তারাদল বিদ্রূপের ভঙ্গিতে তাদের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপছে, দুজনে কষ্ট পাচ্ছে। সমস্ত মহাকাশ জুড়ে, সমস্ত বিশ্বচরাচর জুড়ে এই কষ্ট।

এখন যে কোনমতোই লোকের সামনে মুখ দেখানো যায় না! মুখ তুলে তাকানোর উপায় নেই! মোটের উপর এর পর দুনিয়ায় বেঁচে থাকা যাবে কী ভাবে? ওঃ, কী কাণ্ডটাই যে আমরা বাধালাম!..

দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে!

তাছাড়া এই ভাসিউকোভ্‌কা আর্ট থিয়েটারের ব্যাপারটা মাথা ঘামিয়ে বার করতে যাবারই বা কোন দায় ছিল আমাদের?

আমরা ত দিব্যি নিশ্চিন্তে আর মজাসে জীবন কাটাচ্ছিলাম।

আমাদের কী দরকারটা ছিল?

আমেরিকা যাবার সাধ হয়েছিল? অনুষ্ঠান-সফর? বিজয়মুকুট? হাততালি? হতভাগারা! হাততালির বদলে গালে চড় কষিয়ে দিতে হয়!

এসবেরই শুরু কিন্তু কিয়েভ থেকে। এর জন্য দায়ী কিয়েভ। কিয়েভের মিলিশিয়া। সেই অপয়া টবটা। আর ভালকা। আর মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ। আর 'সালিউত' মার্কা ঘড়ি। আর... সেই জলে-ডোবা লোকটা। জলে-ডোবা লোকটারই দোষ সবচেয়ে বেশি। কিন্তু রসো সব ব্যাপারটা এক এক করে খুলে বলা যাক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পাতাল রেলের ঘটনা। 'মহাকাশচারী'। কিয়েভ মিলিশিয়ার সঙ্গে বিরোধ

গত বছর গরমকালে আমরা কিয়েভে এসেছিলাম। পুরো এক মাসের জন্য। এসেছিলাম আমার আত্মীয়দের কাছে — কাকা-কাকীমার কাছে। খাসা ব্যাপার! সারা বছর আমরা এখানে আসার স্বপ্ন দেখি। কিয়েভে যে আমরা কখনও আসি

নি এমন নয় — এসেছিলাম। জাভা এসেছিল একবার, আর আমি এমন কি দুবার। কিন্তু সেই সময়, ঐ প্রথম বার আমরা ক্লাসসুদ্ধ সবাই এসেছিলাম প্রমোদভ্রমণে, তাও মাত্র দুদিনের জন্য। দ্বিতীয় বার আমি এসেছিলাম একা, জাভাকে ছাড়া। কিন্তু তাতে কোন মজা ছিল না, একেবারেই না। তোমরা ত জানই যে নিজের প্রাণের বন্ধুকে আনন্দের ভাগ দিতে না পারলে আনন্দটা পূর্ণ হয় না। এমন কি অর্ধেকও নয়। চার ভাগের এক ভাগ বা ঐরকম কিছু হবে।

কিয়েভে যদি সবে এসে থাক, তাহলে শুরু করবে কী দিয়ে? ঠিক কথা, চৌরাস্তা দিয়ে! এটাই দস্তুর... ট্রেন থেকে সোজা নেমে বাক্স পেটরা ফ্ল্যাটে নিয়ে এলে, পাজোড়াও আপনাআপনিই তোমাদের বয়ে নিয়ে যাবে চৌরাস্তার দিকে। কাকীমা তোমাদের ছুটতে দেখে পেছন পেছন চিৎকার করে কোন রকমে বলার অবকাশ পাবেন: 'দেখো হারিয়ে-টারিয়ে যেয়ো না, আর দুপুরের খাবারের সময় যেন দেরি...' বাকিটা আর কানে যায় না।

আমরা এসে পৌঁছুলাম, আর তার বিশ মিনিট বাদেই হাঁটতে লাগলাম চৌরাস্তায়।

কী বললাম আমি — হাঁটতে লাগলাম? আমরা উড়ে চললাম, ভেসে চললাম, সগর্বে, জাঁক করে সমান মাপে পা ফেলে চললাম, যেন চলেছি মিছিলে। চৌরাস্তায় অমনি সহজভাবে হাঁটা যায় না। এমনই অসাধারণ রাস্তা এটা। চৌরাস্তায় একবার যে এসে পড়েছে সে হয়ে দাঁড়ায় সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। এখানে সবাইকে মনে হয় কেমন যেন আনন্দোচ্ছল, উৎসবমুখর। আর আশ্চর্য রকমের শিষ্ট, অমায়িক। সবার মুখে হাসি। চৌরাস্তায় লোকে গায়ে গায়ে ঘেঁষে ভিড় করে চললে কী হবে এখানে কেউ কাউকে পায়ে ঠেলা মেরেছে, কনুই দিয়ে ধাক্কা মেরেছে কিংবা গালিগালাজ করেছে এমন আমি দেখি নি। কেউ যদি ধাক্কা মারেও সেটা নেহাৎই অনিচ্ছাতে — 'মাফ করবেন!' — এই বলে হেসে আপন পথ ধরে। এখানে লোকজন চমৎকার! সব রাস্তায় এমন হওয়া দরকার।

আমরা উড়ে উড়ে চলি, ভেসে ভেসে চলি, সমান মাপে পা ফেলে চলি।

নদীপারের মতো চওড়া চৌরাস্তা (উৎসবের দিনে রেডিওতে সব সময় বলা হয়ে থাকে)। তীরে — ফুটপাথে — লোক আর লোক, মাঝখানে, সদর রাস্তায় — গাড়ি। ফুটপাথে যেমন দেখতে পাবে না একটি গাড়ি, তেমনি সদর রাস্তায়ও দেখা যাবে না

একটিও মানুষ। সকলেই যে যার জায়গায়। একে যাতে অন্যের ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে তার জন্য রাস্তা পার হওয়ার জায়গাগুলি মাটির তলায় লুকানো। চৌরাস্তার ব্যবস্থাই এমন যে দেখে মুগ্ধ হতে হয়। 'এখানে গাড়ির তলায় পড়ার চেয়ে আমাদের ওখানে ঘোড়ায় টানা মালগাড়ির নীচে পড়া সহজ,' আমি মনে মনে ভাবলাম। এই কথা ভেবেছি কি না ভেবেছি এমন সময় যেন বাঁধা দড়ি ছিঁড়ে ফুটপাথ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে সোজা গাড়ির তলায় পড়ার জন্য ছুট দিল একটা লোক। মাথায় টাক, চোখে গগলস, কাঁধে ক্যামেরা, দেখে মনে হচ্ছিল পরনে যেন স্রেফ একটি জাঙ্গিয়া — প্যান্ট-ট্যান্ট কিছু নেই। কেবল বোতাম দেখে আমরা আন্দাজ করতে পারলাম যে এটা হল এক ধরনের প্যান্ট, তবে জাঙ্গিয়ার মতোই খাটো। এই প্যান্ট থেকে বেরিয়ে এসেছে ঘন লোমে ঢাকা বিদঘুটে গোদা গোদা পা। দেখেশুনে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে আমাদের দেশী কোন লোক নয়, কোন বিদেশী পর্যটক।

আমি আর জাভা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গিয়ে ভাবলাম: 'দৌড়ে রাস্তা পার হতে পারবে নাকি?'

কিন্তু হঠাৎ — ফুর্-র! যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে দাঁড়াল এক কমবয়সী ছিমছাম গড়নের মিলিশিয়াম্যান, বেশ কায়দা করে তার গোঁফজোড়া পাকানো। নাঙ্গাঠ্যাঙওয়ালা পর্যটকটি সঙ্গে সঙ্গে মাঝরাস্তার আগেই থেমে গিয়ে হাস্যকরভাবে দুহাত ছড়িয়ে গুড়ি মেরে বসে পড়ল। তারপর উলটো দিকে ঘুরে ঘাবড়ে গিয়ে পায়ে পায়ে পিছিয়ে চলে গেল। মিলিশিয়ার লোকটি কেবল মুচকি হাসল এবং আঙুল তুলে শাসাল, শৃঙ্খলাভঙ্গকারী ছাত্রকে মাস্টারমশাই যেমন শাসন করেন (যদিও পর্যটকটি বয়সে মিলিশিয়ার লোকটির চেয়ে দ্বিগুণ বড়)।

'দেখলি! দেখলি ত!' গর্বভরে বলল জাভা। 'ভেবেছে কোথাকার কোন্ লণ্ডন বা রিও-ডি-জেনিরো থেকে এসেছে, যখন তখন যেমন খুশি তেমন গ্যাট-ম্যাট করে ঘুরে বেড়ানো যায়। ঢুঃ ঢুঃ! চলে যাও চাঁদ, মাটির নীচে সুরঙ্গ দিয়ে পার হও, যেমন সবাই যাচ্ছে। কোথাকার কোন্ লাটের বাঁট এলেন আমার!..' জাভা পুলকিত হয়ে বীরপুরুষগোছের, সুশ্রী চেহারার মিলিশিয়াম্যানের দিকে তাকিয়ে আমাকে বলল: 'জানিস পাভেল, যাই বলিস না কেন, মিলিশিয়ার লোক হওয়ার চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না। প্রথম কথা, মহৎ কাজ! যুঝতে হচ্ছে নানা রকমের চোরবাটপাড়, ডাকাত আর গুণ্ডাদের সঙ্গে। দ্বিতীয় কথা, সবাই

তোকে সম্মান করে, দরকার হলে ভয়ও করবে। যাই বলিস না কেন, আমি বোধ হয় মিলিশিয়ার লোকই হব রে। আর তুই? তুই কী হবি?'

'আমি? আমি হব পাইলট। তুই ত জানিসই।'

'সে তোর যা খুশি,' এই বলে জাভা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

জাভা ঘন ঘন তার জীবিকা পালটাত, যেমন বেদে পালটায় তার ঘোড়া। আজ সে দূর সমুদ্রগামী জাহাজের ক্যাপ্টেন, কাল — ভূতত্ত্ববিদ, পরশুদিন — মিঠাই কারখানার ম্যানেজার ('দিনে তিন কিলো করে মিঠাই খাওয়া যায়!')। তারপর কিয়েভ 'দিনামো' দলের ফুটবল খেলোয়াড়। তারপর শিল্পী। তারপর ফাঁদ পেতে জন্তুজানোয়ার ধরার কাজ — বাঘ, তুষার চিতা, জাগুয়ার — এদের ধরে এনে ট্রেনিং দেওয়া। আর এখন দেখ — মিলিশিয়ার কাজ!

আমি কিন্তু ওরকম নই। ক্লাস ওয়ানে থাকতে সেই যে ঠিক করে রেখেছি পাইলট হব, তা-ই আঁকড়ে ধরে আছি।

এমন কি এই কিছুদিন আগে সালিভোন দাদু বলেছিলেন: 'দেখ দেখি কী জেদী!.. যাই বল না কেন, ছেলেটা শেষ পর্যন্ত পাইলট না হয়ে ছাড়বে না দেখছি।'

কেবল কখনও কখনও আমি সহ্য করতে না পেরে সঙ্গদানের খাতিরে জাভার সঙ্গে যোগ দিই। তাও পাইলটত্ব বাদ দিয়ে নয়। আমি ইতিমধ্যে জাহাজী পাইলট হয়েছি, পাইলট ফুটবল খেলোয়াড় হয়েছি, পাইলট-শিল্পী হয়েছি, পাইলট জানোয়ার ধরিয়ে হয়েছি, পাইলট ভূতত্ত্ববিদ হয়েছি, এমন কি হয়েছি মিঠাই কারখানার পাইলট, যার কাজ হল এরোপ্লেনে করে মিঠাই বয়ে নিয়ে যাওয়া।

কিন্তু এবারে আমি ক্ষান্ত হলাম, কেননা পাইলট মিলিশিয়াম্যান আমার ধারণায় এলো না। শূন্যে সে কাকে ধরবে? সারস-টারস নাকি?

না, না, এবারের মতো অন্তত আমি স্রেফ পাইলটই থেকে যাই।

আমরা উড়ে উড়ে চলি, ভেসে ভেসে চলি, সমান মাপে পা ফেলে ফেলে চলি।

ডান দিকে দেয়ালে চীনেমাটির টালি লাগানো জমকাল ঘরবাড়ি, যেন রঙবেরঙের টালি ছাওয়া বিশাল বিশাল চুল্লি, একে অন্যের গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে আছে, ওপরের দিকে উঠতে উঠতে চলে গেছে পেচিওরস্কের দিকে।

বাঁ দিকে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, রোদের আলোয় ঝকঝক করছে তার কাচ।

আরও কিছু দূরে নগর সোভিয়েতের বিশাল দশতলা দালান। 'এই এত প্রকাণ্ড বাড়িটার মধ্যে কত লোক সভা করে রে বাবা!'

নগর সোভিয়েতের পেছনে কোথায় যেন দাঁড়িয়ে আছে টেলিভিশন টাওয়ার — আকাশের গা ফুঁড়ে চলে গেছে সোজা মহাকাশে। উ'চু বটে! এর চেয়ে উ'চু আর কিছু দেখি নি। স্কুলে খারাপ নম্বর পেলে মা'র হাত থেকে লুকোতে হলে এখানেই লুকানো দরকার! এ আমাদের নাশপাতি গাছ নয়। এখান থেকে টেনে নামানো ত দূরের কথা, গলার চিৎকারও কস্মিনকালে এর নাগাল পাবে না!

নগর সোভিয়েতের দালানের পর, স্ভের্দ্লেভ স্ট্রীটের পর চৌরাস্তা মোড় নিয়েছে ডান দিকে আর কালিনিন স্কোয়ারে এসে বাড়িগুলিকে নিজের সামনে থেকে ঠেলে দুপাশে সরিয়ে দিচ্ছে, যেন চিৎকার করে বলতে চায়: 'আমাকে ছেড়ে দাও, আমি নীপারে ডুব দিত চাই!' কিন্তু লেনিনীয় কমসমোল স্ট্রীটে এসে ফিলার্মনির দালানে এসে বাধা পায়। ঠিক এই কারণেই নীপারের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়া আর সম্ভব হল না!

স্ভের্দ্লেভ স্ট্রীটের পর আমরা চৌরাস্তার মহল্লা ধরে আর এগোলাম না — ডান দিকেই দেখতে পেলাম পাতাল রেলের স্টেশন। এমন লোক কে আছে যে ভাসিউকোভ্কা থেকে কিয়েভে এসেছে অথচ উদাসীন ভঙ্গিতে চলে গেছে পাতাল রেলের পাশ কাটিয়ে? — তাকে একবার দেখতে ইচ্ছে হয় আমার।

নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার জন্য কোন বাক্যব্যয় করতে হল না আমাদের, আমরা যেন কোন হুকুম পেয়ে মোড় নিলাম স্টেশনের দিকে।

আমাদের ওপর সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়ল একটা তাজা নিশ্বাস, তাতে এমন একটা বিশেষ ধরনের ঘ্রাণ যা কেবল পাতাল রেলেই পাওয়া সম্ভব।

যদিও এখানে চেকার ছিল না আর বিশেষভাবে তৈরি দুই থামের মাঝখানে প্রবেশপথ অতিথি অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে খোলা ছিল, তবু ফাঁকি দিয়ে ঢোকার কোন মতলব আমরা করলাম না। যারা একটু বোকা-সোকা তারা করে দেখুক গে, আমরা কিন্তু এর মধ্যেই একবার চেষ্টা করে দেখেছি। যত তাড়াতাড়িই তুমি ছোটার চেষ্টা কর না, ঐ যে থামদুটোর গায়ে 'পাঁচ কোপেক ফেলুন' — এই অমায়িক লেখাগুলি জ্বলছে, সেখান থেকে তার চেয়েও দ্রুতগতিতে দুটো বিশেষ ধরনের

হাতল ঝট করে বেরিয়ে এসে তোমার পথ আটকে দেবে, পেটে গংতো মেরে বসবে। এই হল ব্যাপার!

আমরা ভদ্রলোকের মতো কাউণ্টারে পয়সা বদল করে পাঁচ কোপেকের মুদ্রা নিলাম, যথাস্থানে ফেলে ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

'আমরা দুজনে কী মার্জিত আর সম্ভ্রান্ত লোক!' আমি গর্বভরে মনে মনে ভাবলাম। মূর্খ আমি, এই মুহূর্তে কী ঘটবে তা যদি জানতাম...

'দ্যাখ্! দ্যাখ্! সার্জেণ্ট-মেজর পালিয়ানিচ্কো!' হঠাৎ সহর্ষে চিৎকার করে বলল জাভা। 'আয় ওঁর নাগাল ধরা যাক!'

আমি মুখ হাঁ করে কেবল বলেছি কি বলি নি: 'অ্যাঁ? কোথায়?' ততক্ষণে ও এস্কালেটর দিয়ে নীচের দিকে ছুট দিয়েছে।

এস্কালেটরে আমাদের সামনে আগে আগে ঝুড়ি আর বস্তা বাগিয়ে ধরে এবং দুহাতে নতুন একটা দস্তার টব আঁকড়ে দাঁড়িয়ে ছিল একজন মোটাসোটা লোক। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল বাজারে ডিম-টিম বিক্রি করার পর একগাদা সওদা করে বাড়ি ফিরছে।

মোটা লোকটার কয়েক মিটার নীচে এস্কালেটরের ধাপে দাঁড়িয়ে ছিল খড়ের আঁটির মতো চুড়ো করে চুলবাঁধা, ছিমছাম গড়নের একটি মেয়ে — হুবহু ফিল্ম-স্টার! তারও নীচের ধাপে ছিল একজন মিলিশিয়াম্যান, পেছন থেকে সত্যি সত্যিই দেখতে অনেকটা সার্জেণ্ট-মেজর পালিয়ানিচ্কোর মতো, যাঁর সঙ্গে গত বছর একটা দারুণ মজার পরিস্থিতিতে আমাদের আলাপ হয়। তাঁর সঙ্গে আবার দেখা হলে এবং কথা বলতে পারলে অবশ্যই বেশ হত। বিশেষত ভালো লাগত জাভার, কেননা আজ থেকে সে মিলিশিয়াম্যান হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

আমি কোন রকম ভাবনা-চিন্তা না করে দুমদাম এস্কালেটরের ধাপ বয়ে জাভার পেছন পেছন ছুটলাম। মোটা লোকটা সওদা নিয়ে প্রায় গোটা পথ আটকে রেখেছিল। জাভা কায়দা করে তার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। আমিও ঢুকে পড়লাম। মোটা লোকটা দস্তার টবটাকে নিজের পাশে রেখে কেবল দুই আঙুলে ধরে রেখেছিল। আমি নিজের অজানতে ওটাকে ধরে ফেললাম। টব দড়াম করে এস্কালেটরের ওপর আছাড় খেয়ে ছিটকে নীচে পড়ে গেল।

দুম্-দুম্-দুম্!.. ব্যস! — এবারে এসে ঘা মারল 'ফিল্ম-স্টারের' পায়ে।

'ফিল্‌ম-স্টার' টাল সামলাতে না পেরে ধপাস্‌ করে গিয়ে পড়ল টবের ভেতরে। টবটা এবারে যাত্রী নিয়ে দুমদাম শব্দে এগিয়ে চলল সামনের দিকে।

আমরা স্তম্ভিত।

পুতুলের মতো রঙ-করা, চোখ ধাঁধানো সুন্দরী, 'ফিল্‌ম-স্টারটি' তখন বসে আছে টবের ভেতরে এবং দুহাতে টব চেপে ধরে সাঁসাঁ করে এস্‌কালেটরের ওপর দিয়ে নেমে চলেছে নীচে।

চুপচাপ, কোন চিৎকার-চেঁচামেচি নেই, মুখে টুঁ শব্দটি নেই। সে কি এতই সাহসী, নাকি উলটে ভয়ে বোবা হয়ে গেছে — কে জানে? — ব্যাপারটা আসলে কী ঘটছে, ভাবারই ত অবকাশ ছিল না তার।

আর এক মুহূর্ত — তার পরেই মিলিশিয়ার লোকটি — কী বিপদ যে ঘনিয়ে আসছে পিছু ফিরে তাকিয়ে লক্ষ্য করারও সময় পেল না সে — পায়ে আঘাত লেগে পড়ে গেল এস্‌কালেটরের ওপর। এদিকে 'ফিল্‌ম-স্টার' সেই একই পোজে ছুটে চলল পাশ কাটিয়ে।

মোটা লোকটিও তৎক্ষণাৎ ছুটল তার টবের পেছন পেছন, আমার আর জাভার দিকে দৃকপাত পর্যন্ত করল না। সে তার সমস্ত লটবহর নিয়ে থপথপ করে এস্‌কালেটরের ধাপের ওপর পা ঠুকতে ঠুকতে থেকে থেকে উদ্বিগ্ন হয়ে চেঁচাতে লাগল: 'সাবধান! সা-ব-ধান!' যেন বাজারের ভেতর দিয়ে গাড়ি হাঁকাতে গিয়ে চলার পথ না পেয়ে হাঁকডাক করছে গাড়োয়ান — কেবল চাবুক হাঁকড়াচ্ছে না, এই যা!

'ফিল্‌ম-স্টার' আরও কয়েকটি লোককে ভূপাতিত করে এস্‌কালেটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে পাতাল রেলের গোটা স্টেশন ঘরের ওপর দিয়ে গড়গড় করে চলতে চলতে শেষকালে থেমে গেল।

'ফিল্‌ম-স্টার' টবে চেপে সটান কোন এক মার্জিত রুচির দাদুর পায়ের নীচে এসে হাজির হতে তিনি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে কঠোর স্বরে বললেন:

'মাদাম, এ আপনার কি উদ্ভট শখ হল বাচ্চাদের মতো?'

মোটা লোকটা তখনও এস্‌কালেটরে থপথপ করে পা ঠুকে চলেছে আর ভাঙা ভাঙা গলায় বিড়বিড় করে বলছে:

'আমার টব! আমার টব!..' তবে এখন আর তার কণ্ঠস্বরে তেমন উদ্বেগের ভাব নেই।

যে মিলিশিয়াম্যানটি কুপোকাত হয়েছিল (এতক্ষণে আমরা লক্ষ করলাম যে লোকটা মোটেই পালিয়ানিচ্‌কো নয়) সে এবারে গায়ের পোশাকের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে তড়বড় করে ছুটল মোটা লোকটার পেছন পেছন, আর কার উদ্দেশে যেন চেঁচাতে লাগল:

'এক মিনিট! দাঁড়ান! দাঁড়ান!..'

আমরা মিলিশিয়াম্যানের পেছন পেছন আগের মতোই ছুটতে লাগলাম। আমাদের আর কোন উপায় ছিল না; কেননা পাতাল রেলের এস্‌কালেটরগুলি এমনভাবে তৈরি যে তাতে চেপে কেবল এক দিকেই যাওয়া চলে — এ তোমার সাধারণ সিঁড়ি নয়!

আমাদের সৌভাগ্যবশত মিলিশিয়ার লোকটি তখনও বুঝতে পারে নি আসলে কার দোষে এই কেলেঙ্কারি ঘটেছে। সে মোটা লোকটিকে অনুসরণ করছে, আমাদের দিকে তার কোন নজর নেই। কিন্তু শিগগিরই জেনে ফেলবে। আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড... মোটা লোকটার নাগাল ধরবে, আর সে তাকে... আমার দুপা অসাড় হয়ে আসছে... দেখতে দেখতে আমরা নীচে নেমে এলাম।

'ফিল্‌ম-স্টারটির' বোধ হয় এই মাত্র চেতনা ফিরে এসেছে। তখনও অবশ্য বসে ছিল টবের ভেতরে, মুচকি হেসে উৎফুল্ল কণ্ঠে সে বলল:

'মহাকাশযান নিরাপদে অবতরণ করেছে। বেশ ভালো বোধ করছি। ভারহীনতা ও অতিরিক্ত চাপে দৈহিক অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটে নি।'

চারপাশের লোকজন হাসতে থাকে।

মিলিশিয়ার লোক এবং পাতাল রেলের অন্যান্য যে সমস্ত যাত্রী ভিড় করে 'ফিল্‌ম--স্টারকে' ঘিরে দাঁড়িয়ে মজা করছিল, তারা তাকে কী ভাবে অভ্যর্থনা জানায় তা আমরা দেখতে পেলাম না। আমরা তাড়াতাড়ি করে ট্রেনের কামরায় ঢুকে পড়লাম। দরজা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল, ট্রেন ছেড়ে দিল।

পরের স্টেশন — আর্সেনাল্‌স্কায়া। সেখানে কামরা থেকে লাফিয়ে নেমে আমরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে এস্‌কালেটর বয়ে ওপরে উঠে গেলাম। আমরা এত জোর ছুটেছিলাম যে বুক থেকে হৃৎপিন্ড ছিটকে বেরিয়ে পড়ার উপক্রম হল। ওখানে আবার দুটো এস্‌কালেটর, দুটোই বেজায় লম্বা।

পাতাল রেল থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে আমরা মোড় নিয়ে একটা ছাইরঙা বড়

বাড়ির উঠোনে এসে পড়লাম, সেখানে একটা ঝোপের মধ্যে ধপাস্ করে গিয়ে গড়িয়ে পড়লাম মাটিতে — এক কথায়, তখন আর আমাদের ধড়ে প্রাণ ছিল না। চোখে অন্ধকার দেখছি, হাত-পা নড়াচড়া করার ক্ষমতা নেই। কথা বলা ত দূরের কথা, আমরা নিশ্বাসই নিতে পারছিলাম না। কেবল মুখ দিয়ে বাতাস নিচ্ছিলাম, খাবি খাচ্ছিলাম ডাঙায় তোলা মাছের মতো। একটা তিন বছরের মেয়েও আমাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারত, ইচ্ছে করলে পায়ের গোড়ালি ধরে টান মেরে টপ করে থালুইতে পুরে নিয়ে বাজারে গিয়ে বিক্রি করতে পারত একেকটিকে দুই কোপেক করে। এটাই ছিল তখন আমাদের বাজারদর।

কেবল মিনিট দশেক বাদে...

'উঃ!' কোন রকমে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল জাভা।

'আঃ!' আমি সায় দিলাম।

'ছোঃ!' জাভা বলল।

'ফুঃ!' সাড়া দিলাম আমি।

এছাড়া আর কোন কথাবার্তা বলার সামর্থ্য আমাদের ছিল না।

কেবল মিনিট বিশেক বাদে আমরা শেষ পর্যন্ত ধাতস্থ হলাম, যে ঘটনা ঘটে গেল তা নিয়ে আলোচনা করতে পারলাম।

'হ্যাঁ,' জাভা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'বলা যেতে পারে তুই আমার গোটা ব্যাপারটা মাটি করে দিলি। তাছাড়া আর কী? এখন কেই বা আমাকে মিলিশিয়ার কাজে নেবে?..'

'ভাগ তুই! আমার দোষ কী?' আমি আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টায় বললাম। 'কেউ ত আর দেখে নি। আর বড় কথা হল সব ভালোয় ভালোয় কেটে গেছে... কী বলছিস তুই?'

'হ্যাঁ, বললেই হল দেখে নি! ঐ মোটা লোকটা দেখেছে, মিলিশিয়ার লোকটাও। আমরা যখন ওর পেছন পেছন ছুটছিলাম তখন সে আড়চোখে আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল... আর মিলিশিয়াম্যানের স্মৃতিশক্তি যা না, কী বলব! এ নিয়েই ওদের কাজ কিনা!'

'আরে ধুৎ!' আমি তাচ্ছিল্যভরে বললাম।

'রাখ্ তোর 'আরে ধুৎ'! হয়ত ওর মুখের কথা থেকে আঁকা ছবির সাহায্য

নিয়েই এতক্ষণে আমাদের খোঁজ পড়ে গেছে। মুখের কথা থেকে আঁকা ছবি — এটা ভাই সাঙ্ঘাতিক জিনিস...' এই বলে মুখের কথা থেকে আঁকা ছবি যে কত সাঙ্ঘাতিক যেন তা বুঝানোর জন্যই জাভা মাথার ওপর ঘুষি তুলল। মুখের কথা থেকে আঁকা ছবি সম্পর্কে জাভা অনেক কথা শুনেছে যখন সে তৈরি হচ্ছিল সীমান্তরক্ষী হওয়ার জন্য।

'আরে, কী এমন কাজ করেছি আমরা? ভয়ানক কিছুই করি নি!' জাভাকে প্রবোধ দেবার জন্য ততটা নয় যতটা বললাম নিজেকে প্রবোধ দেবার উদ্দেশ্যে। 'অসাবধানে টবটা ধরে ফেলেছিলাম... ইচ্ছে করে ত আর নয়...'

'ইচ্ছে করে যে করিস নি প্রমাণ করতে যা না। ঐ লোকটাই প্রথম বলবে যে বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। নিজে যে নির্দোষ তা দেখাতে হবে ত! মোটের ওপর এমন ঘটনা পাতাল রেলের ইতিহাসেই হয়ত কখনও ঘটে নি। আর তুই বলিস কিনা...'

'পাতাল রেলে বরাবরই আমাদের কপালটা খারাপ দেখছি,' আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম। 'গত বছরও, মনে আছে কেমন কেলেঙ্কারিটা হয়েছিল, এবারেও...'

'জুড়ির নিয়ম,' এই বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলল জাভা।

বলা যায় না, 'জুড়ির নিয়ম' বলে হয়ত সত্যি সত্যিই কোন নিয়ম আছে। বাবার মুখে এই নিয়মের উল্লেখের মধ্যে তেমন একটা গুরুত্বের ভাব থাকত না, আবার তেমন একটা ঠাট্টার ভাবও থাকত না। 'জুড়ির নিয়মের' মোদ্দা কথাটা হল এই যে বিভিন্ন ধরনের বিপদ-আপদ সব সময় জোড়ায় জোড়ায় চলে — একটা ঘটলে পরেরটার জন্যও অপেক্ষা করতে হয়! সাধে কি আর লোকে বলে: 'বিপদ একা আসে না!'

'এটা এমনই যা তা নিয়ম... দেখিস আজ আবার আমরা আর কোন যাচ্ছেতাই কাণ্ডের মধ্যে জড়িয়ে না পড়ি,' এই বলে জাভা হঠাৎ হেসে ফেলল। 'তা যাই বলিস না কেন, টবে করে কী দারুণ গড়গড়িয়ে নেমে গেল...'

'তাছাড়া কী! যেন রকেটে চেপে — হুস্ — খাসা ব্যাপার! আমি নিজেও হয়ত অমন সুযোগ পেলে হাতছাড়া করতাম না, তাই না?' আমি কালবিলম্ব না করে বললাম, যখন উল্লসিত হয়ে উঠলাম এই দেখে যে জাভা আমাকে আর মিলিশিয়ার ভয় দেখাচ্ছে না।

জাভা মাটি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, জিজ্ঞেস করল:

'এখন কোথায় যাওয়া যায়?'

আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম:

'যেখানে খুশি! যদি চাস ত মজার শহরে, নয় ত স্টোরিও সিনেমায়, নয়ত চিড়িয়াখানায়...'

'তা যাওয়া যেতে পারে, তবে কিনা...' বলে জাভা চুপ করে গেল।

'কী?'

'বুঝলি কিনা, যদি...' আবার চুপ করে গেল ও।

'কী? বলই না।'

'আমাদের একা একা যাওয়াটা যেন কেমন... যদি খুঁজে বার করা যেত... কিয়েভের ঐ ছেলেদের... ইগর, কর্ণধার সাশকো... ওদের... কী দারুণ দারুণ ছেলে ওরা সব...' এই বলে আমার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে।

ওর দিকে তাকিয়ে আমি মনে মনে হাসি। ওঃ, দেখালি বটে তুই জাভা! ধূর্ত শেয়াল! বোঝ কাণ্ড, ছেলেদের নাকি তার বড় দরকার! বললেই হল! আরে, তোকে বুঝতে আমার আর বাকি নেই। আমার কাছে তুই হলি একখণ্ড কাচের মতো পরিষ্কার! আমি সেই কিয়েভের শিকারী নই যে আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরাবি। তাহলে আর কী বলছি! শিকার আর মাছ ধরার জন্য কিয়েভ থেকে যে সমস্ত শিকারী আমাদের ভাসিউকোভ্‌কায় আসত তারা প্রায়ই টোপের জন্য আমাদের কাছে ফড়িং চাইত। দেশলাইয়ের বাক্সের এক বাক্সের জন্য দাম দিত পাঁচ কোপেক। আমি ফড়িং ধরতে ধরতে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে যাই; কাজ নিয়েছি ত নিজেকে বিকিয়েই দিয়েছি। এদিকে জাভা বাক্সের ভেতরে খড়কুটো পুরে ওপরে গোটা কয়েক ফড়িং ভরে দিয়েই ছোটে তার বদলে পাঁচ কোপেক পেতে। এই অবস্থায় তাকে ধরে ফেললে সে কেবল নিরপরাধের মতো চোখ পিটপিট করে, তার বক্তব্যটা এই যে: 'আরে, ওদের খাবার না দিয়ে চলে...'

কিন্তু আমি ত আর তোর কিয়েভের শিকারী নই!

'সেটা হলে অবশ্যই দারুণ হত,' আমি বলি, 'কিন্তু কোথায় তাদের পাবি, বল? ঠিকানা ত আমরা জানিই না... তোকে অবশ্য ভালকা তার নিজের ঠিকানা দিয়েছিল।

কিন্তু সেটাকে ত তুই নিশ্চয়ই যত্ন করে রেখে দিস নি... কোথাকার কোন্ ভালকা না কে — তার ঠিকানা যত্ন করে রেখে দেওয়া একটা হাসির ব্যাপারই বটে।'

দেখ কাণ্ড! জাভার গালদুটো সঙ্গে সঙ্গে এমন দপ্ করে লাল হয়ে উঠল যেন সে চড় খেয়েছে।

মানুষের কখন যে কী মতিগতি হয়! দেখে মনে হয় দিব্যি বীরপুরুষ, অথচ সেই মানুষই কিনা কী যে হয়ে যায় ভগবানই জানেন -- কেমন যেন একটা ম্যাড়মেড়ে... আর কার জন্য? — না, কোথাকার কোন্ এক ঝুঁকপরা বকের জন্য... ছ্যাঃ!

সেবার কুনিশের পেছনে যখন আমরা অভিযান চালাই, যখন রবিন্‌সন ক্রুসো হয়ে জাভা জলার জঙ্গলে 'ফের পরীক্ষা' নামে নির্জন দ্বীপে পালিয়ে যায় তখন আমরা ঘটনাক্রমে কিয়েভের পাইওনীয়ারদের সঙ্গে পরিচিত হই। তাদের মধ্যে ছিল ভালকা নামে একটা মেয়ে — রোগা, ঠ্যাঙগুলো তার লম্বা লম্বা; আমার মতে, দেখতে আদৌ সুন্দর নয় (আমাদের ক্লাসের গানিয়া গ্রেবেনিউচকা ওর চেয়ে হাজার গুণ ভালো!)। তবে এটা হল আমার মত। কিন্তু জাভা... ভালকার উপস্থিতিতে জাভা দু' মিনিটের মধ্যে আর জাভা রইল না, স্রেফ বনে গেল একটা অখাদ্য বীটের মাথা। পাইওনীয়াররা কিয়েভে ফেরার মুখে জাভাকে ভালকা তার নিজের ঠিকানা দেয়, যাতে কুনিশের ব্যাপারটার শেষ পর্যন্ত কী পরিণতি হয় সে সম্পর্কে আমরা তাকে লিখি — জানার জন্য তার ভীষণ আগ্রহ।

কুনিশের ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটল আমাদের বিজয়ে। আমরা তখন বীরপুরুষ, বার কয়েক কিছুটা ঠাট্টার ছলে, কিছুটা গুরুত্ব দিয়েও বটে ভালকাকে চিঠি লেখার প্রসঙ্গ তোলে জাভা। 'ছ্যাঃ!' আমি বললাম। 'খেপেছিস নাকি তুই? দ্যাখ না, আমরা যখন ক্যাম্পে থাকি তখন বাড়িতেই ত চিঠি লিখি কালেভদ্রে, আর তুই কিনা চাস...' জাভার একার সাহস হল না চিঠি লেখার। তার ভয় হল পাছে ভুল করে বসে। তাকে যে ফের পরীক্ষায় বসতে হয়েছিল সেটা ভাষার জন্যই কিনা। অতএব চিঠির ব্যাপারে কোন সুবিধা হল না। ঠিকানাটা কিন্তু জাভা যত্ন করে রেখে দিয়েছিল। ওটা ও চিলেকোঠায় লুকিয়ে রেখেছিল, একদিন আমি দেখতে পেলাম ঠিকানাটা সে ফের পড়ছে, যেন ওটা একটা চিঠি। আমি অবশ্য ওকে কিছু বললাম না।

আমরা যখন কিয়েভ যাত্রা করলাম তখন আমি জানতাম যে আজ হোক কাল হোক ভালকার প্রসঙ্গ জাভা তুলবেই। কিন্তু সেটা যে এত তাড়াতাড়ি তা আমি ভাবতে পারি নি। টব নিয়ে যে কাণ্ড ঘটে গেল তাতে যদি দোষটা আমার না হত, তাহলে আমি সম্ভবত অত তাড়াতাড়ি হার মানতাম না। কিন্তু জাভা যে মুখের কথা থেকে আঁকা ছবি আর মিলিশিয়ার কথা ভুলে গেছে, এখন তাতেই আমি খুশি, তাই আমি আপসের মনোভাব গ্রহণ করলাম।

'অত মুসড়ে পড়ার কী আছে?' আমি বললাম। 'চাঙ্গা হয়ে ওঠ! ইগর, কর্ণধার সাশকো আর ভালকার সঙ্গে দেখা করতে পারলে অবশ্য বেশ মজাই হত। ওরা আমাদের কিয়েভ যা দেখাত না! ভালকার ঠিকানা যেন কী? আগে আমার মনে ছিল... কী এক অভ্যুত্থান স্ট্রীট না কী যেন?'

'জানুয়ারী অভ্যুত্থান স্ট্রীট,' বিড়বিড় করে বলল জাভা।

'আরে! এটাই ত সেই রাস্তা! এখানেই ত পাতাল রেলের স্টেশনের কাছে শুরু হয়ে চলে গেছে ঐদিকে, বড় মঠের দিকে। চলে আয়!'

জাভা বাঁকা হাসি হাসল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সাক্ষাতের জন্য জাভার ব্যস্ততা। কানমলা

কয়েক মিনিট বাদেই আমরা এসে পেঁছুলাম সেই বাড়িটাতে যেখানে ভালকাদের ফ্ল্যাট। ফ্ল্যাট খুঁজতে লাগলাম — কোথায় ফ্ল্যাট! গোটা দালান ঘুরে দেখলাম... সবার শেষ তলায় শেষ ফ্ল্যাট — আঠারো নম্বর, অথচ আমাদের দরকার পঁচিশ নম্বর। কী ব্যাপার? ভালকা কি তাহলে ঠকাল, ঠাট্টা করে একটা মনগড়া ঠিকানা দিল?.. জাভার চেহারা তখন এমন হয়েছে যে ওর দিকে তাকাতেও মন খারাপ লাগছিল। অবশেষে আমি ঠিক করলাম ঠাকুমা-দিদিমা গোছের কাউকে জিজ্ঞেস করব। জানা গেল পঁচিশ নম্বর ফ্ল্যাট আছে, তবে তাহলে উঠোনে যেখানে দ্বিতীয় দালান, সেইখানে।

'দ্বিতীয় না কী সব বার করেছে! কেবলই লোকের মাথা গুলিয়ে দেবার জন্য,' বাইরে রাগের ভাব দেখিয়ে গজগজ করলেও জাভা তখন মনে মনে খুশি।

সত্যি সত্যিই কিন্তু রাস্তার দিক থেকে যেমন দালান ছিল, উঠোনেও হুবহু তেমনি একটা বড় ছয়তলা দালান দেখা গেল। কী কারণে যে এটা দ্বিতীয় দালান, কে জানে?

আমরা যখন সামনের দরজায় ঢুকছিলাম তখন আমি লক্ষ করলাম পুরনো আমলের কাচের দরজার পাশ দিয়ে যেতে যেতে জাভা এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে কাচের ওপর তার নিজের চেহারাটা দেখে নিল এবং হাত দিয়ে সামনের চুলের গোছা পাট করল। আমি ভান করলাম যেন কিছুই দেখতে পাই নি।

তিনতলায় গিয়ে আমরা সহজেই পঁচিশ নম্বর ফ্ল্যাট খুঁজে পেলাম। দরজার গায়ে কলিংবেলের গোটা কয়েক বোতাম — ফ্ল্যাটে বোধ হয় অনেক পড়শী ভাগাভাগি করে থাকে। সিঁড়িতে আধা অন্ধকার, আমরা পায়ের পাতায় ভর দিয়ে দাঁড়াই বোতামের ওপরে লেখা নামগুলি পড়ার জন্য। এই যে ... 'মালিনভ্স্কিদের বেল্ বাজাবেন একবার!' এটাই বটে। ভালকার পদবী মালিনভ্স্কায়া। ঠিকই।

'বেল্ বাজা,' জাভা ফিসফিস করে বলল।

'তুই বাজা,' আমি ফিসফিস করে বললাম। কেন জানি না, পেটের ভেতরে কেমন একটা ঠাণ্ডা শিরশির ভাব অনুভব করলাম।

'আরে বাজা না! তুই যে আমার চেয়ে মাথায় উঁচু, তোর পক্ষে আরও সহজ,' চালাকি খাটায় জাভা।

'ঠিকানা দিয়েছে তোকে, তুইই বাজা!' আমিও হার মানার পাত্র নই।

'ধুত্তোর!' রেগে চাপা গলায় এই কথা বলে জাভা মনের জোর খাটিয়ে এগিয়ে গিয়ে কলিংবেল্ টিপল। দরজার ওপাশে ঝনঝন করে বেজে উঠল বেল্।

জাভা লাফিয়ে সরে গিয়ে আমার পিঠের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। আমার বয়েই গেছে আগ বাড়িয়ে দাঁড়াতে! আমিও লাফিয়ে একপাশে সরে যাই, চেষ্টা করি জাভাকে সামনে ঠেলে দিতে।

তখনই ঘটে গেল এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। দেয়ালের আড়াল থেকে ভূতের মতো হুস করে কে যেন এক বিশাল পুরুষ্টু হাত বাড়িয়ে দিয়ে চেপে ধরল জাভার কান। ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা ভাঙা ভাঙা গলা গোটা সিঁড়ি সচকিত করে তুলে এমন

হুংকার দিয়ে উঠল যে প্রতিধ্বনি সিঁড়ির একেকটি ধাপ ডিঙিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে চলল নীচে।

'হুঁহুঁ! ধরা পড়েছে! ধরা পড়েছে শেষকালে!'

জাভা ত কানমলা খাচ্ছে, তাই তার কথা আর না-ই বললাম, কিন্তু ঘটনার আকস্মিকতায় আমি নিজেই কাঠ হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকি, নড়তে চড়তেও পারি না।

এদিকে ভয়ংকর গলা তর্জন-গর্জন করেই চলেছে:

'এই বার বোঝা গেল কে বদমাইশি করছে! কে বারবার বেল্ টিপে পালিয়ে যাচ্ছে!.. এদিকে বেচারি দিদিমা মিছিমিছি তার বুড়ো পায়ে কষ্ট করে উঠে এসে দরজা খুলবে! এই বার মজাটা টের পাবি তোরা!'

এই সময়ই আবার দরজার ওপাশ থেকে শোনা গেল ভালকার রিনরিনে গলা:

'কে?'

এই রে! আমি জাভার দিকে আতংকগ্রস্ত দৃষ্টিতে তাকালাম। জাভা তার সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে এমন মরিয়া হয়ে এক হেঁচকা টানে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুট দিল যে কানটা যদি ভদ্রলোকের হাতে থেকে যেত, তাহলেও সে তাঁর হাত ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসত। কান ত তুচ্ছ! সেই মুহূর্তে নিজেকে ছাড়িয়ে আনার জন্য আধখানা মাথা, এমন কি অর্ধেক ধড়টাও দিয়ে দিতে জাভার কোন আপত্তি ছিল না — যেটুকু থেকে যায় অন্তত তাই নিয়েও ভালকার দৃষ্টি থেকে দূরে কোথাও সরে পড়তে পারলেই হল।

তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখ দেখি: যে সাক্ষাতের জন্য এত প্রতীক্ষা তার

শুরুতেই কিনা তোমাদের ভালকা দেখতে পাবে (হা ভগবান!) কোন এক ইয়া ষণ্ডা একটা নোংরা কুকুরছানার মতো তোমার কান ধরে রেখেছে। অরা তুমি, মাথা নীচু করে করুণ অবস্থায় ঝুলছ নিজের কানে, মাটিতে তোমার পা অবধি স্পর্শ করছে না। এই যে তুমি, যে কিনা এত স্বপ্ন দেখছিলে সেই উত্তেজনাপূর্ণ জমকাল ক্ষণটির, যখন দরজা খুলে যাবে... চৌকাঠে এসে দাঁড়াবে সে, খুশিতে অবাক হয়ে গিয়ে তার চোখের ঘন ঘন পাতায় কাঁপন দেখা যাবে, তার চোখজোড়া উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, গালে গোলাপী ছোপ ধরবে। সে বলবে: 'আরে!' তার পরে: 'এসো, এসো! তুমি নাকি? ওঃ, কী ভালোই যে লাগছে!' গোটা ব্যাপারটা হবে এতই সুন্দর...

অথচ তা না হয়ে কিনা...

আমরা কামান থেকে ছোঁড়া গোলার মতো গড়গড় করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলাম, লাফ দিয়ে গিয়ে পড়লাম উঠোনে, তারপর রাস্তায়, পিছু ফিরে না তাকিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম পুরো একটা মহল্লা। যখন আমরা নিশ্চিন্ত হলাম যে কেউ পিছু ধাওয়া করছে না, একমাত্র তখনই আমরা ঘন ঘন নিশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে স্বাভাবিক পা ফেলতে লাগলাম।

আমরা পথের কোন মাথামুণ্ডু না বুঝেই চলছিলাম, চুপচাপ চলছিলাম।

জাভার চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ছিল। সে চোখমুখ কুঁচকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। কিন্তু আমি সবই বুঝলাম। এটা নেহাৎই যান্ত্রিক কারণবশত। কেবল কানটা যেন কেমন করে যুক্ত হয়ে আছে শরীরের সেই অংশের সঙ্গে যেখান থেকে তৈরি হয় চোখের জল। আর কান যদি জোরে মলে দেওয়া যায়, তাহলে চোখের জলও বেরিয়ে আসে আপনাআপনিই। তার মানে এই নয় যে লোকটা কাঁদছে। জাভা কক্ষণও কাঁদত না!

জাভার কান ফুলে ঢোল হয়ে গেছে আর টকটক করছে জবা ফুলের মতো।

বলাই বাহুল্য, এমন কান নিয়ে আবার সাক্ষাৎপ্রার্থী হওয়ার চেষ্টা করার কোন প্রশ্নই আসে না।

আমরা বেশ বুঝতে পারছিলাম কী ঘটেছে। একটা সাংঘাতিক ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে: স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে কোন এক বখাটে ছোঁড়া মজা করে ফ্ল্যাটের কলিংবেল টিপে পালিয়ে যাচ্ছিল। আর আমরা যখন বেল্ টিপছিলাম তখন দৈবাৎ এক ভদ্রলোক ঐ দিকে এগিয়ে আসতে আসতে দরজার কাছে আমাদের

চাঞ্চল্য লক্ষ্য করে মনে মনে ভেবে নিয়েছিলেন যে আমরা হলাম বদমাশ। আমরা বুঝতে পারলাম যে ঘটনাটা ঘটেছে ভুলক্রমে, কিন্তু তাতে আমাদের মন হালকা হল না। বিশেষত জাভার। কানের জন্য ততটা নয়, যতটা এই কারণে যে ভালকার সঙ্গে দেখা করা হল না, আর এখন সে বলতে পারে আদৌ কখনও দেখা হবে কিনা।

আমার ভয় হচ্ছিল যে গোটা ব্যাপারটার জন্য ও দোষ দেবে আমাকে: কেননা আমি যদি তার কথামতো সঙ্গে সঙ্গে বেল্ টিপতাম এবং ওকে যদি সামনে ঠেলে না দিতাম, তাহলে হয়ত কিছুই ঘটত না। কিন্তু জাভা মহত্ত্ব দেখাল, ও সেসব কিছুই বলল না, কেবল থেকে থেকে চোখের জল মুছতে লাগল।

আমার ইচ্ছে হচ্ছিল হাসিঠাট্টা করে ওকে খুশি করে তুলি, কিন্তু অনেকক্ষণ ভেবেও কূল পেলাম না কী ভাবে তা করা যায়। শেষকালে আমি বললাম:

'ওঃ, যার জন্য আমাদের এই হাল হল সেই শুয়োরটাকে যদি ধরতে পারতাম, তাহলে ওর কান ধরে এমন বেল্ বাজাতাম যে যেখানে সেখানে বেল্ বাজানোর সাধ মিটে যেত, তিন দিন ধরে ওর মাথার ভেতরে ভোঁভোঁ করে বেল্ বাজতে থাকত! তাহলে বাছাধন টের পেত ইয়ার্কি মারার ফল! ওঃ, ওটাকে এমন শিক্ষা দিতাম!'

কিন্তু আমার নির্ভীক মনোভাব জাভার ওপর কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল না। আমি ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

আমরা খাড়াইয়ের ওপরকার পার্কগুলির ভেতর দিয়ে ঘুরে একটা ছোট পুল পার হয়ে 'দ্নিপ্রো' সিনেমা হলে এসে পেঁছুলাম।

'এই ত!' সমুদ্র অভিযানকারী নাবিক ডাঙা দেখলে যেমন খুশিতে চিৎকার করে ওঠে সেই ভাবে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। 'আয় সিনেমা দেখতে যাই! কাকীমা যে বিশেষ করে এই জন্যই আমাদের পয়সা দিয়েছেন। চলে আয়!'

কিন্তু জাভা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে গম্ভীরভাবে বিড়বিড় করে বলল:

'ইচ্ছে করছে না!'

'ঠিক করছিস না কিন্তু,' আমি বললাম। 'এই কান নিয়ে লোকজনের সামনে শোভাবর্ধন করার চেয়ে ঘণ্টা দেড়েক অন্ধকারের মধ্যে সিনেমা হল-এ বসে থাকা ভালো। এর মধ্যে কানও স্বাভাবিক হয়ে যাবে।'

জাভা আগের মতোই আমার দিকে না তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল:

'চল্!'

মুহূর্তের মধ্যে আমি কাউন্টারের দিকে ছুটলাম টিকিট কিনতে।

আমরা যে ছবিটি দেখলাম তার নাম 'সাতজন বীরপুরুষ' — মেরু অভিযানকারীদের বীরত্বপূর্ণ কীর্তি সম্পর্কে ফিল্ম। ছবিটায় সর্বক্ষণ ক্ষিপ্র হয়ে ছুটে চলেছে তুষার-ঝঞ্ঝা আর ছবির নায়কেরা আপাদমস্তক লম্বা লম্বা জমাট বরফের কাঠিতে ঢাকা হয়ে বীরদর্পে হুমহুম করে উঠছে বরফের পাহাড়ে, তুষারের ভেতরে ডুবে যাচ্ছে, একে অন্যকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে চলেছে। এতে জাভার মেজাজ খানিকটা প্রফুল্ল হল। আমরা যখন সিনেমা হল্ থেকে বেরিয়ে এলাম তখন আর তার চোখে আগের মতো নৈরাশ্যজনক বিষাদ আর হাল ছেড়ে দেওয়া ভাব দেখা গেল না, যদিও কানের চেহারা তেমন একটা সুবিধার ছিল না।

পেটের ভেতরে আমি একটা অপ্রীতিকর খিঁচ ধরা শূন্যতা অনুভব করছিলাম — আমার খিদে পাচ্ছিল, আশা ছিল যে এখন বাড়ি যাব। কিন্তু জাভা সে কথা কানেই তুলল না — তার ভয় ছিল যে কাকীমা জিজ্ঞেসাবাদ শুরু করে দেবেন। কী আজব ছেলে রে বাবা! পড়ে গিয়ে চোট পেয়েছি কিংবা লোকেঠাসাঠাসি বাস-এ দরজার ফাঁকে চিপটে গেছে, নয়ত আরও কিছু — কিছু একটা ভেবে বার করা এমন কী কঠিন! কিয়েভের মতো এক বড় শহরে লোকে কত দুর্ঘটনায় ত পড়তে পারে! কিন্তু জাভাকে বুঝিয়ে টলাতে পারলাম না আমি। আমরা দুজনে চৌরাস্তা ধরে নীচের দিকে চলতে লাগলাম। ভ্লাদিমির টিলার কাছাকাছি এসে 'আইসক্রিম' প্যাভিলিয়ন দেখতে পেয়ে জাভা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। হাত দিয়ে সন্তর্পণে কানটা ধরে সে আমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল:

'ঠাণ্ডা জিনিস লাগালে হয়ত একটু আরাম হত... কী বলিস? অ্যাঁ?'

আমি আমার বুকের পকেট ছুঁয়ে দেখলাম, কাঁধ ঝাঁকালাম। ও কীসের ইঙ্গিত করছে আমার বুঝতে বাকি ছিল না। কাকীমার দেওয়া পয়সাগুলি আমরা ইতিমধ্যে সিনেমার পেছনে খরচ করে বসে আছি। অবশ্য আমাদের আরও পয়সা ছিল। আমার বুকের চোরা পকেটে, লাইনিং-এর ভেতরে তিন রুবলের নোট ছিল। আমরা পুরো ছয়মাস ধরে ওটা জমিয়েছি, ওটার ওপর আমাদের বিরাট আশাভরসা ছিল। আমরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে এটাই ঠিক করেছিলাম যে ঐ টাকাটা খরচ করব কোন দারুণ আকর্ষণীয় বস্তুর পেছনে অথবা হেলিকপ্টারে চেপে কিয়েভের ওপর

ঘোরা, কিংবা ষোল বছর পর্যন্ত বালক-বালিকার প্রবেশ নিষেধ মার্কা কোন ফিল্‌ম দেখার মতো নিষিদ্ধ আনন্দ উপভোগের পেছনে, যার জন্য কাকীমা পয়সা দেবেন না। আর জাভার স্বভাবচরিত্র যেহেতু আমার চেয়ে হালকা ধরনের, সেই হেতু এই তিন রুবল সে আধঘণ্টার মধ্যে ফুঁকে দিতে পারে বলে আমরা ঠিক করেছি যে ওটা থাকবে আমার জিম্মায় এবং খরচ করা হবে আমরা দুজনে এক যোগে রাজী হলেই।

এদিকে জাভা কিনা ইঙ্গিত করছে ঐ তিন রুবল থেকে আইসক্রিমের পেছনে যেন খরচ করা হয়! আইসক্রিম খাওয়ার বাসনা আমারও আছে, কিন্তু ওটা ত আর আইসক্রিমের পেছনে খরচ করার জন্য আমরা বাঁচিয়ে রাখি নি... অথচ জাভা আজ দুর্দশায় কষ্ট পাচ্ছে, ঐ ত কানটা কী ভাবে চেপে ধরে আছে! চোখের দৃষ্টিটাও বড় করুণ। আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে শেষ পর্যন্ত 'আইসক্রিম' প্যাভিলিয়নের দিকে চলি। জাভাও চলে আমার পেছন পেছন। টেবিলের ধারে বসি, অর্ডার দিই একশ' গ্রাম করে সবচেয়ে শস্তার আইসক্রিম। যাক গে, ভাগে পড়বে ত তেরো কোপেক করে! তাতে ফতুর হয়ে যাব না...

আমরা একাগ্র মনোযোগ সহকারে খেতে থাকি, খেতে খেতে মুখে চুমকুড়ি কাটি, চামচ চাটি। জাভা থেকে থেকে ঠাণ্ডা চামচ কানে ঠেকায়। কিন্তু একশ' গ্রাম এমন একটা কী! তিন মিনিটের মধ্যে সামনের বাটিদুটো চাটতে চাটতে চাঁছাপোঁছা হয়ে গেল, আয়নার মতো চকচক করতে লাগল আর তাতে পড়ল আমাদের ঝুঁকে পড়া নাকের প্রতিফলন। জাভা করুণভাবে তার কানে হাত বুলাচ্ছে। কানের জন্য আত্মত্যাগের প্রয়োজন। আমি ঠোঁটের মিষ্টি চাটি, মরিয়া সঙ্কল্প করে বসি (সেতু থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো) — দুটো প্লাম-আইসক্রিম অর্ডার দিই।

ওঃ, কিয়েভের আইসক্রিমের কী স্বাদ, কী দারুণ স্বাদ!

তোমরা ভাবছ প্লাম-আইসক্রিমে জাভার কান শান্ত হল বুঝি? মোটেই নয়। প্লাম-আইসক্রিমের পর এলো চকোলেট-আইসক্রিম, তারপর চেরি আর ফলের, তারপর বাদামের। আর প্রতিটি ভাগের সঙ্গে যোগ কর আরও এক গেলাস করে সিরাপ জল। জাভার কানের জন্য আমাদের বড় রকমের খেসারত দিতে হল! আমাদের তিন রুবলের নোটটা পুরো খরচ হয়ে গেল। রয়ে গেল মাত্র কয়েকটা কোপেক। দাম দিতে গিয়ে আমি প্রায় কেঁদেই ফেললাম।

আমরা দোকান থেকে যখন বেরোলাম তখন আমাদের পা টলে উঠল।

তারপর পাক্কা আধঘণ্টা দোকানের পাশের বেঞ্চিতে চুপচাপ বসে রইলাম। তারিয়ে তারিয়ে সুখ উপভোগ করতে লাগলাম। আহা, রোজ যদি আইসক্রিম দিয়ে দুপুরের খাওয়া সারা যেত! সকালের খাওয়া, এমন কি রাতের খাওয়াও!

হঠাৎ বাঁ দিকে তাকিয়ে জাভা বলল:

'ওখানে ওটা কী, বলতে পারিস?'

''শয়তানের চরকি',' আমি বললাম।

'তাহলে আমরা আর বসে আছি কেন?'

'চল্, যাওয়া যাক।'

'পয়সা-কড়ি আছে আমাদের?'

'এটার জন্যে হবে 'খন।'

আর যাই হোক তাই হোক, 'শয়তানের চরকির' পেছনে শেষ কপর্দক খরচ করতে আমি অন্তত পিছপা নই। আমার পক্ষে এটা অত্যন্ত দরকার। আমি যে পাইলট হওয়ার উদ্যোগ করছি!

আমরা ঠিক সময়মতো এসে হাজির হলাম। শেষ কেবিনটা খালি ছিল। আমরা বসামাত্রই চরকি চলতে শুরু করল। ওঃ, কী দারুণ! উঠছে ত উঠছেই!.. ভেতরের সবকিছু যেন পুরো বেরিয়ে এসে নীচে চলে যাচ্ছে। ঠিক যেন এরোপ্লেনে! ওপরে ওঠার সময় মনে হয় যেন এরোপ্লেন মাটিতে নামছে। নীচের দিকে নামার সময় — যেন এরোপ্লেন ঊর্ধ্বগতিতে চলেছে (হাজার হোক, আমি এরোপ্লেনে চেপেছি — তোমরা ভাবছ কী! — 'ভুট্টাচাষী' নামে যে কৃষি-বিমান আমাদের মাঠে কীটনাশক ছড়ায় তাতে চেপেছি)।

তায় আবার এই চরকিটা দাঁড়িয়ে আছে নীপারের পাড়ে উঁচু খাড়াইয়ের ওপর। এখান থেকে দেখা যায় অনেক অনেক দূর, ঠিক যেন এরোপ্লেন থেকে। নীচে পদোল আর নীপার, আর বাঁ দিকের উপকূলের বিস্তার, প্রসারিত হতে হতে চলে গেছে সেই দিগন্ত অবধি। ঐ যে ওখানে ত্রুখানভ দ্বীপ... স্নানের ঘাট। ওঃ, কত যে লোক ওখানে! বালু পর্যন্ত চোখে পড়ে না। আর পা ফেলার ত বোধ হয় কোন জায়গাই নেই। ওখানে লোকে একে অন্যকে চাপা না দিয়ে কী করে থাকতে পারে!

ও হো! আরে, গাছপালার মাঝখানে এটা কী?.. আমি যে আর সামলাতে পারছি না গো! আরে, এটা যে প্যারাসুট টাওয়ার! ঠিকই! তাই ত দেখছি!

ওঃ, এই মিনার থেকে যদি ঝাঁপ দিতে পারতাম! ঝাঁপ না দিয়ে আমার কোন উপায় নেই। পাইলটের পক্ষে প্যারাসুট নিয়ে ঝাঁপ দেওয়া — নাবিকের সাঁতার কাটারই সামিল।

'জাভা!' আমি বললাম। 'দেখছিস ঐ মিনারটা? চল্, ওখান থেকে ঝাঁপ দেওয়া যাক!'

'চল্! এ আর এমন কি?' জাভা সঙ্গে সঙ্গে রাজী। পাইলট হওয়ার কোন বাসনা যদিও ওর নেই, কিন্তু কোন জায়গা থেকে ঝাঁপ দেওয়া, আগ বাড়িয়ে কোথাও ছুটে যাওয়া, কোন কাণ্ডকারখানা বাধিয়ে তোলা — এসব ব্যাপারে তার কখনও 'না' নেই!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্নানের ঘাট। নাগরদোলা। জলডুবি। তেরো নম্বর ফ্ল্যাটের অচেনা লোকটি

আমরা শেষকালে সিঁড়ি দিয়ে ছুটতে ছুটতে 'আমুদে শহর' থেকে চললাম নীচে, উপকূলের দিকে। দিব্যি সিঁড়ি। তবে বড় বেশি লম্বা। নীচের দিকে দৌড়ুচ্ছি বটে, তবু হাঁপ ধরে যায়।

'দৌড়ানোর কী আছে? সময় চলে যাচ্ছে নাকি?' আমি বললাম, আর নিজে মনে মনে ভাবি: 'ঝাঁপ দিতে হলে আগে থেকে শক্তি খরচ করলে চলবে না। কে জানে; শেষটায় কেমন দাঁড়াবে। হাজার হোক, প্রথম বার ত!'

আমরা গতি কমিয়ে দিয়ে পা ফেলে ফেলে চললাম।

নীচে যা দেখতে পেলাম সেটা না তোরণ, না কুঞ্জ — এটা আবার কী রে বাবা? তার ওপরে একটা থাম, থামের মাথার দিকটা কেমন যেন চওড়া।

'দাঁড়া,' জাভা বলল, 'এখানে কী যেন লেখা আছে।'

জাভা যে-কোন ঐতিহাসিক স্মারক ও স্মৃতিস্তম্ভের ওপরকার লেখা পড়তে ভালোবাসে। আমরা এগিয়ে গেলাম। দেয়ালে একটা স্মৃতিফলক গাঁথা, তাতে লেখা আছে:

স্মৃতিচিহ্ন
কিয়েভকে ম্যাগডেবুর্গীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের
অধিকার*) দানের নিদর্শনস্বরূপ
১৮০২ সালে নির্মিত
স্থপতি
আ. ন. মেলেন্স্কি

এটা যে একটা স্মৃতিচিহ্ন হতে পারে, কখনও ভাবতেই পারতাম না! স্মৃতিচিহ্ন বলে যা তৈরি হয়ে থাকে তা হয় কোন ঘোড়সওয়ার বা পদাতিক সৈন্য, সব সময়ই কোন না কোন বীরপুরুষ... সেনানায়ক বা প্রতিভাবান কোন লোকটোক। আর এখানে কিনা কোথাকার কোন্ মাগডেবুর্গীয় অধিকার! বোঝ কান্ড!..

স্মৃতিফলকের লেখাটাই একমাত্র লেখা নয়। এছাড়া আরও অসংখ্য লেখা ওখানে ছিল। তবে সেগুলি হাতে লেখা, আর তাদের উদ্ভব অনেক পরবর্তী কালের। গোটা 'মাগডেবুর্গীয় অধিকার' 'কোলিয়া+ওলিয়া=প্রেম', 'ভাসিয়া+তাসিয়া= প্রেম', 'ইউরা+নিউরা=প্রেম' ইত্যাদি মোটামুটি একই ধরনের কতকগুলি ফর্মুলায় ঘন কণ্টকিত হয়ে ছিল।

কে আবার একজন যেন ইয়া গোদা গোদা অক্ষরে, মাটি থেকে একেবারে মিটার তিনেক উ'চুতে ধেবড়ে লিখেছে তার ফর্মুলা: 'জেকা+লিওখা=প্রেম'। এর জন্য বাড়ি থেকে সম্ভবত তাকে মই নিয়ে আসতে হয়েছিল। অত লম্বা শরীর ত আর তাই বলে ওর হতে পারে না! সাধারণ মানবীয় ভাষায় লোকটার নাম নির্ঘাত আলিওশা, আর মেয়েটার নাম জেনিয়া; বোকাটা লিখেছে রুশীতে, কিন্তু তার জানা ছিল না যে ইউক্রেনীয় ভাষায় 'লিওখা' মানে 'শুয়োর'। দাঁড়াচ্ছে এই যে নিজেই নিজেকে শুয়োর আখ্যা দিয়েছে।

ওখানে যারা লিখেছিল তাদের কেউই যে হাতের লেখায় ভালো নম্বর পায়

ি সেটা স্পষ্ট — এমনই কাকের ঠ্যাঙ বগের ঠ্যাঙ তারা ছড়িয়ে রেখেছে! তাছাড়া এও স্পষ্ট যে তারা একে অন্যকে ভালোবেসে থাকলেও অন্য কাউকেই ভালোবাসত না, কেননা থামটাকে তারা এমন কদর্য করে রেখেছে যে তাকিয়ে দেখা যায় না।

'কেন যে ওদের অক্ষরজ্ঞান দেওয়া হয়েছিল!' জাভা ব্যথিত স্বরে বলল।

'দেখ, কে কাকে বলে! ওরে আমার জাভা রে, তুইই না স্কুলের পেছনের চালাঘরের গায়ে অ্যাসিস্‌টেণ্ট টীচার সাভ্‌ভা কনোনভিচের বিরুদ্ধে চক দিয়ে নানা স্লোগান লিখে রেখেছিলি?' আমি মনে মনে ভাবলাম। কিন্তু বলি বলি করেও বললাম না। আমি নিজেও ত আরেক পাপী: বেড়ার গায়ে আজেবাজে কত কিছুই লিখেছি। অথচ দেখ দেখি, এটা কেমন খারাপ। না, আর কখনও করব না!

মহৎ অনুভূতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা চললাম গ্রুখানভ দ্বীপের অভিমুখী পথচারী চলাচলের রাস্তার দিকে। সেতুর ওপর দিয়ে অবিরাম ধারায় চলেছে জনস্রোত। কোথায় চলেছে এরা? ওখানে যে এমনিতেই না আছে দাঁড়ানোর না আছে বসার ঠাঁই... ওঃ, আজ কেউ না কেউ চাপা না পড়ে যায় না। প্রাণহানি না হয়ে যায় না!

প্রাণহানি... প্যারাসুট টাওয়ারের যত কাছাকাছি আসি, ততই আমার বুকের ভেতরে বিশ্রী নোংরা পিছলে, ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা কী যেন একটা ক্রমেই বেশি করে কিলবিল করতে থাকে। হাজার হোক, উঁচু বটে, মূর্তিমান কলেরা!.. এ তোমার উইলো নয়, যার ডাল থেকে আমরা নদীতে ঝাঁপ দিই। প্যারাসুট না খুললেই চিত্তির — ধপাস্‌! — সঙ্গে সঙ্গে অক্কা...

আচ্ছা, জানতে ইচ্ছে করে প্যারাসুট টাওয়ারে প্যারাসুট খুলল না এমন ঘটনাও কী ঘটে?.. ওখানে কি দুর্ঘটনা ঘটে? আর প্রাণহানি...

আমরা সেতু পার হয়ে বাঁয়ে, টাওয়ারের দিকে মোড় নিলাম। জানতে ইচ্ছে করে, জাভা এখন কী ভাবছে। দিব্যি দেখি খোশমেজাজে চলেছে, বেশ খোশমেজাজে। রাশভারী প্রকৃতির লোকেরা প্রথমবার প্যারাসুট নিয়ে ঝাঁপ দিতে এই ভাবে যায় না।

আমি প্যারাসুট টাওয়ারের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখি। ওখান থেকে কেউ ঝাঁপ-টাঁপ দিচ্ছে এমন কোন লক্ষণ ত দেখছি না। এমনও ত হতে পারে যে আজই কোন প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে... আর আমরা দুটো বোকা কিনা চলেছি...

বুদ্ধিমান লোকেরা ঐ ত খেলছে পিং-পং, টেবিল টেনিস — দিব্যি নিরাপদ

খেলা, জীবনের পুরোপুরি গ্যারান্টি দেয়। বিশটা টেবিল দাঁড় করানো আছে, সাদা রঙের প্লাস্টিকের বলগুলি তার ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে বৃষ্টির ছাটের মতো।

আর এই হল প্যারাসুট টাওয়ার। দেখ দেখি — কিছুই নেই। প্যারাসুটের নামগন্ধ নেই। যে কাছিতে প্যারাসুট ঝুলে থাকার কথা, সেটা ওপরে কোথায় যেন ছুঁড়ে ফেলে রাখা হয়েছে।

টাওয়ারের কিছু দূরে গাছতলায় প্রায় আদুল গায়ে ক্যাম্বিশের প্যান্ট পরনে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বসে ছিলেন। ভদ্রলোকটি জাঙ্গিয়া না পরে যে প্যান্ট পরে বসে ছিলেন তা থেকেই আমি ভেবে নিলাম যে উনি কর্তৃপক্ষের কেউ হবেন।

আমি এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম:

'দয়া করে বলবেন কি টাওয়ারটা চালু আছে কিনা?'

ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে খ্যাঁক-খ্যাঁক করে বললেন:

'চালু না থাকার কী আছে? চালু ত আছেই। কেবল দেখতেই ত পাচ্ছ প্যারাসুট নেই। বলছে, কেউ নাকি চুরি করেছে। অথচ প্যারাসুট ছাড়া ওখান থেকে লাফ দেওয়া বিপজ্জনক। তবে হ্যাঁ, তোমরা চেষ্টা করে দেখ হে, ছেলেরা। আমি দেখতে পাচ্ছি তোমরা এমন বীরপুরুষ যে প্যারাসুটের কোন দরকার নেই তোমাদের।'

আমরা বুঝতে পারলাম যে ভদ্রলোক ঠাট্টা করছেন। চালু নেই, অবশ্যই চালু নেই টাওয়ারটা... হুর্-র...

'কী আফশোসের কথা,' আমি বললাম।

টাওয়ারের কাছাকাছি ছিল নাগরদোলা। আমি প্রথমে ভাবলাম সচরাচর যেমন হয়ে থাকে তেমনি কোন নাগরদোলা-টোলা হবে। পরে ঠাহর করে দেখলাম, — না না, মোটেই সাধারণ নয়। একটা উঁচু লোহার থামের ওপর বিশাল এক চাকা বসানো আর সেই চাকার গায়ে লম্বা লম্বা শেকল থেকে ঝুলছে বসার আসন। চাকাটা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে আসনগুলিও পাক খায় এক পাশে সরে গিয়ে, একটা টিনের কৌটো তারে ঝুলিয়ে মাথার ওপর ঘোরাতে থাকলে যেমন হয়।

আমি জাভার দিকে তাকিয়ে বললাম:

'হয়ে যাক, কী বলিস?'

'হয়ে যাক।'

আমরা শেষ কপর্দক পর্যন্ত ঝেড়েঝুড়ে বার করলাম। দাম দিলাম। উঠে বসলাম। নাগরদোলা চলতে শুরু করল। গোড়ায় আস্তে আস্তে। পরে ক্রমেই বাড়তে থাকল তার গতি।

'ও হো-হো-হো-ও!' আমি চেঁচালাম।

ভসভসিয়ে আনন্দ বেরিয়ে আসছে। ওঃ, কী দারুণ নাগরদোলা! তুমি যেন পাখির মতো শূন্যে উড়ছ, যেন কোন কিছুর ওপরই তোমার ভর নেই... উঃ-উঃ-উঃ!..

'ঘর্-র্-র!' আওয়াজটা করলাম আমি, ইঞ্জিনের ঘর্ঘর আওয়াজ নকল করে। যেন শব্দের চেয়ে দ্রুতগতি কোন জঙ্গী বিমানে চেপে উড়ছি। 'গুড়ুম্-গুড়ুম্-গুড়ুম্!..' মেশিনগান থেকে আমি গুলি করি জাভাকে লক্ষ্য করে।

জাভা ফিরে তাকায়, সঙ্গে সঙ্গে সেও শুরু করে:

'গুড়ুম্-গুড়ুম্-গুড়ুম্!..'

'সামাল, এবারে ধাক্কা মারলাম!' জাভার দিকে উড়ে আসতে আসতে আমি চেঁচিয়ে বললাম — তারপরই দুম্ করে ওকে ধাক্কা মারলাম পেছন থেকে। ও আমার কাছ থেকে ছিটকে সরে গেল। তারপর ও উড়ে আসে আমার দিকে — দুম্ করে মারে আমাকে! — সঙ্গে সঙ্গে আমিও ছিটকে সরে যাই।

ই-ইঃ! একেই বলে নাগরদোলা! ওঃ, এই না হলে নাগরদোলা! কোন দুর্ঘটনার আশঙ্কা নেই তোমার! কোন প্রাণহানির আশঙ্কা নেই! এমনই শেকল যে একটা বলদকে পর্যন্ত ধরে রাখা যায়।

ওঃ, এমন যদি কেবল ওড়া যেত... সারাটা দিন যদি ওড়া যেত!..

এদিকে হঠাৎই গতি কমে এলো... আরও কমে এলো... শেষে একেবারে যাকে বলে স্টপ্!

'হয়ে গেছে! নেমে পড়!'

'যাঃ বাবা! এত কম?'

'আরও যদি চাও, কোন আপত্তি নেই — পয়সা দাও, নাগরদোলায় পাক খাও যত খুশি।'

প-য়-সা! কোথায় আর পাব এই পয়সা, যখন তা চলে গেছে এখানে, আমাদের পেটে! কেন যে এত আইসক্রিম গিলতে গেলাম আমরা! আমরা ত আরও দু-তিন

ভাগ কম খেলেও খেতে পারতাম! নাগরদোলায় খরচ ঠিক পুষিয়ে যেত। এখন এই বিতিকিচ্ছিরি আইসক্রিমের জন্য ওড়ার এমন মজাটা বাদ দিতে হচ্ছে। অথচ আমার পক্ষে এটা খুবই দরকারী ছিল।

এঃ, কী বোকা আমি, কী বোকা! জাভার কান না হয় জাভার দরকার! কিন্তু আমার কী? আমার তাতে কী? আমার নিজের জন্য সাশ্রয় করতে পারলেও ত হত। জাভা না হয় একাই খেত। আমাদের ভাসিউকোভ্‌কায় কি আর আইসক্রিমের অভাব আছে? কিন্তু এমন নাগরদোলা? — কবে বসানো হবে কে জানে? ততদিনে আমি ত বড়ই হয়ে যাব...

জাভা আমার মনের অবস্থা দেখে সমবেদনায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল:

'চল্‌, অন্তত জলে নেমে চান করা যাক...'

'ধুৎ!' আমি হতাশ ভঙ্গিতে হাত নাড়লাম। 'চান করে কী হবে আমার! কিয়েভে আমি চান করতে এসেছি নাকি? বাড়িতেই ত আমি কত চান করতে পারি... তাছাড়া এখানে চান করার জায়গা কোথায় শুনি? লোকজনের মাঝখানে পথ-টথ হারিয়ে ফেলবি, যেমন হয় বনের মধ্যে। জল পর্যন্ত পৌঁছুতেই পারবি না। আর পাড়ের কাছে ত জল বলে কিছু নেই — কেবল লোক আর লোক...'

কিন্তু ওটা আমি অমনিই বললাম, মনের খেদটা কোন কিছুর ওপর ঝাড়বার জন্য। কিয়েভের স্নানের ঘাটে এসে স্নান না করে থাকতে পারে নেহাৎই কোন অসুস্থ বা বিকৃতমস্তিষ্কের লোক। বিশেষত এমন আইঢাই গরমে। আমরা তাই পথ কেটে চলতে লাগলাম জলের দিকে।

লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড় কাকে বলে তার সঠিক ধারণা আমার নেই। কিন্তু মনে মনে যদি ধারণা করতে হয়, তাহলে সম্ভবত কিয়েভের স্নানের ঘাট স্মরণ করা দরকার। আমার মতে, সেখানে লাখ দশেকের কম লোক ছিল না। বিশ্বাস না হলে যাচাই করে দেখতে পার।

জায়গাটা দেখতে লাগছিল কোন এক বিশাল বাজারের মতো। তবে সবাই বিবস্ত্র আর বিকিকিনিও কেউ করছে না। একসঙ্গে এত বিবস্ত্র লোক আমি জীবনে দেখি নি। দেখেছি একটা, দুটো, বড়জোর তিনটে... আর হ্যাঁ, ডজন দু-তিনেক — সাধারণ স্নানঘরে। কিন্তু এখানে কয়েক লক্ষ বিবস্ত্র লোক! এমন যে হতে পারে বিশ্বাসই করা যায় না।

সেকালের লোকেরা যে নরকের অগ্নিকুণ্ডের কথা ভেবেছিলেন ওটা তাঁদের আদৌ কল্পনা নয়। সেই অগ্নিকুণ্ড আর কী অগ্নিকুণ্ড! গরমকালে ছুটির দিনে কিয়েভের স্নানের ঘাট — হ্যাঁ, একেই বলে আসল নরকের কুণ্ড! এখানে লোকে সত্যি সত্যি রোদে পুড়ে ভাজা-ভাজা হয়ে যায়। অর্ধেক লোকই নাঙ্গা হয়ে, চোখ বন্ধ করে, চুপচাপ মড়ার মতো স্থির হয়ে পড়ে আছে। কেবল তাদের পেটের ওঠা-পড়া দেখে বোঝা যাচ্ছে যে তারা এখনও বেঁচে আছে, এখনও নিশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলছে। বাকি অর্ধেক অনবরত এটা-ওটা খেয়ে চলছে — চিবুচ্ছে, গিলছে, কচরমচর করছে, তিনকোনা প্যাকেট থেকে দুধ খাচ্ছে, বোতল থেকে বীয়ার ও লেমোনেড খাচ্ছে।

মনে হয় এই বাকি অর্ধেক বোধ হয় বিশেষ করে খাওয়ার জন্যই এসেছে স্নানের ঘাটে। মাত্র সামান্য কিছু সংখ্যক লোক দাপাদাপি করছে জলে। কিন্তু শরীরের চাপে নীপারের অর্ধেক জল ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার পক্ষে এই কিছু সংখ্যক লোকই যথেষ্ট। নগণ্য সংখ্যক আরও একটি অংশ সর্বক্ষণ কোথায় যেন চলেছে। চলেছে লোকজনের শরীর ডিঙিয়ে, কারও হাত, কারও পা, কারও বা মাথা এবং দেহের অন্যান্য অংশ মাড়িয়ে। কিন্তু এই নগণ্য অংশটিও রেলস্টেশনের ঠেলাঠেলি-ধাক্কাধাক্কির পরিস্থিতি গড়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। আর ঐ যে ওখানে — ধুপ্! ধাপ! ধুপ্! গাছের নীচে চলেছে ভলিবল খেলা। গোল হয়ে দাঁড়িয়ে লোফালোফি করে চলেছে বল। স্বাভাবিকভাবে খেলবে, তা ত নয়, সবাই যেন অন্যের মাথা তাগ করার জন্য ব্যস্ত। রঙবেরঙের বলগুলি শূন্যে ততটা উড়ছে না, যত না লোকজন ডিঙিয়ে গড়াতে গড়াতে চলেছে বালির ওপর দিয়ে। এমনই হল স্নানের ঘাটের ভলিবলের মহিমা।

এদিকে 'ব্যায়ামবীররা' ঘুরে বেড়াচ্ছে গুরুগম্ভীর চালে, থেকে থেকে মাস্‌ল ফুলাচ্ছে, চাকার মতো বুকের পেশী দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। প্রত্যেকের হাতে রবারের ব্যান্ড দিয়ে লাগানো রয়েছে পোশাক ঘরের নম্বর, যেন 'ব্যায়ামবীরদের' সকলকেই কেউ নম্বরী করে দিয়েছে।

'এই যে গারিক!'

'কী খবর শুরিক!'

'হ্যালো, মারিক!'

এই 'ব্যায়ামবীররা' একে অন্যকে সম্ভাষণ করে চলতে চলতে, না থেমে, মাথা না ঘুরিয়ে, যাতে নিজেদের সুঠাম গড়নের ক্ষতি না হয়। আর এই নম্বর করা মারিক, গারিক, শুরিক — এরা সকলেই তাদের গুরুগম্ভীর চালের জন্য দেখতে টার্কি-মোরগের মতো, বাকি লোকদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য এখানে যে তারা ছিল উল্‌কিতে চিত্রবিচিত্র। হাতে, বুকে, পায়ে, এমন কি পিঠে — কোথায় না ছিল উল্‌কি আঁকা! কী জিনিসই না ছিল শরীরের চামড়া ফুটিয়ে আঁকা! ছিল জাহাজ, ছিল বাজপাখি, জীবজন্তু, নারীমূর্তি, ছোরা, আর ছিল নানা রকমের জ্ঞানগর্ভ বাণী, এই যেমন: 'বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি মৃত্যু' কিংবা ঐ গোছের কিছু। এটা হল প্রথম কথা। আর দ্বিতীয়ত, ওদের প্রত্যেকের গলায় একটা না একটা কিছু ঝুলছিল। কোন চেন্‌ আর তার সঙ্গে হয়ত বা একটা নাল কিংবা ফলক, নয়ত মেয়েদের ব্রোচ কিংবা চাবি, মায়... ক্রস। আর আশ্চর্য লাগছিল এই ক্রস সেই সমস্ত বুকের ওপর ঝুলতে দেখে যেখানে শরীরের চামড়া ফুটিয়ে আঁকা ছিল দস্যুজাহাজ, ছোরা, পরন্তু 'বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি মৃত্যু'। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে ঈশ্বরের সঙ্গে এই ক্রসের কোন সম্পর্ক ছিল না, এ হল নেহাৎই ফ্যাশন।

'আরও কত কিছুই না হতে পারে! পাদ্রীর জোব্বাও হয়ত ওদের ফ্যাশন হয়ে দাঁড়াবে,' আমি মনে মনে ভাবলাম। 'তখন হয়ত কিয়েভের গারিকরা পাদ্রীর জোব্বা পরে চৌরাস্তায় হাঁটবে...'

আর এই যে, এ লোকটা কী অদ্ভুত! লোকের যেখানে চুল থাকে (যেমন ধর মাথায়), সেখানে ওর টাক, আর লোকের যেখানটায় ন্যাড়া (যেমন ধর পিঠে), সেখানে ওর কটা রঙের গজগজে লোম — ভালুকের মতো। লোকটা কিনা শুয়ে আছে রোদে পোড়া হওয়ার জন্য। আজব লোক! রোদে পোড়া সে হবে কোত্থেকে? এই দুর্ভেদ্য পশম ভেদ করে সূর্যের আলো কি আর দেহ স্পর্শ করতে পারে!

আবার দেখ বুড়ো লোকটার কাণ্ড! জল থেকে তড়াক করে উঠেই দেখ কেমন ব্যায়াম শুরু করে দিয়েছে: ডন-বৈঠক কষছে, লাফঝাঁপ দিচ্ছে একটা বাচ্চা ছেলের মতো। চেহারাটা ত ঐ রোগা লিকলিকে, মাথার ওপরটায় টাক, আর দুপাশে লম্বা লম্বা চুল কাঁধ অবধি ঝুলে পড়েছে। হাসছে বত্রিশ পাটি দাঁত বার করে, কার দিকে যেন চোখও টিপছে। দাদু বটে!.. আরে, একবার তাকিয়েই

দেখ ওখানে কী হচ্ছে! বুড়ি দিদিমা, মাথায় পাকা চুল, গালে ভাঁজ পড়েছে, এদিকে কিনা টেনিস — না, কী বলে যেন ওটাকে — ব্যাডমিন্‌টন র‍্যাকেট দিয়ে দুমাদুম পেটাচ্ছে। এমন পেটাচ্ছে যে দেখে চোখে ধাঁধা লেগে যায়। ও হো-হো! আমাদের ত্রিন্‌দিচ্‌কা দিদিমাকে এমন র‍্যাকেট হাতে দেখা গেলে কী মজাই না হত। গাঁসুদ্ধ সবাই ছুটে আসত দেখতে। অথচ এখানে কেউ নজরই দিচ্ছে না।

কিয়েভের এই বুড়ো-বুড়িরা বেশ কিন্তু। কেমন যেন ছেলেমানুষ-ছেলেমানুষ। যেন বুড়ো খোকা। এদিকে অল্পবয়সী ছোকরারা উলটো। ঐ যে দুটোতে চলেছে। একেকটার বয়স বছর বিশেক হবে, এর বেশি নয়। অথচ দুজনেই দাড়িওয়ালা। আজব কাণ্ড!

এদিকে গাছতলায় নিদ্রা যাচ্ছে এক ভদ্রমহিলা। আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে নাক ডাকাচ্ছে। স্নানের ঘাটে যে কেন এলো বোধগম্য হচ্ছে না। বাড়িতেই ত কম্বল মুড়ি দিয়ে দিব্যি ঘুমানো যায়।

আর কত যে বাচ্চাকাচ্চা! কত বাচ্চাকাচ্চাই না এসে জুটেছে স্নানের ঘাটে! এদিক-ওদিক থেকে কেবলই শোনা যায়:

'সেমা, জল থেকে উঠে আয়! জল থেকে উঠে আয়, সেমা!'

'গ্যালিয়া আর দূরে সাঁতার দিস নে! ফিরে আয়!'

'সাশা, তোর চটি কোথায়? বলি, কোথায় তোর চটি?'

'আলিক, ভিজে জাঙ্গিয়া খুলে ফেল।'

'তোলিয়া, ওকে বল্‌টা দিয়ে দে! তোলিয়া! এটা যে তোর বল্‌ নয়, ওর বল্‌ এটা!'

'ইয়াশা, এই বখাটেপনার জন্যে তুই আর চান করতে পারবি না। পারবি না... বখাটেপনার জন্যে।'

'ফানিয়া, তুই আমার চটিজুতোর ভেতরে ফের বালি ছড়িয়েছিস? এক্ষুনি বালি ঝেড়ে ফ্যাল বলছি।'

'এই ডিমটা খেয়ে নে বাবা! মাত্র একটাই ডিম!' ডোরাকাটা সাঁতারের পোশাক পরনে এক মোটা-সোটা মহিলা বছর বারো বয়সের এক গাল ফোলা হৃষ্টপুষ্ট ছেলের দিকে একটা ছাড়ানো ডিম বাড়িয়ে দিয়ে বলছে।

ছেলেটা নাক সিটকাল, মুখ কোঁচকাল — খাওয়ার ইচ্ছে নেই।

'খা না বাবা, আর জবালাস নে!' মহিলা অনুনয় করে বলল।

আবার জলের ভেতর থেকে চড়াই পাখির মতো জিরজিরে, বছর ছয়েকের একটা ছেলে কিচিরমিচির করে উঠল:

'ম্যা, ম্যা গো, জল! ম্যা গো, নীপার! ম্যা, আমি চান করছি! ম্যা গো. জল!' যেন জীবনে কখনও জল দেখে নি, কস্মিনকালে স্নান করে নি।

আমরা জলের একেবারে কাছাকাছি এসে জামাকাপড় ছেড়ে রাখার উপযোগী জায়গা খুঁজতে লাগলাম। প্রসঙ্গত, লোক গিজগিজে নীপারের দিকে তাকিয়ে আমার মনে ভাবনা হল: 'এখন যদি কেউ ডুবে যেত, তাহলে আমরা তাকে অবশ্যই উদ্ধার করতাম! কোন একটা বাচ্চা-টাচ্চা ডুবলেই অবশ্যই ভালো হয় — উদ্ধার করা সহজ...'

কাউকে বাঁচানো এবং মোটের ওপর বীরপুরুষ বনা — এটা ছিল আমাদের বহুকালের অপূর্ণ সাধ। বিশেষ করে ভালো হয় যদি সেটা করতে পারি সবার চোখের সামনে... এই ধর না কেন ঐ যে ছটফটে ছেলেটা কিচিরমিচির করছে — ওর হাবুডুবু খেতে বাধা কোথায়? আমরা ওকে চোখের পলকে — ঝটাস্! আর দেখতে হবে না! 'সান্ধ্য কিয়েভে' পরের দিনই হেডিং: 'ভাসিউকোভ্‌কার দুই খুদে বীরপুরুষ!'

'ঠিক গতকালই 'সান্ধ্য কিয়েভ' থেকে আগ্রহ প্রকাশ করা হয়...' হঠাৎ আমি শুনতে পেলাম এক প্রফুল্ল কণ্ঠস্বর। আমি চমকে উঠলাম: আমার মনের ভাবনা কেউ শুনে ফেলল নাকি?

না, দুজন পুরুষের মধ্যে কথা হচ্ছিল মাত্র। একজন মাঝারি আকারের, মুখটা তার গোল ছাঁদের, দাঁড়িয়ে ছিল হাঁটুজলে। অন্যজনের কাঁধ চওড়া, নাক অনেকটা বঁড়শীর মতো বাঁকা — সে দাঁড়িয়ে ছিল জলের ঠিক কাছাকাছি, বালির ওপরে। সে ইতিমধ্যে জামাকাপড় পরে ফেলেছে (সম্ভবত বাড়ি যাবার উদ্যোগ করছিল), তবে তখনও জুতো পরে নি — জুতোজোড়া তার হাতে ছিল।

'সবাই জানতে চায় রাজার ভূমিকা সম্পর্কে,' গোলমুখ লোকটা বলে চলল। 'না, আমি বললাম, এখনও বলার সময় হয় নি। যখন তৈরি হবে, তখন আসবেন।'

'ঠিক কথা,' তাকে সমর্থন করে বলল কুঁজোনাক। 'আগে থাকতে বলা কখনও উচিত নয়। সৃজনী পরিকল্পনা নিয়ে এই ভাবে মত বিনিময় করা, প্রতিশ্রুতি

দেওয়া, প্রতিজ্ঞা করা — এসব আমি বরদাস্ত করতে পারি না; পরে হয়ত দেখা গেল সব ফাঁকা — কিছুই নেই! শত্তুরের মুখে ছাই পড়ুক গে! আমার আবার তাড়া আছে, রেডিও অফিসে যেতে বোধ হয় দেরিই হয়ে গেল... গালিনাকে আমার অভিনন্দন। দু' এক দিনের মধ্যেই যাব 'খন... বাড়ি আমার মনে আছে... আর ফ্ল্যাটের নম্বর, আমার যতদূর মনে পড়ে, তেরো, তাই না?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ! তেরো! এসো কিন্তু!' গোলমুখ লোকটা সোল্লাসে চেঁচিয়ে বলল, আর কুঁজোনাক একটু দূরে দূরে সরে যেতেই নীচু গলায় বিড়বিড় করে বলল: 'শত্তুরের মুখে ছাই পড়ুক!' কথাটা অবশ্য আমাদের কানে গেল।

আমি আর জাভা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। এটা সে কার উদ্দেশে বা কেন বলল, আমাদের ঠিক বোধগম্য হল না।

গোলমুখ অভিনেতাটি জলে ডুব দেওয়ার উদ্দেশ্যে চটপট কয়েক পা এগিয়ে যাবার পর হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ঝটকা মেরে হাত তুলল:

'ইস্! ঘড়িটা খুলতে ভুলে গেছি!' এই বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখতে পেয়ে বলল: 'এই যে খোকারা, এটা ওখানে, ঐ ছাইরঙা প্যাণ্টের ওপর রেখে দাও না, নইলে আমাকে আবার ফিরতে হয়,' এই কথার সঙ্গে সঙ্গে সে ঘড়িটা আমাদের দিকে বাড়িয়ে দিল।

আমি তার অনেকটা কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তাই ঘড়িটা আমিই নিলাম। অভিনেতাও তৎক্ষণাৎ ঝপাং করে জলে গিয়ে পড়ল। আর দুই পা ছুঁড়ে মোটর বোটের মতো ফেনা তুলতে তুলতে বুকে ভর দিয়ে সাঁতার কাটতে লাগল। জোর সাঁতার কাটে! আমরা কয়েক সেকেণ্ড ধরে তার সাঁতার কাটা লক্ষ করতে লাগলাম। এমন সময় বাঁ দিকে কোন একটা জায়গা থেকে শোনা গেল আর্তনাদ:

'ডুবেছে! ডুবেছে!.. তোলা হয়েছে ডোবা লোকটাকে!'

'কোথায়? কোথায়?' আমরাও সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠলাম।

যেদিকে লোক ছুটছিল সেদিকে ছুটলাম।

এতে আর বলার কী আছে? তোমাদের সামনে যদি লোকে 'ডুবেছে' বলে চিৎকার করত, তাহলে কি তোমরা স্থির হয়ে জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারতে? তায় আবার, এইমাত্র যখন স্বপ্ন দেখছিলে কাউকে বাঁচানোর! উপরন্তু সত্যিকারের কোন জ্যান্ত ডোবা মানুষকে যদি কখনও চোখে না দেখে থাক, তাহলে ত কথাই নেই...

অবশ্য জ্যান্ত বলে কোন কথা নেই... মোটের ওপর... মানে, এক কথায়... জলে ডোবা মানুষ।

'কোথায়? কোথায়? কোথায়?' কিছু একটা দেখতে পাবার চেষ্টায় আমরা লোকজনের মাঝখানে উঁকিঝুঁকি দিতে লাগলাম।

কিন্তু লোকে ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, কোন জলে ডোবা মানুষকেই দেখা যাচ্ছিল না।

তখন আমরা চার হাত পায়ে ভর দিয়ে চললাম — চললাম লোকজনের দুপায়ের ফাঁক দিয়ে দিয়ে, কুকুরছানার মতো। শেষকালে দেখতে পেলাম। বালির ওপর বিশাল, লম্বা কে একজন চিত হয়ে পড়ে ছিল আর তার ওপর চেপে বসে ছিল এক রোগা, নাকচোখা লোক। এই দ্বিতীয় লোকটি যৌবনোত্তীর্ণ, তার বুকের ওপর সাদাটে চুলের গোছা। সে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যবস্থা করছিল। এক! দুই! এক! দুই! সিলভেস্টরের প্রক্রিয়ার সাহায্যে।

'এবারে আমাকে দিন,' গাঁট্টাগোঁট্টা গোছের, রোদে পোড়া যে লোকটি লাইফবোটে নিয়ে ডিউটি দিচ্ছিল, সে তার নৌকোয় চেপে এই মাত্র জায়গায় হাজির হয়ে বলল। ডোবা লোকটিকে সে জল থেকে না তুলে যে একটা অতি সাধারণ — শুধু তা-ই বা কেন — এমন বৈশিষ্ট্যহীন চেহারার একটা মানুষ তুলেছে, তাতে স্পষ্টতই সে দারুণ অস্বস্তি বোধ করছিল।

আমরা ডোবা লোকটিকে নিরীক্ষণ করে দেখলাম। সম্ভবত লোকটা ছিল ঐ গ্যারিক-ম্যারিকদেরই কেউ, কেননা তার গলায় চেনের সঙ্গে ঝুলছিল একটা ঘোড়ার পায়ের নাল, আর হাতে উল্কি করা ছিল তীর বেঁধানো হৃৎপিণ্ড, তারই নীচে লেখা ছিল এই বাণীটি: 'আকৈশোর নেই কোন মুখ'।

চোখা-নাক আর লাইফবোটের লোকটি দুবার অদলবদল করে শ্বাস-প্রশ্বাস ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করল, কিন্তু জলে ডোবা লোকটার জীবনের কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

জনতার মধ্যে গুঞ্জন উঠল:

'এত কমবয়স...'

'আহা, কী দুর্ভাগ্য!'

'কী করে ঘটল এটা?'

'শোনা যাচ্ছে, সাঁতার কাটতে কাটতে বয়ার সারির ওপারে চলে গিয়েছিল, সেখানে খিঁচুনি উঠল না কী যেন...'

'ওঃ, এই নীপার, কত লোকেরই না প্রাণ নিচ্ছে!'

হঠাৎ জলে ডোবা লোকটা চোখ খুলল। জনতার মধ্যে একটা উত্তেজনাময় সাড়া পড়ে গেল।

লোকটা মাথা তুলে ঘোলাটে চোখে লোকজনের ওপর দৃষ্টি বুলাল, কনুইয়ে শরীর ভর দিল। এই সময় তার বুকের ওপর বসে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যবস্থা করছিল নাকচোখা লোকটি। সে এবারে নাক দিয়ে বাতাস টেনে চোখমুখ কুঁচকে বলে উঠল:

'আরে এ যে মাতাল!'

লাইফবোটের লোকটিও জলে ডোবা লোকটার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল:

'ঠিকই ত! ভকভক করে গন্ধ বেরোচ্ছে যেন পিপে থেকে!'

'তবে রে হারামজাদা!'

'শুয়োরের বাচ্চা!'

'আচ্ছা করে গিলে জলে নেমেছে...'

'এই আইটাই, গরমে মদ খাওয়া — জান কাবার হওয়ার দাখিল!'

'এই তাহলে তোর খিঁচুনি...'

'এত কমবয়স!' চারদিক থেকে শোনা গেল।

চোখা-নাক তখনও জল থেকে ওঠানো পুনরুজ্জীবিত মাতালটার ওপরে বসে ছিল, বেশ কিছুক্ষণ তাকে দেখার পর সে হাত তুলে — চটাস্! চটাস্! — তার মুখের ওপর এমন চড় কষিয়ে দিল যে ঝনঝন আওয়াজ উঠল।

'ঠিক কাজ!'

'অমনই হওয়া উচিত ওর!'

'মদ খাওয়ার ফলটা যেন জানতে পারে! যেন বুঝতে পারে লোককে উতলা করে তোলার ফল কী!'

'আমরা ভাবলাম দুর্ঘটনায় একটা প্রাণ গেল বুঝি, এদিকে ও কিনা...'

'আরও দেওয়া উচিত! আরও ঘা কতক দেওয়া উচিত ওকে!'

'আরও যোগ করছি আমরা!'

লোকের মেজাজ সঙ্গে সঙ্গে অন্য মূর্তি ধারণ করল, উত্তেজনার ভাবটা কমে এলো।

চোখা-নাক ঝট করে উঠে পড়ল, 'জলে ডোবা' লোকটাকে ডিঙিয়ে জায়গা ছেড়ে চলে গেল। সামনের ভিড় করা লোকজন সরে গিয়ে ওকে পথ করে দিল।

'কিছু না, আমরা ওকে মাতলামী ছাড়ানোর স্টেশনে নিয়ে যাব, সেখানে ও মজাটা টের পাবে,' লাইফবোটের লোকটা খুশির সুরে এই কথা বলে তাকে দুই বগলের নীচে হাত দিয়ে চেপে ধরে নিয়ে চলল নৌকোর দিকে। 'আরে, যে লোকটা তোকে জল থেকে উদ্ধার করল তাকে একবার ধন্যবাদও ত দিতে হয়!'

'নামটাও ত জানার চেষ্টা করা উচিত ছিল!'

'ভাবছিস এমন একটা 'লাশ' জল থেকে টেনে তোলা ওর পক্ষে সহজ কাজ ছিল!' 'জলে ডোবা' লোকটাকে নিয়ে যাবার সময় তার পেছন পেছন চেঁচিয়ে লোকে বলল। কিন্তু লোকটা তখনও বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে — স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এখনও হুঁশ ফিরে আসে নি। নৌকো ছেড়ে দিল, সকলে যে যার জায়গায় চলে যেতে লাগল।

'আরে! ঘড়িটা যে রাখা দরকার ছিল!' হঠাৎ আমার টনক নড়ল, কেবল এখনই আমার নজরে পড়ল যে তখনও হাতে ঘড়ি ধরে রেখেছি। আমি আর জাভা পেছন দিকে ঘুরে গিয়ে ছুটলাম। এখানে-ওখানে... কিন্তু কোথায় সেই ছাইরঙা প্যাণ্ট? কোথাও নেই। হয়ত এখানে নয়, হয়ত আরেকটু বাঁ দিকে ছিল?.. কিন্তু না, ওখানেও নেই... কী ব্যাপার? ও মশাই, গেলেন কোথায়? চোখের সামনে শত শত লোকের চেহারা ভাসছে — কিন্তু সবই অপরিচিত। মনে হচ্ছে, এখানে নয়... আরও একটু দূরে... কিন্তু কোথায়? নেই ত!.. আমার মনে হয়, পেছনে... না কি সামনে?.. বলা যায় না! আমরা ছুটোছুটি করি একবার সামনে আরেকবার পেছনে, কিছুতেই খুঁজে পাই না — না ঐ জায়গাটা, না অভিনেতাকে, না তার ছাইরঙা প্যাণ্ট... তাছাড়া ওকে বার করবই বা কী করে যখন সর্বত্রই একই রকমের বালি, লোকজনও একই রকমের বিবস্ত্র এবং সনাক্ত করার মতো বিশেষ কোন চিহ্ন নেই!

ওঃ, এই 'জলে ডোবা' মাতাল লোকটাকে নিয়ে আমাদের কোন্ দরকার ছিল? এখন কী হবে?

'জলে নেমে দ্যাখ ত রে জাভা! ঐ অভিনেতাটা হয়ত এখনও জলে সাঁতার কাটছে।'

জাভা জামাকাপড় খুলে ঝপাং করে জলে গিয়ে পড়ল।

আমি পাড়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ছুটোছুটি করে বেশি দূরে গিয়ে করার ভরসা পেলাম না — জাভাকে অন্তত যেন হারিয়ে না ফেলি। কিন্তু সর্বক্ষণ খুঁজতে থাকি — লোকের মুখ উঁকি মেরে দেখি।

আধঘণ্টা বাদে জাভা জল থেকে উঠে এলো। ক্লান্তিতে হাঁসফাঁস করতে করতে সে বলল:

'নেই...'

'জলে ডুবে গেল না ত লোকটা?' আমি ভেবাচেকা খেয়ে বললাম।

'আর প্যাণ্ট? প্যাণ্ট নেই যে... লোকটা ত প্যাণ্ট খুলেই সাঁতার কাটতে নেমেছিল...' জাভা আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলল। 'তাছাড়া এমন সাঁতার কাটে যে তোর সমুদ্র অবধি সাঁতরে পার হতে পারে, ডুববে না।'

'কী করা যায় এখন?'

'আমি তার কী জানি?'

আমার এমন দুঃখ হল যে কান্নাই পেয়ে গেল। দিব্যি দেখতে, ভালো লোকটি আমাকে ঘড়িটা দিল। বলল, 'ওহে বন্ধু, আমার প্যাণ্টটার ওপর রাখ ত — নইলে আমাকে আবার জল থেকে উঠতে হয়।' আর আমার কিনা... এই কাজ। ঘড়ি নিয়ে — চম্পট! এখন ফ্যা-ফ্যা করে খুঁজে বেড়াও!'

'জাভা রে, তার মানে দাঁড়াচ্ছে এই যে আমি ঘড়িটা মেরে দিয়েছি,' আমি মুখ কাচুমাচু করে বললাম।

জাভা কী বলবে বুঝতে না পেরে কাঁধ ঝাঁকাল।

জীবনে নিজেকে নিজের কাছে এত খারাপ আর কখনও লাগে নি। অবশ্য সে রকম কোন ঘটনা যে কখনও একেবারে ঘটে নি এমন নয়। আমরা কখনও কখনও পড়শী নাস্তিয়া দিদিমার বা কুনিশদের বুনো নাশপাতি গাছ ঝাড়া দিয়েছি। তা ঐসব গাছে এত নাশপাতি থাকত যে অমনিতেই সেগুলো গাছের তলা থেকে না কুড়ানোর ফলে ঘাসের ভেতরে চাপা পড়ে পচত। তাছাড়া নাস্তিয়া দিদিমা ছিল এত লোভী, এমনই বদ যে তার দাপটে আমাদের গোটা পাড়া অতিষ্ঠ। আমরা এই

নাশপাতি গাছ ঝাড়া দিতাম বিশ্রী বুনো ফলগুলির জন্য ততটা নয়, যতটা গাছের মালিকের লোভী স্বভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর উদ্দেশ্যে।

এছাড়া যখন ছোট ছিলাম তখন মাসীর কাছ থেকে পিঠে চুরি করে খেয়েছি। তা সে ত আপন মাসীর কাছ থেকে, তাও আবার কী? না, পিঠে... এখন কিনা বাইরের একজন লোকের কাছ থেকে চুরি করে বসলাম পিঠে নয়, ঘড়ি — দামী জিনিস... এদিকে আমরাই আবার উদ্যোগ করছিলাম চোর ধরার! কী করে ধরব, যখন আমরা নিজেরাই... চোর!

আমার ইচ্ছে হচ্ছিল উঠে দাঁড়িয়ে গোটা স্নানের ঘাটের উদ্দেশে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে চেঁচিয়ে বলি: 'কামরেড মিলিশিয়াম্যান! আপনারা আমার টুঁটি টিপে আমাকে ধরে নিয়ে যান থানায়। আমি চোর! একজন ভালো মানুষ আমার সততায় বিশ্বাস রেখেছিলেন, কিন্তু আমি তাঁর ঘড়ি চুরি করেছি। আপনারা আমাকে ধরুন!'

কিন্তু আমি উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচালাম না। তার কারণ এই যে সৌভাগ্যবশত ধারে কাছে একটিও মিলিশিয়ার লোক ছিল না। হয়ত বা ছিলও, কিন্তু থাকলেও সে ছিল বিবস্ত্র। বিবস্ত্র অবস্থায় থাকলে কি আর তাকে চেনার জো আছে! তাছাড়া, মোদ্দা কথা, বিবস্ত্র মিলিশিয়াম্যান — কোন মিলিশিয়াম্যান পদবাচ্য নয়। বিবস্ত্র মিলিশিয়াম্যানের সামনে বুক ধড়ফড়ানির কোন ভাবই হয় না। এই ধর না কেন, আমাদের গাঁয়ের মিলিশিয়াম্যান কমরেড ভালিগুরার কথা। গাঁয়ের পাঁড় মাতাল বুরমিলো কেবল তখনই তাঁকে সমীহ করে যখন তিনি পুরোদস্তুর ধড়াচূড়া পরে থাকেন। আবার যখন এমন হয় যে আমাদের এই মিলিশিয়াম্যানটি টুপি আর পোশাকী আঁটো জামা না পরে কেবল ঘোড়ায় চড়ার আঁটো প্যাণ্ট পরে তাঁর সবজি বাগানে কাজ করছেন, সেই সময় বুরমিলোকে শান্ত করার জন্য লোকে তাঁর কাছে এলে ভালিগুরা যেমন ছিলেন সেই অবস্থায় চলে এলেন, তখন বুরমিলো তাঁর দিকে ফিরেও তাকায় না, কেবল রাগে গরগর করে বলে:

'এ আবার কে? ফুঃ! তোকে চিনি না! এখান থেকে ভাগ বলছি! গেলি! ফুঃ!'

কিন্তু কমরেড ভালিগুরা একবার তার মিলিশিয়ার পোশাকী জামা আর টুপি পরে দাঁড়ালেই হল, বুরমিলো তৎক্ষণাৎ ভেড়ার মতো শান্ত হয়ে গিয়ে বলে: 'মাফ করবেন কর্তা,' সঙ্গে সঙ্গে সে শুতে চলে যায় বাড়িতে।

না, বিবস্ত্র মিলিশিয়াম্যান — মিলিশিয়াম্যান পদবাচ্য নয়...

'বুঝলি রে?' জাভা বলল, 'যাই বলিস না কেন, অভিনেতাকে আমরা খুঁজে পাব না।'

'তাহলে কি মিলিশিয়াকে জানাব?' আমি ওর কথার মাঝখানে বলে ফেলেই হৃৎপিণ্ডের তলায় একটা ঠাণ্ডা শিরশির ভাব অনুভব করলাম।

'হুঃ!' খেঁকিয়ে উঠল জাভা। 'ওখানে ঠিক আমাদের জন্যেই বসে রয়েছে। যা! মজাটা টের পাবি 'খন! চোট খাওয়া মিলিশিয়াম্যানটিকে অভিনন্দন জানা গে।'

'তাহলে কী করা যায়?' আমি কাঁদো কাঁদো হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'আমরা এখানে এসেছি কী ভাবে? ব্রিজের ওপর দিয়ে। আর লোকজন ফেরে কোন্ পথে? তাও ব্রিজের ওপর দিয়ে। অন্য কোন পথ নেই। তাই বলি কি, ব্রিজের পাশে বসে অপেক্ষা করা যাক। হয় আমরা তাকে দেখতে পাব, নয়ত সে আমাদের দেখতে পাবে। স্নানের ঘাট থেকে সে এখনও যায় নি। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ঘড়ি ছাড়া যাবে কোথায়, শুনি?'

'আচ্ছা, দেখা যাক,' আমি মনে মনে ভাবলাম। 'জাভা হয়ত ঠিকই বলছে। জিভ বার করে স্নানের ঘাটে ছুটোছুটি করে বেড়ানোর চেয়ে ব্রিজের ধারে বসে থাকাই বোধ হয় ভালো।' আমরা বসলাম রেলিং-এর পাশে: জাভা ডান দিকে, আমি বাঁ দিকে। বসে আছি ত আছিই। ইতিমধ্যে সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। লোকজন স্নানের ঘাট থেকে চলেছে বাড়ির দিকে। প্রায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে ঘন প্রাচীরের মতো হয়ে চলেছে ত চলেইছে... ওঃ চোখ টাটায়... মাথাও ঘুরে যায়। এই ভিড়ের মধ্যে কি কাউকে ঠাহর করা যায়? একমাত্র আশা, যদি আমাদের লক্ষ করে।

আমার চেহারা তখন এমনই শোচনীয় যে এক মহিলা আচমকা আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে: 'আহা বেচারি বাচ্চা ছেলেটা,' বলেই হঠাৎ আমার হাতে গুঁজে দিলেন তিনটি কোপেক। আমার চেহারা পুরোদস্তুর এমন বিকৃত আকার ধারণ করেছে যে ভদ্রমহিলা আমাকে ভিখিরি বলেই ধরে নিয়েছেন। আমার চমক যখন ভাঙল ততক্ষণে সেই ভদ্রমহিলাকে আমি হারিয়ে ফেলেছি। ঐ ভাবেই আমি দাঁড়িয়ে রইলাম তিন কোপেক হাতে নিয়ে... কোন্ পর্যায়ে যে গিয়ে পৌঁছেছি আমি! — দুর্ভাগ্যের একশেষ!.. ভালো বলতে হবে যে জাভা অন্তত জানে না: লোকজনের ভিড় থাকায় আমরা একে অন্যকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমি তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে

উঠলাম, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম দুহাত পেছনে লুকিয়ে রেখে, যাতে ভগবান না করুন আবার কেউ দান না করে বসে।

ইতিমধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। লোকজনের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে। অথচ অভিনেতার দেখা নেই।

খিদেয় আমার পেটের ভেতর গড়গড় করছে। আইসক্রিম ছাড়া কিছুই যে খাই নি আমরা। জাভা আমার দিকে এগিয়ে এসে বলল:

'কী হাঁদারামই না হয়েছি রে আমরা দুটিতে। এখানে দাঁড়িয়ে আছি কী করতে? লোকটা অভিনেতা? অভিনেতা। তাহলে চল্, কাল থিয়েটারে-থিয়েটারে ঘুরে খুঁজে বার করব'খন। তাছাড়া আমরা এও জানি যে লোকটা জারের পার্ট করে।'

আরে তাই ত! এটা আমার নিজেরই বা মাথায় খেলল না কেন? ধন্যি জাভা! সাবাস বটে! যাই বল না কেন, ওর মাথাটা বেশ কাজ করে কিন্তু! ছোঁড়ার মাথা আছে! অবশ্যিই কাল থিয়েটারে-থিয়েটারে ঘুরে (কিয়েভে আছেই পাঁচটা কি ছয়টা) আমাদের অভিনেতাকে খুঁজে বার করব, ঘড়িটা ফেরত দিয়ে জলে ডোবা লোক আর বাকি সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে, সব যেমন যেমন ঘটেছিল, ওকে বলব।

কোন নিরুপায় অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার উপায় যখন খুঁজে পাওয়া যায় তখন এই দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে কী ভালোই যে লাগে!

'দে দেখি, একবার ভালো করে দেখি, কী ঘড়ি এটা,' জাভা বলল।

আমরা রাস্তার আলোর নীচে (ইতিমধ্যে আলোও জ্বলে উঠেছে) দাঁড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে নিরীক্ষণ করতে লেগে গেলাম।

চমৎকার ঘড়িটা! গোল আর চেপটা, পাঁচ কোপেকের পয়সার আকারের। কালো ডায়েলে সংখ্যার বদলে সোনালি কতকগুলি ড্যাশচিহ্ন। কাঁটাও সোনালি, সেই কাঁটা আবার দুটো নয়, তিন-তিনটে। তৃতীয়টা চুলের মতো লম্বা আর সরু — গোটা ডায়েল জুড়ে দৌড়চ্ছে — সেকেন্ড মেপে চলছে। এমন জিনিস এর আগে আমরা কখনও দেখি নি।

জাভা বলল:

'আচ্ছা, এবারে একটু হাতে পরে দ্যাখ দেখি।'

'আমার বয়ে গেছে।'

'এতে আবার কী আছে! হাজার হোক যাকে বলে চুরি করা, তুই যদি অনেকটা

সেই কাজই করে থাকিস, তাহলে অন্তত হাতে পরে দেখ, অন্তত পরে খানিকটা ঘুরে বেড়া। কাল কিন্তু আর সুযোগ পাবি না।'

'অন্যের ঘড়ি পরতে আমার বয়ে গেছে।'

'ইস্, কী ডাঁট দেখ! হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলছিস! আচ্ছা, তোর যখন অত ডাঁট, তখন দে, আমিই পরি।'

এই বলে সে আমার কাছ থেকে ঘড়িটা নিয়ে হাতে পরল — সঙ্গে সঙ্গে ওর বয়স যেন পাঁচ বছর বেড়ে গেল। এমন কি ওর মুখের হাবভাবও হয়ে গেল বেশ গম্ভীর আর কড়া। ঘড়ি সমেত হাতটাকে না ঝুলিয়ে একটা লাঠির মতো একপাশে সোজা লম্বা করে উঁচিয়ে রেখে সে বুক ফুলিয়ে চলতে লাগল, থেকে থেকে আড়চোখে তাকাতে লাগল হাতটার দিকে। কখনও কখনও কনুইটা ভাঁজ করে চোখের কাছে হাত নিয়ে এসে দেখে — কটা বাজে। এদিকে আমাকে লক্ষই করে না, আমার সঙ্গে একটা কথাও বলে না, যেন দুনিয়ায় আমি বলে কারও অস্তিত্বই নেই।

আমি নিজে ঘড়িটা যে কেন পরলাম না এই ভেবে মনে মনে আমার ক্ষোভ ও বিরক্তি হতে লাগল। ঘড়িটা, বলা যেতে পারে, 'আমার', এর জন্য আমাকে মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে, অথচ পরে বেড়াচ্ছে কিনা জাভা। শুধুই কি তাই? — পাজীটা আবার বড়াই করেও বেড়াচ্ছে!

সমস্ত ঘাটটা পেরিয়ে আমরা যখন পাতোন ব্রিজের কাছে এসে পেঁাছলাম তখন আমি সহ্য করতে না পেরে বলে ফেললাম:

'হয়েছে! খুলে ফ্যাল্! নষ্ট-টষ্ট করে ফেলবি, তখন ত আবার আমাকেই জবাবদিহি করতে হবে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে জাভা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘড়িটা হাত থেকে খুলল, এবারে সে আবার হয়ে গেল পাঁচ বছরের ছোট, আর আগের মতোই শূন্যগর্ভ।

ঘড়িটা আমি পকেটের ভেতরে লুকিয়ে রেখে তবেই স্বস্তি পেলাম; তারপর মনে পড়ে গেল:

'এই দ্যাখ্, আমি তোকে বলতেই ভুলে গিয়েছিলাম... ব্রিজের ওপর এক ভদ্রমহিলা আমাকে তিন কোপেক দিয়েছিলেন।'

'তাই নাকি?' জাভা গা ঝাড়া দিয়ে বলল। 'তাহলে আর হেঁটে যাচ্ছি কোন্ দুঃখে! ট্রামে চেপে যাওয়া উচিত ছিল। পা আর চলছে না রে।'

'আরে বুদ্ধু, এটা যে ভিক্ষের পয়সা! ভিক্ষের পয়সায় কে ট্রামে চেপে যায়! ভদ্রমহিলা আমাকে ভিক্ষে দিয়েছেন, বুঝতে পারছিস, ভেবেছেন যে আমি ভিখিরি।'

'আচ্ছা, এই ব্যাপার! মজার ত!' অবশেষে জাভা অনুধাবন করতে পারল। 'এখন তাহলে কী করবি ওটা দিয়ে?'

'তা ত জানি না...'

সত্যি সত্যি পরিস্থিতিটা যা-তা। নিয়ে নেব? কোনমতেই না!.. ছুঁড়ে ফেলে দেব? কেবল পুঁজিবাদী কর্তারাই টাকা-পয়সা ছোঁড়াছুঁড়ি করে। আমি আর জাভা ভাবতে লেগে গেলাম, ভাবলাম আর ভাবলাম, শেষকালে ভেবে এই বার করলাম যে কোন সত্যিকারের ভিখিরির দেখা পাওয়ামাত্র পয়সাটা তাকে দিয়ে দেব (এই তিন কোপেক আজ অবধি আমার বাড়িতে পড়ে আছে — কিছুতেই সত্যিকারের ভিখিরির দেখা পাচ্ছি না)।

'এদিকে ঘড়ির ব্যাপারটা ত বেশ দাঁড়াল!' উত্তেজিত হয়ে বলল জাভা, তার চোখে ঝলকে উঠল শিকারীর চোখের দীপ্তি। 'খাসা ব্যাপার! এ যেন অপরাধীর খোঁজ করা! তবে হ্যাঁ, সবচেয়ে বড় কথা হল এই যে লোকটা কোথায় থাকে আমরা জানি। তেরো নম্বর ফ্ল্যাট...'

'আহা, কী কথাই শোনালি!' আমি খে'কিয়ে উঠলাম। 'কিয়েভে কয় হাজার গণ্ডা তেরো নম্বর ফ্ল্যাট আছে জানিস? সবগুলো ঘুরে ঘুরে সারা জীবনেও শেষ করা যাবে না।'

'সে যাই বলিস না কেন, দারুণ কিন্তু...' জাভা হার মানতে চায় না। 'অনেকটা চোর ধরার মতন। তবে এখানে দাঁড়াচ্ছে উলটো, বুঝলি কিনা... চোরেরাই খুঁজতে বেরিয়েছে জিনিসের মালিককে, যে জিনিস চুরি গেছে সেটা ফেরত দেবার জন্যে। যেন সিনেমা! ঠিক কিনা, বল?'

'সিনেমা এখন বেরিয়ে যাবে, দেখবি কাকীমা আমাদের কী বলেন। আমাদের কথা ভেবে ভেবে হয়ত এতক্ষণে ভাবনা-চিন্তায় তাঁর মাথাই খারাপ হওয়ার দাখিল হয়েছে...'

...কাকীমা আমাদের কিছু বললেন না। তিনি মাথায় পটি লাগিয়ে চুপচাপ শুয়ে ছিলেন গদির ওপর। যা বলার বললেন কাকা... তিনি বললেন:

'ওহে চ্যাঙরা ছেলেরা, তোমরা যদি আমার নিজের ছেলে হতে, তাহলে এখন তোমাদের বিশেষ একটা জায়গায় এমন ঝাড় ঝাড়তাম যে কাল আর প্যাণ্টের ভেতরে পশ্চাদ্দেশ গলানোর মতো অবস্থা তোমাদের থাকত না। এটা করার অধিকার যেহেতু আমার নেই সেই হেতু সোজাসুজি তোমাদের বলে রাখি: ফের যদি একবারও এমন ঘটনা ঘটে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে টিকিট কেটে ঐ দিনই তোমাদের পাঠিয়ে দেব ভাসিউকোভ্‌কায়। তোমাদের জন্যে বিপত্নীক হবার সাধ আমার নেই। ভাবনায়-চিন্তায় তোমাদের কাকীমার প্রায় মারা যাবার দশা। ঐ দেখ, শুয়ে রয়েছে মাথার যন্ত্রণায়...'

আমরা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম, আমতা-আমতা করে বলতে লাগলাম যে আমরা সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম, তারপর 'শয়তানের চরকিতে' পাক খেলাম, আর তারপর গিয়েছিলাম আমাদের চেনাশোনা একটা মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে (ভালকা মালিনভ্‌স্কায়া, সত্যি বলছি, এই যে ঠিকানা আছে... খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন!), সেখানে আমাদের চমৎকার আদর-আপ্যায়ন করা হয়, ওদের পীড়াপীড়িতে খাওয়াদাওয়া করতে হয়, বসে বসে টেলিভিশনও দেখতে হয়; আমাদের কিছুতেই ছাড়তে চায় না ওরা... কথা দিলাম, আর কখনও এমন হবে না।

এর পর আমরা শুধু চা খেয়ে ('ওঃ, কী নিমন্ত্রণটাই না আমরা খেয়েছি!') পেটে খিদে নিয়ে শুয়ে পড়লাম।

...শুয়ে শুয়ে কিছুতেই ঘুম আসে না আমাদের।

দেরিতে হলেও অনুশোচনায় আমি দগ্ধ হতে থাকি। কাঠের ভেতরের ঘুণ পোকার মতো বিবেক আমাকে কুরে কুরে খেতে থাকে।

'সবই কেমন যেন বিতিকিচ্ছিরি হয়ে দাঁড়াচ্ছে!' আমি মনের জ্বালায় ফিসফিস করে বলি। 'হতে চাই বীরপুরুষ, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন এমন কাজ করে ফেলি যে মিথ্যে কথা বলতে হয়, ফাঁকি দিতে হয়। সবই মাত্র এক দিনের মধ্যে! অভিনেতাকে ফাঁকি দিলাম, বলা যেতে পারে তার জিনিস চুরিই করলাম, মিলিশিয়ার লোককে মাটিতে ফেলে দিলাম, তিন রুব্‌ল উড়িয়ে দিলাম, কাকীমাকে গুচ্ছের মিথ্যে কথা বললাম, কাকাকেও... এমন কি ভিক্ষে নিতে হল। আচ্ছা, বীরপুরুষ হতে গেলে কি এত মিথ্যে কথা বলতে হয়, এত অসৎ কাজ করতে হয়?

যদি তা-ই হয় তাহলে এসব বীরত্বের কোন দামই নেই! কেমন যেন একটা

ফাঁকি মারা বীরত্ব। যারা সত্যিকাদের বীর — সবচেয়ে বড় কথা, তারা সবাই সৎ লোক। কারমেলুক, দোভ্‌বুশ, কাউণ্ট অফ মণ্টিক্রিস্টো, ক্যাপ্টেন নেমো, ক্যাতিগোরশ্‌কো, পাক্রিশকিন... এ'রা কখনও মিথ্যে কথা বলেন নি। আর আমরা হলাম মিথ্যেবাদী, ঠক...'

জাভা আমার কথায় সায় দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

'তা বটে,' সে বলল। 'আমরা একেবারে ডাহা মিথ্যেবাদী বনলাম। মোট কথা... আয়, ঠিক করা যাক... আর কখনও এমন করব না।'

'যা বলেছিস, আয়,' আমি বললাম, 'তবে হ্যাঁ, এমন একটা কিছু ভেবে বার করতে হবে যাতে আমরা মিথ্যে বলার লোভ সামলাতে পারি। আয়, প্রতিজ্ঞা করা যাক (শরীর থেকে রক্ত চিরেও করা যেতে পারে) যে আর কখনও মিথ্যে কথা বলব না। ঠিক করা যাক: আমাদের মধ্যে কেউ যদি সত্যি বলতে না পারে কিংবা না চায়, তাহলে সে যেন চুপ করে থাকে; তাকে যত খোঁচানো হোক, তার কাছ থেকে যতই কথা টেনে বার করার চেষ্টা করা হোক সে যেন মুখ বুজে থাকে, একটি কথাও না বলে।'

'ভালো কথা,' জাভা ঘাড় নেড়ে সায় দিল। 'কেবল রক্ত চিরে এর আগেও আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি— তাতে কোন কাজ হয় না। আর এখন ঠিক করা যাক: আমাদের দুজনের একজন যদি তা সত্ত্বেও নিজেকে সামলাতে না পেরে মিথ্যে কথা বলে ফেলে... তাহলে অন্যজন তার কপালে তিনটে টোকা মারবে। আর সেটা করতে হবে সঙ্গে সঙ্গে: রাস্তায়, স্কুলে, ক্লাস চলার সময়, এমন কি মিটিং চলার সময় প্রিসিডিয়ামে — যেখানেই ঘটুক না কেন। টালবাহানা করার বা পালটা ঘা মারার কোন অধিকার থাকবে না। কোনমতেই না। পবিত্র নিয়ম! প্রথম মিথ্যের জন্যে তিনটে টোকা, দ্বিতীয়বার মিথ্যের জন্যে ছয়টা টোকা, তৃতীয় বারের জন্যে — বারোটা — এই ভাবে চলবে। শক্তির পরীক্ষা যাকে বলে! আর ইচ্ছেশক্তিও করে তুলব পোক্ত... জানিস ত বীরত্বের জন্যে এটা কত দরকার!'

জাভা মাথা থেকে কিছু না কিছু মজার জিনিস বার করবেই। এবারেও আমার সন্দেহ হচ্ছিল যে টোকা দিয়ে মিথ্যে বলার অভ্যাস ছাড়ানোর ইচ্ছে তার যতটা না ছিল তার চেয়েও বেশি ছিল জিনিসটা মজার করে তোলার। কিন্তু এ নিয়ে আমি আর তর্ক করলাম না — ফলটা ভালো হলেই হল।

এটাই হল আমাদের স্থির সঙ্কল্প।

এবারে নিজেদের প্রায় শতকরা একশ ভাগ সৎ অনুভব করে আমরা নিশ্চিন্তমনে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তেরো নম্বর ফ্ল্যাটের অচেনা জারের সন্ধানে। থিয়েটারে সাক্ষাৎকার। জাভা রেন্-এর গরিমা ও পতন

সকালটা শুরু হল চমক দিয়ে। আমি জেগে উঠতে দেখি জাভা ততক্ষণে জামাকাপড় পরে তৈরি। জামাকাপড় পরতে পরতে দেখতে পাই ও আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ টিপছে আর মাথা নেড়ে ইশারা করছে, যেন বলতে চাইছে — চল্ রে, একটা গোপন কথা আছে। আমি ওর পেছন পেছন হাতমুখ ধোয়ার ঘরে গেলাম।

জাভা আমার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল:

'তোর কাকা যে প্রতিগুপ্তচর বিভাগে কাজ করেন এটা তুই আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলি কেন?' বলেই টোকা মারার জন্য আঙুল বাঁকায়।

আমি চোখ বড় বড় করে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম:

'কোন্ প্রতিগুপ্তচর বিভাগ?'

'কোন্ প্রতিগুপ্তচর বিভাগ আবার? — ঐ যে যারা স্পাই ধরে।'

'ধুৎ! এসব স্পাই-স্পাই করে তোর মাথাটাই বিলকুল বিগড়ে গেছে দেখছি।'

'মোটেই বিগড়ে যায় নি,' ও বলল। 'তুই কি ভাবিস আমি বোকা? অস্ত্র, প্রথম কথা, পেয়ে থাকে মিলিশিয়ার লোকে, দ্বিতীয় কথা — সীমান্তরক্ষীরা, আর তৃতীয় কথা — প্রতিগুপ্তচর বিভাগের লোকেরা। এটা আমি ঠিক জানি। তোর কাকা যখন মিলিশিয়ার লোক নন, সীমান্তরক্ষীও নন, তখন প্রতিগুপ্তচর বিভাগের লোক ছাড়া আর কী হবেন শুনি?'

'কী ধরনের অস্ত্র?' আমি বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম।

'পিস্তল!' জাভা স্পষ্ট করে বলল।

'বলিস কী? কোথায় দেখলি তুই?'

'লেখার টেবিলের দেরাজের ভেতরে — ঐ দ্যাখ্ না, সামান্য টেনে খোলাই আছে দেরাজটা।'

'বটে? চল্ দেখি!' এখন আমিই টোকা মারার জন্য আঙুল বাঁকাই। 'দেখিস, যদি মিথ্যে হয়ে থাকে, তাহলে মজা টের পাবি' খন!'

হাতমুখ ধোয়ার ঘর থেকে আমরা বেরিয়ে এসে এঘর ওঘর ঘুরলাম (যেন অমনি অমনিই)। তারপর চললাম লেখার টেবিলটার দিকে। তৎক্ষণাৎ এক নজরে দেখে নিলাম ফাঁক করা দেরাজটা — আরে! মিথ্যে বলে নি ত জাভা! পিস্তল! সত্যিকারের পিস্তল! নীলচে রঙের ইস্পাত মৃদু চিকচিক করছে।

আমার বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ড ততক্ষণে অসাড় হয়ে গেছে। কাকা তখন ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যায়াম করছিলেন। আমি তাঁর দিকে দৃষ্টি হানলাম। কিছুক্ষণ বাদে জিজ্ঞেস করলাম:

'গ্রিশা কাকু! আচ্ছা, আপনার এখানে এটা কী?'

'কোথায়?' কাকা ঘরে ঢুকে আমার দিকে এগিয়ে এলেন।

'এই যে, দেরাজের ভেতরে।'

'ওঃ... পিস্তল।'

'পিস্তল কেন?'

'কেন — মানে? খেলা স্টার্ট দেওয়ার পিস্তল। কখনও দেখ নি নাকি?'

আরে রাম! এই-বুঝি তোর প্রতিগুপ্তচর! আমার কাকা যে 'বলশেভিক' কারখানার ওস্তাদ কারিগর — ফোরম্যানই নন, তিনি একজন ওস্তাদ খেলোয়াড়ও বটেন, স্পোর্টস মাস্টার (কোন এক সময় শখ করে লাইট অ্যাথলেটিক্স চর্চা করেন, আর এখন প্রজাতন্ত্রের প্রথম শ্রেণীর বিচারক)। আমি কিনা সঙ্গে সঙ্গে অনুমান করতে পারলাম না এটা আসলে কী ধরনের পিস্তল! তবে হ্যাঁ, মোটের ওপর, সত্যি কথা বলতে গেলে কি, স্টার্ট দেওয়ার পিস্তল আমি কাছে থেকে কখনও দেখি নি, হাতেও ধরি নি। জাভাও অবশ্য নয়। দেখি জাভা লজ্জায় লাল হয়ে গেছে: এরকম

একটা মারাত্মক ভুল করে ফেলার জন্য তার লজ্জা হচ্ছে, বিমূঢ় ভাব লুকানোর জন্য সে জিজ্ঞেস করল:

'আচ্ছা, ওটা দিয়ে গুলি ছোঁড়ে কী করে?'

'খুবই সহজ।' কাকা দেরাজ থেকে পিস্তল বার করে নিলেন, তারপর বললেন: 'নির্দেশ দেওয়া হয়... 'অন্ ইওর মার্কস'! তারপর... 'অ্যাটেন্শন!' এর পরেই...' বলতে বলতে কাকা পিস্তল মাথার ওপর তুললেন।

গুড়্-ড়ুম! বাপ্ রে বাপ, কানে তালা ধরিয়ে দিল! আর ঠিক সেই মুহূর্তেই:

'ও মাগো!.. ঝন্-ন্-ন্!..' রান্নাঘরে সশব্দে হুড়মুড় করে কী যেন একটা আছড়ে পড়ল। আমরা সে দিকে ছুটে গেলাম। রান্নাঘরের মাঝখানে মেঝের ওপর বসে আছেন কাকীমা, আর তার পাশে ভেঙে খানখান হয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে একটা পাত্র, যেটাতে তিনি পিঠে তৈরি করার জন্য পোস্ত বাটছিলেন। অপ্রত্যাশিত গুলির শব্দে চমকে গিয়ে কাকীমা মেঝের ওপর ধপ করে পড়ে গেছেন।

তার মুখের অবস্থা তখন এমন হাস্যকর যে আমরা হেসে না উঠে পারলাম না।

'গ্রি-শা!' ভর্ৎসনার ভঙ্গিতে মাথাটা এক পাশে কাত করে করুণ সুরে বললেন কাকীমা। 'একেবারে বাচ্চা ছেলের মতো! এ কেমন ধারা কাণ্ডকারখানা! আমি প্রায় মারা যাই আর কি...'

'ন্যাড়া ঝোপের নীচে খরগোসের মতো অবস্থা দেখছি তোমার!—তুমি যে এমন ভীতুর ডিম তার জন্যে দোষ কার বল?' হাসতে হাসতে বললেন কাকা।

'তা যাই বলুন না কেন, যেমন গুড়ুম আওয়াজ তোলে তাতে যে কেউই ভড়কে যেতে পারে,' আমি বললাম। কাকীমার জন্য আমার মায়াই হচ্ছিল।

'এটা দিয়ে গুপ্তচরও ধরা যেতে পারে,' জাভা বলল। 'আওয়াজ বেরোয় পিস্তলের মতন!'

'গ্রিশা কাকু, দেবেন একবার গুলি ছুঁড়তে?' আমি সাহস করে বললাম।

'তা দিতে পারি... তবে কিনা...' এই বলে কাকা চোখের ইশারায় কাকীমাকে দেখিয়ে দিলেন। কাকীমা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে ভাঙা পাত্রের খোলামকুচি কুড়োতে লেগেছেন।

'আমরা শোয়ার ঘরে গিয়ে ছুঁড়ব!' জাভা ছুটে এসে বলল।

'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

কিন্তু শোয়ার ঘরে গিয়েও গুলি ছোঁড়ার আগে আমি জোরে চেঁচিয়ে বললাম:

'কাকীমা, অন্ ইওর মার্কস! অ্যাটেন্শন!'

আর তারপরই দু'হাতের আঙুল দিয়ে ঘোড়া টিপলাম (এক হাতে সামলানো সম্ভব নয় — বড় শক্ত!)। ওঃ, কী প্রচণ্ড গুড়ুম আওয়াজই না হল! আমার ত মনে হয় কাকার হাতে যেমন হয়েছিল তার চেয়েও জোরে।

আমি আর জাভা দু-দুবার করে গুলি ছুঁড়লাম — এর বেশি কাকা ছুঁড়তে দিলেন না (বললেন, 'এর পর পাড়াপড়শীরা ছুটে আসবে!')।

পিস্তলের এই ঘটনায় আমি খানিকটা আমোদ পেলাম। কিন্তু ঘড়ির কথা মনে হতেই আমার হৃৎপিণ্ডটা আবার মোচড় দিয়ে উঠল। অন্ধকার কামরায় আটক কুকুরছানার মতো সেটা কিঁউকিঁউ করতে লাগল। গোটা ব্যাপারটা তাহলে কী হবে? অভিনেতাকে আমরা খুঁজে পাব কি? এখন সে আমাদের কী বলবে?

সকালের খাওয়ার সময় আমি ভুরু কুঁচকে চুপচাপ খাবার টেবিলের ধারে বসলাম। জাভা আমার দিকে তাকিয়ে বারবার চোখ টিপতে লাগল — ও আমাকে সমর্থন দিয়ে জিইয়ে রাখার চেষ্টা করছিল।

নিরুৎসাহ হয়ে ওমলেট চিবোতে চিবোতে আমি ভাবতে লাগলাম। ভাবলাম,

15–1068

কাউকে ফাঁকি না দিয়ে (কোনক্রমেই নয়!) যেমন করে হোক বাড়ি থেকে বেরিয়ে অভিনেতার খোঁজে যেতে হবে।

মিথ্যে কথা বলারই বা কী দরকার? কিশোর রঙমহলে যাবার অমনিতেই কথা আছে আমাদের। আগে ভেবেছিলাম কয়েকদিন বাদে যাওয়া যাবে, তা না করে আজ গেলেই ত হয়। কিশোর রঙমহলে যাবার পথে আমরা অন্যান্য থিয়েটারে গিয়েও আমাদের অভিনেতার খোঁজ করব। শো আরম্ভ হবে বারোটায়, আর এখন দশটাও বাজে নি, সময় পাওয়া যাবে।

থিয়েটারের কথা বলতে কাকা আপত্তি করলেন না, কেবল কী যেন ভেবে বললেন:

'আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব নাকি? কী বল?'

আমরা দেখলাম যে এটার কোন দরকারই নেই, এতে আমাদের পুরো কাজটাই মাটি হয়ে যাবে। আমি তাই তাড়াতাড়ি করে বলে ফেললাম:

'আপনার কি আর ভালো লাগবে? ওখানে ত সবই বাচ্চাদের! আমি যদি বয়স্ক লোক হতাম...'

কাকা আমার মনের ভাব আঁচ করতে পারলেন কিনা জানি না, কিন্তু কেন যেন তিনি হেসে বললেন:

'কথাটা ঠিকই। একা একাই যাও। আমি ঠাট্টা করলাম আর কি। তবে মনে রেখো, যদি আবার কোথাও গিয়ে বেপাত্তা হয়ে যাও, তাহলে কালই বাড়িতে ফেরত!'

কাকা আমাদের টাকা দিলেন। নতুন কড়মড়ে শার্ট, ইস্ত্রি করা প্যাণ্ট, আর সবে এই প্রথম বার-করা চকচকে জুতো পরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

তোমাদের অবস্থা কেমন হয় জানি না, তবে আমার পরনে যখন আগাগোড়া নতুন পোশাক থাকে তখন নিজেকে কেমন যেন ন্যাংটো-ন্যাংটো মনে হয়। মনে হয় সবাই আমাকে দেখছে, তখন লজ্জা লাগে, অস্বস্তিকর ঠেকে, আর মনে হয় লোকের চোখের সামনে থেকে কোথাও গিয়ে লুকিয়ে পড়ি। এর পরিণতিতে সর্বদা যা ঘটে তা হল এই যে আমি হয় জামার হাতা দেয়ালের গায়ে ঘষব, যাতে ওটাকে তেমন নতুন বলে মনে না হয়, অথবা প্যাণ্টে দাগ ফেলব, নয়ত মাটিতে খোঁচা লাগিয়ে জুতোর ডগাটা ভোঁতা করে নেব, যাতে ওটা তেমন চকচকে না থাকে। একমাত্র তখনই আমি অনেকটা স্বচ্ছন্দ বোধ করি। এখনও তাই, সিঁড়ির মুখে

বেরিয়ে এসে আমি সঙ্গে সঙ্গে রেলিং-এ কনুই ভর দিয়ে তরতর করে নেমে পড়লাম, শার্টের ওপর নোংরা দাগ ফেললাম। একমাত্র এর পরই বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। কিন্তু তাহলে কী হবে, নতুন পোশাক-পরিচ্ছদ পরে হাঁটতে অস্বস্তিই হচ্ছিল, আনাড়ি-আনাড়ি লাগছিল নিজেকে: জুতো পরা পাদুটো যেন বেড়ি বাঁধা, কাঁধে কলারের ঘষা লাগছে, এ যেন জোয়াল লাগানো হয়েছে — মাথা ঘোরাতে গেলে গোটা শরীরটাই ঘোরাতে হয়। কেন, থিয়েটারে কি আর সাধারণ পোশাকে যাওয়া যায় না? ওখানে ত লোকে নাটক দেখতে যায়, লোকে যাতে তোমাকে দেখে সে জন্য নিশ্চয়ই নয়! আমি যদি বড় কর্তা হতাম, তাহলে এই হুকুম পর্যন্ত জারি করতাম যে নতুন পোশাকে যেন কাউকে থিয়েটারে ঢুকতে দেওয়া না হয়। যাক গে, তোমাদের দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই, থিয়েটারের কর্তা আমি কস্মিনকালে হতে যাচ্ছি না, আমি পাইলট হব।

আমরা ট্রলিবাসে চেপে বসে রেড আর্মি স্ট্রীটের মিউজিক্যাল কমেডি থিয়েটারের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। আমরা শুরু করলাম এই থিয়েটারটা দিয়ে, কেননা আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল এই গোলমুখ সুশ্রী অভিনেতাটি নির্ঘাত কমেডিতে অভিনয় করে থাকেন (এছাড়া কোথায় আর জারের পার্ট তাঁর পক্ষে করা সম্ভব?)।

আমরা প্রবেশপথের মুখে ঘরটাতে ঢুকলাম। ফাঁকা। কোন সাড়াশব্দ নেই। ডান দিকে টিকিট কাউণ্টার। সারা দেয়াল জুড়ে বিশাল বিশাল দরজা। আমরা সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলাম দরজার দিকে। ঠেলা দিলাম — বন্ধ নয়। ভেতরে উঁকি মেরে দেখি সেখানেও কেউ নেই।

আমি বললাম:

'হয়ত এখনও সময় হয় নি, আসতে দেরি আছে হয়ত।'

'এখনও যদি সময় না হয়ে থাকে তবে আর কখন হবে! দশটা বেজেছে!' জাভা বলল। 'অন্যান্য লোকের মতো অভিনেতাদেরও কাজে আসতে হয় সকাল বেলায়। নইলে চলবে কেন! এটাও একটা চাকরী যে...'

'তাহলে কেউ নেই কেন?'

'তুই কি মনে করিস ওরা দরজার সামনে ঘুরঘুর করে বেড়ায়? নেই যখন তখন বুঝতে হবে আছে স্টেজে —রিহার্স্যাল দিচ্ছে। চল!'

কিন্তু আমরা দরজা থেকে ঘুরতে না ঘুরতে আমাদের মুখোমুখি এগিয়ে এলেন এক অল্পবয়সী মহিলা। মহিলার পরনে মিলিশিয়ার লোকের মতো নীল রঙের আঁটো পোশাক।

'তোমাদের কী চাই এখানে, খোকারা?'

আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম, ভেবাচেকা খেয়ে গেলাম। এ'কে কী ভাবে জিজ্ঞেস করা যায়? এদিকে ভদ্রমহিলা ফের বললেন:

'কী ব্যাপার, বল ত?'

এখানেই জাভা তালগোল পাকিয়ে বলে ফেলল:

'আমরা জারকে চাই।'

'কোন্ জার?' অবাক হয়ে ভুরু তুলে বললেন মহিলা।

'ঐ যার গোল মুখ, মাথায় টাক,' এবারে আমিই যোগ করলাম।

ভদ্রমহিলা হেসে উঠে বললেন:

'তোমরা একটু দেরি করে ফেলেছ খোকারা। আজ পঞ্চাশ বছর হল জার-টারের পাট চুকে গেছে। আগে খোঁজ করা উচিত ছিল।'

জাভা সাহস করে বলল:

'না না, কী যে বলেন আপনি! আমরা কি আর সত্যিকারের জার খুঁজছি? সত্যিকারের জারে আমাদের কোন কাজ নেই। আমরা চাই অভিনেতাকে, যিনি জারের পার্ট করেন। বুঝতে পারলেন না?'

'উনি তেরো নম্বর ফ্ল্যাটে থাকেন!' আমার মুখ দিয়ে ফস করে বেরিয়ে গেল।

'এবারে বুঝতে পারলাম,' মহিলা বললেন। 'তবে কথাটা এই যে জারের ভূমিকায় অভিনয় করেন এরকম কেউ আমাদের এখানে নেই; কেননা আমাদের অনুষ্ঠানের তালিকায় এখন জার সম্পর্কে একটি নাটকও নেই। তা তোমরা আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানেই ঐ অভিনেতা খোঁজ করছ কেন? উনি কি তোমাদের বলেছেন যে আমাদের থিয়েটারে কাজ করেন? নাম কী?'

আমি আর জাভা মুখ চাওয়া-চাউয়ি করলাম।

'নাম জানি না,' আমি বললাম, 'কেবল এটাই জানি যে উনি জারের পার্ট করেন।'

'কিন্তু কোথায় তিনি এই জারের পার্ট করেন? কোন্ থিয়েটারে?'

'জানি না...'

'হুঁঃ, দেখ কাণ্ড! স্বপ্নে দেখেছিলে নাকি তোমরা ঐ অভিনেতাকে? কোথা থেকে তোমরা জানতে পারলে যে জারের ভূমিকায় নামেন?'

'উনি আমাদের নিজেই বলেছেন।'

'ওঃ, তার মানে, তোমাদের সঙ্গে পরিচয় আছে?'

'এই সামান্য আর কি...' আমি ইতস্তত করে কথাটা বলে জাভার দিকে তাকালাম: আরে, ও চুপ করে আছে কেন? অন্য সময় ত আগ বাড়িয়ে কথা বলে, এখন কোন রা নেই, যেন কুলুপ এঁটে রয়েছে।

'এ আবার কী রকম পরিচয়, যখন নাম জানা নেই, কোন্ থিয়েটারে কাজ করেন তাও জানা নেই তোমাদের,' মহিলা জেরা করেন।

'ঐ আর কি... জেনে নেবার মতো সময় ছিল না।'

'তা তোমরা ওঁর খোঁজ করছ কেন এখন?'

'দরকার আছে... একটা ব্যাপারে কথা বলার ছিল...'

'শিল্পসৃষ্টি সম্পর্কে নাকি?' মৃদু হেসে বললেন ভদ্রমহিলা।

'হুঁ...'

কথাটা আমার মুখ থেকে পড়েছে কি পড়ে নি অমনি — টকাস! টকাস!.. আমার চোখ থেকে যেন ফুলকি ঝরে পড়ল। এমন কি মাথার পেছনটা টনটন করে উঠল। এমনই টপটপ আওয়াজ যে মনে হল মাথায় ত নয়, ফুটির গায়ে টোকা পড়েছে।

ঘটনার আকস্মিকতায় ভদ্রমহিলা সট করে দুহাত তুলে হাতে হাত বন্ধ করে বললেন:

'ওকে মারছ কেন? এ কি গুণ্ডামি, অ্যাঁ! কোন কারণ নেই, কিছু নেই, মিছিমিছি...'

মহিলা চেঁচামেচি করে আরও কী বললেন তা আমি শুনতে পাই নি — আমরা ততক্ষণে রাস্তায় এসে পড়েছি। আমার মাথা তখন ভোঁ ভোঁ করছিল, চোখে জল এসে গেছে।

এই জন্যই তাহলে জাভা চুপ করে ছিল — ওর নিজের ভয় ছিল যে মিথ্যে বলে ফেলবে, আর অপেক্ষা করছিল কখন আমি মিথ্যে বলি। কিন্তু আমি কি

একটা সাংঘাতিক কোন মিথ্যে বলেছি? আমি ত ভদ্রমহিলার ঠাট্টা-করা প্রশ্নের জবাবে 'হ্বঁ' বলেছি। এটাকেও ঠাট্টা বলে ধরে নেওয়া যেত। ঠাট্টা করারও জো নেই দেখছি! এ ভাবে একে অন্যের খ্বঁত ধরতে গেলে ত একেবারে ব্বড়ো বয়স অবধি ফোলা কপাল নিয়ে ঘ্বরে বেড়াতে হবে!

'তুই কি রাগ করলি নাকি?' পেছনে শ্বনতে পেলাম জাভার গলা। 'কিন্তু আমরা যে নিজেদের মধ্যে এরকমই ঠিক করেছিলাম,' সে বলে চলল কোন অন্বশোচনার ভাব না দেখিয়ে। 'দোষ কারোই নয়...'

আমি চুপ করে রইলাম।

'রাগ করার কোন কারণই তোর থাকতে পারে না। এটা কিন্তু তুই ঠিক করছিস না। তাহলে আর ওরকম ঠিক করার কোন্ দরকার ছিল?'

ও আবার আমাকে কথাও শোনাচ্ছে! কথা বলে যখন ঠিক করা হয়েছে তখন রাগ করাটা অবশ্যই বোকামি, কিন্তু যখন সমস্ত লোকজনের সামনে তোমার কপালে কেউ ঘা মারে, অথচ পালটা দেবার পর্যন্ত কোন অধিকার তোমার নেই, তারপরও কি তুমি দাঁত বার করে হাসবে? তারপরও কি আহ্লাদে গান গাইবে?

'কী, হল কী রে তোর?' জাভা ছাড়বার পাত্র নয়। 'আচ্ছা, আমি যদি মিথ্যে কথা বলি, তাহলে আমার কপালে ঘা বসিয়ে দিস, চোখের পলকটি পর্যন্ত পড়বে না আমার, দেখে নিস।'

যা বলছে সবই ঠিক, কিন্তু অপেরা থিয়েটারে পেঁছানোর আগে পর্যন্ত আমি চুপ করে রইলাম। থিয়েটারের চত্বরের সামনে আসার পরই আমি কপালে হাত ব্বলিয়ে বললাম:

'একটু অন্য রকম ভাবে জানা দরকার। আরেকটু চালাকি খাটিয়ে। প্রথমে ওদের ঐ অন্বষ্ঠানস্বচিটা দেখতে হয়। তা নয় ত এসেই ঝপ্ করে বলে বসলি — জারকে চাই। লোকে ত আর তাই বলে ওরকম কিছ্ব হাজির করবে না।'

'তা ত বটেই, তা ত বটেই,' জাভা সোৎসাহে সায় দিয়ে বলল। আমি নীরবতা ভেঙেছি দেখে ও উল্লসিত হয়ে উঠল। আমরা ঠিক করলাম যেমন যেমন ঘটেছিল সব বলব: বলব যে অভিনেতা নীপারে স্নান করতে গিয়ে দৈবাৎ একটা জিনিস (জিনিসটা যে কী তা না বললেও চলবে: বললেই হবে যে গোপনীয়; কেননা ঘড়ির কথা

মুখে উচ্চারণ করতেও ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে) আমাদের কাছে রাখতে দিয়েছিলেন— ওটা আমরা ফেরত দিতে এসেছি।

মিউজিক্যাল কমেডির চেয়ে অপেরায় জারদের ব্যাপারটা বহুগুণ ভালো ঠেকল। 'বরিস গদুনভ'এ জার আছে, 'জার সালতানের রূপকথা', 'ডিসেম্ব্রিস্ট' আর 'তুষারকুমারী' — সেখানেও জার। এটা জানার পর আমার ভারী আনন্দ হল, আমি তখন নিশ্চিত যে এই জারদের মধ্যেই আমরা নির্ঘাত আমাদের গোলমুখ, টাক-মাথা জারকে খুঁজে পাব। কিন্তু শেষ অবধি দেখা গেল এই জারেরা কেউই খাপ খায় না। এরা সেই জার নয়। একজনও টাক-মাথা নয়। সবারই মাথায় চুল, এমন কি কোঁকড়ানো চুল। সকলেই লম্বা, ঢেঙা। এই তথ্য আমরা জানতে পেলাম টিকিট কাউন্টারের মহিলার কাছ থেকে। এমন কি ভদ্রমহিলা তাদের সকলকে দেখালেনও। ওখানে ফয়ারে তাদের পোর্ট্রেট ছিল। তাদের মধ্যে 'আমাদেরটিকে' দেখতে পেলাম না। আমরা বেজার হয়ে বেরিয়ে এলাম অপেরা থিয়েটার থেকে।

'ও কিছু নয়,' কৃত্রিম ফুর্তি দেখিয়ে জাভা বলল। 'আমি আগেই ঠিক জানতাম যে অপেরায় নেই। অপেরা অভিনেতারা গলার যত্ন নেয়, ঠান্ডা লাগার ব্যাপারে তাদের ভয় আছে। একজন গায়কও নদীতে চান করতে যাবে না। চান করতে যায় কেবল নাটকের অভিনেতারা।'

আমরা লেনিন স্ট্রীট ধরে নীচের দিকে নেমে গেলাম লেসিয়া উক্রাইনকা রুশ ড্রামা থিয়েটারে। কিন্তু সেখানেও (এর পর আবার আমরা গেলাম ফ্রাঙ্কো থিয়েটারে) আমাদের সম্পূর্ণ হতাশ হতে হল — জার নিয়ে একটাও নাটক নেই।

এবারে রয়ে গেল কিয়েভের শেষ থিয়েটার — কিশোর রঙমহল।

আমরা ফ্রাঙ্কো থিয়েটার থেকে সিঁড়ি বয়ে ওপরে উঠে চলতে লাগলাম ওর্‌জনিকিদ্‌জে স্ট্রীটের ওপরকার এক আশ্চর্য বাড়ির পাশ দিয়ে। বাড়িটার গায়ে আগাগোড়া অদ্ভুত অদ্ভুত মূর্তি লাগানো: হাতি, সাপ, আজব ধরনের সব পাখি আর একেবারেই দুর্বোধ্য নানা জীবজন্তু ও বিকট বিকট দানবের চেহারা। অন্য সময় হলে আমি হয়ত হাঁ করে চোখ বড় বড় করে এই বাড়িটা দেখতে থাকতাম, কেননা দুনিয়ায় এমন বাড়ি আর কোথাও নেই। কিন্তু এখন কৌতূহল না দেখিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেলাম, তাকালাম না পর্যন্ত! কিছুতেই আমার কোন আনন্দ নেই। আমার মনটা তখন খিঁচরে আছে, এতই বিষণ্ণ হয়ে আছে যে ঐ ভয়ঙ্কর

জীবজন্তুরা সকলে যদি হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠে সেখানে উ'কি মারত, তাহলে তারা নিজেরাই হয়ত আঁতকে উঠত।

'দুঃখ করিস নে,' জাভা আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল। 'ও নির্ঘাত কিশোর রঙ্গমহলের অভিনেতা। দেখিস, যা বললাম! হয়ত বাচ্চাদের কোন রূপকথায় জারের পার্ট করে। বোধ হয় হাসির অভিনয় করে। আমার মনে হয় আমরা ওকে যেন টেলিভিশনেও দেখেছি। ঐ যে সেই রে, যে চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে ধপাস!.. হি-হি-হি...'

জাভা আমাকে আনন্দ দেবার চেষ্টা করল। কিশোর রঙ্গমহলে যাবার পথে সারাক্ষণ সে কিছু না কিছু একটা মজার জিনিস ভেবে বার করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু আমার তাতে কোন ভাবান্তর হল না।

আমরা থিয়েটারে প্রবেশ করলাম — মনে হল যেন টিফিনের সময় স্কুলে এসে পড়েছি: হৈচৈ, হুড়োহুড়ি, ছুটোছুটি। আর সকলেই কেন যেন বাচ্চা — পাইওনীয়ারের টাই পর্যন্ত নেই। আমরা টিকিট কাউণ্টারের দিকে এগিয়ে গেলাম। জানা গেল, ছোট ক্লাসের ছেলেমেয়েদের জন্য নাটক হবে। রূপকথামূলক নাটক।

'রাজা সম্পর্কে নাকি?' সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'না, 'লিটল রেড রাইডিং হুড' জবাব দিলেন কাউণ্টারের মহিলাটি।

আমাদের মুখ বেজার হয়ে গেল, কিন্তু কিছু করার নেই। বাড়িতে ত আর যাওয়া যায় না! তাছাড়া ফয়ারে অভিনেতাদের পোর্ট্রেটগুলিও দেখা দরকার।

'কী আর করা যাবে? 'লিটল রেড রাইডিং হুড' দেখতে যেতে হয়,' জাভা বলল।

আমরা টিকিট নিলাম। এগিয়ে চললাম। ছোটদের গায়ে ধাক্কাধাক্কি করে ফয়ার দিয়ে চলতে চলতে পোর্ট্রেটগুলি নিরীক্ষণ করতে লাগলাম। প্রতিটি ছবির দিকেই এগোতে গিয়ে আমার শিহরণ জাগে, আমি মনে মনে আতঙ্ক অনুভব করি। এটাই শেষ থিয়েটার, শেষ আশাভরসা।

সবগুলি পোর্ট্রেট খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম আমরা, আমার হৃৎপিণ্ডটা ভগ্নোৎসাহ হয়ে একেবারে চুপসে গেল... আমাদের অভিনেতা নেই। নেই ত নেই-ই। এখন কী করা যায়? কোথায় তার খোঁজ করি? তার মানে লোকটা অভিনেতা নয়। কিন্তু সে নিজেই বলল যে অভিনেতা। রাজা সম্পর্কে বলল... তাহলে?

'দাঁড়া, দুঃখ করিস নে,' জাভা আমাকে উৎসাহিত করে তোলার জন্য বলে।

'এমনও ত হতে পারে যে কোন কারণে তার পোর্ট্রেটের জায়গা হয় নি এখানে। তোর মনে আছে, স্কুলে সম্মানিত ছাত্রদের বোর্ডে গ্রিশা গনোবোবেলের কেন জায়গা হল না? কারণ হল এই যে যখন ফোটো তোলা হয়েছিল ঠিক সেই সময়টাতেই ওকে মৌমাছি কামড়েছিল, ওর মুখটা ফুলে হয়েছিল ঢোল। এরও ত হতে পারে তেমন একটা কিছু...'

'কী যে বলিস!' আমি হতাশার ভঙ্গিতে হাত নাড়াই, এদিকে নিজেরই মনে মনে ইচ্ছে হচ্ছিল — আহা, এটা যদি সত্যি হয়! আহা, যদি সত্যি হয়!

'আরে, তোমরা যে! কী খবর?' হঠাৎ শুনতে পেলাম। গলার আওয়াজ পেয়ে সেই দিকে ঘাড় ফেরাতেই দেখি সাদা ফ্রক পরে, মাথায় বিরাট প্রজাপতির আকারে ফুল করে ফিতে আঁটা, দাঁড়িয়ে রয়েছে... ভালকা। সে নীল ইউনিফর্ম পরা ক্লাস ওয়ানের একটা ছেলের হাত ধরে রেখেছে।

'আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পেরেছি!' সোল্লাসে গুঞ্জন তুলে বলল সে। 'তোমরা কি অনেক দিন হল কিয়েভে? এক্সকার্সনে এসেছ, তাই না? ক্লাসসুদ্ধ সবাই, নাকি একা?'

আমি চুপ করে থাকি। ওর চেনা, ও-ই বলুক। কিন্তু জাভাও চুপ করে থাকে। জাভাকে যদি তখন তোমরা দেখতে! প্রথমটায় ও ফেকাসে হয়ে গেল, তারপর লাল হয়ে গেল, পরে আবার ফেকাসে হয়ে গেল, আর শেষে ওর মুখ ছেয়ে যেতে লাগল কেমন যেন কতকগুলো ছোপে। এমন কি গত বছর ও যখন পুরনো পাতকুয়োর মধ্যে পড়ে গিয়েছিল তখনও ওর এমন চেহারা হয় নি।

এদিকে ভালকা ছাড়ার পাত্রী নয়:

'তোমরা কি অনেক দিনের জন্যে এসেছ? তোমাদের ঐ বে-আইনী শিকারীদের তোমরা তখন ধরতে পেরেছিলে? তোমরা যে লিখবে বলে কথা দিয়েছিলে তার কী হল?.. ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছ বুঝি? অ্যাঁ? আরে, চুপ করে আছ কেন তোমরা? আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও না নাকি?'

অবশেষে জাভা নিজেকে সামলে নিল, মুখ খুলল। তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো এই কথাগুলি:

'না, না... সে সব কিছুই না, বরং তার উলটো...'

কথাগুলির মধ্যে যে খুব একটা বাকচাতুর্য প্রকাশ পেল এমন বলতে পারি

না, তবে ওদের কথাবার্তার মধ্যে আমি আর কিছু বলতে গেলাম না। করুক গে বক্‌বক্‌!

তাছাড়া বলতে যাওয়ার সময়ও ছিল না — শেষ ঘণ্টা পড়ে গেল, সবারই তাড়া ছিল হল্‌-এ ঢোকার। শো শুরু হয়ে গেল। আমরা বসে ছিলাম সাত নম্বর সারিতে, আর ভালকা — নয় নম্বরে। এদিকে জাভা স্টেজের দিকে না তাকিয়ে বারবার প্যাণ্টের ঘষটায় সীট পালিশ করে, মাথা পেছন দিকে ঘোরায় — ভালকার দিকে তাকায়।

'মাথা উলটো দিকে ঘুরে যাবে, তখন উলটো হয়ে চলতে হবে,' আমি বিরক্ত হয়ে ওকে খোঁচা দিয়ে বলি।

ও কিন্তু কানেই তোলে না।

এই সময় মঞ্চের ওপর বুকের পাঁজরা বার করা লম্বা নাকওয়ালা নেকড়ে দরজা ভেঙে দিদিমার কাছে এসে হাজির হয় তাকে খাওয়ার উদ্দেশ্যে। দিদিমা চটপট যতরকম ভাবে সম্ভব আত্মরক্ষার চেষ্টায় আসবাবপত্র দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করে, গোটা মঞ্চ জুড়ে ছুটে বেড়াতে থাকে, নেকড়েকে লক্ষ্য করে ঘড়া, ডেকচি আর সাংসারিক অন্যান্য জিনিসপত্র ছুঁড়তে থাকে।

কুটিরের কাছে, বেড়ার গায়ে বাঁধা ছিল সত্যিকারের একটা জ্যান্ত মুরগী — দিদিমার সবেধন টিঙটিঙে মুরগী। নাটক চলার সময় যে দড়িতে মুরগীটা বাঁধা ছিল সেটার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে সে ছটফট করতে লাগল। লড়াইয়ে ব্যস্ত নেকড়ে আর দিদিমা সেদিকে নজরই দিল না। দর্শকরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল, তারা দেখতে পেল বেচারি মুরগী ইতিমধ্যে শক্তি হারিয়ে ফেলে কোন রকমে নিশ্বাস ফেলছে। কী করা যায়? চেঁচিয়ে ত আর নাটকটাকে মাটি করা যায় না...

আমি দেখতে পেলাম জাভা তার জায়গায় বসে উসখুস করছে, যেন তার প্যাণ্টের ভেতরে কেউ জ্বলন্ত কয়লা ঢেলে দিয়েছে। তারপর হঠাৎ সে উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে চলল। মাঝখানের যাতায়াতের জায়গা দিয়ে সোজা স্টেজের দিকে। আমার শ্বাসরোধ হয়ে গেল। হল্‌-এর সকলেরও সেই অবস্থা, সকলের মাথা ঘুরে গেল জাভার দিকে, যেমন হয় কুচকাওয়াজের সময় যখন সেনাপতি ফৌজ পরিদর্শন করেন। আপন মনে চলতে চলতে স্টেজের ওপর গিয়ে উঠল, মুরগীর দিকে এগিয়ে গিয়ে দড়ির জট খুলতে থাকে। এদিকে অভিনেতারা নিজেদের মনে অভিনয় করে

চলে, জাভার দিকে তাদের কোন নজরই নেই, যেন ও স্টেজেই নেই। জাভা মুরগীর বাঁধনের জট ছাড়িয়ে দিয়ে চুপচাপ পিছে ফিরে এলো তার নিজের জায়গাটিতে। যখন সে বসল কেবল তখনই আমি শুনতে পেলাম তার ভারী ভারী নিশ্বাস ফেলার আওয়াজ আর বুকের ভেতরে হৃৎপিন্ডের ধুকপুকে। কয়েক মিনিট বাদে নেকড়েটা শেষ অবধি দিদিমাকে খেয়েই ফেলল — প্রথম অঙ্ক শেষ হল। পর্দা নেমে গেল, হল্-এ আলো জ্বলে উঠল। সবাই হাততালি দিতে লাগল, পরন্তু বেশির ভাগ দর্শকই মাথা ঘোরাল জাভার দিকে। বোঝা গেল না কার উদ্দেশে ওরা হাততালি দিচ্ছে — অভিনেতাদের উদ্দেশে, না জাভার উদ্দেশে। আমাদের দিকে তৎক্ষণাৎ ছুটে এলো ভালকা।

'দারুণ! সাবাস বলতে হয়! কী ভাবে মনে মনে ঠিক করলে বল দেখি? আমি ত মরে গেলেও পারতাম না। ওঃ সাবাস বটে!' কথাগুলি সে বলল জোরে, এমন কি আমার মনে হল বেশ জোরে। বোঝাই যাচ্ছিল, জাভার সঙ্গে যে পরিচয় আছে, সকলকে এটা দেখানোই ছিল তার উদ্দেশ্য। এর জন্য সে গর্ব বোধ করছিল। চার দিক থেকে জাভার ওপর এসে পড়েছে পুলকিত দৃষ্টি। আমরা যখন ফয়ারে বেরিয়ে এলাম, তখন সারা সময় কখনও এখানে, কখনও বা ওখানে শোনা যেতে লাগল চাপা গলায় লোকে বলাবলি করছে: 'ঐ যে! ঐ ছেলেটা! ঐ যে! সাদা জামা পরা!'

আমার মনে হয়, এটা ঠিক সেই জিনিস যা জাভা কেবল স্বপ্নেই কল্পনা করতে পারত। জাভাকে ভাগ্যবান বলতে হবে। সে খুশিতে ডগমগ — একথা বললেও বোধ হয় সবটা বোঝানো যাবে না। ফয়ারে সে হাঁটছিল যেন রণপা পরে, যেন সে দুনিয়ার সবার ওপরে। তার চোখ থেকে এমন দীপ্তি ঠিকরে বেরোচ্ছিল যা সাধারণ লোকের চোখ থেকে বার হওয়া সম্ভব নয়। সে তখন অনেক অনেক দূরের মানুষ — জীবনে কখনও তাকে আমার কাছ থেকে এত দূরে দেখি নি। আমি এবং ঘড়ির জন্য আমার দুর্ভাবনা — এখন তার কাছে সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন। ও অবশ্যই বীরপুরুষ বনে গেল, এতে আর সন্দেহ কি, কিন্তু ওর দিকে তাকাতে আমার ভালো লাগছে না।

'এটি হল আমার ছোট ভাই মিকোলা,' নীল ইউনিফর্ম পরা ক্লাস ওয়ানের ছেলেটাকে সর্বক্ষণ আমাদের আশেপাশে ঘুরঘুর করতে দেখে জাভা আশ্চর্য হয়ে তার দিকে তাকাতে ভালকা বলল।

ছোট ভাই মিকোলাও লজ্জায় লাল হয়ে গেল, যেন তার সঙ্গে যার আলাপ করিয়ে দেওয়া হল সে বড়নাক জাভা নয় — মহাকাশচারী পপোভিচ, ফিল্ম স্টার রিবনিকভ। বা আরও কোন নামজাদা কেউ।

'আসলে ওরই জন্যে এখানে আসতে হল আমাকে, মা এখনও ওকে একা ছাড়ে না,' ভালকা অনেকটা কৈফিয়ত দেওয়ার সুরে বলল।

জাভা খোলাখুলি তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে মিকোলার ওপর চোখ বুলিয়ে নিল। ছেলেটার মুখচোখ আরও লাল হয়ে গেল।

'আচ্ছা, তোমরা ওদের শেষ অবধি ধরতে পেরেছিলে কি?' ভালকা জিজ্ঞেস করল।

'সে আর বলতে!' জাভা অবহেলাভরে বলল।

'অথচ চিঠি লিখলে না! এ কী রকম! নাকি ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছিলে?'

'না, হারাই নি... তবে...' বলেই জাভা কাঁধ ঝাঁকাল, আর এই ভঙ্গিটা থেকেই বোঝা গেল যে তার মোদ্দা কথাটা হচ্ছে: লেখার আবার কী আছে? ভারী দায় পড়েছে...

ভালকা দপ করে জ্বলে উঠল। অস্বস্তির ভাব কাটিয়ে উঠে সে বলল:

'তোমরা নিশ্চয়ই একা ওদের ধর নি, বড়রা তোমাদের সাহায্য করেছে। নাকি উলটো, তোমরাই বড়দের সাহায্য করেছ...'

'আরে, বড়দের আবার কী ব্যাপার আছে এখানে,' খিঁচিয়ে উঠল জাভা। 'আমরা নিজেরাই...'

সঙ্গে সঙ্গে সে আমার দিকে দৃষ্টি হানল, ঠোঁট কামড়াল। কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে।

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাত তুলে ওর কপালে টকাস টকাস করে তিনটে টুস্কি মারলাম — ওঃ যা আওয়াজটা হল! ভালকা চেঁচিয়ে উঠল। ছোট ভাই মিকোলা হিহি করে হাসতে লাগল। কাছাকাছি আরও কে যেন হেসে উঠল। রণপা ভেঙে পড়ে গেল, জাভা এসে পড়ল মাটির পৃথিবীতে — সে তখন স্তম্ভিত, টমেটোর মতো লাল হয়ে গেছে সে, তার চোখদুটো বিস্ফারিত। ওর জন্য আমার মায়াই হচ্ছিল। কিন্তু আমার কী দোষ? অমন শর্ত করার কোন্ দরকার ছিল?..

জাভা পালটা দেবার চেষ্টা করছে না দেখে ভালকা (দরদ তার উথলে উঠল) আমার ওপর ঝাঁঝিয়ে উঠল:

'এ কী কাণ্ড! জ্ঞানগম্যি লোপ পেল নাকি? এ আবার কী ধরনের ঠাট্টা?'

আমাদের চারপাশে ছেলেপুলের দল জড়ো হতে থাকে। জাভার চোখের দৃষ্টি তখন কোণঠাসা জন্তুর মতো এদিক-ওদিক ছুটতে থাকে। সে কষ্টেসৃষ্টে বার করল হাসি — চেষ্টাকৃত, করুণ হাসি (পরের নাশপাতি গাছে চড়ে বসার পর মালিকের চোখে পড়ে গেলে লোকে অমন হাসি হাসে)। জাভা বলল:

'ও কিছু নয়... ঠিকই করেছে... এখন আমাদের শোধবোধ হয়ে গেল।' তারপর ভিড়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে সে বলল: 'দেখছ কি হাঁ করে? সিনেমা জমবে!'

বাচ্চারা হেসে সরে পড়তে লাগল, তাছাড়া ঘণ্টাও পড়ল, বিরতি শেষ হল।

'কিন্তু সে যাই বল না কেন, এটা কী হল? তোমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করেছ নাকি?' ভালকা মনে সান্ত্বনা পায় না।

'মোটেই ঝগড়া করি নি! আমাদের মধ্যে একটা শর্ত ছিল — এই আর কি।' ব্যাখ্যা করার ইচ্ছে জাভার ছিল না। আমরা ততক্ষণে হল্-ঘরে ঢুকে নিজেদের জায়গার দিকে এগিয়ে চললাম।

'এ আবার কেমন ধারা শর্ত, অ্যাঁ?' ভালকা ছাড়ে না (ওঃ, একেই বলে মেয়েলি কৌতূহল!)।

'সে পরে হবে, পরে...'

'বেশ, ভালো কথা, পালাবে না কিন্তু।'

'আচ্ছা।'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গুমটি। কানের বদলে কান!

শো শেষ হল। আমরা থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এলাম। জাভা ততক্ষণে টুস্‌কির ধাক্কা পুরোপুরি সামলে উঠেছে। মোরগের মতো ঘাড়টা লম্বা করে বাড়িয়ে (মনে হচ্ছিল এক্ষুনি বুঝি কোঁকর ও কোঁ করে ডাক ছাড়বে!) সে বাচ্চাদের মাথার ওপর দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছিল। ও ভালকাকে খুঁজছিল আর কি।

'চলে গেলেই ত হয়, কী বলিস? ওকে দিয়ে আমাদের কী দরকার? কেবলই কিচিরমিচির — ছাতার পাখির মতন,' আমি মুখ ভার করে বললাম।

আমার মেজাজটা তখন... তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারছ, কেমন হতে পারে: ঘড়ির জন্য মনটা খচখচ করছে — ওটা জগদ্দল পাথরের মতো বুকের ওপর চেপে বসে আছে। মালিকের কাছে ঘড়িটা যাবে বলে কোন আশাভরসা ত দেখতে পাচ্ছি না। ইচ্ছে হচ্ছিল রাস্তায় বেরিয়ে গিয়ে চিৎকার করি। কিন্তু এত বড় শহরে, যেখানে পনেরো লক্ষ লোকের বাস এবং আরও পাঁচ লক্ষ বাইরের লোকের হরদম যাতায়াত, সেখানে কোন নাম-ঠিকানা না জেনে রাস্তায় চেঁচিয়ে লাভটা কী? নিরুপায় অবস্থা! কেঁদেই বা ফল কী?

কিন্তু জাভার মেজাজ সম্পূর্ণ অন্য সুরে বাঁধা, সে ওসব কথাই ভাবছে না।

'কী করে যাই বল? বলিস কী তুই!' সে বলল। 'আমরা যে অপেক্ষা করব বলে কথা দিয়েছি। ফের আমাকে দিয়ে মিথ্যে বলাতে চাস নাকি? দেখিস, অমন করলে কিন্তু টুস্‌কি খেতে বেশি সময় লাগবে না!'

'আমরা কথা দিয়েছি!' বেশ মজার কথা বলে দেখছি! ও একা কথা দিয়েছে, আর বলে কিনা 'আমরা'! আরে, কী আমার যৌথবাদী রে!

কিন্তু আমি কিছুই বলার অবকাশ পেলাম না — ভিড়ের মধ্য থেকে ছোট ভাই মিকোলাকে সঙ্গে নিয়ে ফুড়ুৎ করে বেরিয়ে ভালকা আমাদের দিকে ছুটে এলো।

'এদিকে আমি ফয়ারে তোমাদের খোঁজাখুঁজি করছিলাম — ভাবলাম তোমরা বুঝি ওখানে অপেক্ষা করছ। আচ্ছা, চল!'

আমরা ভাতুতিন পার্কের অভিমুখী রাস্তা ধরে চললাম। ভালকা সর্বক্ষণ কিছু না কিছু বলে যাচ্ছিল, কিন্তু আমি শুনছিলাম না। ওতে আমি উৎসাহ পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ আমি শুনতে পেলাম নিজের নাম:

'কী হল, পাভলিক অমন গুম মেরে আছে কেন? কেমন যেন কটমট করে তাকাচ্ছে... কোন অসুখ-টসুখ করে নি ত ওর? নাকি কিছু ঘটেছে?'

'তোর নিজেরই অসুখ করেছে,' আমি বিরক্ত হয়ে মনে মনে ভাবলাম। 'আমার কাছ থেকে ও চায় কী? তাছাড়া আমাকে কেউ পাভলিক বলে ডাকে এটা আমি পছন্দ করি না। পাভলিক-রাভ্‌লিক*!..'

জাভা অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। তার চোখ যেন বলছিল: 'ক্ষমা করবি ভাই, মিথ্যে কথা বলতে পারছি না।'

'হ্যাঁ, ঐ আর কি,' সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'একটা বাজে ঘটনা ঘটে গেছে।'

ঘড়ির ঘটনা, আমরা আজ কী ভাবে এক থিয়েটার থেকে আরেক থিয়েটারে ঘুরেছি সেই বৃত্তান্ত — যা যা ঘটেছে সব জাভা বলতে লাগল।

গোড়ায় আমি ওকে বাধা দিতে গেলাম, ওকে বলতে দেবার ইচ্ছে আমার ছিল না, কিন্তু পরে হাল ছেড়ে দিলাম — ভাবলাম, বলুক সে, এতে আর কী এমন আসে যায়?

জাভার মুখের বিবরণ শুনতে শুনতে ভালকা সারাক্ষণ ওঃ-আঃ করতে থাকে, অবাক হয়ে যায়। জাভার বৃত্তান্ত শেষ হলে ভালকা উত্তেজিত হয়ে বলে:

'নাও ঠেলা! কাণ্ড বটে!.. বোঝ দেখি, কী ব্যাপার! ঐ অভিনেতাকে খুঁজে বার করতেই হবে, অবশ্যই করতে হবে...' বলতে বলতে হঠাৎ তার চোখদুটো চকচক করে উঠল। 'আরে শোন! আমার মনে হয় একজনের কাছ থেকে তোমরা সাহায্য পেতে পার। আমাদেরই কাছাকাছি থাকেন এক বুড়ো ভদ্রলোক — অভিনেতা, মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ। উনি এখন পেনশনভোগী, স্টেজে নামেন না, তবে সব অভিনেতাকেই জানেন। বিপ্লবের আগেও তিনি থিয়েটারে অভিনয় করতেন। তোমরা তাঁর কাছে তোমাদের 'জারের' বর্ণনা দাও, উনি হয়ত বলতে পারবেন লোকটা কে। যদি চাও, তাঁর সঙ্গে তোমাদের আলাপ করিয়ে দিতে পারি।'

---

* রাভলিক — ইউক্রেনীয় ভাষায় — শামুক।

আমরা এ ওর মুখ চাওয়া-চাউয়ি করলাম। জাভা আমার দিকে বিজয়ীর দৃষ্টিতে তাকাল। আরে বাপু, এখনও বলা যায় না, এই মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ আমাদের সাহায্য করতে পারবেন কিনা! তবে চেষ্টা করে দেখতে বাধাটা কী! আমার অবস্থা এখন এমন নয় যে প্রস্তাবটা ঠেলতে পারি।

'উনি কি এখন বাড়িতে?' প্রশ্নটা করে আমি বুঝিয়ে দিলাম যে আমার আপত্তি নেই।

'হ্যাঁ, সম্ভবত বাড়িতেই। তিনি প্রায়ই অসুস্থ থাকেন, মোটের ওপর বাড়িতেই বেশি বসে থাকেন। চল, যাওয়া যাক।'

জানুয়ারী অভ্যুত্থান সরণিতে আমাদের পূর্বপরিচিত সেই প্রাঙ্গণটি। সেখানে গিয়ে পৌঁছুতেই আমরা শুনতে পেলাম ফুর্তিবাজ বাজনার জোরাল সুর — দোতলার ব্যালকনিতে অল্পবয়সী কিছু লোকজন টেপরেকর্ডার চালাচ্ছিল। আমি ভাবলাম এটা সুলক্ষণ — এই ধর না কেন, সিনেমায় যখন কোন ব্যাপার ভালোয় ভালোয় শেষ হয় তখন সব সময় ফুর্তিবাজ বাজনা বাজে। আমার আর জাভার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ এবং ভালকারা একই দালানে বাস করেন। আমরা দুজনে তাই খোশ মেজাজে বাজনার তালে তালে পা ফেলে ফেলে চললাম সদর দালানের দিকে। কিন্তু ভালকা বলল: 'না না, এদিকে।' বলেই সে মোড় নিল অন্ধকার ফটকের ভেতরে। আমি আর জাভা লজ্জায় লাল হয়ে গেলাম — ভালকা যদি ধরে ফেলে যে আমরা এর আগেই এখানে এসেছিলাম! ভালো বলতে হবে যে ফটকের ভেতরে অন্ধকার থাকায় ও কিছুই লক্ষ করল না। ফটক থেকে বেরিয়ে আমরা গিয়ে পড়লাম পেছনের আঙিনায়, হেলেপড়া চালাঘরগুলির দিকে। চালাঘর ছিল অনেক। কোন কোনটি দোতলা, সেগুলিতে আছে কাঠের সিঁড়ি আর দোতলা বরাবর সরু কাঠের সাঁকো পাতা — স্টীমারে যেমন দেখা যায়; কোন কোনটি বা নীচু, মাটির লাগোয়া। চালাঘরগুলির মাঝখানের অন্ধকার গলিটার মধ্যে জ্বলজ্বল করছিল বিড়ালের সবুজ চোখজোড়া।

আমরা চালাঘরের সারির পাশ কাটিয়ে পায়ে-চলা-পথ ধরে নীচে নামতে লাগলাম। পথটা এঁকেবেঁকে গিয়ে মিশেছে ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে। বাঁ দিক থেকে শুরু হয়েছে বড় মঠের এলাকা, কোথাও কোথাও জেগে আছে, কোথাও বা তোপ দাগার ফুটো সমেত দুর্গের পাথুরে দেয়াল আবার লুকিয়ে পড়েছে

গাছপালা, ঝোপঝাড় আর নানা ধরনের আগাছার শ্যামলিমার মধ্যে। দেয়ালের নীচে ঘন জঙ্গলের মধ্যে ছিল একটা রহস্যময় অন্ধকার। সেখান থেকে ভেসে আসছিল স্যাঁতসেঁতে, ঠাণ্ডা, পচা-পচা গন্ধ।

'কসাক-ডাকাত খেলা খেলতে হয় ত এইখানে!' জাভা ঈর্ষাকাতর স্বরে ফিসফিস করে বলল আমাকে।

ঠিকই, কসাক-ডাকাত খেলা এখানে দারুণ জমবে!

সামনে চোখ ধাঁধিয়ে জ্বলজ্বল করছিল কোন এক ঘণ্টা-মিনারের সোনালি গম্বুজ। আর গম্বুজটার ডান দিকে... হাঃ! চেনা জিনিস বটে! হাই ভোল্টেজের তারের খুঁটি। এই দৈত্যাকার লৌহসারসগুলি আমাদের গাঁয়ের পাশ বরাবরও গোটা মাঠের ওপর দিয়ে পা ফেলে ফেলে মিলিয়ে গেছে দূর দিগন্তের বুকে।

আমরা ঘণ্টা-মিনারের দিকে নেমে গেলাম। ঢালাই লোহার বিশাল বিশাল ফটক খোলা ছিল, খিলানের আকারের প্রবেশদ্বার দিয়ে আমরা এসে হাজির হলাম বড় মঠের ভেতরের প্রাঙ্গণে।

ভালকা ঐ ফটকের পাশ কাটিয়ে চলে যাবার উদ্যোগ করছিল, এমন সময় জাভা বলল:

'আচ্ছা, অন্তত এক মিনিটের জন্যে গিয়ে একবার উঁকি মেরে দেখে নিলে হত না?'

'নাও ঠেলা!' রাগে আমি ভুরু কোঁচকালাম। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘড়ির ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলার জন্য আমার তর সইছিল না।

কিন্তু চালাঘরগুলির মাঝখানে লুকিয়ে থাকা বিড়ালগুলির চোখ থেকে যেমন সবুজ রঙের আগুন ঠিকরে পড়ছিল, জাভার চোখেও তেমনি আভা দেখা গেল। আমি বুঝে ফেললাম: এই কেল্লার প্রাচীর, এই তোপ দাগার ফুটো — আগাগোড়া এই প্রাচীন বড় মঠটি তার কল্পনায় রহস্যময় অজানা লোকজনে, টিকটিকিতে আর গুপ্তচরে গিজগিজ করছে। জাভা এখনই শুনতে পাচ্ছে গুলি-গোলার আওয়াজ, 'হাত তুলে দাঁড়াও!' পিছু ধাওয়ার শব্দ আর... মোট কথা এড্ভেঞ্চার ফিল্মে যা যা ঘটে তার সবই।

এখন তার সঙ্গে তর্ক করতে যাওয়া বৃথা।

'আমরা কেবল একটু দেখব, ব্যস,' মিনতিভরা চোখে সে আমার দিকে তাকাল।

'আরে তাই ত, তোমরা বুঝি আগে কখনও এখানে আস নি!.. তাহলে চল, চল!' ভালকা সঙ্গে সঙ্গে কিচিরমিচির করে বলল।

না গিয়ে উপায় রইল না।

'এখানে বড় মঠ শেষ হয়েছে...' ভালকা বলল। 'এটা হল দূরের গুহার ঘণ্টাঘর। আর এটা — মেরীমাতার দেবালয়।'

তবে ও ব্যাখ্যা করে না বললেও পারত। বিশেষ বিশেষ ফলকের ওপরকার লেখা পড়ে এসবই জানা যেত। জাভা তার প্রিয় অভ্যাসবশত সেই কাজই করল।

'মেরীমাতার দেবালয়, বারোকো স্থাপত্যের রীতিতে ১৬৯৬ সালে নির্মিত...' সে জোরে জোরে পড়ল।

'দুর্দশাগ্রস্ত বারোকো,' আমি বললাম। 'বড় রকমের মেরামতি দরকার...'

বাস্তবিকই, মেরামত-করা স্বর্ণশীর্ষ ঘণ্টাঘরের পাশে মেরীমাতার গির্জাটাকে করুণ ও পরিত্যক্ত দেখাচ্ছিল: গম্বুজগুলির চটা উঠে গেছে, সেগুলি কালো হয়ে গেছে, দেয়ালে ফাটল ধরেছে, জানলার কাচ খসে পড়েছে। গির্জার কাছেই ছিল জলের পাইপ দিয়ে তৈরি, মরচে ধরা, হেলেপড়া ভারা। মনে হচ্ছিল এই ভারাগুলিও যেন গির্জার মতোই সুপ্রাচীন। গির্জার প্রবেশপথ ইট গেঁথে বন্ধ করা ছিল।

গির্জার কাছের ছোট আঙ্গিনাটা প্রতিরক্ষামূলক প্রাচীরে ঘেরা। প্রাচীরের গায়ে ছিল ছোট ছোট চৌকোনা জানলা আর তোপ দাগার সরু সরু ফুটো। এখানে, গাছপালার মাঝখানে নির্জন শ্যামল কোণে ছিল কতকগুলি প্রাচীন সমাধি — দেখা যাচ্ছিল ক্রস, লোহার বেড়া আর মর্মরপাথরের স্মরণিক।

আমরা গির্জার চারপাশ ঘুরে যখন চলে যাচ্ছিলাম তখন জাভা পড়ল একটি স্মরণিকের গায়ে লেখা আছে:

কুতুজভের এডজুটেণ্ট
১৮১২ সালের পিতৃভূমির যুদ্ধের বীর
পদাতিক বাহিনীর জেনারেল
প. স. কাইসারভের উদ্দেশে
উত্তরপুরুষগণের কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ
১৯৫১ সাল

আরেকটিতে:

ম. ই. কুতুজভের সহযোদ্ধা
১৮১২ সালের পিতৃভূমির যুদ্ধের বীর
পদাতিক বাহিনীর জেনারেল
আ. ই. ক্রাসোভ্‌স্কির উদ্দেশে
উত্তরপুরুষগণের কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ
১৯৫১ সাল।

'দেখলি,' জাভা বলল। 'এমন সমস্ত ঐতিহাসিক জেনারেলদের সমাধি, আর তুই কিনা যেতেই চাইছিলি না।'

'আমাদের এখানে অনেক ঐতিহাসিক মানুষের সমাধি আছে,' ভালকা বলল। 'এই বড় মঠে আছে কোচুবেই*⁾ আর ইস্‌ক্রার সমাধি, ভিদুবেৎস্কি মঠে আছে উশিন্‌স্কির*⁾, আর বেরেস্তোভের পরিত্রাতা গির্জায় আছে ইউরি দলগোরুকির*⁾, যিনি মস্কোর প্রতিষ্ঠাতা।'

জাভা ফের আমার ওপর গর্বিত দৃষ্টি বুলিয়ে নিল, ভাবটা এই যেন এই কথাগুলি ভালকা বলে নি, বলেছে জাভা নিজে।

'সময় করে দেখতে হবে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি বললাম। 'তবে এখন চল, ঐ ভালেরিয়ানভিচের কাছে যাওয়া যাক।'

'চল, চল,' ভালকা সায় দিয়ে বলল।

আমরা ফটক দিয়ে বেরিয়ে এসে কেল্লার প্রাচীর বরাবর হে'টে আরও নীচে নেমে এলাম।

ও, কী জায়গাই না মোহান্তরা বেছে নিয়েছিল তাদের বড় মঠের জন্য! উদ্দাম শ্যামলিমার মাঝখানে, নীপারের খাড়া ঢালের ওপর। কূলকিনারাহীন নীল দিগন্তের চারপাশের সম্পূর্ণ দৃশ্যের ওপর সেখান থেকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা কঠিন।

আঁকাবাঁকা পায়ে চলা পথ ধরে আমরা এসে নামলাম অ্যাসফল্‌ট বাঁধানো রাস্তায়। এই রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা এলাম একটা সরু, বাঁকা শাখাপথে, যেখানে বাগানের শ্যামলিমার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল মাটির অনেকটা ভেতরে গাঁথা, হেলেপড়া কতকগুলি পুরনো আমলের নিকানো কুটির। প্রায় প্রতিটি কুটিরের ওপর

টেলিভিশনের অ্যান্টেনা খাড়া হয়ে ছিল বলেই স্থির করা যাচ্ছিল যে এগুলি আজকের দিনের বাসগৃহ, শেভচেঙ্কোর আমলের নয়।

যে কুটিরটির সামনে এসে ভালকা থমকে দাঁড়াল সেটি ছিল সম্ভবত সবচেয়ে জরাজীর্ণ। ছোট্ট উঠোনটাতে উত্তেজিতভাবে ঘন ঘন মাথা নেড়ে খোঁড়াখুঁড়ি করে বেড়াচ্ছিল কিছু সাদারঙের নোংরা মুরগী, আর বেপরোয়া ভঙ্গিতে মাথার ঝুঁটি তেরছা করে বাগিয়ে ম্যানেজারের মতো গম্ভীরভাবে পায়চারী করছিল বিচিত্র বর্ণের এক মোরগ। এই রাস্তায় অন্যান্য বাড়ির মালিকদের যেমন সবজি বাগান বা ফলগাছের ঝোপঝাড় ছিল সে সবের কিছুই এখানে নেই। কেবল ফুল: গোলাপ, পিওনি, ম্যালো, ফ্লোক্সি — এই রকম নানা ফুল।

আর এই ফুলের বাগিচার মধ্যে ছোট্ট কুটিরটা দাঁড়িয়ে ছিল একটা খেলাঘরের মতো। কুটিরের দেয়াল গ্রামীন রীতিতে পরিপাটি করে লেপা, রোয়াকটা নীল রঙ করা আর চালার নীচে দেয়ালের ওপর ঝুলছে কতক শুকনো ঘাসের গোছা।

ভালকার পেছন পেছন আমরা আঙ্গিনায় প্রবেশ করলাম। দেউড়ির সামনের তক্তাটা প্রায় মাটির সঙ্গে বসে গেছে, আমরা পা ফেলতেই সেটা ক্যাঁচকোঁচ করে উঠল। ভালকা দরজায় ধাক্কা দিল। কেউ জবাব দিল না। ভালকা কিছু না বুঝতে পেরে কাঁধ ঝাঁকাল। তারপর জানলার দিকে এগিয়ে এসে হাতের তালু দিয়ে কপাল আড়াল করে শার্সি ঘেঁষে দাঁড়াল।

'না, নেই দেখছি,' বেকায়দা অবস্থাটা কাটিয়ে উঠতে উঠতে ভালকা বলল, 'বুঝলে কিনা, সম্ভবত চলে গেছেন কুরেনেভ্‌কায় ওঁর ভাইপোর কাছে। কোন কোন সময় রোববার সেখানে যান, যখন শরীরের অবস্থা ভালো মনে করেন। কিন্তু উনি শিগগিরই ফিরে আসবেন, তোমরা চিন্তা করো না। উনি সব সময় সকালে চলে যান, দুপুর নাগাদ ফিরে আসেন।'

চারপাশের সমস্ত কিছু ছিল এত অভ্যস্ত, এতই কাছের যে আমার কেন যেন সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস হল এখানে যে লোকটি বাস করেন তিনি অবশ্যই আমাদের সাহায্য করবেন। আমি তাই সন্ধে অবধি হলেও অপেক্ষা করতে রাজী আছি।

ভালকা বলল:

'আমাদের বাড়ি এসো। তোমাদের আমি আমার বইপত্র দেখাব। আর ফোটো। আমার পুরো দুখানা ফোটোর অ্যালবাম আছে। উনি শিগগিরই আসবেন, তোমাদের

চিন্তার কারণ নেই।'

ভালকা এমন সুরে কথা বলছিল যে মনে হল মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ যে সুস্থ বোধ করায় ভাইপোর কাছে গেছেন এটা যেন ওরই দোষ। আমরা ফিরে চললাম। যা যা দেখলাম সে সব মিলে আমার মনে এক আশ্চর্য ছাপ রেখে গেল।

এই মাত্র ছিল ট্রলিবাসসঙ্কুল কোলাহলমুখরিত শহুরে পথ, তারপরই হঠাৎ — গির্জা, নিস্তব্ধতা, ক্রস, পুরনো সমাধি, 'পদাতিক বাহিনীর জেনারেল ক্রাসোভ্স্কি', কেল্লার কালচে রঙ ধরা প্রাচীর, তারপর ঝপ করে কোত্থেকে আকাশ ফুঁড়ে উঠে পড়ল হাই ভোল্টেজ তারের খুঁটি, তারপর আচমকা পল্লীর বাঁকা রাস্তাটি, মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচের কুটির — মুরগীরা ক'ক-ক'ক করছে, জানলার নীচে ম্যালো ফুলের গাছ, সূর্যমুখী। আর নীচে চলে গেছে উপকূল সরণি: ট্রামগাড়ি, বাস, মোটরসাইকেল। ডান দিকে বিশাল পাতন সেতু। বাঁয়ে আরেকটি সুন্দর সেতু — পাতাল রেলের লাইন সোজা ভূগর্ভ ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে তারই ওপর দিয়ে নীপারের আরেক পাড়ে গেছে।

এই সবকিছু, এই নতুন আর পুরনো কী ভাবে যে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল তা ভাবতে গেলে রীতিমতো আশ্চর্য হতে হয়।

আমরা চালাঘরগুলির জায়গায় এসে পেঁছিুলাম। এই দোতলা 'জাহাজবাড়িগুলির' একটিতে, দুতলা জুড়ে টানা সেতুর রেলিঙের ওপর বসে ছিল হেঁড়ে, চওড়া মুখের একটা ছেলে। তার পরনে চেককাটা শার্ট, আর যেটা আমার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করল তা হল নীল রঙের তেরপলের কাপড়ের প্যান্ট। এ ধরনের প্যান্ট আগে আমি কখনও দেখি নি। প্যান্টের ওপর ছিল ধাতুর তৈরি অসংখ্য বল্টু জাতীয় চাকতি লাগানো। দেখে মনে হচ্ছিল এই প্যান্টটা কোন কাপড়ের তৈরি নয়, লোহার তৈরি, আর সেলাই ত করা নয়, যেন বল্টু জাতীয় চাকতি দিয়ে আঁটা।

'লোকার' প্যান্ট পরনে এই ছোঁড়াটাকে দেখে ভালকা চেঁচিয়ে বলল:

'এই গুমটি, তুই ফের কাল আমাদের দরজার ঘণ্টা বাজিয়েছিস? যদি ঘণ্টা বাজানো না থামাস তাহলে মজাটা টের পাবি কিন্তু!'

'কেটে পড়্!' এই বলে গুমটি দাঁতের ফাঁক দিয়ে পিচ কেটে থুতু ফেলল।

'দেখবি, দেখবি বলে রাখলাম!' ভালকা দমে না।

'যা যা বেশি বকিস নে!' অবজ্ঞাভরে মুখ বাঁকিয়ে বলল গুমটি।

'কী ব্যাপার?' ঠাকুর্দার মতো গম্ভীর সুরে জিজ্ঞেস করল জাভা।

আমি দেখতে পেলাম জাভা সঙ্গে সঙ্গে লাল হয়ে গেল। ভালকা বলার আগেই আমাদের বুঝতে কিছু বাকি ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম সে কী বলে। শেষ পর্যন্ত ভালকা বলল:

'এই দেখ না, ধরেছে এক কায়দা — দরজায় ঘণ্টা বাজিয়ে পালিয়ে যায়। মজা পেয়ে গেছে!'

জাভা আমার দিকে বিদ্যুতের ঝলকের মতো দৃষ্টি হানল, আর তাতে আমি ভেতরে ভেতরে দারুণ তাপ বোধ করতে লাগলাম। ও বলল:

'পাভেল চল্ ত দেখি!'

চালাঘরের দোতলায় ওঠার জন্য যে কাঠের মই ছিল আমরা সঙ্গে সঙ্গে সেটার দিকে ছুটে গেলাম।

'আরে কর কী তোমরা? ছাড়, ছাড়! বদমাশটার সঙ্গে লেগে কাজ নেই!' ভালকা চেঁচিয়ে বলল (ও ভাবছিল বুঝি নিছক উদারতা ও বীরব্রতীর অনুভূতিবশত আমরা এটা করছি)।

কিন্তু আমরা ওর কথায় কান না দিয়ে এমন ভাবে মইয়ের ধাপে পা ফেলে তরতর করে ওপরে উঠতে লাগলাম যেমন নাবিকেরা করে থাকে সকলে মিলে কোন কাজে হাত লাগানোর সময়। গুমটির পালানোর রাস্তা ছিল না, তাছাড়া পালানোর কোন চেষ্টাও সে করল না। সে কেবল রেলিঙ থেকে নেমে পড়ে বুকের ওপর দুহাত ভাঁজ করে রেলিঙে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ছেলেটা মোটামুটি আমাদেরই বয়সী, কিন্তু বেশ শক্তসমর্থ আর কাঁধজোড়াও আমাদের চেয়ে চওড়া। কিন্তু আমাদের গাঁয়ে গোরু চরানোর মাঠে এর চেয়েও কঠিন বিরুদ্ধপক্ষের সঙ্গে মোকাবিলা করার অভ্যাস আমাদের আছে।

'তার মানে ঘণ্টা বাজাস! অ্যাঁ, বেল টিপিস!' গুমটির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ফোঁসফোঁস করে বলল জাভা।

গুমটি কিন্তু তার ভঙ্গি পর্যন্ত পাল্টাল না, একই ভাবে বুকের ওপর দুহাত ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে রইল। কেবল দাঁতে দাঁত চেপে সে বলল:

'দাঁড়া, পা বাড়াবি না বলছি, তাহলে কিন্তু দ্ব'পা টানটান করে চিতপাত হয়ে পড়ে থাকতে হবে! আমি সাম্বো অভ্যাস করি, এমন এমন প্যাঁচ জানি যে তোমরা সঙ্গে সঙ্গে টুপ করে নীচে পড়বে পাকা নাশপাতির মতো।'

'দ্-দেখা যাবে!' ফোঁসফোঁস করে এই কথা বলেই জাভা আচমকা গ্বমটির কান চেপে ধরল — তাও আবার দ্বই আঙ্বলে নয়, হাতের পাঁচপাঁচটা আঙ্বল দিয়ে।

গ্বমটি ঝটকা মেরে জাভার পেটে ঘ্বষি মারতে গেল। কিন্তু জাভা তার অন্য খালি হাতটা দিয়ে তার হাত চেপে ধরল, আর আমি চেপে ধরলাম অন্য হাতটা... আর ঠিক একই সময় আমরা দ্বজনে ওর পা মাড়িয়ে চেপে রাখলাম; জাভা — বাঁ পা, আমি — ডান পা, যাতে দ্বই পা ছ্বঁড়ে বাধা দিতে না পারে। এ ধরনের 'সাম্বো' আমাদের খ্বব ছোটবেলা থেকেই জানা আছে। গ্বমটি এদিক ওদিক পাক খেয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল, কিন্তু আমরা ওকে চেপে রেখেছিলাম যেন সাঁড়াশী দিয়ে। জাভা ওর কান আচ্ছা কর মলতে মলতে বলতে লাগল:

'তোর ভাগ্য ভালো বলতে হবে যে আমরা তোর ম্বখে মারছি না। তোর যা পাওনা আমরা কেবল সেটাই মিটিয়ে দিচ্ছি। একজন আমাদের বলেছিল তার হয়ে মিটিয়ে দিতে।'

প্রথম দিকে গ্বমটি বারবার দাঁতে দাঁত চেপে বলতে থাকে:

'হয়েছে! হয়েছে!'

তারপর চুপচাপ কেবল ফোঁসফোঁস আওয়াজ বার করতে লাগল। শেষে তার চোখে জল বেরিয়ে এলো, সে অন্বনয়বিনয় করে বলতে লাগল:

'ছেড়ে দে! বলছি ছেড়ে দে! ছেড়ে...'

'আর ঘণ্টা বাজাবি? বাজাবি?'

'ন্-না, আর করব না...' ঢোক গিলে চোখের জল সামলাতে সামলাতে ব্যা-ব্যা করে বলল গ্বমটি।

আমরা ওকে মইয়ের ম্বখে টানতে টানতে নিয়ে এসে ছেড়ে দিলাম। আমি আর সামলাতে না পেরে হাঁটু দিয়ে দিলাম এক ঘা কষিয়ে। গ্বমটি তার 'বল্টুমারা' প্যাণ্টে ঝনঝন আওয়াজ তুলতে তুলতে নীচে গড়িয়ে পড়ল।

নীচে পড়তেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে খানিকটা ছুটে গেল. তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে চোখের জলে চওড়া মুখটা মাখামাখি করে চেঁচিয়ে বলল:

'আচ্ছা রসো, রসো! আমার খপ্পরে না পড়ে যাবে কোথায়!..'

এই বলে হাতের মুঠো পাকিয়ে শাসিয়ে হাওয়া হয়ে গেল।

নীচে আমাদের অভ্যর্থনা জানাল ভালকা আর তার ছোট ভাইটি — যেন আমরা দুই মহাকাশচারী বীর। যেন আমরা চালাঘর থেকে নামি নি, ভনুকোভো বিমানবন্দরে 'তু-১০৪' বিমান থেকে নামলাম সিঁড়ি বয়ে। কেবল ফুল আর ব্যাণ্ডপার্টির বাজনা ছিল না — এই যা।

ছোট ভাই মিকোলা ত আনন্দে নেচে কূল পায় না। সে বলল:

'দারুণ! দারুণ! আমাদের সব ছেলেমেয়ে গুমটিকে ভয় পায়, কিন্তু তোমরা... ওঃ দারুণ! দারুণ! সব্বাইকে বলব...'

আমরা এমন ভঙ্গি করলাম যে এ ত আমাদের কাছে তুচ্ছ, বিশেষ কিছুই এতে নেই।

'আচ্ছা, ওর নাম গ্নমটি কেন? ওর নাম নাকি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আরে না, সবাই ওকে ঐ নাম দিয়েছে... তোমরা দেখেছ ত ওর ম্নখটা কেমন? সত্যিকারের গ্নমটি। ওর আসল নাম অবশ্য তোলিক। বিশ্রী, বড় পাজী ছেলে...' মিকোলা সখেদে মনের ঝাল মিটিয়ে বলল: সম্ভবত গ্নমটির কাছ থেকে প্রায়ই তার ভাগ্যে কিছ্ন জোটে।

হঠাৎ ভালকা উল্লসিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল:

'আরে, এই ত মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ!'

এক দীর্ঘদেহী ভদ্রলোককে লাঠিতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে ফটকের ওধার থেকে আসতে দেখা গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ

পা ফেলার ভঙ্গিটা ভারী না হলে সম্ভবত বলা কঠিন হত তিনি বৃদ্ধ না তর্নণ — তাঁর স্বচ্ছ আসমানী রঙের দ্নচোখের ঝলকে ঠিকরে পড়ছিল এমনই দ্নষ্টুমিভরা খ্নশি-খ্নশি ভাব। টাকের ছিটেফোঁটা লক্ষণও ছিল না — সামান্য সাদার ছোঁয়াচ লাগা তার ছাই-ছাই ঘন চুলের রাশি বেপরোয়া ভঙ্গিতে ঝ্নঁটির আকার ধারণ করে প্রায় অর্ধেক কপাল ঢেকে দিয়েছে। ম্নখটা আপেলের মতো লাল ছোপ ধরা, চকচক করছে।

সবকিছ্ন মিলে তার চেহারায় 'ঠাকুর্দা-ঠাকুর্দা' ভাবের কেমন যেন অভাব দেখা গেল।

এবারেও স্নানের ঘাটে আমার যেমন মনে হয়েছিল, তেমনি ভাবনার উদয় হল আমার মনে: আচ্ছা, কিয়েভে এ ধরনের স্মার্ট চেহারার দাদ্নর সংখ্যা কত?'

'নমস্কার, মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ, আমরা কিন্তু আপনার কাছেই গিয়েছিলাম!' ভালকা তাঁর ম্নখোম্নখি এগিয়ে এসে বলল।

'বেশ, বেশ! ভালো ত? কী ব্যাপার?' সারা চোয়াল জুড়ে বাঁধানো ঝকঝকে সাদা দাঁত বার করে মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ আমাদের উদ্দেশে হাসলেন।

'ওঃ, বড় গুরুতর ব্যাপার, বড় গুরুতর...' ভালকা তড়বড় করে বলল। 'আপনার কাছে আমরা সাহায্য চাই।'

'আচ্ছা, এমন ব্যাপার? তা, এতে কী আছে? আমি তোমাদের সেবার জন্যে সদাপ্রস্তুত, প্রিয় বন্ধুরা। আমার এই ছিয়াত্তর বছরের হাড়ের পক্ষে তোমাদের জন্যে যতদূর করা সম্ভব করব, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পার তোমরা,' বৃদ্ধ অভিনেতা বললেন। ভালকা বৃত্তান্তটা বলার জন্য সবে হাঁ করেছে, অমনি মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন:

'না গো মেয়েটি! আমার কথাটা শোন! মুখ বন্ধ কর! একটি কথাও নয়! ব্যাপার যখন গুরুতর তখন এরকম পথ চলতে চলতে তার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। সবাই মিলে চল আমার ভবনে! সেখানে জুত করে কথাবার্তা বলা যাবে।'

এই ঠাট্টা মেশানো চনমনে সুরটি সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ অভিনেতার প্রতি কেমন যেন একটা প্রীতির উদ্রেক করে। আমাদের মুখে আপনাআপনি ফুটে উঠল হাসিখুশি ভাব। তাঁর সঙ্গ পেয়ে আমরা এমন হালকা আর এত ভালো বোধ করতে লাগলাম যে মনে হচ্ছিল আমরা যেন বহুকাল তাঁর সঙ্গে পরিচিত।

'এরকম কুটিরে আমি থাকি বলে তোমরা হয়ত অবাক হয়ে যাচ্ছ?' আমরা যখন তাঁর কুটিরের দিকে এগিয়ে গেলাম তখন তিনি বললেন মৃদু হেসে। 'কতবারই না আমাকে এখান থেকে অন্য জায়গায় সরানোর চেষ্টা করা হয়েছে, আমি স্রেফ 'না' করে দিয়েছি। এই ফুল ছেড়ে যাওয়া, এখানকার এ সবকিছু ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আসতে আজ্ঞা হোক!'

কুটিরে ছিল দুটো ছোট ছোট ঘর, আর খুবই ছোট একটা রান্নাঘর। ছাদের সিলিং নীচু — বাড়ির কর্তা অনায়াসে হাত দিয়ে নাগাল পেতে পারে। এই কারণে এবং উঠোনের দিক থেকে ঝোপঝাড় ও গাছপালা জানলাগুলি ঢেকে দিয়েছে বলেও বটে, দিনটি রৌদ্রোজ্জ্বল হওয়া সত্ত্বেও বাড়ির ভেতরে ছিল সবজে আলো-অন্ধকার। তাছাড়া এই ছোট ছোট ঘরগুলিকে আলোকিত ও রৌদ্রোজ্জ্বল বলে কল্পনা করাও কেমন যেন কঠিন। আলো-অন্ধকার ভাবটাই তাদের পক্ষে বেশি শোভা পায়। দুটি ঘর এবং রান্নাঘরটাও ছোট-বড় ফুলের টবে বোঝাই। জানলার

তাকে, টুলে, বিশেষভাবে তৈরি তাকে এবং স্রেফ মেঝের ওপর টবগুলি রাখা ছিল। টবে ছিল লিলি, প্রিমরোজ ইত্যাদি যত রকমের সম্ভব ঘরোয়া ফুলের গাছ। তবে সবচেয়ে বেশি — ক্যাকটাস্। এত বিভিন্ন ধরনের ক্যাকটাস্ যে থাকতে পারে এর আগে আমি কখনও ভাবিই নি: ছোট, গোল — যেন সবুজ রঙের সজারু, বড় বড়, প্রাগৈতিহাসিক গিরগিটিদের মতো বিরাট বিরাট থাবাওয়ালা ঘন কাঁটায় ঢাকা, আবার প্রায় সম্পূর্ণ কাঁটা ছাড়া — কত রকমের যে ক্যাকটাস্! নানা আকারের, নানা রঙের। ছিল মজবুত চেহারার বয়স্ক ক্যাকটাস্,

আবার একেবারেই ছোট, ফুরফুরে রোঁয়ায় ঢাকা ক্যাকটাস্। এ যেন ঠিক কোন রূপকথার ক্যাকটাস্‌রাজ্য।

ক্যাকটাস্ ছাড়া ঘরে আরও যে জিনিসটির আধিপত্য ছিল তা হল ফোটো। ঘরের দেয়ালগুলি ফ্রেমে বাঁধানো ছবিতে আগাগোড়া ভর্তি। আর বেশির ভাগ ছবিতেই শোভা পাচ্ছিলেন স্বয়ং মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ। অগণিত সংখ্যক মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ চার দিক থেকে আমাদের দিকে তাকাচ্ছিলেন। সকলেই নানা ধরনের।

টপ-হ্যাট পরে মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ। আস্ত্রাখান টুপি মাথায় মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ। চাঁদি টুপি মাথায় মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ। গোঁফওয়ালা ও গোঁফছাড়া মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ। নাবিক বেশে মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ। কসাক বেশে মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ। ভবঘুরে মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ (ছেঁড়া জামাকাপড় পরনে)। পশুলোমের ওভারকোট গায়ে মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ। আলখাল্লা পরনে মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ। মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ... উলঙ্গ। অবশ্য সত্যি কথা বলতে গেলে কি, পুরোপুরি উলঙ্গ নয়, একটা নেংটি জড়ানো। সম্ভবত কোন জংলীর ভূমিকায়, কেননা নাকে আবার একটা আঙটা ঝুলছে।

ওঃ, সবগুলো মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচকে দেখতে গেলে মাথা ঘোরার উপক্রম আর কি।

এদিকে, ঈশ্বরভক্ত লোকেরা যেখানে আইকন রাখে, সেখানে, কোনায় কী একটা যেন ঝুলছে। প্রথমে ত আমি ভেবেই বসেছিলাম যে আইকন: দু'ধারে নকশা কাটা তোয়ালে, তাছাড়া সোনার ফ্রেমও ঝকঝক করছে। ভালো করে তাকিয়ে দেখি সেখানে পেঁশনে চশমা চোখে এক ভদ্রলোক, মুখে তাঁর সিগারেট গোঁজা। অথচ আমাদের ঠাকুমা-দিদিমার মুখে যতদূর শুনেছি, প্রভু পরমেশ্বর ত ধূমপান করতেন না, চশমাও পরতেন না। আর কস্মিনকালে হাসেনও নি। অন্তত আমি ত এমন একটা আইকনও দেখি নি যেখানে ভগবানের মুখে আছে সিগারেট, চোখে চশমা অথবা নিছক তিনি হাসছেন। তিনি সর্বদাই গম্ভীর, অসন্তুষ্ট। কী করে যে লোকে তাঁকে বিশ্বাস করে, অমন বিরস চেহারাকে!

পরে অবশ্য ভালকা আমাদের বলেছে যে, সিগারেট মুখে ঐ ভদ্রলোকটি হলেন বিখ্যাত অভিনেতা স্তানিস্লাভ্স্কি — তাঁরই পোর্ট্রেট ওটা। এই স্তানিস্লাভ্স্কিই মস্কো আর্ট থিয়েটার সংগঠন করেন মস্কোয়। আর অভিনেতাদের কাছে তিনি ছিলেন সত্যিকারের, ঈশ্বর — সদাশয়, হাস্যময়, প্রফুল্ল... তিনি একটা বেশ সুন্দর পদ্ধতির প্রচলন করেন। পদ্ধতিটা যে আসলে কী, দুর্ভাগ্যবশত ভালকা তা ভালো করে বোঝাতে পারল না, যেহেতু তার নিজেরই জানা ছিল না, তবে সে এই কথা বলল যে স্তানিস্লাভ্স্কির পদ্ধতি আজও পৃথিবীর সর্বত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

কিন্তু সে হল পরের কথা। আপাতত আমি আর জাভা নিরীক্ষণ করে দেখতে থাকি, আর এদিকে ভালকা বেশ গুছিয়ে আমাদের এড্ভেঞ্চারের এবং ঘড়িসংক্রান্ত ঘটনার এমন জীবন্ত বর্ণনা দিতে থাকে যে মনে হচ্ছিল সে নিজেই যেন ঐ পরিস্থিতিতে পড়েছিল। মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ যেহেতু ভালকার পরিচিত, যেহেতু তাঁর সঙ্গে সে স্বচ্ছন্দ বোধ করে সেই হেতু আমরাও ঘটনাটা বলার ভার পুরোপুরি তার ওপর ছেড়ে দিই, কেবল কখন-সখন এক-আধটা শব্দ যোগ করি।

মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ গম্ভীরভাবে, গভীর মনোযোগ দিয়ে কথাগুলি শুনলেন।

ভালকার কথা শেষ হতে তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠল।

'বটে, বন্ধুমহোদয়বৃন্দ,' খুশির সুরে তিনি বললেন। 'বিষয়টা পরিষ্কার। বিনা

দোষে দোষী... অনিচ্ছাকৃত দুষ্কর্ম... হয়, হয় বৈকি অমন ঘটনা। তবে মুষড়ে পড়ার কারণ নেই। লোকটা যদি সত্যি সত্যিই অভিনেতা হয়ে থাকে আর সে যদি কিয়েভে থাকে, তাহলে মাটির তলা থেকে হলেও তাকে বার করব, খুঁজে পাবই। ছবির মধ্যে তোমরা যে তাকে খুঁজে পাও নি সেটা তেমন কোন ব্যাপার নয়। বাইরের কোন অতিথি অভিনেতাও হতে পারে। আমাদের এখানে যে এখন মস্কোর পুশ্‌কিন ড্রামা থিয়েটারের, ল্‌ভোভের জানকোভেৎস্কায়া আর জাপোরজিয়ের শোর্স ড্রামা থিয়েটারের অনুষ্ঠান-সফর চলছে। সুতরাং খোঁজার আরও জায়গা আছে। কিন্তু প্রিয় বন্ধুরা, এ কাজটা কাল পর্যন্ত স্থগিত রাখতে হবে...' সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের পাদুটো দেখিয়ে বললেন: 'বুঝলে কিনা, আমার এইদুই সঙ্গিনী বড্ড বেশি আবদারে। মেরে কেটে ফেললেও বেশি হাঁটিতে নারাজ। বিশেষত এই এটি — শ্রীমতী বামাসুন্দরী। শ্রীমতী দক্ষিণাকে তবু বলে কয়ে রাজী করানো যায়। কিন্তু এটি এমন জেদ ধরে থাকে — জায়গা থেকে নড়াচড়ার নাম নেই! ওদের সাহায্যের জন্যে আমি অবশ্য তৃতীয় আরেকজনকে রেখেছি,' হাতলে কুকুরের মাথা কোঁদা, গাছের শাখার মতো দেখতে মোটা ছড়িটাকে মাথা নেড়ে ইশারা করে দেখিয়ে বললেন তিনি, 'কিন্তু তাহলে কী হবে — গোঁ ধরে বসে থাকে। কাল সকালের আগে কোনমতে রাস্তায় নামতে রাজী করানো যাবে না। তাছাড়া আজ দেরিও হয়ে গেছে — শিগগিরই সন্ধের শো আরম্ভ হয়ে যাবে, আর শোর আগে অভিনেতার কাছে মঞ্চ ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্বই থাকে না। তাকে ব্যস্ত করে তোলা ঠিক হবে না। তার মানে, আমাদের পরিকল্পনাটা হবে এই রকম: কাল সকালে তোমাদের নিয়ে আমি যাব... ফিল্‌ম স্টুডিওতে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ফিল্‌ম স্টুডিওতে... ওখানে আমার একটা ছোটখাটো শুটিং আছে। এখন আমি কেবল সিনেমার চলৎশক্তিহীন ভূমিকায় নামতে পারি। তা ঐ ফিল্‌ম স্টুডিওতেই আমরা তোমাদের 'জারকে' তল্লাসের জন্যে জরুরী তদন্তদল তৈরি করে ফেলব। এ কাজে এক দিকে ব্যবহার করা হবে তরুণ সৃজনীশক্তি (অর্থাৎ অল্পবয়সী দ্রুতগতি অভিনেতাদের), অন্য দিকে — বিংশ শতাব্দীর বিস্ময় — টেলিফোন; এই ভাবে আমরা বিপুল অভিযান চালাব... ফলে ঘড়ি তার মালিককে খুঁজে পাবে।'

কথাগুলি তিনি এমন সহজভাবে আর জোর দিয়ে বললেন যে সেই মুহূর্তে

আমার কোন সন্দেহই রইল না যে সব ভালোয় ভালোয় মিটে যাবে। নিজের অজানতে আমার মুখে হাসি ফুটে উঠল। জাভার মুখেও। ভালকা হাসল, ওর ভাই মিকোলা হাসল।

আমার তখন খুবই ইচ্ছে হচ্ছিল মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচকে আনন্দ দেবার মতো, ভালো কিছু একটা বলি। ফোটোগুলির দিকে তাকিয়ে আমি বললাম:

'এতগুলো ভূমিকায় আপনি অভিনয় করেছেন! দারুণ ত!'

মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ যেন আমার মনোগত অভিপ্রায় টের পেয়ে গিয়ে মুচকি হাসি হাসলেন।

'হ্যাঁ, তা অভিনয় যৎসামান্য করেছি ভদ্রমহোদয়রা... যেমন পারা যায় করেছি আর কি,' তিনি ফোটো বোঝাই দেয়ালের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে শেষকালে কিয়েভ অপেরা থিয়েটারের একটা বড় ফোটোর ওপর স্থির দৃষ্টি রেখে বললেন: 'আর এই যে বন্ধুরা, এটা হল আমার সবচেয়ে পবিত্র জায়গা। এখানে আমি জীবনে প্রথম থিয়েটারে আসি, প্রথম দেখি মঞ্চ, মঞ্চের অভিনেতাদের। এখানেই প্রথম আমার সামনে উত্তোলিত হয় থিয়েটারের যবনিকা।'

মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ মুহূর্তের মধ্যে গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে বললেন:

'অনেক কাল আগেকার কথা, অনেক-অনেক কাল হয়ে গেল! কিন্তু যত অদ্ভুতই মনে হোক না কেন, তোমরা আমাকে বিশ্বাস করতে পার: তখন আমি ছিলাম নেহাৎই ছোট ছেলে, তোমাদের থেকেও অনেক ছোট। আমরা তখন সবে তেরনোপোলশ্চিনা থেকে কিয়েভে এসেছি, আমার মা এই থিয়েটারে ঝাড়ুদারণীর কাজ নিলেন। একদিন তিনি আমাকে থিয়েটারের শো দেখাতে নিয়ে এলেন। তখন হচ্ছিল ভার্দির অপেরা 'ত্রাভিয়াতা'। তোমরা শুনেছ নিশ্চয়ই?'

'তা আর শুনি নি? রেডিওতে শুনেছি,' জাভা সগর্বে বলল, এবং কারও মনে যাতে সন্দেহ না জাগে সেই জন্য মোরগকণ্ঠে গাইল: 'ত্যা-জিব অণ্ড-ল মোরা যেথা হেন দু-র্-ভোগ...'

'ঠিক, ঠিক,' মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ হাসলেন। 'এই হল 'ত্রাভিয়াতা'। আমি বসে ছিলাম একেবারে স্টেজের কাছে, যেখান থেকে আলোকসম্পাত করা হয় সেই বক্সে (যিনি আলোকসম্পাত করেন মা'র কথায় তিনি আমাকে সেখানে বসতে দেন)। সব দেখা যাচ্ছিল, শোনাও যাচ্ছিল চমৎকার। আমি বসে থেকে থেকে

বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে নিজের চোখে এই যা যা দেখছি তা স্বপ্ন নয়, রূপকথা নয়। শেষ অঙ্কে যখন ভিয়োলেত্তা মারা যাচ্ছে তখন এতটা অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম, সে সত্যি সত্যি মারা যাচ্ছে বলে আমার এতটা বিশ্বাস হয়েছিল যে আলফ্রেড ও জেরমনের অসঙ্গত আচরণ আমার হঠাৎ কেমন যেন বিশ্রী ঠেকল। একজন মহিলা বলতে গেলে মৃত্যুপথযাত্রী, আর এই বদমাশ দুটোতে কিনা গলা ফাটিয়ে গান করছে! আমি আত্মসংবরণ করতে না পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম: 'চোপ্ রও! গান নয়! ও যে মরতে বসেছে। এই সময় কিনা গান!' আলোকসম্পাত যিনি করছিলেন তিনি আমার পাশে বসে ছিলেন; ঘটনার আকস্মিকতায় তিনি চেয়ার থেকে গড়িয়েই পড়লেন। ভাগ্যি ভালো যে এই সময় অর্কেস্ট্রায় বিশেষ করে জোরে সুর বাজছিল এবং জেরমন আর আলফ্রেডও তাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে গান গেয়ে চলছিল, ফলে কুকুরছানার সুরে আমি যে কিঁউকিঁউ চিৎকার করলাম তা কারও কানে গেল না। শেষ পর্যন্ত ঘটল এই যে আলোকসম্পাতের ভারপ্রাপ্ত ভদ্রলোকটির কাছ থেকে আমি মাথার পেছনে জোর চাঁটি খেলাম, তিনি আমাকে করিডরে বার করে দিলেন। সেই সময় 'ত্রাভিয়াতার' শেষটা তাই আমার পক্ষে দেখা সম্ভব হয় নি। কিন্তু থিয়েটারের নেশা সারা জীবনের মতো পেয়ে বসল।

'পরে মা কতই না বুঝলেন, কতই না চেষ্টা করলেন আমাকে মানুষ করে তোলার জন্য (তাঁর জ্ঞানবুদ্ধিতে, মানুষ হওয়া মানে আমলা হওয়া), কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। দু' বছর যেতে না যেতে আমি অফিসের চাকরী ছেড়ে দিলাম, বিবিকভ্স্কি বুলভারের সবচেয়ে উঁচু পপলার গাছের মাথায় আমলার চিহ্ন আঁকা টুপিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যোগ দিলাম ক্রুচিনিনের দলে, সেখানে হলাম এক্সট্রা, অর্থাৎ যে অভিনেতা ভিড়ের মধ্যে, জনতার ভূমিকায় অভিনয় করে, যার মুখে কোন কথা নেই, এমন কি যার নাম পর্যন্ত বিজ্ঞাপনে ওঠে না... এই ঘটনা ঘটে ফুন্দুক্লেয়েভস্কায়া স্ট্রীটের বোর্গানিও থিয়েটারে। এখন ঐ রাস্তার নাম লেনিন স্ট্রীট আর থিয়েটারের নাম লেসিয়া উক্রাইনকা থিয়েটার।'

মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন, তাঁর চোখদুটো চকচক করছে, গালে ফুটে উঠেছে টকটকে গোলাপী রঙ। বুড়ো মানুষদের মুখে তাঁদের অতীতের স্মৃতিকথা শুনতে আমার চিরকালই ভালো লাগে। তুচ্ছ ঘটনার

বৃত্তান্তও যে তাঁদের মুখে এত আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে এর ব্যাখ্যা কী, কে জানে?.. ঐ একই ঘটনা যদি এখন ঘটত, তাহলে খুব সম্ভব মোটেই আকর্ষণীয় হত না।

'ওঃ আমার প্রিয় দর্শকেরা, থিয়েটারে আসার ঐ প্রথম বছরগুলো, সে যেন ছিল আমার প্রথম প্রেমের মতো। সম্ভবত আমার মতো আর কেউই নিজের এই কাজটাকে এত গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করে নি। কেউই আমার মতো অত যত্ন করে, অতক্ষণ ধরে মেক-আপ নিত না। কেউই আমার মতো অমন বিচলিত হত না স্টেজে ঢোকার আগে। যদিও আমি জনতার সঙ্গে মাত্র এক মিনিটের জন্যে মঞ্চে আসতাম, একটা কথাও বলতাম না, এমন কি দর্শকেরা আমাকে লক্ষও করত না। কিন্তু আমার মনে হত সবাই যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তারপর আমাকে দেওয়া হল ছোট্ট একটা ভূমিকা, এই একরত্তি। আমি স্টেজে ঢুকে বলতাম: 'কাউণ্টেস অসুস্থ, দেখা করতে পারছেন না।' বলেই আমি মুখ ঘুরিয়ে চলে যেতাম। ব্যস। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এই কথাগুলোর মধ্যেই আছে নাটকের প্রধান আইডিয়া। তাই সেগুলো আমি উচ্চারণ করতাম এমন সুরে যেন দুনিয়ার অন্তিম মুহূর্ত সম্পর্কে ঘোষণা করছি। এই প্রথম হল্-এর সকলে আমাকে দেখছে, আমার কথা শুনছে। এই অনুভূতির বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। তায় আবার আমার কথা দিয়েই শেষ হচ্ছে নাটকের প্রথম অঙ্ক। যবনিকা নেমে আসে, সঙ্গে সঙ্গে হল্-এ শোনা যায় করতালিধ্বনি। মনে হত লোকে যেন আমাকে, কেবল আমাকেই হাততালি দিচ্ছে।'

মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ আরও অনেকক্ষণ থিয়েটার সম্পর্কে, তাঁর নিজের জীবন সম্পর্কে বললেন।

বাড়ি ফেরার পথে আমি আর জাভা সারাক্ষণ মুখ বুজে রইলাম। আমরা তখন ভাবছিলাম। এই প্রথম সত্যিকারের একজন অভিনেতার সঙ্গে আমাদের আলাপ। এক অভিনেতার সঙ্গে, যিনি থিয়েটারে অভিনয় করেছেন, সিনেমায়ও নামেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

'জারমশাই, আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল!'
'হুঁ-হুঁ, এইবার!'

সন্ধ্যা। আমরা খোলা জানলার পাশে গদি আঁটা বিছানায় শুয়ে আছি। ঐ দিন এত রকমের ছাপ আমাদের মনের ওপর পড়েছে যে আমরা যদি সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়তাম তাহলে বলতে হত আমরা নেহাৎই চেলাকাঠ।

জাভা সর্বক্ষণ ছটফট করছিল, যেন কিছু একটা তাকে কামড়াচ্ছে। আমার বন্ধুকে আমি ভালোমতোই জানি। আমি জানি কিসে ওকে কামড়াচ্ছে। কোন একটা চিন্তা তাকে কামড়াচ্ছে, শান্তি দিচ্ছে না।

'কী ব্যাপার রে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

জাভা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কিন্তু চুপ করে থাকে।

'কী রে বল্ আমাকে, কী ব্যাপার,' আমি ফের বলি।

জাভা আরও একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তারপর বলে:

'বুঝলি পাভেল, আমি ঠিক করেছি বড় হয়ে আমি হয়ত অভিনেতাই হব।'

'তাহলে মিলিশিয়াতে যাবে কে? কে ধরবে অপরাধীদের?' আমি মৃদু হাসলাম। 'মিলিশিয়ার লোকেরা সবাই যদি অভিনেতা বনে যায়... এই যেমন তারাপুন্‌কা, যেমন তুই... তাহলে ত পিঁপড়ের মতো পিলপিল করে নানা জাতের অপরাধী জন্মাতে থাকবে, তাদের জ্বালায় জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। এই কথাটা তুই ভেবে দেখেছিস কি?'

'ও কিছু নয়,' ভারিক্কি চালে বলল জাভা, 'আমার দরকার হবে না, যাকে ধরার, অমনিতেই ধরা যাবে।'

'তুই মনে করে দ্যাখ দেখি গতকাল কী বলেছিলি! দুদিন আগের কথাও নয়, এই গতকালই বলেছিলি!'

'সে ত গতকালের কথা, আর এটা হল আজকের। জীবন ত আর এক জায়গায় থেমে নেই!'

'সে যাই হোক না কেন,' আমি বললাম, 'আমি শুনেছি যে এর জন্যে দরকার প্রতিভার... দারুণ প্রতিভার!'

'ও কথা আর তুই বলিস না! আর যাই থাক না থাক, প্রতিভা আমাদের দুজনেরই আছে। এতে কোন সন্দেহ নেই। তুই কি ভাবিস তুই অভিনেতা হলে খারাপ অভিনেতা হবি? হুঃ, বললেই হল!.. দর্শকরা কেঁদে কূল পাবে না!'

'এটা ঠিকই বলেছিস, কেঁদে কূল পাবে না,' আমি হিহি করে হেসে বললাম। 'টিকিটের জন্যে যে দণ্ড গেছে তার শোকে...'

'কী যা-তা বলছিস! তুই কি ভাবিস গাঁয়ে আমাদের লোকে খামোকাই 'নাটুকে' বলে? সালিভোন দাদু ত সর্বক্ষণই বলেন: 'এই যে নাটুকে! যাকে বলে নাটুকে।'

তোমার মুখের ওপর যখন কেউ বলে যে তুমি প্রতিভাবান আর বেশ জোর দিয়েই বলে, তখন তর্ক করা বড় কঠিন। আমি অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করে কিছু একটা বলে চুপ করে গেলাম।

জাভা এখন বিনা বাধায় বলে চলল:

'যাই বলিস না কেন অভিনেতাদের জীবন সবচেয়ে ভালো... সবার চেয়ে ভালো জীবন কাটায় ওরা। গান, বাজনা, হাততালি। জীবন ত নয় যেন মে দিনের উৎসব! আর খ্যাতি! অভিনেতাদের কী দারুণ খ্যাতি! সবচেয়ে পণ্ডিত আকাদমিশিয়ানদেরও জানা নেই অমন খ্যাতি, যেমন খ্যাতি পেয়ে থাকে অভিনেতারা। তুইই বল্ দেখি, কোন আকাদমিশিয়ানের চেহারা তোর জানা আছে?.. দেখলি ত! অথচ দ্যাখ, কাদোচ্নিকভকে জানিস, রিব্নিকভকে জানিস, বাতালভকে জানিস, স্মক্তুনোভ্স্কিকে, ফিলিপ্পভকে*) জানিস। ওদের কথা না হয় বাদই দিলাম। একবার সিনেমার পর্দায় যে আর্টিস্ট মাত্র এক ঝলক দেখা দিয়েছে তাকেও সবাই জানে। সে যখন রাস্তায় চলে তখন সবাই আঙুল দিয়ে তাকে দেখায় — ঐ যে! ঐ যে! — আর তুই বলিস কিনা...'

আমি ওর কথায় সায় দিতে বাধ্য হলাম।

বিখ্যাত অভিনেতা হতে পারলে যে কত ভালো হয় এই বিষয়ে আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি স্বপ্ন দেখলাম।

প্রসঙ্গত বলি, আমার স্বপ্নগুলো প্রায় কেন যেন হয়ে থাকে কেমন সব তালগোল পাকানো, এড্ভেণ্চার ধরনের, উদ্ভট উদ্ভট। স্বপ্নের বৃত্তান্ত দিতেও আমি ভালোবাসি। জাভা সব সময় আমাকে ধরে: 'বল্ দেখি কী স্বপ্ন দেখলি?' আমিও সোৎসাহে বৃত্তান্ত দিই। আমার স্বপ্নে জাভা ঈর্ষা বোধ করে, সে বলে আমি নাকি জাগ্রত অবস্থার থেকে স্বপ্নে অনেক ভালো জীবন কাটাই, তাই আমার পক্ষে জেগে না উঠে সারা সময় ঘুমোতে পারলেই সম্ভবত ভালো হত...

যাই হোক, স্বপ্নে আমি দেখতে পেলাম... আমি যেন মঞ্চের মাঝখানে বিশাল এক রাজকীয় পশুলোমের কোট গায়ে সিংহাসনে বসে আছি। আর পশুলোমের কোটটা থেকে কেন যেন বিকট গন্ধ বেরোচ্ছে যেমন গন্ধ বেরোয় সালিভোন দাদুর বুনো শুয়োরছানাটার গা থেকে। কিন্তু আমার মাথায় সোনার রাজমুকুট আর হাতে একটা জবরদস্ত মুগুর — তার মাথাটা গোল করা — একে বলে 'রাজদণ্ড'।

অন্ধকার হল্-ঘরের সব জায়গা থেকে (স্টল আর সারকেল থেকে) আমার দিকে জ্বলজ্বল করে তাকাচ্ছে গোরু-ভেড়ার মুখ। এখানে-ওখানে সর্বত্র দর্শকদের বদলে বসে আছে গোরু-ভেড়া আর নানা জাতের শিঙওয়ালা জন্তুজানোয়ার। আমি কিন্তু তাতে একটুও অবাক হচ্ছি না। যেন এটাই স্বাভাবিক। প্রথম সারিতে বসে আছে আমাদের এক-শিঙওয়ালা গোরু মান্কা, জাভাদের ফুটকিদার 'অবদান', জোরা নামে ছাগলটা আর যৌথখামারের ষাঁড় পেত্কা। আমি থেকে থেকে আড়ালে (যাতে অন্য দর্শকদের চোখে না পড়ে) ওদের দিকে চোখ ঠারছি, যেমনভাবে অভিনেতা চোখ ঠারে হল্-ঘরে নাটক চলার সময় তার আত্মীয়স্বজনদের দেখতে পেলে।

এদিকে আমি প্রধানত উচ্চারণ করে চলছি একটা সুদীর্ঘ স্বগতোক্তি — কোন শব্দ ছাড়া, অথচ দারুণ সারগর্ভ আর সুন্দর... অবশেষে আমি স্বগতোক্তি শেষ করে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম করতালিধ্বনির আশায়। কিন্তু হল্-ঘরে থমথমে নীরবতা। এমন সময় আমার খেয়াল হল: আরে, এখানে হাততালি পড়বে কী করে! — আমার দর্শকদের ত হাতই নেই, তার বদলে আছে খুর! খুর দিয়ে কেউই হাততালি দিয়েছে এমন কথা কি তোমরা কখনও শুনেছ? কী বোকা রে বাবা আমি, বিচলিত হয়ে পড়ছি কেন? আমার দর্শকদের পক্ষে ত

হাততালি দেওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়। তারা জানে কেবল ব্যা-ব্যা, ম্যা-ম্যা আর হাম্বা-হাম্বা করতে... তবে আমার প্রতি শ্রদ্ধাবশত সে কাজ তারা করছে না। তারা চুপ করে আছে, আর এই নীরবতার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করছে আমার অভিনয় দেখে তাদের পুলক। মান্‌কা আর 'অবদান' অভিভূত হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। ছাগল জোরা দাড়ির প্রান্ত দিয়ে চোখের জল মুছছে। আর যৌথখামারের ষাঁড় পেত্‌কা, যাকে সকলে ইতর ও বর্বর বলেই জানে — ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে একটা বাচ্চা ছেলের মতো। আমি উত্তেজনাবশে উঠে দাঁড়াই, কিন্তু মাথা নুইয়ে ওদের নমস্কার জানানোর বদলে হঠাৎ গোটা হল্‌-ঘর সচকিত করে আমি চাবুক হাঁকাই (আমার হাতে এখন দেখছি রাজদণ্ডের বদলে আছে চাবুক!)। আমার দর্শকবৃন্দও হুড়মুড় করে জায়গা ছেড়ে ছুটে পালায়। চক্ষের পলকে হল্‌ ফাঁকা। একটিও জনপ্রাণী নেই। কেবল চেয়ার।

এই সময় হঠাৎ উইংসের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে... জাভা। তার পরনে মিলিশিয়ার ইউনিফর্ম।

হাইবুটের খটখট আওয়াজ তুলে সে আমার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলে:

'আইন ভঙ্গ করা হচ্ছে? আইনভঙ্গ করবি না বলছি! নইলে এক্ষুনি থানায় ধরে নিয়ে যাব।'

আমি ওর দিকে তাকিয়ে রাগে গরগর করে বলি:

'আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলার অধিকার তোকে কে দিল? আমি হলাম জার!'

'কিসের তুই জার রে বদমাশ! তুই চোর! তুই সত্যিকারের জারের কাছ থেকে ঘড়ি চুরি করেছিস, এই যে আমার কাছে পরওয়ানা আছে তোকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবার। জারমশাই, আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল!' এই বলে জাভা কী একটা যেন কাগজ আমাকে দেখায়।

আমি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ি। আমি বলি:

'জাভা, এমন করছিস কেন বল্‌ ত?.. তুই ত জানিস কী ভাবে কী ঘটেছে। এটা যে দৈবাৎ।'

ও কিন্তু তার জবাবে রেগে বলে:

'ওরে চোর, আমাকে, শাসন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিকে 'তুই' বলে ডাকিস, এত বড় স্পর্ধা তোর! আবার আইন ভঙ্গ করছিস!'

'মাফ করবেন,' আমি এবারে মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে না পেরে বলি, 'আমি কিন্তু ভেবেছিলাম যে আপনি আমার বন্ধু।'

'ভাবলেই হল আর কি!' জাভা কঠিন স্বরে এই কথা বলেই হঠাৎ আমার মাথা লক্ষ্য করে একটা থলে ছুঁড়ে দিল। আমি আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা হয়ে কিছুই আর দেখতে পারি না, হাত-পাও নাড়তে পারি না। থলে থেকে একটা সুতো আমার মুখের ওপর পড়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে, কোনমতেই ওটাকে সরাতে পারছি না। ব্যাপারটা এতই অসহ্য যে চেঁচাতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার, কিন্তু চিৎকারটা আমার গলায় আটকে পড়ছে... শেষ কালে আমি জেগে উঠি।

দেখা যাচ্ছে আমার মুখের ওপর একটা মাছি ঘুরঘুর করছে। আমি যখন চোখ খুললাম তখন সে আমার নাকের ওপর বসে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে সামনের পাগুলো ঘষাঘষি করছিল। আমি ঠোঁট নেড়ে আওয়াজ করলাম — ফুই! — মাছি উড়ে গিয়ে সিলিং-এর নীচে কোথায় যেন ভনভন আওয়াজ করে এসে বসল আমার কপালের ওপর... স্বপ্নের কথা ভেবে কোন লাভ নেই।

আমি বিছানায় উঠে বসে 'মিলিশিয়ার লোক' জাভার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। সে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে গালের নীচে হাতের তালু রেখে, মাঝে মাঝে ঠোঁট দিয়ে চুকচুক করছে একটা ছোট বাচ্চার মতো।

''আইন ভঙ্গ করবি না!'.. হুঁ হুঁ, পাজী কোথাকার! বিশ্বাসঘাতক!' আমি বিড়বিড় করে ওর পাঁজরে আঙুল দিয়ে খোঁচা মারলাম।

সঙ্গে সঙ্গে ওর ঘুম ভেঙে গেল, ও সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে ঘুমজড়ানো চোখে পিটপিট করে তাকাতে লাগল।

'অ্যাঁ? কী ব্যাপার?'

'উঠে পড়! আমার ঘুম ভেঙে গেছে, একা ভালো লাগছে না,' শান্তস্বরে বললাম আমি।

'ধুত্তোর!.. আহাম্মক!' বলেই সে বালিশের ওপর ধপ্ করে পড়ে চোখ বন্ধ করল।

'আইন ভঙ্গ করবি না!' মিলিশিয়াম্যানের ভঙ্গিতে বললাম আমি।

'ভাগ বলছি, আমার ঘুম পাচ্ছে।'

'মর গে তুই, ঘুমকাতুরে!' এই বলে আমি বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে ব্যালকনিতে গেলাম সকালের তাজা বাতাসে নিশ্বাস নেবার জন্য।

ওঃ, কী দারুণ সকালটা! সূর্যের কিরণে ঝলমল করছে, টুংটাং আওয়াজ তুলছে, চকচক করছে একটা নতুন পয়সার মতো। খুশিতে ভরপুর, কলকাকলিতে মুখরিত, সুরেলা। ওঃ, কী সুরেলা!..

'আভে-এ মারি-ইয়া, আ-আভে, মা-আরি-ইয়া' — খোলা জানলার ফাঁক দিয়ে ভেসে আসছে একটা ছেলের উঁচু ও পরিষ্কার গলার বিষণ্ণ সুর।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে:

'জামা-ই-কা! জামা-ইকা!..' সেই একই ফুর্তিতে, খুশিমাখা সুরে গান গেয়ে ওঠে দ্বিতীয় আরেকটি জানলা থেকে।

'সা-আন্‌তা লু-উচি-ইয়া! সান্তা লুচিয়া!..' তৃতীয় জানলা থেকে বয়ে চলে তার সুরলহরী। একই সময় চতুর্থ জানলা থেকে তারই অন্তরঙ্গ, বিষণ্ণ কণ্ঠস্বর, তবে এখানে একেবারেই শিশুকণ্ঠ: 'মাম্মা, মাম্মা...'

ওঃ গাটা ছমছম করে ওঠে!

সে বছর গ্রীষ্মকালে কিয়েভের লোকেরা ইতালির বালক গায়ক রবার্তিনো লরেত্তির গান নিয়ে মেতে ওঠে, প্রায় ঘরে ঘরে থাকত তার গানের রেকর্ড। খুব ভোরবেলা থেকে শহরের ওপর ভেসে চলত রবার্তিনোর সুরেলা গলার গান।

'আমার আর জাভার — আমাদের যদি এমন বুলবুলের মতো গলা থাকত,' আমি মনে মনে ভাবলাম। 'কী ভাবে খ্যাতি পাওয়া যেতে পারে তাই নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হত না। দিব্যি স্টেজে গিয়ে বুক টানটান করে গ্র্যান্ড রয়েলের সামনে দাঁড়িয়ে মুখ খুললেই হল...' কিন্তু সে গুড়ে বালি! আমাদের গলা দিয়ে কেবল 'আগুন! আগুন!' কিংবা 'বাঁচাও! বাঁচাও!' চেঁচানোই শোভা পায়। আর শিল্পী যদি হতে হয়, তাহলে কেবল নাটকে। কিংবা সিনেমায়! এই ত চাই! এটা আমরা পারি! সিনেমা!.. আমার পেটের ভেতরে আনন্দের সুড়সুড়ি খেলে যায়। আজই ত আমরা ফিল্‌ম স্টুডিওতে যাব! সত্যিকারের ফিল্‌ম স্টুডিওতে, যেখানে ফিল্‌মের শুটিং হয়... আমরা দেখতে পাব নামজাদা ফিল্‌ম

স্টারদের। কী ভাবে শুটিং হয় তাও দেখব... বড় আশ্চর্য জিনিস দেখব! ওঃ! বিশ্বাসই হচ্ছে না!..

জাভা ততক্ষণে উঠে পড়েছে। আমরা চটপট সকালের খাওয়া সেরে নিলাম — তারপর আর কী? — চালাও!

...সকালে লোকজনকে কী সুন্দরই না দেখায়! যেন শিশিরে ধোয়া! খোশমেজাজী, তাজা, এমন কি যেন কচমচে, কচি শসার মতো। আর চোখই বা তাদের কেমন! নির্মল, স্বচ্ছ, সদ্য ফোটা ফুলের মতো।

আমরা বাস-এ চেপে চলি, আমি চারধারের সবকিছু নিরীক্ষণ করতে থাকি। আমি তখন দারুণ খোশমেজাজে আছি। সকলকেই আমার ভালো লাগছে! কী ভালোই না লাগছে আমার!

আমরা আনন্দে পা ফেলতে ফেলতে এসে উপস্থিত হই ভালকাদের উঠোনে। প্রথমে আমাদের যেতে হবে ওর কাছে, তারপর মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচের কাছে। এমন সময় আমরা দেখতে পেলাম এক দঙ্গল ছেলে (জনাবিশেকের কম হবে না) আর তাদের মাঝখানে গুমটি। ওরা ঠেলাঠেলি লাগিয়েছে ঠিক ভালকাদেরই দালানে ঢোকার মুখে, কী যেন খেলায় মেতেছে — ওদের ভেদ করে কোনমতে যাবার উপায় নেই। আমরা ইতস্তত করে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এই সময় গুমটি আমাদের দেখতে পেল। আমি লক্ষ করলাম, ওর চোখদুটো জ্বলে উঠল। ও ছেলেদের কী যেন বলল, সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা তেড়ে এলো আমাদের দিকে। মুহূর্তের মধ্য আমরা চারদিক থেকে ঘেরাও হয়ে পড়লাম।

'গেলাম! বেঘোরে মারা গেলাম!' আমার মাথার ভেতরে ঝলক দিয়ে উঠল এই চিন্তাটা।

'পাভেল! আমার পেছনে!' জাভা চেঁচিয়ে বলল।

চক্ষের পলকে আমি লাফিয়ে ওর কাছে সরে আসি, ওর পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি। এই ভাবে আত্মরক্ষার আটঘাট বেঁধে আমরা সামনের দিকে ঘুষি বাগিয়ে দাঁড়ালাম। এদিকে চারদিকের ঘেরটা ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। গুমটি এখন জাভার নাকের সামনে দুহাত নাড়িয়ে চেঁচাচ্ছে:

'হুঁ-হুঁ, এইবার!'

এদিকে লালাঝরা, ল্যাগবেগে একটা ছেলে আমার দিকে এগিয়ে আসতে আমি

তার বুকে ঠেলা মেরে সরিয়ে দিই। কে যেন আমার পায়ে ধাক্কা দিল — আমি ব্যথা পেলাম। আর একটি মুহূর্ত — এখনই শুরু হয়ে যাবে মারপিট। মারপিট বা বলি কেন! মার, পিটুনি, আমাদের দফা রফা... আমি এখনই দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি আমার ওপর মারের বহরটা।

এই সময় জাভা হঠাৎ বিদ্রূপের সুরে ঝনঝনে গলায় বলে:

'জুটেছ ত তোমরা এই এতজনে! এতজনে কিনা দুজনের ওপর! ভালো ব্যাপার দেখছি!'

'কী, বলে কী ও? আমাদের যে এখানেই পিষে মেরে ফেলবে!' আমি ভাবতেই শিউরে উঠি। এদিকে গুমটি দাঁতে দাঁত চেপে রাগে গরগর করতে করতে বলে:

'তুই হারামজাদা আরেকবার কথা বলে দ্যাখ! এইসা দেব না একটা!' সঙ্গে সঙ্গে সে হাত তোলে।

এমন সময় ওদের মধ্যে থেকে একজন বলে ওঠে:

'কথাটা ঠিকই বলেছে। পুরো দঙ্গল নিয়ে লাগাটা ঠিক হবে না! বুঝলি গুমটি, তুই ওদের একজন কারও সঙ্গে লড়... সেটাই ঠিক হবে। ন্যায্য হবে, শোধও তোলা হবে... আর আমরা বিচার করব। দেখব যাতে সব নিয়মমাফিক হয়।'

কথাগুলি বলল আলুথালু চুলভরা মাথাওয়ালা বছর চৌদ্দ বয়সের এক ছোকরা, যে পিছনে কোথাও দাঁড়িয়ে ছিল; তবে তার মাথাটা সামনের আর সকলের মাথা ছাড়িয়ে উঠে গেছে। গুমটি সঙ্গে সঙ্গে হাত নামাল। দেখেশুনে মনে হল এরকম সিদ্ধান্ত তার মনঃপূত নয়, কিন্তু কিছু করার নেই... সে প্রথমে জাভার ওপর, পরে আমার ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে গজগজ করে বলল:

'আচ্ছা। তাহলে আমি এই এটার সঙ্গে লড়ব,' সঙ্গে সঙ্গে আমার কাঁধে আঙুলের খোঁচা দিয়ে আরও বলল: 'আমার মনে হয় এটা বেশি পোক্ত।'

একদম বাজে কথা: জাভা দেখতে আমার চেয়ে শক্তসমর্থ — কিন্তু কেউই এ নিয়ে তর্ক তুলল না।

'খাড়া পাড়ের ঢালটার দিকে চল্,' আলুথালু চুলওয়ালা ছেলেটা বলল।

তৎক্ষণাৎ গোটা দঙ্গলটা আমাদের ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল খাড়া পাড়ের

দিকে। প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে আমার ভেতরে যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে কী যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে, ক্রমেই নীচে, আরও নীচে নামছে।

'আমি কেন?' আমার প্রাণের ভেতরে চিঁচিঁ করে উঠল মেষশাবকের আর্তস্বর। কিন্তু আমি চুপ করে রইলাম। আমাকে চুপ করে থাকতেই হবে। আমি যে পুরুষমানুষ!

জাভাও চুপ। ওর মনের কথা আমি বুঝতে পারছি। মনে মনে সে নিজেকে আমার সামনে অপরাধী ভাবছে (কেননা গুমটির কান ত ও-ই মলেছিল, আমি কেবল ধরেছিলাম)। ওর বদলে যে বাধ্য হয়ে আমাকেই লড়তে হচ্ছে এই ভেবে জাভা ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। আর ওর এখন করারই বা কী আছে? ও ত আর বলতে পারে না যে আমি না লড়ে ও লড়বে। এর অর্থ, সকলের সামনে আমাকে দুর্বল প্রতিপন্ন করা, সেটা হবে মুখের ওপর থুতু ছিটানোরই সামিল। না, এ কাজ সে করতে পারে না! আমি বুঝতে পারছি ওকে। আমি মরে গেলেও কলঙ্কের বোঝা মাথায় বইব না।

আমরা কাঁটাঝোপের ভেতর দিয়ে খাড়া ঢালটার দিকে নামতে থাকি।

'এই যে এখানে,' আলুথালু চুলের ছেলেটি বলল। আমরা থেমে গেলাম।

ঝোপঝাড়ের মাঝখানে একটা ছোট খাটো ফাঁকা জায়গা। তিন দিক থেকে কাঁটাঝোপ, এক দিকে খাড়া ঢাল। ছেলেগুলি সরে গিয়ে অর্ধবৃত্তের আকারে কাঁটাঝোপের পাশে এসে দাঁড়ায়। এইবারে আমি দাঁড়ালাম আমার শত্রুর মুখোমুখি। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকি এগিয়ে এসে, এদিক-ওদিক হেলেদুলে আমরা লক্ষ্য স্থির করতে থাকি।

গুমটি আমার চেয়ে লম্বায় বড়, চওড়ায়ও, আর মজবুতও যে আমার চেয়ে বেশি তাতেও কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার কি আর বাছাবাছির উপায় ছিল? তা সে যাই হোক না কেন, গুমটি যতই শক্তি ধরুক, দশজনের বিরুদ্ধে লড়াই করার চেয়ে একজনের বিরুদ্ধে লড়াই করা ভালো।

তোমরা হয়ত নিজেরাই জান যে লোকে সচরাচর ভয় পায় যতক্ষণ মারামারি শুরু না হচ্ছে। এর পরে অবশ্য আতঙ্ক আর থাকে না। তার বদলে দেখা দেয় ক্রোধ, যন্ত্রণা ও মত্ততা।

গুমটি হাত চালাল, আমি সঙ্গে সঙ্গে গুড়ি মেরে বসে পড়লেও তার ঘুষি

দড়াম করে আমার মাথায় এসে পড়ল। এই সময় আমি এমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলাম যে ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না তোমাদের। ওরে শয়তান গুমটি! ওরে আকাট! গোটা দলবল নিয়ে তুই তোর সাহস দেখাতে এসেছিস! আর যখন একা ছিলি তখন ত নাকের জলে চোখের জলে একাকার হয়েছিলি! ওরে নচ্ছার ছারপোকা! আমিও রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে তেড়েফুঁড়ে এগিয়ে গেলাম। লাট্টুর মতো বনবন করে গুমটির চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে তাকে ঘুষি মারতে লাগলাম, ছিটকে সরে যেতে লাগলাম। ও কেবল এলোপাতাড়ি ওর 'আঁকশি' নেড়ে একই জায়গায় পা ফেলে চলল।

ছেলের দল হৈ-হৈ করে উঠল:

'আরে গুমটি, কী হল রে?'

'আরে, মার ওকে!'

'পাঁজরার নীচে ঘেঁষে মার!'

'নাকে, নাকে!'

কিন্তু গুমটি কেবল ফোঁসফোঁস করে দু' হাত ছুঁড়তে থাকে যাঁতাকলের ডানার মতো। অবশেষে সে আমার জামা আঁকড়ে ধরে আমাকে জড়িয়ে ধরল, আমরা দুজনেই গড়িয়ে পড়লাম মাটিতে।

'জোরে চেপে বোস ওর ওপরে! চাপ দে! চাপ দে! চিত করে ফ্যাল!' ওরা গুমটিকে উৎসাহ দিতে লাগল।

কিন্তু গুমটির ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে। ও নয়, আমিই ওকে চিত করে ফেললাম, মাটিতে চেপে শক্ত করে ধরে রাখলাম। আমাদের দুজনের মুখ প্রায় ছুঁই-ছুঁই, আমরা ঘন ঘন নিশ্বাস নিতে লাগলাম... শিগগিরই দেখা গেল বিজিত গুমটির নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেছে। ব্যস! আমার জিত!

'না, না, এ চলবে না! এটা ঠিক নয়! নিয়মমাফিক হয় নি! এরকম প্যাঁচ কষা নিয়ম নয়!' হঠাৎ আমার কানে এলো, আমি টের পেলাম কে যেন প্যান্ট ধরে গুমটির ওপর থেকে আমাকে হিঁচড়ে তুলছে।

মাথা ওঠাতে দেখতে পেলাম টানছে সেই ল্যাগবেগে ছোঁড়াটা যাকে আমি এর আগে বুকে ঠেলা মেরেছিলাম। আমি ভালোভাবে জানি যে আমি সততার সঙ্গে লড়াই করেছি, কোন অন্যায় প্যাঁচ আমি কষি নি, কিন্তু আমি তখন হাঁসফাঁস

করছিলাম, দম নিয়ে যে কথা বলব সে উপায় আমার ছিল না। আমি কেবল আশা নিয়ে তাকিয়ে থাকলাম আলুথালু চুলওয়ালা ছেলেটার দিকে। কিন্তু সে চুপ করে থাকে, হস্তক্ষেপ করে না। সঙ্গে সঙ্গে আমার বুঝতে বাকি থাকে না: আমার অবস্থা সঙ্গীন। ওরা গুমটির বন্ধু, অবশ্যই ওদের ইচ্ছে ছিল গুমটি যেন জেতে। এতে কোন সন্দেহ নেই। নইলে এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের আয়োজন করে তাদের লাভটা কী? নইলে ত ওরা স্রেফ আমাদের ছালচামড়া ছাড়িয়ে নিতে পারত। আমার জয় — ওদের, ওদের সকলের লজ্জার ব্যাপার। এটা ওরা মেনে নেবে না। ভালোভাবে লড়া যায় তখনই, যখন জয়ের আশা থাকে, কিন্তু সেই আশা যখন না থাকে... ইতিমধ্যে আমাকে টেনে তোলা হয়েছে আর পুনরুত্থিত গুমটি ততক্ষণে আমাকে ঠেসে ধরেছে এবং নিজের হারের জন্য প্রচণ্ড ক্ষেপে গিয়ে আমার মাথাটা মাটিতে ঠুকছে। জাভা প্রতিবাদ করে চেঁচিয়ে কী যেন বলছে; কিন্তু ওর আর করার কী আছে!..

দুম্, দুম্, দুম্! আমার মাথাটা ঘণ্টার মতো বেজে ওঠে। চোখে অন্ধকার দেখছি, ভাবনা-চিন্তা গুলিয়ে আসছে...

এমন সময় হঠাৎ শুনতে পেলাম:

'ওরে নির্লজ্জ! ওরে বেহায়ার দল! ছাড়লি! এক্ষুনি ছাড়! ছাড় বলছি! ছাড়!' ভালকার তীক্ষ্ম কণ্ঠস্বর।

আমার মাথার ভেতরের আওয়াজটা সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায়। গুমটি আমার ওপর থেকে ছিটকে পড়ে মাটিতে। আমি মাথার ওপর দেখতে পাই নির্মল নীলাকাশ, সেখানে উড়ছে সাদা পায়রার ঝাঁক। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি যে কোথা থেকে যেন এখানে ভালকার আবির্ভাব ঘটেছে, আর সে-ই আমার ওপর থেকে গুমটিকে ধাক্কা মেরে ঠেলে দিয়ে এখন সামনে দাঁড়িয়ে জঙ্গী ভঙ্গিতে হাত নাড়িয়ে চেঁচাচ্ছে:

'নির্লজ্জ! বেহায়া! তোরা আবার নাকি পাইওনীয়ার! কে বলবে যে তোরা স্কুলে পড়িস! গুণ্ডা! দাঁড়া, আমি সব বলে দেব! সব বলে দেব স্কুলে! দেখিস না! তোদের মা-বাবাকেও বলব। আলিক, তোর মা-বাবাকে, ভোভ্‌কা, এডিক — তোদের মা-বাবাকেও। আর গুমটি, তোর নামে সোজা মিলিশিয়াতে জানাব। তোকে কলোনিতে পাঠানো হবে। দেখিস না! এই ছেলেরা গাঁ থেকে শহরে

এসেছে আমাদের অতিথি হয়ে, আর তোরা কিনা ওদের মারতে লেগেছিস! তাও আবার সবাই মিলে দল বেঁধে! এ বুঝি অতিথির সঙ্গে তোদের ব্যবহার! বেহায়া!..'

এই ভাবে চিৎকার-চেঁচামেচি করতে করতে সে আমাকে উঠতে সাহায্য করল, আমার হাত ধরে নিয়ে চলল। জাভাকেও টানতে টানতে নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ল। আমাদের শত্রুরা সরে গিয়ে আমাদের যেতে দিল। কেউ আমাদের ধরে রাখার চেষ্টা পর্যন্ত করল না। সবাই চুপ। কেবল আমরা যখন চলে গেলাম তখনই কে যেন একটা তীক্ষ্ম শিস দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে গোটা দঙ্গলটা বস্তা থেকে ছড়িয়ে পড়া ডালের মতো নীচে, খাড়া ঢালের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। ওরা হয়ত অন্যরকম আচরণ করত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সম্ভবত বিবেচনা করল যে গুমটি আমার ওপর যথেষ্ট শোধ নিয়েছে।

আমি জামার আস্তিন দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে টলতে টলতে চলতে লাগলাম।

'সাবাস পাভেল! তুই ওকে দিয়েছিস! খুব এক চোট দিয়েছিস বটে!.. ও কেবল এলোপাতাড়ি হাত-পা ছুঁড়ছিল!' জাভা আমার কাঁধ জড়িয়ে ধরে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলল। 'তুই ওদের সকলকে দেখিয়ে দিয়েছিস ভাসিউকোভ্‌কার ছেলে কাকে বলে। সাবাস!'

এই কথা শুনতে আমার ভালোই লাগছিল, কিন্তু আমার দুঃখ হচ্ছিল এই ভেবে যে ভালকা তা দেখতে পেল না, এসে আমাকে দেখতে পেল বিধ্বস্ত অবস্থায়, তাছাড়া বলতে গেলে ও-ই এসে আমাকে উদ্ধার করল। ওর কাছে আমি অবশ্যই কৃতজ্ঞ — কে বলতে পারে ঐ গুমটিটা আরও কত বার মাটিতে আমার হতভাগ্য মাথাটা ঠুকত! কিন্তু সেই সঙ্গে আমি অনুভব করছিলাম কেমন যেন একটা অস্বস্তি আর লজ্জা এই জন্য যে আমাকে উদ্ধার করল কিনা একটা মেয়ে! এমনই একটা অস্বস্তি, যেন ও আমাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখে ফেলেছে। সে যাই হোক না কেন, আমি সন্তুষ্ট। আমি কিন্তু ন্যায়সঙ্গত ভাবেই হারিয়েছি গুমটির মতো একটা সবল ছেলেকে, আমার চেয়েও বড়সড় একটা ছেলেকে; যে আমাকে বেছে নিয়েছিল তার চেয়ে দুর্বল ভেবে।

পথে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল ছোট ভাই মিকোলা। জানা গেল সে-ই

ভালকাকে ডেকে এনেছে। সে খাড়া ঢালের দিকে আমাদের নিয়ে যেতে দেখেছে, আমাদের গতিক খারাপ আন্দাজ করে ছুটে গেছে ভালকাকে ডেকে আনতে।

'তোমাকেও সাবাস বলতে হবে ভালকা!' জাভা বলল। 'একা, অথচ ভয় হল না! ওরা যে দলে পড়ে তোমাকেও পিটুনি দিতে পারত!'

'একবার চেষ্টা করে দেখলেই মজাটা টের পেত! এমন একটা তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে তুলতাম যে গোটা শহরের লোকজন ছুটে আসত! তাছাড়া, ভাবছ আমি আঁচড় দিতে পারি না? কেউ একবার গায়ে হাত তুলেই দেখুক না, তার গর্ভধারিণী মাও তাকে চিনতে পারবে না!'

জাভা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে কনুই দিয়ে আমার পাঁজরে ঠেলা দিল: ভাবটা এই যে, দ্যাখ, কেমন মেয়ে, একেই বলে মেয়ে! জবাবে আমি মাথা নাড়লাম: অর্থাৎ, হ্যাঁ, ধন্যি মানতে হয় এই মেয়েকে, ভগবান ওর মঙ্গল করুন...

ভালকা আর জাভা আমাকে ঝেড়েঝুড়ে যতটা পারা যায় সাফসুতর করে দিল, কিন্তু তাহলে কী হবে, আমার চেহারা তখন এমন যেন গোরুতে চিবিয়ে খেয়েছে। কিন্তু কিছুই করার ছিল না, মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ অনেকক্ষণ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন, যাওয়া দরকার।

মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ ঠাট্টা করে আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানালেন: 'নমস্কার মহোদয়-মহোদয়ারা!' তারপর মনোযোগ দিয়ে আমাকে দেখার পর হঠাৎ হাতের ইশারায় সতর্কতামূলক ভঙ্গি করলেন, যদিও কিছু বলার কোন অভিপ্রায় আমার ছিল না, তবু তিনি বললেন:

'একটি কথাও নয়! সব পরিষ্কার। শত্রুর সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়েছিল। সীমান্ত সংঘর্ষ। কারণ অজ্ঞাত, তবে মনে হয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু মানমর্যাদার ব্যাপার... মানসিক তৃপ্তির তাগিদে। দ্বন্দ্বযুদ্ধ। বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও আপনারই জিত হয়েছে। তাই ত?'

আমি হেসে মাথা নাড়লাম। কী লোক দেখ দেখি! ওঁর সঙ্গ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মন হালকা হয়ে যায়।

মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ এর বেশি আর কিছু জিজ্ঞেসাবাদ করলেন না। তিনি কেবল বললেন:

'দশ মিনিটের মধ্যে গাড়ি এসে যাবার কথা। আমরা ফিল্ম স্টুডিওতে যাব। তোমরা একেবারে ঠিক সময় এসে গেছ।'

আমাদের অবশ্য দশ মিনিটও অপেক্ষা করতে হল না। মিনিট দু-তিন বাদেই আমরা শুনতে পেলাম মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচের কুটিরের সামনে একটা গাড়ি এসে থামল, গাড়ির দরজা খোলার আওয়াজ হল, আর সঙ্গে সঙ্গে উঠোনে শোনা গেল কমবয়সী কার যেন কণ্ঠস্বর:

'মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ, আমি এসে গেছি! আপনাকে নিতে এসেছি...'

নবম পরিচ্ছেদ

ফিল্ম স্টুডিওতে। প্রথম চমক। দ্বিতীয় চমক

এই হল ফটক। যে ফটক নিত্যকার ধরাবাঁধা দুনিয়া থেকে সিনেমার মায়াময়, রূপকথার কল্পরাজ্যকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। কেমন যেন আক্ষেপ হয় এই ভেবে যে ফটকটা দেখতে কিনা এতই সাধারণ, নেহাৎই সাদামাঠা! আর এত নীচু যে টপকানো ত যায়ই, এমন কি লাফিয়েও পার হওয়া যায়। আমি হলে ফিল্ম স্টুডিওর জন্য এমন ফটক কক্ষণও বানাতাম না! অন্ততপক্ষে করতাম ...শীতপ্রাসাদের সেই ফটকটার মতো, যে ফটক টপকে 'অক্টোবরে লেনিন' ফিল্মের নাবিকেরা ভেতরে ঢোকে। হয়ত বা আরও উঁচু। হাজার হোক ফিল্ম স্টুডিও যে!

যাই হোক, আপাতত এই নীচু ফটকটা খুলে গেল, আমরা ফিল্ম স্টুডিওর চৌহদ্দিতে এসে পড়লাম।

বাঁ দিকে তাকাতে দেখি — ওরে ব্বাবা, কী ফলবাগান! ছোটখাটো নয়, কূলকিনারা চোখে পড়ে না! মনে হল আমরা ফিল্ম স্টুডিওতে আসি নি ত, এসেছি যেন রাষ্ট্রীয় খামারে...

'এটা হয়ত অভিনেতাদের জন্যে... পলিটেকনিক শিক্ষার কোন ব্যাপার-ট্যাপার হবে... শুটিং-এর পরে কাজ করে...' ফিসফিস করে বলল জাভা।

'তা হতে পারে,' আমি সায় দিই।

আমরা ডান দিকে তাকাতে দেখি একের পর এক রঙচঙে পাত খাড়া করা আছে (হাইওয়েতে যেমন দেখা যায়, অনেকটা সেই ধরনের)। জাভা পড়ে দেখল সেগুলির, একটার গায়ে লেখা আছে: 'শিল্প জনগণের সম্পত্তি'। '...সমস্ত শিল্পের মধ্যে আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ — চলচ্চিত্র' (ভ. ই. লেনিন)।

আরেকটির গায়ে লেখা ছিল এই কথাগুলি:

'মানুষের সবকিছু হওয়া চাই সুন্দর — তার চেহারা, পোশাক-পরিচ্ছদ, তার অন্তঃকরণ, ভাবনা-চিন্তা — সবই...' (আ. প. চেখভ)।

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম: আমার চেহারাটা দাঁড়িয়েছে যেন পেরেক ঠুকে ক্ষতবিক্ষত; আমার পোশাক-পরিচ্ছদ দোমড়ানো মোচড়ানো, নোংরা; ঘড়ির কথা মনে পড়লেই অন্তঃকরণটা খচখচ করতে থাকে... কেবল ভাবনা-চিন্তার ব্যাপারে আমি ছিলাম উচ্চমার্গে, আমি চমৎকার আর মহৎ কাজ করতে চলেছি। কিন্তু ভাবনা-চিন্তা আর কে দেখতে যাচ্ছে...

আমরা গাড়ি থেকে বেরিয়ে মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচের পেছন পেছন ফিল্‌ম স্টুডিওর দরজার দিকে রওনা দিলাম। হ্যাঁ, একেই বলে দরজা! কী দারুণ! ঘোরে! স্টীমারের প্রপেলারের মতো কিংবা জলে ঠেলা যাঁতাকলের চাকার মতো (এখানে কেবল পাশে ঘোরে, এই যা)। একটা পাল্লা ঠেললে তোমার পেছন পেছন আরেকটি পাল্লা তেড়ে এসে পিঠে ঘা মারবে। দরজা বটে!

দরজার পাল্লাগুলি আমাদের ঠেলে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। জাভা কেবল নাক দিয়ে বাতাস টেনে সঙ্গে সঙ্গে নাকমুখ সিটকাল। আমারও ঐ অবস্থা। হাসপাতাল-হাসপাতাল গন্ধ। ওখানে, বাঁ দিকে ডিসপেনসারি গোছের কী একটা যেন ছিল। আমি মনে মনে ভাবলাম, হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে সিনেমা তৈরি করা তেমন একটা নিরাপদ কাজ নয়, যখন চিকিৎসার ব্যবস্থা সদাপ্রস্তুত।

আমরা ধাপ বয়ে খানিকটা ওপরে উঠে টানা লম্বা করিডর ধরে চললাম। আমি আর জাভা নানা বইয়ে (লেভ্ কাস্‌সিল ও অন্যান্যদের লেখায়) একাধিকবার ফিল্‌ম স্টুডিও সম্পর্কে এই কথাই পড়েছি যে সেখানে এলে সঙ্গে সঙ্গে করিডরেই আজব আজব কাণ্ডকারখানা শুরু হয়ে যায়: হয়ত দেখলে পিটার দি গ্রেট চাপায়েভের সঙ্গে গলা জড়াজড়ি করে হাঁটছেন, কোন রোমান গ্ল্যাডিয়েটর সোভিয়েত

ইউনিয়নের বীরের কাছ থেকে আগুন জ্বালিয়ে সিগারেট খাচ্ছে, আর সাগররাজ্যের অহঙ্কারী রানী গতকাল ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে চমৎকার ব্লাউজ কেনার গল্প করছে এক সাধারণ যৌথখামারনীর কাছে।

এসব দেখার সুযোগ পেতে আমাদের ধৈর্য হল না। আমরা থেকে থেকে এপাশে ওপাশে তাকালাম। কিন্তু করিডর ধরে কেন যেন যাচ্ছিল নেহাৎই সাধারণ লোকজন, অতি সাধারণ পোশাকে (কেউ কেউ আবার কাজের পোশাকে, যেমন কারখানায় দেখা যায়), কোথায় তোমার গ্ল্যাডিয়েটর, কোথায়ই বা রাজা!.. সম্ভবত আমরা এমন এক দিনে এসে পড়েছি যখন স্টুডিওতে আকর্ষণীয় কোন শুটিং ছিল না। আমাদের বরাত মন্দ!

হঠাৎ...

'এই যে! এই যে!' আমার পাঁজরে খোঁচা দিয়ে বলল জাভা। আমাদের মুখোমুখি এগিয়ে আসছিল কোমরে বেল্ট আঁটা সামরিক ইউনিফর্ম পরনে, মাথায় সবুজ রঙের সামরিক টুপি আঁটা একটি লোক। দীর্ঘকায়, ছিমছাম গড়নের, কঠিন তার মুখভঙ্গি।

'মনে হচ্ছে অভিনেতা কাদোচ্নিকভ... কোন গেরিলার পার্ট করছেন,' ফিসফিস করে বলল জাভা।

মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচকে দেখে ফৌজী লোকটি অমায়িক হাসি হেসে টুপিতে হাত ঠেকিয়ে স্যালুট করল। মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচও মৃদু হেসে প্রীতি সম্ভাষণ করলেন। আমরা যখন তাকে ছাড়িয়ে চলে গেছি তখন আমি সাহস করে মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচকে জিজ্ঞেস করলাম:

'উনি কে? নাম কী?'

'পেত্রেঙ্কো,' একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ বললেন। 'চমৎকার লোক... ফায়ার ব্রিগেডের লোক... স্টুডিওতে অগ্নিকান্ড রোধের দায়িত্ব ওর ওপরে।'

'ধুত্তোর!'

'কী যে সব ফায়ার ব্রিগেডের লোক হয়েছে! দেখে মজা পাওয়া যায় না, হেলমেট অবধি পরে না,' দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বিড়বিড় করে বলল জাভা।

আমরা অনেকক্ষণ ধরে আধা-অন্ধকার, সরু করিডর দিয়ে হেঁটে চললাম। যাদের

সঙ্গেই আমাদের দেখা হয় তারা প্রায় সকলে (করিডরে লোক ভিড় করে আছে, যেমন ভিড় করে থাকে কিয়েভের বিখ্যাত চৌরাস্তায়) মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচকে প্রীতি সম্ভাষণ জানায়। ঠিক যেমন হয় গাঁয়ে — প্রতি পদক্ষেপে 'নমস্কার'।

অবশেষে মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ এসে দাঁড়ালেন একটা দরজার সামনে, যার ওপর ঝোলানো বোর্ডে লেখা ছিল এই কথাগুলি: ''আমাকে চুমো দাও, বন্ধুরা!' শুটিং দল'। দরজার ওপাশ থেকে ভেসে আসছিল দারুণ হৈ-হট্টগোল। মনে হচ্ছিল ওখানে লোকজন গিজগিজ করছে, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া আর চিৎকার-চেঁচামেচি করছে। কিন্তু মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ দরজা ঠেলে খুলতে আমরা যখন ভেতরে প্রবেশ করলাম তখন দেখা গেল ঘরে মাত্র একজন লোক। তাকে যুবক বলা যায় না (পঞ্চাশের ওপরে বয়স হবে), তবে বেশ ফুর্তিবাজ চেহারার আর শক্তসমর্থ, মাথায় একরাশ কালো চুল। টেবিলের ওপর বসে তিনি টেলিফোনে কাকে যেন গালাগাল দিচ্ছিলেন, এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর মুখে কথার কোন কামাই ছিল না, নিজের কথার মাঝখানে নিজেই বাধা দিয়ে বলে চলছিলেন:

'দেখুন দেখি, আপনাদের জন্যে শুটিং বন্ধ হবার দাখিল... গতকাল কী পূর্বাভাস দিয়েছিলেন? বলেছিলেন যে রোদ থাকবে, বৃষ্টিপাত হবে না, বুঝলেন... বৃষ্টিপাত হবে না! কিন্তু কী করলেন? বলুন দেখি, আমার অবস্থাটা কী করলেন?... জানলার দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন! হাত উঠিয়ে জানলার দিকে নির্দেশ করে তিনি বললেন। 'আপনাদের ওখানে জানলা আছে ত? একবার দেখে নয়ন সার্থক করুন, বুঝলেন! বৃষ্টি ত বৃষ্টি! বৃষ্টিতে আকাশ ছেয়ে গেছে! বৃষ্টি আর বৃষ্টি, বিন্দুমাত্র আলোর ঝলক নেই, বুঝলেন...'

সত্যি সত্যিই আকাশে মেঘ ছড়িয়ে পড়েছে, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিও পড়তে শুরু করেছে।

'যাচ্ছেতাই ব্যাপার, বুঝতে পারছেন...' শেষবারের মতো গালিগালাজ বর্ষণ করে তিনি টেবিল থেকে তড়াক করে নেমে এসে মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচক জড়িয়ে ধরে, চুমো খেয়ে বললেন: 'নমস্কার দাদা! এই আর কি বকাবকি করছিলাম ওদের... কী যেন বলে... যারা আবহাওয়ার খবর দেয়...'

'আবহাওয়া-পর্যবেক্ষক?' মৃদু হেসে বললেন মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ! আবহাওয়া পর্যবেক্ষক... কী আমার দৈববাণী, বুঝলেন কিনা...'

18-1068

বলে তিনি টেলিফোনটার উদ্দেশে আঙুল তুলে শাসালেন। 'আরে বাপু মুরোদ নেই ত আবোল-তাবোল বলে লোকের মাথা গুলিয়ে দেওয়া কেন শুনি? আরে, আমার এখানে হয়েছে কি, আগামী পরশুদিন ইউলিয়াকে 'লেনফিল্‌ম' তলব করেছে। প্লেনের টিকিট পর্যন্ত আছে, এদিকে আমি এখনও আউটডোর শুটিং করতে পারলাম না এই এর জন্যে... যাকে বলে বৃষ্টিপাত, বুঝলেন কিনা, তার জন্যে... আজ ফের শুটিং করতে হবে ইনডোরে... সবাই এতক্ষণে ওখানে... ছুটতে হচ্ছে... চটপট যেতে হচ্ছে...'

'এখানে এই ছেলেদের একটা আর্জি আছে...' মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ সবে বলার জন্য মুখ খুলেছেন, অমনি 'আমাকে চুমো দাও, বন্ধুরা!' বেশ ভদ্রভাবে তাঁকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন:

'মাফ করবেন দাদা... পরে... পরে!' তিনি অনুনয়ের ভঙ্গিতে বুকে হাত রেখে মাথা নোয়ালেন। 'শুটিং-এর পর... সব ব্যাপার হবে শুটিং-এর পর... এখন সবচেয়ে জরুরী কাজ হল শুটিং... চটপট ফ্লোরে চলে আসুন... ফ্লোরে! আর এই যে ভাই তোমরা, তোমরাও... তোমাদের আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি,' তিনি আমাদের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন। 'তবে একটা কথা, চুপচাপ থাকতে হবে, বুঝলে কিনা, যাতে... বুঝলে ত...'

মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ উল্লসিত হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন:

'কী বল? যাওয়া যাক... শুটিং বোধ হয় তোমরা কখনও দেখ নি। তা তোমাদের ভালোই লাগবে... দেখার ইচ্ছে আছে?'

বলাই বাহুল্য, আমরা সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলাম। ভালকাও নিজেকে সামলাতেই পারল না, এমন কি হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠে বলল: 'ওঃ কী দারুণ!' জাভা সগর্বে তার দিকে তাকাল: ভাবটা এই যে যা বল তাই বল, আমাদের কল্যাণেই ত ফিল্‌ম স্টুডিওতে আসা হল। শুধুই কি তাই? — আবার শুটিং-এ! কিয়েভে থাকলে কী হবে, শুটিং ত জীবনেও দেখে নি।

আবার আমরা চললাম টানা করিডর ধরে।

আমি চলতে চলতে ভাবতে লাগলাম: 'কী এরা সব আবহাওয়া-পর্যবেক্ষক, অতি সাধারণ বৃষ্টির পর্যন্ত পূর্বাভাস দিতে পারে না! আমাদের ওখানে যে কোন ঠাকুমা-দিদিমা তিনদিন আগে থেকে বৃষ্টির পূর্বাভাস দেবে। বিশ্বাসযোগ্য কত

লক্ষণই না আছে! বাতাস কী ভাবে পাক খাচ্ছে — চৌকাঠের ওপর দিয়ে, না চৌকাঠ থেকে তা দেখে বলে দিতে পারে। মুরগীদের আচরণ, সূর্য কী ভাবে অস্ত যাচ্ছে — এসব দেখেও... কখনও কখনও গাছ দেখেও... আবহাওয়া-পর্যবেক্ষণ অফিসে মুরগী রাখলেই ত পারে — কোন ঝঞ্ঝাট নেই! তাহলে ফিল্মের শুটিংও বন্ধ হয় না!'

এই সময় আমরা নীচে নামলাম, নেমেই এসে পড়লাম যেন কোন এক কারখানার এক বিশাল কর্মশালায়। ওপরের সিলিং প্রায় চোখে দেখা যায় না। আমরা সকলে হঠাৎ কেমন যেন ছোট্ট, এতটুকু হয়ে গেলাম... চলছি ত চলছিই — শেষ নেই।

সিমেণ্টের মেঝের ওপর খটখট করে পা ফেলে আমাদের মুখোমুখি খুটখুট করে এগিয়ে এলেন রোগা চেহারার একজন লোক, মাথায় তাঁর টাক। দূর থেকেই তিনি হাত নাড়াতে নাড়াতে চেঁচিয়ে বললেন:

'এই যে ভিতিয়া!'

'আরে জেনিয়া!' সহর্ষে বললেন 'আমাকে চুমো দাও, বন্ধুরা!'।

যখন আমরা কাছাকাছি চলে এসেছি তখন মধ্যবয়স্ক ভিতিয়া মধ্যবয়স্ক জেনিয়াকে জড়িয়ে ধরলেন, তাঁরা একে অন্যকে চুমো খেলেন। তারপর তিনি চুমো খেলেন মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচকে। আমার তখন ভয় হচ্ছিল পাছে আমাদেরও চুমো খেয়ে বসেন, কিন্তু তা না করে আমাদের উদ্দেশে কেবল হাত নেড়ে তিনি বললেন:

'এই যে দাদারা!'

আমরা নিজেদের অজানতেই ফিক্ করে হেসে ফেললাম: প্রৌঢ় মানুষটি, যাঁর হয়ত নাতি-নাতনীও আছে, তিনি কিনা ওঁর কাছে হলেন ভিতিয়া, আর আমরা হলাম দাদা... সবই উলটো দেখছি!

জেনিয়া নিজে সম্ভবত ভিতিয়ার চেয়েও বয়সে বড়, কারণ কেবল এই নয় যে তাঁর টাকের চারধারে ঝিলের চারপাশের নলখাগড়ার মতো গোছা গোছা পাকা চুল খাড়া হয়ে ছিল (ভিতিয়ার কিন্তু একটিও পাকা চুল ছিল না!)। জেনিয়ার গোটা মুখটা বড় বড় বলিরেখায় ভর্তি — উনুনে সেঁকা আপেলের মতো। রেখাগুলি যেন চোখের কোনা থেকে কিরণের মতো সরু সরু হয়ে বেরিয়ে এসেছে। এই

জন্যই তাঁর চোখে সর্বক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছিল একটা দীপ্তি আর হাসি-হাসি ভাব। কালো জ্বলজ্বলে চোখজোড়া ছুটে বেড়াচ্ছে ইঁদুরছানার মতো।

সংক্ষেপে বলতে গেলে বেশ সুশ্রী তাঁর চেহারা।

আমি লক্ষ করেছি যে আমাদের দিকে যখন তিনি চটপট এগিয়ে আসছিলেন তখনই তাঁর চোখের দৃষ্টি কেন যেন আমার আর জাভার ওপর তাক করা ছিল। যখন তিনি ভিতিয়া ও মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচকে চুমো খাচ্ছিলেন তখনও তিনি আমাদের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নেন নি। প্রীতি সম্ভাষণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাদের দিকে ইঙ্গিত করে ভিতিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন:

'এরা কারা? কার?'

ভিতিয়া কাঁধ ঝাঁকিয়ে মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচের দিকে তাকালেন।

'আমার,' হেসে বললেন মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ।

'ওরা কি পার্ট করছে নাকি?' আবার জেনিয়া বললেন ভিতিয়াকে উদ্দেশ্য করে।

ভিতিয়া মাথা নেড়ে জানালেন যে তা নয়।

'তাহলে চুপ করে আছ কেন!' জেনিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন। 'ওরা যে আমার এই এতটা দরকার!' বলে তিনি হাতের তালু দিয়ে গলার ওপর হাত বুলালেন। 'চমৎকার খাপ খাবে! কাল যে জনতার দৃশ্য তোলা হবে। এই রকম ছেলেদের কথাই ভাবছিলাম আমি! দাদারা, তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ!' তিনি বুকে দু'হাত রেখে বললেন। 'তোমাদের কাছে আমি অনুনয় করেই বলছি। তোমাদের জন্যে গাড়ি পাঠিয়ে দেব! কাল... বেলা বারোটায়... শুটিং-এ... এখানে, আমাদের স্টুডিওতে... তোমাদের বাবাদের সঙ্গে আমি কথা বলে নেব... মাত্র এক দিনের জন্যে... তোমরা কোথায় থাক?' সঙ্গে সঙ্গে তিনি পকেট থেকে নোটবই বার করলেন। 'পারলে আরও দুই একটা ছেলেকে জুটিয়ে এনো...' ঠিকানা লিখতে লিখতে তিনি বললেন। 'সাড়ে এগারোটার সময় আমার অ্যাসিস্টেণ্ট তোমাদের নিতে আসবে... তাহলে, কথা রইল ত!.. চমৎকার, চমৎকার... আচ্ছা চলি! কাল ফের দেখা হবে।'

তিনি যখন ছুটে আমাদের কাছ থেকে সরে গেলেন একমাত্র তখনই আমার চৈতন্য হল যে আমাদের, মানে জাভাকে আর আমাকে সিনেমায় নামার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, কাল, হ্যাঁ আক্ষরিক অর্থেই আগামীকাল আমরা বনে যাব ফিল্‌ম আর্টিস্ট, আর আমাদের চাঁদমুখ দেখতে পাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সকলে, এমন

কি, হতে পারে বিশ্বসুদ্ধ সবাই — সংক্ষেপে বলতে গেলে, এমন জিনিস রূপকথায়ই ফলে, আমরা কেবল স্বপ্নেই এটা ভাবতে পারতাম। ওঃ কলকল-ছলছল! আনন্দে কী যেন একটা কলবল, গুরগুর করে উঠল, শিস দিয়ে উঠল আমার প্রাণের ভেতরে — এমনই গুরগুর আর হিসহিস করতে থাকে সামোভারে জল ফোটার সময়। আর একটু হলেই বুঝি আমার নাক দিয়ে বেরিয়ে পড়ে টগবগে আনন্দের ভাপ... আমি জাভার দিকে তাকাই — আনন্দে লোকের মুখ যে এরকম বোকা-বোকা হয়ে যেতে পারে তা আমার ধারণায় ছিল না।

'দেখ দেখি! তোমাদের আমি অভিনন্দন জানাই!' মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ সোল্লাসে বললেন। 'দেখা যাচ্ছে পরিচালক ইয়েভগেনি মিখাইলভিচের কাছে তোমরা ভীষণ দরকারী ছিলে। কালই সিনেমায় নামবে... সিনেমা, দারুণ জিনিস ভাই!'

'সমস্ত শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ!' সগর্বে বলল জাভা।

'বড় আনন্দ হচ্ছে তোমাদের কথা ভেবে!..' সরু সরু কাঁপা কাঁপা গলায় বলল ভালকা। ওর দারুণ হিংসে হচ্ছিল আমাদের কথা ভেবে। সে যে ছেলে নয় এই ভেবে সম্ভবত আর কখনও এত দুঃখ সে পায় নি।

'ও কিছু নয়, পরের বার মেয়েদের দরকার হবে... দেখো, আমি বলে রাখলাম!' কথাগুলি আমি এমন স্বরে বললাম যেমন লোকে বলে থাকে ছোটদের কিংবা রোগীদের। আমার তখন মন উদার। আমার মনের ভেতরে ফড়ফড় করে উড়ে বেড়াচ্ছিল প্রজাপতির দল...

আমরা বাঁ দিকে মোড় নিয়ে একটা ছোট দরজা দিয়ে ঢুকে এসে পড়লাম বিরাট এক অন্ধকার হল্-ঘরে। কতকগুলি পার্টিশন আর ঘরবাড়ির মাঝখান দিয়ে মোটা মোটা রবারের কেব্‌ল-এর গায়ে হোঁচট খেতে খেতে আমরা অনেকক্ষণ ধরে প্রায় আন্দাজ করে করে এঁকেবেঁকে চলতে লাগলাম। অবশেষে বেরিয়ে এলাম উজ্জ্বল আলোকিত একটা চত্বরে... ওরে ব্‌বাবা! চত্বরে দাঁড়িয়ে রয়েছে এরোপ্লেন! মানে, পুরো এরোপ্লেন নয়, তার অংশ। 'তু-১০৪' এরোপ্লেনের সামনের অংশটা লম্বালম্বি চেরা। কিন্তু সব যেন সত্যিকারের এরোপ্লেনের মতো: গদি-আঁটা চেয়ার, আলো, সবকিছু (আমি এরোপ্লেনে চড়েছি কিনা, তাই জানি)। শুটিং তখনও আরম্ভ হয় নি, তাই যাত্রীরা, এয়ারহোস্টেস ও পাইলটরা শান্তভাবে পায়চারি করছিল চত্বর বরাবর। খুঁটির ওপর বসানো বিশাল বিশাল সার্চলাইটের সামনে ব্যস্তসমস্ত

হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল কাজের পোশাক পরনে লোকজন। আর এরোপ্লেন বরাবর যে রেললাইন চলে গেছে তার ওপর দিয়ে চেককাটা জামা গায়ে এক ছোকরা ধীরে ধীরে একটা ট্রলিতে করে নিয়ে চলছিল সিনেমার ক্যামেরা। ক্যামেরার গায়ে লেপটে দাঁড়িয়ে ছিল কালো রঙের আলখাল্লা গায়ে একটি লোক।

'চার নম্বর বন্ধ করুন!' আমরা যখন এগিয়ে আসছিলাম ঠিক সেই সময় চিৎকার করে বলল লোকটা।

খুট করে কিসের যেন আওয়াজ হল, অমনি ওপরে মঞ্চে রাখা সার্চলাইটগুলির একটি নিভে গেল।

ওঃ, এখানে কী মজার! তায় আবার এরোপ্লেন! (স্টুডিওতে লোকের যেন জানা ছিল যে আমি একজন ভাবী পাইলট।) প্রবল আনন্দের উত্তেজনা আমাকে পেয়ে বসল। এখানে সবকিছু এত অসাধারণ আর হাসিখুশিতে ভরপুর যে আমাদের মনে হচ্ছিল যেন আমাদের নিজেদের জন্মদিন বা ঐ রকম কোন উৎসবের আয়োজন হতে চলেছে — অতিথিরা ইতিমধ্যে এসে গেছে, টেবিলের ধারে আসন গ্রহণ করছে। এখুনি শুরু হয়ে যাবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যাপার — শুটিং — এই ভেবে আমি এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না।

'ভাসিয়া কোথায়?' দাঁতে দাঁত চেপে বললেন 'আমাকে চুমো দাও, বন্ধুরা!' 'আবার দেরি?.. কী আর করা যাবে? বসি, বসে বসে ওর জন্যে অপেক্ষা করা যাক।' তিনি ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন, দু'হাতে হাঁটুজোড়া চেপে ধরে বসে রইলেন স্থির প্রস্তরমূর্তির মতো।

কিন্তু কয়েক মিনিট যেতে না যেতেই অন্ধকারের মাঝখান থেকে হাঁসফাঁস করতে করতে ফ্লোরে ছুটে এলো এক যুবক। তার পরনে পাইলটের ইউনিফর্ম।

'ভিক্তর ভাসিলিয়েভিচ, মাফ করবেন! মাফ করবেন! ঘড়ি... বন্ধ হয়ে গিয়েছিল... আমার দোষ নেই... দম দিতে ভুলে গিয়েছিলাম।'

'আর আমার ঘড়িটা?' হঠাৎ আমার খেয়াল হল। 'আমিও ত দম দিই নি। নিয়মিত দম দেওয়া উচিত। বাবা রোজ দম দেন দেখেছি। নইলে নষ্ট হয়ে যাবে আবার... দম দেওয়া দরকার!'

আমি পকেটে হাত গলালাম।

...আমার মনে হল যেন বিশাল সার্চলাইটটা আমার মাথার ওপর পড়ে যাচ্ছে। আমার পা টলে উঠল...

পকেটে ঘড়িটা নেই!

দশম পরিচ্ছেদ

কোথায় ঘড়ি? শত্রুর ডেরায় পদার্পণ

'এখুনি শুরু হবে! এখুনি শুরু হবে!' উত্তেজিত স্বরে বলল জাভা। 'আর এই টুপি পরা লম্বা লোকটা হুবহু ফিলিপ্পভের মতো দেখতে। সত্যি কিনা?'

'জাভা...' নিষ্প্রাণ কণ্ঠে আমি বলি। আমার কণ্ঠস্বর যেন ভেসে আসছে অনেক-অনেক দূর থেকে, অন্য কোন গ্রহ থেকে।

'হয়ত বা সত্যিকারের ফিলিপ্পভই হবে... ওঃ, আলাপ করতে পারলে দারুণ হত!.. সামনে এগিয়ে গিয়ে যদি বলতে পারতাম: 'নমস্কার, কাল আমাদেরও শুটিং আছে... আপনার সঙ্গে একটু পরামর্শ করতে চাই।''

'জাভা!'

'ছেলেরা হিংসেয় ফেটে মরবে!' উত্তেজনায় জাভার শ্বাস রোধ হয়ে আসে। 'কী সৌভাগ্য আমাদের! ওঃ, কী সৌভাগ্য!'

'জাভা...'

'আমি তোকে বলেছিলাম না যে আমরা অভিনেতা হব! আর তুই কেবল 'পাইলট, পাইলট'... তোতা পাখির মতো...'

আমি জাভার হাত চেপে ধরে তাকে অন্ধকারের মধ্যে পার্টিশনের আড়ালে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাই।

'কী ব্যাপার?' ও আমার হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করে।

'ঘড়ি...'

'অ্যাঁ?'

'নেই...'

'কী?'

'ঘড়ি নেই...'

'গেল কোথায় তাহলে?'

'আরে, ছিল ত পকেটে... কিন্তু নেই...' আমি পকেট উলটে দেখালাম, যদিও অন্ধকারের মধ্যে দেখানোর কোন মানে হয় না — কিছুই দেখতে পেল না।

জাভা বিস্ময়ে হতবাক।

'শুটিং-এর পর মালিককে খুঁজে পাওয়া যাবে, আর তখন...' আমি হতাশ হয়ে বললাম।

'এটা ঘটেছে মারামারির সময়! এতে কোন সন্দেহ নেই! তোরা যখন গড়াগড়ি খেয়ে মাটিতে পড়লি তখনই পকেট থেকে পড়ে গেছে!.. চল্! শুটিং যতক্ষণ চলতে থাকবে ততক্ষণে আমরা সময় পাব...'

আমি চেঁচিয়ে ভালকাকে ডাকলাম।

জাভা লোকজনের মাঝখান দিয়ে গলিয়ে কাছে গিয়ে তার কানে কানে ফিসফিস করে কী যেন বলল। ভালকা ঠোঁটজোড়া গোল করে পাকিয়ে বলল 'ওঃ!' চোখের পলকে ওরা দুজনেই ছুটে এসে হাজির হল আমার পাশে। অন্যদের মনোযোগ যাতে বিচ্ছিন্ন না হয় সেই জন্য আমরা সাবধানে বেরোবার রাস্তার দিকে এগোতে লাগলাম। ফ্লোরে তখন এমন হুড়োহুড়ি চলছে যে আমাদের দিকে নজর দেবার অবকাশ কারও ছিল না। কেবল সাদা স্মক গায়ে একজন মোটাসোটা মহিলা আমাদের চালচলন লক্ষ করেন। কিন্তু ব্যাপারটাকে তিনি ধরলেন অন্যভাবে। আমাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে মহিলা মৃদুস্বরে বললেন:

'বাঁ দিকের দ্বিতীয় দরজা — মেয়েদের, তৃতীয় দরজা — ছেলেদের।'

আমরা বিব্রত বোধ করলাম, কিন্তু কোন রকম ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করলাম না।

...জীবনে কখনও আমি এত তাড়াহুড়ো করি নি। আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেছি: প্রথম 'আমি' সামনের দিকে ছুটে চলেছে, এদিকে দ্বিতীয় 'আমি' কিছুতেই প্রথমের নাগাল ধরতে পারছে না।

পাতাল রেলে আমরা এস্কালেটর দিয়ে তরতর করে ছুটে নীচে নেমে গেলাম, যদিও রেডিওতে এক মহিলা জোর গলায় সতর্ক করে দিচ্ছিলেন: 'এস্কালেটরে

ছোটা নিষেধ!' তারপর 'আর্সেনাল' স্টেশন — ওপরে ওঠার পালা। ওঃ, হৃৎপিণ্ডটা যেন বুকের খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসতে চায়!

বিশ নম্বর ট্রলিবাসটা এত আস্তে আস্তে চলছিল যে ইচ্ছে হচ্ছিল ট্রলিবাস থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে আগে আগে ছুটি।

আর মেরীমাতা গির্জার পাশের টিলার ওপর দিয়ে এমন ছুট দিলাম যে পায়ের গোড়ালি মাথার পেছন দিক স্পর্শ করছিল।

অবশেষে... এই ত... এই ত সেই অভিশপ্ত জায়গাটা!.. আমরা তিনজনেই সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে চার হাত পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে হাতড়াতে লাগলাম। কাঁটাঝোপে আমাদের গাল ছড়ে গেল, কাঁটা আমাদের চোখে এসে লাগছিল, চুলে জড়িয়ে যাচ্ছিল... ঘড়ির কোন পাত্তা নেই। তোমাদের হয়ত হাসি পেতে পারে, কিন্তু বলব কি, আমি মাটির ওপর কান খাড়া করলাম ঘড়ির টিক-টিক শুনতে পাব এই আশায় (স্যাপাররা এই ভাবে মাইন অনুসন্ধানকারী যন্ত্র খাড়া করে রাখে)। কিন্তু টিক-টিক শোনা গেল না। আমার কেবল মনে হল আমার দেহের নীচে জমির বিশাল হৃৎপিণ্ডটা ভয়ঙ্কর ধড়ফড় করছে। আসলে আমার বুকের ভেতর আমার নিজের হৃৎপিণ্ডটাই চাপা আর্তনাদ তুলছিল।

'এই ত এখানে তুই ওকে ল্যাং মেরেছিলি,' হামা দিতে দিতে বিড়বিড় করে বলল জাভা। 'এখানে তোরা গড়াগড়ি খেয়ে পড়েছিলি... এখানে তুই ওর ওপর চেপে বসেছিলি... এই যে এখানে ওর ওপর থেকে ওরা তোকে টেনে তুলেছিল...'

হঠাৎ আমি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসলাম, আমার মনে হল আমার সর্বাঙ্গ যেন শক্তি হারিয়ে অবসন্ন হয়ে পড়েছে।

'জাভা রে,' আমি মৃদুস্বরে বললাম, 'ওরা ঘড়িটা পকেট থেকে বার করে নিয়েছে। যখন প্যাণ্ট ধরে আমাকে টেনে তোলে... কোন সন্দেহ নেই ... তখন আমার মনেও হয়েছিল কে যেন আমার প্যাণ্টের পকেটে হাত গলিয়েছে। কিন্তু তখন এমন কথা আমার একেবারেই মনে হয় নি...'

জাভা এবং ভালকাও উঠে বসল। আমরা বসে বসে নীরবে এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। ঘটনা ক্রমেই জটিল আকার ধারণ করছে। আজকের দিন অবধি, যাকে বলে পাকেচক্রে চোর, আমাকেও তা-ই বলা যেত (কেননা যাই বল,

ঘড়ি আমি চুরি করি নি, ওটা আমি ফেরত দিতে চাই, আর সবচেয়ে বড় কথা, ফেরত দিতে পারতামও), কিন্তু এখন গোটা ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াল অনেক জটিল — ঘড়ি আমি ফেরত দিতে পারছি না। দাঁড়াচ্ছে এই যে চুরি করি আর না-ই করি, আমারই দোষে ঘড়িটা গেল, আইন অনুযায়ী আমিই এর জন্য দায়ী! আইন অনুযায়ী আমি — চোর!

'চল, গুমটির কাছে যাওয়া যাক!' মাটি থেকে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ভালকা বলল।

আমি হতাশ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিক্ত আফশোসের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম: কী, বলে কী ও? ধর, আমরা না হয় গেলাম ওর কাছে, গিয়ে ধর বললাম: 'ঘড়িটা দিয়ে দে!' তাতে ও কেবল খ্যাঁকখ্যাঁক করে বিদ্রূপের হাসি হেসে বলবে: 'ওসবের আমি কী জানি?' এখন প্রমাণ কর যে ওরাই নিয়েছে! ভালকা কি মনে করে যে যার সঙ্গে আজই আমার লড়াই বেধেছিল এবং নীতিগতভাবে যাকে আমি হারিয়েছি, আমার সেই পরম শত্রু আমার ওপর সদয় হবে, আমাকে অনুগ্রহ করবে! কী আজব মেয়ে রে বাবা!

'চল, গুমটির কাছে যাই!' জোর গলায় আবার বলল ভালকা। 'যদি না চাও ত আমি একাই যাব!'

'আরে, একা যাবে কেন?' মাটি থেকে উঠতে উঠতে আমার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল জাভা। 'চল...'

'দূর!' হতাশার ভঙ্গিতে হাত নেড়ে আমি বললাম বটে, তবু উঠে দাঁড়ালাম (ওরা যদি ভেবে বসে যে আমি ভয় পেয়ে গেছি, তাহলে ত আরও চমৎকার!)।

আমরা তিনজনে পরপর সার বেঁধে পায়ে-চলা-পথ ধরে চলতে লাগলাম: সামনে ভালকা (এ কাজের সাফল্যে তারই বিশ্বাস আমাদের সকলের চেয়ে বেশি), তারপর জাভা (ভালকার খাতিরে সে চেষ্টা করছিল বিশ্বাস রাখার), আর তার পিছে আমি (আমার একেবারেই বিশ্বাস ছিল না)।

আমরা চললাম শত্রুর ডেরার উদ্দেশে। আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন এক গুপ্তকর্মী, আমাকে পাঠানো হয়েছে জার্মান ফাশিস্ত বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগে। আমি যে ভয় পেয়েছিলাম তা নয়, না, ভয় আমি পাই নি, তবে কিনা মিছিমিছি চড়চাপড় খাওয়ার ইচ্ছে আমার ছিল না।

'ও এখন কোথায়? তুমি জান?' জাভা জিজ্ঞেস করল ভালকাকে।

'হয়ত চালাঘরগুলোর পেছনে — ওখানে ওদের সদরদপ্তর কিনা... নয়ত মাঠে— ফুটবল খেলছে... তা নয়ত বাড়িতে আছে। ওর বাড়ি আমি চিনি,' জোর দিয়ে বলল ভালকা।

চালাঘরগুলির পেছনে, 'সদরদপ্তরে' একটি 'যোদ্ধাকেও' দেখা গেল না। খেলার মাঠেও না।

'চল, ওর বাড়িতে যাওয়া যাক! ওর মাকে বলব যে আমরা মিলিশিয়াতে জানাব, আর মোট কথা... এর জন্যে কলোনিতেও পাঠিয়ে দিতে পারে ওকে!' উত্তেজিত হয়ে বলল ভালকা।

ভালকারা যেখানে থাকত সেই বাড়ির অংশ থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল গুমটিকে। আমরা তার দিকে ধেয়ে গেলাম। ও কিন্তু পালানোর কোন চেষ্টা করল না। এমন কি আমার মনে হল আমাদের দেখে ওর চোখে যেন খুশির ঝলক খেলে গেল।

'ঘড়ি কোথায়?' ভালকা লাফিয়ে তার সামনে এগিয়ে এসে বলল।

'প্রথমত, তোমাদের 'নমস্কার-টমস্কার' কোথায় গেল?' জ্বালা ধরানো ঠাট্টার সুরে বলল গুমটি। 'কী অভদ্র সব তোমরা, শিক্ষাদীক্ষার কোন বালাই নেই দেখছি!

লোকের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয় তোমাদের মা কি তা শেখান নি?'

'ওসব বলে তুই আমাদের বোকা বানাতে পারবি না! বলি, ঘড়ি কোথায়?' নীচের চোয়াল সামনে বাড়িয়ে দিয়ে ভয়ঙ্কর মুখভঙ্গি করে বলল জাভা।

'ওঃ, কী ভয়ঙ্কর! এক্ষুনি আমি তোতলাতে শুরু করব গো! আমাকে ভয় দেখিও না গো তোমরা!' গুমটি বিদ্রূপ করে বলল।

'ঘড়ি কোথায়?!' রাগে গরগর করতে করতে জাভা আবার বলল।

'মাফ করবেন, কোন্ ঘড়ির কথা আপনারা বলছেন?' চোখ পিটপিট করতে করতে গুমটি এমনভাবে বলল যেন তার কোন দোষ নেই।

'সেই ঘড়ি যেটা তোরা বার করে নিয়েছিস ওর পকেট থেকে!' আমার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে চেঁচিয়ে বলল ভালকা।

'সোনালি? যার ডায়ালটা কালো? 'সালিউত্' মার্কা?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ!' আমি আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলাম।

'দেখি নি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে এই কথা বলে গুমটি সখেদে মাথা নাড়ল।

'ওরে পাজী, বদমাশ!' ভালকা চেঁচিয়ে বলল।

'আমার ওপর চোটপাট করবে না বলছি! আমার নার্ভের গোলমাল আছে। আমি যখন ছোট ছিলাম তখন মা পর্যন্ত আমার ওপর চোটপাট করতেন না।'

'যা ভেবেছিলাম! ওর কাছ থেকে আর কীই বা আশা করা যায়?'

'ঘড়ি দে বলছি, নইলে...' বলতে বলতে আমি হঠাৎ ঠেকে গেলাম, কেননা আমার নিজেরই জানা ছিল না এখন কী করা উচিত।

'আচ্ছা, তোমরা চাও নীল বর্ডার দেওয়া থালায় করে ওটা তোমাদের কাছে আনা হোক? আর ফ্ল্যাটের চাবি? — দরকার নেই তোমাদের? ঐ যে যেখানে টাকা-পয়সা আছে...'

ছেলেটা সম্ভবত ইল্‌ফ ও পেত্রোভের 'সোনার বাছুর' খুব করে পড়েছে আর সেখান থেকেই বুলি কপচাচ্ছে ওস্তাপ বেন্দেরে ভঙ্গিতে।

''আচ্ছা ঠিক আছে!' ফোঁস ফোঁস করে বলল ভালকা। 'ভালোভাবে না চাস, তোর মা'র কাছে যাব... মিলিশিয়ার কাছে যাব... যেখানে যেখানে দরকার যাব!..

তুই যখন চোর, চুরি করিস... মিলিশিয়া তোকে কলোনিতে পুরুক! চল, যাওয়া যাক!' আমাদের দিকে ইঙ্গিত করে সে বলল।

'ওঃ, চটপট কতকগুলো কথা বলে দিলেই হল! চোর... মিলিশিয়া... কলোনি... হাঃ! প্রমাণ কর্ না যে আমরা তোদের কাছ থেকে কোন জিনিস নিয়েছি! প্রমাণ কর্ দেখি!'

'প্রমাণ করব!'

'কিছুই প্রমাণ করতে পারবি না... কিন্তু তোরা যদি এমন চালবাজ না হতিস, তাহলে আমি তোদের সাহায্য করলেও করতে পারতাম... এমনও ত হতে পারে যে আমি কিছু জানি...'

'কী? কী? কী জানিস তুই?' থতমত খেয়ে আমরা জিজ্ঞেস করলাম।

'প্রথমত আমি নিশ্চিত জানি যে আমি নিই নি। কেননা আমার দুই হাতই... হে-হে-হে... আটক ছিল... না বলতে পারবি?' এই বলে সে বাঁকা হাসি হেসে আমার দিকে তাকাল।

'তারপর?' আমি লজ্জায় লাল হয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম (আমার মনে পড়ে গেল যে আমার মাথাটা ও জোর মাটিতে ঠুকেছিল — তার মানে, বুঝতেই পারা যাচ্ছে, ওর দুহাত আটক ছিল!)।

'কিন্তু আমি জানি কে নিয়েছে। একটা ছোকরা... ও আমাদের দলের নয়। ঘটনাক্রমে তখন ওখানে ছিল। ওটা হল রামঘুঘু, বুঝলি... মেয়াদ খেটেছে... জেল খেটেছে। সুতরাং...'

আমি জানতাম না 'রামঘুঘু' কাকে বলে, 'মেয়াদই' বা কী, তবে বুঝতে পারলাম: ব্যাপারটা ঘোরাল। গুমটি যদি মিথ্যে না বলে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে ঘড়ি পড়েছে খাঁটি চোরের হাতে।

'তারপর?' আমি অসহিষ্ণু হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আমার বুকের ভেতরটা বিশ্রী রকম শিরশির করে উঠল।

'খালি 'তারপর' আর 'তারপর'! বললাম না, ওটা একটা রামঘুঘু! তোর ঘড়ি আর দেখতে হচ্ছে না! কিন্তু আমাদের ছেলেরা ফৌজদারী আইন মেনে চলে... চোর-ছ্যাঁচোড়দের আমরা নিজেরাই পছন্দ করি না। তবে ব্যাপারটা আমাদের চৌহদ্দিতে ঘটেছে বলে আমরা এতে হস্তক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিন্তু

কাজটা সোজা নয়: দাগীটা তোর সাধের জিনিস (অর্থাৎ ঘড়ি) কোথায় নিয়ে রেখে দিয়েছে কে জানে। ওর সঙ্গে ভালোমতো বোঝাপড়া করা দরকার। মোট কথা, আমি তোমাদের খ‍ুঁজছিলামও। এই ত এইমাত্র গিয়েছিলাম ওর ওখানে।' সে ইঙ্গিতে দেখাল ভালকাকে।

'তারপর?' (আর কীই বা বলার ছিল আমার?)

'আমাদের ছেলেরা সবাই আজ স্টেডিয়ামে থাকবে। আজকে 'টর্পেডোর' খেলা যে! ম্যাচ শ‍ুর‍ু হওয়ার আধঘণ্টা আগে আমরা মিউজিক্যাল কমেডি থিয়েটারের কাছে রেড আর্মি ও জিলিয়ানস্কায়া স্ট্রীটের মোড়ে তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করব... তোমাদের জন্যে দ‍ুটো বাড়তি টিকিটও আছে। আমার এখন তাড়া আছে... আচ্ছা চলি!' ও ফটকের দিকে ছ‍ুটে গেল।

আমরা ম‍ুখ চাওয়া-চাউয়ি করলাম। সমস্ত ব্যাপারটিই আকস্মিক ও অদ্ভুত। অনেক কিছ‍ুই ঘটতে পারে বলে আমরা মনে মনে ভেবে নিয়েছিলাম, কিন্তু এটা আমরা আশা করি নি... বীরব্রতীদের ভূমিকায়, ন্যায়প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামী হয়ে দেখা দিয়েছে কিনা গ‍ুমটি আর তার দলবল! প‍ুরো জিনিসটা যেন একটা ধাপ্পাবাজী বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু ওরা আমাদের ধাপ্পা দিতে যাবে কেন? সত্যি বলতে গেলে কি, ওরা যে ঘড়ি নিয়েছে তা প্রমাণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ইচ্ছে করলেই ওরা ঘড়িটা প‍ুরোপ‍ুরি গায়েব করে দিতে পারত। এখন ত আমরা অনায়াসে মিলিশিয়ায় খবর দিতে পারি, যেহেতু ওরা নিজেরাই বলেছে... তাহলে কি ধরে নিতে হবে যে গ‍ুমটি সত্যি সতিই আমাদের সাহায্য করতে চায়?

উঠোনে আমরা চটপট একটা জর‍ুরী পরামর্শসভা সেরে নিলাম। তাতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে আমি আর জাভা মিউজিক্যাল কমেডি থিয়েটারের দিকে শত্র‍ুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাব, আর ভালকা স্টুডিওতে ছ‍ুটে গিয়ে মাক্সিম ভালেরিয়ানোভিচকে সবকিছ‍ু ব‍ুঝিয়ে বলবে — উনি ত জানেনই না যে আমরা কোথায় গেলাম। এর পর আমি আর জাভা বাড়ি চলে গেলাম — ম্যাচ শ‍ুর‍ু হতে এখনও অনেক দেরি, ইতিমধ্যে দ‍ুপ‍ুরের খাওয়া সেরে নেওয়া যেতে পারে।

কাকা আমাদের দেখে সোল্লাসে চেঁচিয়ে বললেন:

'ওহে ছেলেরা, ঠেলা সামলাও! এখন আমি তোমাদের এমন একটা জিনিসের

কথা বলব!' তাঁর চোখমুখ চকচক করছিল। 'ভাবছ কী? আজ আমরা কোথায় যাচ্ছি জান? জান না ত? তাহলে বলি শোন — ফুট-বল খেলা দেখতে! কিয়েভ 'ডিনামো' আর মস্কো 'টর্পেডো'র ম্যাচ! মরশুমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খেলা! দেশের চ্যাম্পিয়নশিপের মীমাংসা হতে চলেছে! আরে এ কি, তোমরা দেখছি ভেবাচেকা খেয়ে গেলে! তা ত হওয়ারই কথা! তোমাদের ভাসিউকোভ্কায় কি আর জীবনে কখনও এই জিনিস দেখতে পেতে?.. নাকি তোমরা এতে সন্তুষ্ট নও? অ্যাঁ? স্টেডিয়ামে যাবার ইচ্ছে নেই নাকি? অ্যাঁ?'

'তোমার মতো ফুটবল-পাগলের কাছে এটা ঘটনা বটে! কিন্তু ওরা হল সুস্থমস্তিষ্কের লোক,' রান্নাঘর থেকে শোনা গেল কাকীমার গলা। 'ঠিক বললাম কিনা?'

'সুস্থমস্তিষ্কের লোকে ফুটবল ভালো না বেসে পারে না!' কাকা জবাব দিলেন।

'অবশ্যই, আমরা খুশি হয়ে দেখতে যাব!.. ফুটবল! তা আর বলতে!' অবশেষে সংবিৎ ফিরে পেয়ে আমি বললাম।

''এ' সেক্টর! সবচেয়ে ভালো জায়গা!' পকেট থেকে টিকিট বার করে কাকা সগর্বে বললেন।

'কী মজা!' আমি উল্লসিত হয়ে বললাম।

...দুপুরের খাওয়াদাওয়ার আগে, খাওয়ার সময় এবং তার পরেও — সর্বক্ষণ আমি এই ভেবে মাথা ঘামাতে লাগলাম, টিকিট যাতে আমাদের হাতে আসে আর কাকা যাতে কাছে না থাকেন তার জন্য কী করা যায়? টিকিটগুলো আমাদের যতটা দরকারী ছিল (শত্রুদের উপর যাতে নির্ভর করতে না হয়) ঠিক ততটাই আমাদের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় ছিলেন কাকা — তিনি থাকলে গোটা জিনিসটাই ভণ্ডুল হয়ে যেতে পারে।

আমি অনেকক্ষণ মধুর চারধারে মাছির মতো কাকার চারপাশে ঘুরঘুর করতে লাগলাম। শেষকালে বলেই ফেললাম:

'কাকা, আপনি টিকিটগুলো আমাদের দিন না কেন, আমরা আগে আগে চলে যাব।'

'একসাথে নয় কেন?' কাকা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

'ব্যাপারটা হচ্ছে কি, আমাদের জন্যে কয়েকজন অপেক্ষা করছে,' আমি মেঝের দিকে দৃষ্টি নামিয়ে মিনমিন করে বললাম।

কাকা চালাক-চালাক দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে চোখ টিপলেন।

'বটে... বুঝলাম। এর মধ্যেই জুটিয়ে ফেলেছ... অ্যাঁ?'

আমরা কূটনৈতিক ভঙ্গিতে চুপ করে রইলাম।

'বেশ... ভালো কথা। এই নাও তোমাদের টিকিট... দেখবে কিন্তু ওখানে যা অবস্থা হয়...'

একাদশ পরিচ্ছেদ

কিয়েভ 'ডিনামো' বনাম মস্কো 'টর্পেডো'

ট্রলিবাস ইতিমধ্যে চলতে শুরু করেছে। আমরা লাফিয়ে ভেতরে উঠতেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল, ট্রলিবাসও স্টার্ট দিল। তিল ধারণের জায়গা নেই। একজনের তেরপল-কাপড়ের প্যাণ্টের ভেতরে নাক গুঁজে আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম নীচের পাদানিতে। আমরা আমাদের নাকটা সামান্য ফেরানোর উদ্দেশ্যে পিঠ দিয়ে দরজায় চাপ দিলাম। কিন্তু এই সময় ওপরে কোথায় যেন শোনা গেল মাইক্রোফোনে ড্রাইভারের ঘোষণা: 'ইভান কুদ্রি স্ট্রীট'। ট্রলিবাস থেমে গেল। দরজা খুলে যেতে আমরা ভাবলাম এখুনই বেরিয়ে যাই। কিন্তু না, সে উপায় নেই! বাইরে থেকে এমন চাপ এলো যে তার ঠেলায় আমরা ওপরে উঠে গিয়ে ট্রলিবাসের অনেকখানি ভেতরে চলে গেলাম। লোকের চাপে আমরা মেঝেতে পা না ঠেকিয়ে ঝুলছিলাম। ওঃ-ওঃ-ওঃ!.. আ-আ-আ!.. এ ভাবে যাওয়ার চেয়ে হেঁটে যাওয়া ভালো!

হাসিখুশি মেজাজের মহিলা কণ্ডাক্টরটি ট্রলিবাসের ছাদের দিকে যেন দৃষ্টি রেখে সারাক্ষণ চিৎকার করে বলছিল:

'কে টিকিট কাটতে ভুলে গেছেন? আপনার সেবার জন্যে আমি আছি! এই যে আমি এখানে। অনুগ্রহ করে আমার দিকে নজর দিন। বেরিট টুপি মাথায় ইয়ং ম্যান, মুখ ঘুরিয়ে নেবেন না! আমি রাগ করব কিন্তু! আর এই যে মশাই আপনি,

বুড়ি দিদিমাকে জায়গা ছেড়ে দিতে হয় ত! আর কে টিকিট কাটতে ভুলে গেছেন? অনুগ্রহ করে কাটুন! আজ টিকিটের দাম কী সস্তা, ওঃ কী সস্তা! মাত্র চার কোপেক! অনুগ্রহ করে টিকিট কাটুন, টিকিট কাটুন!..'

আমরা চেষ্টা করছিলাম কণ্ডাক্টর মহিলার দিকে না তাকাতে। বিনা টিকিটে যাবার আদৌ কোন ইচ্ছে আমাদের ছিল না, কিন্তু টিকিট কাটতে হলে দাঁতে চেপে পয়সা নিয়ে তবে ট্রলিবাসে উঠতে হত। আর এখন পয়সার জন্য পকেটে হাত ঢোকানোর চেষ্টার কথা ভাবাই যায় না। পকেটে হাত ঢোকানো ত দূরের কথা! হাত এদিক-ওদিক নড়ানোর উপায় নেই। অতএব ইচ্ছে না হলেও বিনাটিকিটের যাত্রী হয়েই আমাদের যেতে হল।

ঠেলাঠেলি সত্ত্বেও লোকজনের মেজাজ ছিল প্রফুল্ল। তারা সব সময় নিজেদের মধ্যে এবং কণ্ডাক্টরের সঙ্গেও মজা করে কথাবার্তা বলছিল। 'ওঃ, আজ আমরা 'টর্পেডো'কে এক চোট দেখিয়ে দেব!' 'দেখো, আমাদেরই উলটে দেখিয়ে না দেয়!' 'আমি বলে রাখলাম, বরিলেভিচ অন্তত তিনটে গোল করবেই!' এই রকম টুকরো-টুকরো উচ্চকণ্ঠের কথাবার্তায় আমরা বুঝতে পারলাম যে অধিকাংশ যাত্রীই চলেছে ফুটবল খেলা দেখতে।

শেষ স্টপেজের আগের স্টপেজে, অক্টোবর হাসপাতালের কাছে আমরা লোকের ধাক্কায় বাহিত হয়ে ট্রলিবাস থেকে বেরিয়ে এলাম, এসে পড়লাম ক্রীড়াপ্রাসাদের পাশ দিয়ে কেন্দ্রীয় স্টেডিয়ামের অভিমুখী উত্তাল জনস্রোতের মধ্যে।

আমাদের আগে আগে যে লোকটা চলছিল সে হঠাৎ ঝট করে সরে গেল গেটের এক পাশে, যেখানে কিছু লোক ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল। একে ওকে ঠেলাঠেলি করে লোকজন কার ওপর যেন ঝুঁকে পড়ছিল। গোড়ায় মনে হল

তারা বুঝি কাউকে ধরে মারছে। কিন্তু আমরা যখন সেখানে এসে পেঁছলাম তখন দেখতে পেলাম যে মাঝখানে এক বুড়ি দিদিমা দাঁড়িয়ে সূর্যমুখীর বীচি বিক্রি করছে। বুড়ির বড় তাড়া ছিল, সে পুরো গেলাস কখনই খদ্দেরদের ঢালছিল না, আর সব সময় চোরের মতো এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। তারপর হঠাৎ ঝুড়িটা তুলে নিয়ে খুটখুট করে হাঁটা দিল রাস্তা ধরে। তার চারপাশে যারা ছিল তারাও সবাই মৌমাছির ঝাঁকের মতো দঙ্গল বেঁধে তার পেছন পেছন চলল অন্য ফটকের কাছে। আমরা মুখ চাওয়া-চাউয়ি করলাম: এ কি আজব কাণ্ড রে বাবা! (পরে অবশ্য কাকা আমাদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেছিলেন। জানা গেল যে কিয়েভের লোকেরা সূর্যমুখীর বীচি ছাড়া ফুটবল কল্পনাই করতে পারে না, যদিও অন্যান্য সাধারণ দিনগুলিতে সূর্যমুখীর বীচি তারা প্রায় দাঁতেই কাটে না। অথচ ফুটবল খেলার দিনে দুঘণ্টার মধ্যে ক্রীড়ামোদীরা কয়েক ওয়াগনভর্তি সূর্যমুখীর বীচি দাঁতে ছাড়িয়ে খায়। ফলে স্টেডিয়াম যাচ্ছেতাই রকম নোংরা করে ফেলে। এই কারণে স্টেডিয়ামের আশেপাশে সূর্যমুখীর বীচি বিক্রি করার নিষেধ আছে মিলিশিয়া থেকে। কিন্তু কিয়েভের সমস্ত বাজার ঝেঁটিয়ে পসারিণীরা ঐ দিন স্টেডিয়ামের কাছাকাছি এসে জোটে বেআইনীভাবে এবং স্টেডিয়ামে ঢোকার মুখে, ফটকের কাছে বেচে তাদের আপত্তিকর পসরা। খেলার ক্যালেণ্ডার তাদের খুব ভালো জানা আছে, একটা খেলাও তারা বাদ দেয় না। কোন কোন বুড়ি দিদিমা আবার খেলার ভক্তও বনে গেছে। সূর্যমুখীর বীচি বিক্রি করা হয়ে গেলে তারা খালি ঝুড়ি নিয়ে স্টেডিয়ামে ঢোকে আর সেখানে ভাঙা ভাঙা বাজারে গলায় ফুটবল খেলোয়াড়দের উদ্দেশে চিৎকার-চেঁচামেচি করে।)

মিউজিক্যাল কমেডি থিয়েটারের দিকে যেতে যেতে আমরা আরও আশ্চর্য হলাম এই ভেবে যে লোকে এত আগে থাকতে এমন ভিড় জমিয়েছে কী করতে? — খেলা শুরু হতে এখনও পুরো চল্লিশ মিনিট বাকি! অথচ সকলে ছুটছে, ধাক্কাধাক্কি করছে, যেন খেলা শুরু হয়ে গেছে!

আমরা ভেবেছিলাম যে গুমটি ও তার দলবলের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। আমরা একটু এদিক-ওদিক করে এলাম শুরু হওয়ার দশ মিনিট আগে। কিন্তু হঠাৎ আমি ঠিক কানের কাছে শুনতে পেলাম তীক্ষ্ন শিস আর গুমটির গলা:

'এই ত ওরা এসে গেছে!'

মুহূর্তের মধ্যে পরিচিত ছেলেদের দঙ্গল আমাদের ঘিরে ধরল। কিন্তু এবারে ওদের মুখে ভীতিপ্রদর্শনের চিহ্ন ছিল না, ছিল কৌতূহল।

'এই যে,' উদ্বিগ্ন হয়ে পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে বলল গুমটি। 'এই যে তোমাদের টিকিট... না, না, দাম দিতে হবে না, আমরা তোমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।' বলে সে সতর্কতার ভঙ্গিতে একটা হাত সামনে উঁচিয়ে ধরল, যদিও টিকিটের দাম দেওয়ার আদৌ কোন চেষ্টা করছিলাম না আমরা। ওর এই কথাগুলি সম্ভবত উদারতার নিদর্শনস্বরূপ আগে থেকে ভেবেচিন্তে ঠিক করে রাখা।

'ধন্যবাদ,' দস্তুরমতো ভদ্রভাবে বললাম আমি, 'কিন্তু টিকিট আমাদের আছে,' বলেই পকেট থেকে টিকিট বার করলাম।

দলবলের মধ্যে কে যেন হিহি করে হেসে উঠল। গুমটি গুটিসুটি মেরে গেল, কিন্তু দেখা যাচ্ছিল ছাড়ার পাত্র সে নয়।

'দেখা দেখি কেমন! হয়ত কোন পাস-টাস... হুম্... সেক্টর 'এ'! তাহলে ত কোন কথাই নেই... তা আমাদের ভালোই হল, আমরা এখুনই ওগুলোর ব্যবস্থা করে ফেলছি!' সঙ্গে সঙ্গে সে হঠাৎ জোরে হেঁকে উঠল: 'কার টিকিট চাই?'

চক্ষের পলকে গুমটি আমাদের চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল: ডজন কয়েক সতৃষ্ণ টিকিটপ্রার্থী জোরে চেপে ধরল তাকে। স্টেডিয়ামে যাবার পথে প্রতি পদক্ষেপে আমরা দেখেছি এ ধরনের হতভাগ্য লোকজনকে বিরস বদনে দাঁড়িয়ে থাকতে। এরা সকলে ভিখিরির মতো কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞেস করছিল:

'বাড়তি টিকিট আছে?'

'বাড়তি টিকিট হবে কি?'

'কার বাড়তি টিকিট আছে?'

যাদের টিকিট আছে তারা কারও তোয়াক্কা না করে এদের ধাক্কা দিয়ে, পা মাড়িয়ে দিয়ে সগর্বে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল।

...আধ মিনিট বাদে আমরা অবশেষে আবার দেখতে পেলাম গুমটিকে। তার অবস্থা তখন এমন বিপর্যস্ত যে দেখে মনে হচ্ছিল তাকে যেন লোকে ধরে পিটুনি দিয়েছে।

'ফুটবলের টিকিট বিক্রি করতে যাওয়া — ট্রামের নীচে চাপা পড়ারই সামিল,' বাঁকা হেসে একথা বলে সে বিরক্তি প্রকাশ করে হাত নাড়ল। 'চল, স্টেডিয়ামে যাওয়া যাক! নইলে আবার নিজেদের জায়গায় যেতেই পারব না।'

'তাহলে কখন... ঐ ব্যাপার নিয়ে কথা হবে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'পরে, পরে! ম্যাচের পর। এই জায়গাতেই দেখা হবে...'

তর্ক করে লাভ নেই।

বিনা টিকিটে কিয়েভের স্টেডিয়ামে ঢুকতে পারার চেয়ে কোন একটা ছোট দেশের সীমান্ত পার হওয়া বোধ হয় সহজ। সেক্টর 'এ'-তে পৌঁছুতে গিয়ে বার পাঁচেক আমাদের টিকিট চেক হল।

আমরা যখন বসলাম ততক্ষণে ফুটবল খেলোয়াড়রা মাঠে বল্ পেটাপেটি করছে। তবে আমরা জানতাম যে এটা সত্যিকারের খেলা নয়, নিছক হাত-পা খেলানো। বল্ ছিল অনেক, প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের জন্য একটার কম নয়, বেচারি গোলকিপাররা কোনঠাসা ইঁদুরের মতো গোলপোস্টের ভেতরে ছুটোছুটি করছিল, হামেশাই 'ফসকাচ্ছিল'।

কাকা এলেন (ঠেসাঠেসি করে বসতে হল আমাদের), তিনি ধূর্ত দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলেন। আমরা ভদ্রতার খাতিরে চোখ নামালাম — ভাবুন যা খুশি।

হাত-পা খেলানোর পর্ব শেষ হল, মাঠ খালি হয়ে গেল। আরও কয়েক মিনিট বাদে মাঠে এলেন তিনজন: একজন মাঝখানে, বল্ নিয়ে, অন্য দুজন দু'পাশে, ফ্ল্যাগ হাতে নিয়ে — রেফারি আর লাইনসম্যান।

রেফারি মাঠের মাঝখানে বল্ রাখলেন, হুইসল বাজালেন। স্টেডিয়ামের মাঝের অংশের নীচ থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো টীমদুটি। খেলায়াড়রা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পরস্পর শুভেচ্ছা বিনিময় করল। তারপর দর্শকদের মাঝখান থেকে হঠাৎ মাঠে কয়েকজন লোক ছুটে এলো ফুলের স্তবক হাতে নিয়ে — ফুটবল খেলোয়াড়দের উপহার দিতে। আর ফুটবল খেলোয়াড়রা স্তবকগুলি ছুঁড়ে দিল চিত্র-সংবাদদাতাদের দিকে, যারা বসে ছিল বেঞ্চে (তাহলে উপহার দেওয়া কেন বাপু?)। এদিকে রেফারি আরও একবার হুইসল বাজালেন — খেলা শুরু হয়ে গেল।

'এই-এই-এই!'

'আ-আ-আ!'

'কানেভা, এগিয়ে যা, এগিয়ে যা!..'

'আ-আ-আ!'

'সেরেব্রো, এগিয়ে যা! এগিয়ে যা সেরেব্রো!..'

'ও-ও-ও!'

'বাজিলিয়াকে পাস দিয়ে দে! পাস দে বাজিলি-য়া-কে!'

'এই-এই-এই!'

'দে বিবা'কে! বিবা'কে দে!'

'অ্যা-অ্যা-অ্যা-ই!'

স্টেডিয়ামের বিশাল গামলাটা টগবগে ডেকচির মতো ফংসে উঠছে... মনে হচ্ছে যেন ভাপ ওপরে উঠে গিয়ে মেঘের আকার ধারণ করছে।

...আমাদের কাছাকাছি বসে ছিল একজন লোক, যাকে দেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক না সার্কাসের খেলোয়াড় বলা কঠিন। এক দিক থেকে দেখতে গেলে অধ্যাপকের সঙ্গে তার বেশ মিল — চোখেমুখে বুদ্ধিজীবী-বুদ্ধিজীবী ভাব, চশমা, দাড়ি। বগলের নীচে পোর্টফোলিও। কিন্তু অন্য দিক থেকে... বিলকুল সার্কাস খেলোয়াড়! সর্বক্ষণ লম্ফঝম্প করছে, ব্যাব্যা করছে, শিস দিচ্ছে, চিঁহিঁহিঁ করছে ঘোড়ার মতো। আর কিয়েভ 'ডিনামো' যখন গোল দিল, তখন সে তার পোর্টফোলিও প্রায় মেঘের নীচে ছুড়ে দিয়ে পরে লুফে নিল এক হাতে। তাছাড়া যে কোন সার্কাস খেলোয়াড়েরও সাধ্য নয় অমন কাজ করা! এক মুহূর্তের জন্যও মুখে বুলির কামাই নেই অধ্যাপক-সার্কাস খেলোয়াড়টির। কোন ফুটবল খেলোয়াড় যখন বল্ নিয়ে সামনে ছুটে যায় তখন সে তাকে তাড়া দিয়ে কর্ণভেদী স্বরে বলতে থাকে:

'চলেছে-চলেছে-চলেছে!' তার গলার আওয়াজ তখন এমনই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে যে ঐ ভাবে কারও পক্ষে 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে চিৎকার করাও লজ্জাজনক।

যতক্ষণ না সেই খেলোয়াড়ের কাছ থেকে বিপক্ষদলের কোন খেলোয়াড় বল্ কেড়ে নিচ্ছে ততক্ষণ সে চেঁচিয়েই চলে। শেষকালে বিরক্তির সঙ্গে হাত নেড়ে চেঁচিয়ে বলে:

'যা ভেবেছিলাম! পাস দেওয়া দরকার! বাজিলেভিচকে পাস দেওয়া উচিত ছিল!..' সঙ্গে সঙ্গে অন্য এক ফুটবল খেলোয়াড়ের দিকে তার মনোযোগ আকৃষ্ট হতে বলে: 'দেখ কাণ্ড! স্রেফ চরে বেড়াচ্ছে!.. দৌড়ানো দরকার, দৌড়ানো দরকার! আরে বাপু, তুই যে ফুটবল খেলোয়াড়, গোরু নোস ত!'

বেচারি ফুটবল খেলোয়াড়টির হাঁপ ধরে গেছে, সে হাঁসফাঁস করছে — এক দণ্ড নিশ্বাস ফেলারও অধিকার কি তার নেই! কী নিষ্ঠুর ক্রীড়ামোদী!

তার পাশে বসে ছিল এক মহিলা — সম্ভবত তার স্ত্রী — মোটাসোটা চেহারা, মাথায় খবরের কাগজের টুপি — নিজের হাতে তৈরি। মহিলা মুখ বুজে কষ্ট ভোগ করে যাচ্ছিল, কিন্তু এমন ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছিল যে মনে হচ্ছিল স্টেডিয়ামের মাথার ওপরকার তাজা বাতাস যেন একটু একটু করে কমে আসছে। অধ্যাপক-সার্কাস খেলোয়াড়টি থেকে থেকে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছিল:

'ভাবনার কিছু নেই! ভাবনার কিছু নেই! সব ভালোয় ভালোয় শেষ হবে। আমাদের দল জিতবে...'

কিন্তু অধ্যাপক-সার্কাস খেলোয়াড় আর তার স্ত্রী বেশিক্ষণ আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারল না। মাঠে যা ঘটছিল তা এতই আকর্ষণীয় যে আমরা বিশ্বসংসারের তাবৎ কথা ভুলে গেলাম। আমরা তখন আর সেই পাভেল নই, জাভা নই, যাদের আছে নিজস্ব চরিত্র, রুচি ও আকর্ষণ। যাকে বলে 'স্টেডিয়াম', প্রবল উত্তেজনার বিকারে কম্পমান সেই বিশাল সত্তার আমরা যেন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশমাত্র।

স্টেডিয়ামের দর্শকরা যখন মনে করল যে 'টর্পেডো'র গোলপোস্টে এগারো মিটারের পেনাল্টি শটের নির্দেশ না দিয়ে রেফারি ভুল করেছেন (হ্যাণ্ডবল্ কিন্তু ঠিকই হয়েছিল!) তখন আমরাও সকলের সঙ্গে গলা ফাটিয়ে, পেটে খিল ধরিয়ে চিৎকার করে বললাম:

'রেফারিকে সরাও! রেফারিকে সরাও!'

লোকে যেন ছালচামড়া ছাড়িয়ে নেবার জন্য ক্ষেপে উঠেছে। সেই মুহূর্তে এগারো মিটারের পেনাল্টি শট ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না জগতে।

দারুণ জিনিস এই ফুটবল! আমার মনে হয় চিকিৎসার উপায় হিশেবেও এর ব্যবহার চলতে পারে। যেমন ধর, নার্ভের রোগ যাদের আছে তাদের চিকিৎসার জন্য। তাছাড়া যে কোন অপ্রীতিকর অবস্থা ও খারাপ মেজাজ কাটিয়ে উঠতে ফুটবল খুবই সাহায্য করে। অন্ততপক্ষে আমি ত খেলা চলার সময় আমার নিজের সমস্ত অপ্রীতিকর অবস্থার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। মনে পড়ে গেল কেবল ম্যাচ শেষ হতে। আবার কাকার কাছ থেকে সটকাতে হয়।

'আচ্ছা কাকা, আপনি বাড়ি যান, আমাদের এখন একটা কাজ আছে...' কথাগুলি আমি এমন ভাবে বললাম যেন আমরা বয়স্ক আর উনি শিশু।

কিন্তু সে যাই হোক 'টর্পেডো'র বিরুদ্ধে 'ডিনামো' ৩:২ গোলে জিতে যাওয়ায় কাকার মেজাজ চমৎকার ছিল, তাই তিনি আমাদের ছেড়ে দিলেন।

এবারে আমাদের অপেক্ষা করতে হল। মিনিট দশেক, কিংবা তার বেশিও হতে পারে। পরন্তু তোমরা যেমন ভাবছ তেমন সহজ ছিল না এই অপেক্ষা করাটা, কেননা অপেক্ষা করা নয় ত, যেন রীতিমতো লড়াই করা। সারাক্ষণ লড়াই করে যেতে হয় অসংযত জনস্রোতের বিরুদ্ধে — জনস্রোত যেন আমাদের ধুয়ে কিংবা ছিটকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছিল কালিনিন স্কোয়ারের ওপরে। এর বিরুদ্ধে আমাদের প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করতে হচ্ছিল। অবশেষে ছেলেদের আবির্ভাব ঘটল।

'চল!' গুমটি নির্দেশ দিল।

আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে স্রোতের টানে ভেসে চললাম।

স্রোতের গায়ে দিক ঠিক করে নিয়ে গুমটির কাছে ভেসে এসে অধৈর্যের সঙ্গে আমি জিজ্ঞেস করলাম:

'কী হল?'

'পরে! এটা ঠিক জায়গা নয়...'

বোঝ কাণ্ড, এই শুরু হল গড়িমসি।

আমরা ভেসে উঠলাম গিয়ে বেস্‌সারাব্‌কায়, তারপর আবার গিয়ে ডুব দিলাম পেচিওর্‌স্কের অভিমুখী পথের মাঝখানের এক চত্বরে। এখানে একটা অন্ধকার ফটকের নীচে এসে গুমটি দাঁড়িয়ে পড়ল।

'মানে, কথাটা হল এই,' ষড়যন্ত্রীর মতো মৃদুগলায় সে বলল এদিক-ওদিক

তাকাতে তাকাতে। 'ঐ দাগীটার সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা হয়। কোন রকমে বলে কয়ে আমরা ওকে রাজী করিয়েছি। এই যে ওরাই বলুক না...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা বটে!' সমস্বরে জোর দিয়ে বলল ছেলের দল।

'ও ঘড়ি দিতে রাজী হয়েছে,' গুম্‌টি বলে চলল। 'তবে রাতের বেলায়, অন্য সময় নয়। অবশ্য আজই দেবে। আগামীকাল অবধি অপেক্ষা করা যাবে না; কেননা আগামীকাল ওকে কিয়েভ থেকে সরে পড়তে হবে — মিলিশিয়া ওর খোঁজ করছে...'

'তারপর?' আমার বুকটা দমে গেল।

'পাকা কথা! ঘড়ি আছে ওর গোপন কুঠরীতে... বড় মঠের কাছে গুহার ভেতরে। দিনের বেলায় সেখানে যাওয়া চলবে না — তাড়া খাওয়ায় ভয় আছে... তাই কথা বলে ঠিক করা হয়েছে যে মাঝরাতে মেরীমাতার গির্জার সামনে দেখা করব — আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, কাইসারভের সমাধির কাছে। জান ত জায়গাটা?'

আমি আর জাভা মুখ চাওয়া-চাউয়ি করলাম। বোকা বানানোর তাল নাকি? সত্যিই কি বোকা বানাতে চায়? কিন্তু কেন? আর নেহাৎই যদি তাই হয়... কী করা যায়? এখানে আর কী করারই বা আছে?

'ভয় পাচ্ছ নাকি?' অবজ্ঞাভরে চোখ কুঁচকে বলল গুম্‌টি। 'আর যদি ভয়ই পাও, তাহলে তোমাদের যেমন খুশি। ঘড়ি তোমাদের, আমাদের নয়... আমরা একা অবশ্যই যাব না, আমাদের কোন্ ঠেকা পড়েছে?..'

'ঠিক আছে,' আমি বললাম। 'আমরা আসব।'

ঘড়িটা আমার নিজের হলে যাব কি যাব না এই নিয়ে আমি হয়ত আরও খানিকটা ভাবতাম। কিন্তু তোমরা নিজেরাই জান ত এটা কী ঘড়ি!

'ফের দেখা হবে,' সোল্লাসে বলল গুম্‌টি। 'তবে দেখো, ঘুমিয়ে সময় কাবার করে দিও না!'

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কসাকের বংশ — নেই তার ধ্বংস।
কসাক-নেতা কারাফোলকা।
নীপার-কসাকদের পত্র। কবরখানায় রাত
(স্মৃতিচারণ)

সন্ধ্যা। এগারোটা। আমরা ব্যালকনির খোলা দরজার কাছে কিয়েভের বিখ্যাত চৌরাস্তার মতো চওড়া গদির ওপর শুয়ে আছি।

চুপচাপ শুয়ে থাকি, নড়াচড়া করি না — ভান করি, যেন ঘুমোচ্ছি। অপেক্ষা করতে থাকি কখন কাকা-কাকীমা ঘুমিয়ে পড়বেন, আর সেই সুযোগে চুপিচুপি সটকান দেব।

না, এই ভাবে না ঘুমিয়ে মটকা মেরে শুয়ে শুয়ে অপেক্ষা করার চেয়ে অসহ্য প্রতীক্ষা বোধ হয় আর কিছু হতে পারে না। শুধু অপেক্ষাই নয়, জানাও নেই কী অপেক্ষা করছে তোমার জন্য। যখন তোমাকে মাঝরাতে যেতে হচ্ছে ছমছমে অন্ধকারের মধ্যে কোথায় কোন্ কবরখানায়।

নানা রকম ভয়ের অনুভূতি আর অতীতের স্মৃতি মাথার মধ্যে ভিড় করে এসে ক্লান্ত করে দিচ্ছে।

স্মৃতি! আমি অবশ্য ভোল্ফ মেস্সিং নই, দূর থেকে অন্যের চিন্তা-ভাবনা পড়তে পারি না, কিন্তু এই যে জাভা আমার পাশে শুয়ে আছে তার দিকে না তাকিয়েও আমি হলফ করে বলতে পারি যে আমি যে স্মৃতিচারণ করছি সেই একই স্মৃতিচারণ এখন সেও করছে। এতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই! অন্য কোন স্মৃতিচারণ এখন তার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়... সে ঘটনাও ঘটেছিল রাতে, ঘটেছিল কবরখানায়ই... তখনও এমনি ভাবেই গলা শুকিয়ে আসছিল, দম আটকে আসছিল, অসাড় হয়ে যাচ্ছিল পাদুটো।

...ঘটনাটা ঘটেছিল গত বছর সেপ্টেম্বরে, 'রবিন্‌সন' সংক্রান্ত ঘটনার ঠিক পরেই। অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের গ্রামে এলো একদল প্রত্নতত্ত্ববিদ। কয়েকজন লোকের এক অভিযাত্রীদল। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, একেবারে অপ্রত্যাশিত অবশ্য নয়। অভিযাত্রীদের দুজনকে আমরা ভালোমতোই জানতাম। ওরা ছিল কিয়েভের শিকারী, যারা প্রতি বছর শিকার করতে আর মাছ ধরতে আমাদের এখানে আসত, ওদের জন্যই ত আমরা ফড়িং ধরতাম। আমরা সব সময় ওদের নিয়ে খানিকটা তাচ্ছিল্য ও উপহাস করতাম, যেমন করতাম অন্যান্য শহুরে লোকদের নিয়ে, গ্রামে ঠিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারে না বলে। ওরা যখন ভোরবেলায় অতিকষ্টে শিকারের জন্য বিছানা ছেড়ে উঠত, যখন আমাদের নৌকোয় চড়ে যেতে গিয়ে জলার জঙ্গলে নৌকো উলটিয়ে হাবুডুবু খেত, যখন আনাড়ী হাতে মাছ কুটতে গিয়ে তারা হাত কেটে রক্তারক্তি করে ফেলত, তখন আমরা হাসতাম। আমরা তাই ধারণাই করতে পারতাম না যে এত দারুণ দারুণ জিনিস তাদের জানা আছে।

অথচ দেখ কী ভাবে কী ঘটে যায়... ওরা আমাদের এখানে এসেছিল শিকার করতে, কোন খোঁড়াখুঁড়ির কথা, প্রত্নতত্ত্বের কোন ব্যাপার তাদের ভাবনায়ই ছিল না, স্রেফ বিশ্রাম করছিল, এর বেশি কিছু নয়। কিন্তু একদিন সন্ধ্যাবেলায় ধুনির সামনে জাউ খেতে খেতে আমাদের দুই শিকারী — ভারাভা দাদু আর সালিভোন দাদুর সঙ্গে তাদের গল্পগুজব চলে — প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুচে গেল ওদের জাউ খাওয়া, ওদের শিকার, ওরা ভুলে গেল জগৎসংসারের সমস্ত কিছু... পর দিনই চলে গেল কিয়েভে (যদিও দুজনেই ছিল ছুটিতে, ওদের ইচ্ছে ছিল পুরো একমাস শিকার করে কাটানো)। শেষে আমাদের এখানে এসে হানা দিল প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানকারী দল নিয়ে।

আমাদের এই অঞ্চলটা নাকি ঐতিহাসিক, আর আমাদের গ্রামটাও যতদূর হতে পারে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই প্রাচীন। প্রাচীন যে তা আমরা অমনিতেই জানতাম, কিন্তু এটা যে ঐতিহাসিক সে নিয়ে আমরা তেমন করে ভাবি নি। অথচ আমাদের ভাসিউকোভ্‌কা নাকি বিখ্যাত নীপার-কসাকদের অভিযানের পথে, ঠিক চৌমাথায় অবস্থান করছিল।

আর ভাসিউকোভ্‌কার সীমানার ওপারে যে বুড়ো ওক গাছ আছে ঠিক তারই

নীচে, শীতল ছায়ায় অভিযানের মাঝখানে জিরানোর জন্য থেমেছিলেন ভ্লাদিমির মনোমাখ, সম্রাজ্ঞী ওল্‌গা, বগদান খ্‌মেলনিৎস্কি...

আমরা হাঁ করে শুনতে লাগলাম প্রত্নতত্ত্ববিদদের বিবরণ: নীপার-কসাক গোষ্ঠীর কথা, প্রবাদ-পুরুষ কসাক নেতা সেই ইভান সির্কোর কাহিনী, যিনি পনেরো বার নির্বাচিত হয়েছিলেন কসাকদের প্রধান নেতা, যাঁর নজির নীপার-কসাকদের ইতিহাসে আর নেই, যাঁকে শত্রুরা ভয় পেত 'আগুনের চেয়ে বেশি, ঝড়ঝঞ্ঝা, এমন কি মহাপ্রলয়ের চেয়েও বেশি'; আমরা শুনলাম নীপার-কসাক গোষ্ঠীর শেষ নেতা পিওতর কালিশেভ্‌স্কির কথা — এই কালিশেভ্‌স্কিকেই সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় একাতেরিনা সলোভেৎস্ক মঠে নির্বাসনদণ্ড ভোগের জন্য পাঠান, আর সেখানে স্যাঁতসেঁতে ঠান্ডা খোড়লের মধ্যে তিনি পুরো পঁচিশ বছর কাটান, কিন্তু বশ্যতা স্বীকার করেন না, পরিত্যাগ করেন না কসাকধর্ম, অমানুষিক যন্ত্রণা সহ্য করেও একশ বারো বছর পরমায়ু ভোগ করেন — এমনই মহাশক্তিধর ছিলেন তিনি!

আমরা প্রতিটি কথা গিলতে লাগলাম। বোঝ কাণ্ড! দেখ দেখি কেমন ছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষরা!

ঐ দিনই অভিযানকারীরা গ্রাম থেকে দুই কিলোমিটার খানেক দূরে স্তেপে কসাক টিলা খুঁড়তে শুরু করল। আর বলাই বাহুল্য, আমরা, ছেলেরা অন্ধকার হয়ে আসা পর্যন্ত যেখানে খোঁড়াখুঁড়ি চলছে সেই জায়গায় পড়ে থাকতাম। প্রত্নতত্ত্ববিদরা যখন খুঁড়ে বার করল কসাকদের অস্ত্রশস্ত্র (তলোয়ার, পিস্তল), আর পলতোলা কাচের তৈরি ভোদ্‌কার বোতল (যদিও খালি), আর কাঠের পাইপ, যার ওপর লেখা ছিল মুক্তাখচিত এই বচনটি: 'কসাকের পাইপ খাসা, সৎচিন্তার বাসা...' — তখন ত উত্তেজনায় আমরা গর্তের মধ্যে গিয়ে পড়ি আর কি! এটা ছিল এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য! প্রত্নতত্ত্ববিদরা প্রথমে কোদাল দিয়ে সন্তর্পণে খুঁড়ল, তারপর দুই হাতে আঁচড়ে আঁচড়ে মাটি তুলল, অবশেষে কোন জিনিসের অস্তিত্ব টের পাবার পর বিশেষ ধরনের বুরুশ দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে ঘষে ঘষে মাটি সাফ করতে লাগল... আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখতে লাগলাম। মাটির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো এমন সমস্ত জিনিস যেগুলি তিনশ বছরেরও বেশি সময় ওখানে পড়ে ছিল।

প্রত্নতত্ত্ববিদরা বলল যে টিলাটায় ইভান সির্কোর সেনাবাহিনীর কোন এক বিখ্যাত নীপার-কসাকের সমাধি আছে, সিভাশের কাছে ক্রিমিয়ার খানকে বিধ্বস্ত করার পর ক্রিমিয়ায় ফেরার পথে ঠিক এই জায়গায়ই সির্কো তাঁর শিবির স্থাপন করেন। বোঝা যাচ্ছে এখানেই তাঁর এক আহত সঙ্গীর মৃত্যু হয়। তাকে সমাধিস্থ করা হয় এখানে। আর নীপার-কসাকদের প্রথা অনুযায়ী কবরে রাখা হয় তার কসাক অস্ত্র, পাইপ এবং অবশ্যই এক বোতল ইউক্রেনীয় ভোদ্‌কা, যাতে পরকালে সে ফুর্তিতে কাটাতে পারে।

আমরা অনেকক্ষণ ধরে নিরীক্ষণ করে দেখতে লাগলাম এই জিনিসগুলি, বিশেষত পিস্তল আর তলোয়ার। তলোয়ারের খাপটা আবার রুপোর কারুকাজ করা আর তার হাতলটা হাতির দাঁতের।

জাভা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিসফিস করে আমার কানে কানে বলল:

'ওঃ, যদি জানতাম, তাহলে আমরা নিজেরাই খুঁজে বার করতে পারতাম!'

টিলা ছাড়া অভিযানকারী দলবল ওক গাছের সামনেও খোঁড়াখুঁড়ি চালায়। সেখান থেকে অবশ্য ঢাকনা দেওয়া মরচে ধরা একটা মগ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না, কিন্তু সকলে বলল যে মগটা খোদ ইভান সির্কোরই বলা যেতে পারে।

তারপর দলের লোকজন গ্রামে ঘুরে ঘুরে অনেকক্ষণ ধরে আমাদের সবচেয়ে বুড়ো দাদু আর ঠাকুমা-দিদিমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে — কিংবদন্তী ও উপকথা সম্পর্কে এবং নীপার-কসাকদের বংশধরদের সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করে। বিশেষ করে দীর্ঘ সময় ধরে কথাবার্তা চলে একশ সাত বছর বয়স্কা ত্রিন্‌দিচ্‌কা দিদিমার সঙ্গে।

'আচ্ছা দিদিমা, দয়া করে বলুন দেখি আপনার বাপ-ঠাকুর্দা কী কাজ করতেন?' মধুর স্বরে তাঁকে জিজ্ঞেস করল বেঁটেখাটো, মোটাসোটা প্রত্নতত্ত্ববিদ সিদরেঙ্কো (সেই সিদরেঙ্কো, যার বন্দুক এক সময় জলায় পড়ে গিয়ে খোয়া যায়)।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ বাছা... ছিল...' খুশিতে মাথা নাড়লেন ত্রিন্‌দিচ্‌কা দিদিমা।

'কী কাজ করতেন ওঁরা দিদিমা?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ,' দিদিমা মাথা নাড়লেন।

'নাকি স্রেফ চাষী ছিলেন, গম-জই বুনতেন?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ,' মাথা নাড়লেন ত্রিন্‌দিচ্‌কা দিদিমা।

'গম-জই বুনতেন?' হতাশ হয়ে ফের প্রশ্ন করল সিদরেঙ্কো।

'বুনত, গম-জই বুনত বৈকি...' খুশিতে মাথা নাড়লেন ত্রিন্‌দিচ্‌কা। 'তাছাড়া যব, জনার... আর বাড়ির জানলার নীচে পোস্ত...'

মোট কথা, বুড়ির কাছ থেকে কিছুই জানা গেল না।

আরও যে জিনিসটি অভিযানকারীদের আগ্রহ সৃষ্টি করল তা হল গ্রামের সবচেয়ে পুরনো কুটিরগুলি — যেগুলির মাথায় খড়ের চাল, যেগুলি প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, শেওলায় ছেয়ে আছে। এ ধরনের কুটির এখন আর সংখ্যায় খুব একটা বেশি নেই। প্রত্নতত্ত্ববিদরা সেগুলির প্রত্যেকটির আগাপাশতলা ঘুরে ঘুরে তন্ন তন্ন করে দেখে, আনাচে-কানাচে কোথাও উঁকিঝুঁকি মারতে বাদ রাখে না। এখানেই ঘটে গেল আমাদের কাছে একটা অপ্রত্যাশিত, অপ্রীতিকর ঘটনা। কারাফোলকারা যেখানে বাস করে সেই কুটিরটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে সিদরেঙ্কো হঠাৎ আনন্দে এমন সোরগোল তুলল যে মনে হল বুঝি সোনার সন্ধান পেয়েছে। ছাদের কড়িকাঠের গায়ে চুনকাম করা স্তরের নীচে সে আবিষ্কার করেছে এই লেখাটি: 'অত্র কুটির ১৭৪৯ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে তিতারোভ শিবিরের কসাক গাভ্রিলা কারাফোলকা কর্তৃক স্থাপিত হইল।'

'দেখুন, দেখুন!' সোল্লাসে চিৎকার করে বলল সিদরেঙ্কো। 'এটা যে ইতিহাস! এ যে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন... শুনছেন, শুনছেন আপনারা সবাই, এই কুটিরটাকে রক্ষা করুন... আজ থেকে আমরা এটাকে রেজিস্টারী করে রাখছি... এ যে দুর্লভ বস্তু!'

কারাফোলকাদের বাড়ির সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল, আবিষ্কারটা তাদের কাছে আনন্দেরও বটে — তারা নিজেরাই জানত না যে তাদের কুটিরটা এত বিখ্যাত। ঐ দিনই জানা গেল যে সালিভোন দাদু নীপার-কসাকদলের কোন এক কসাক-লেফটেনান্টের প্র-প্রপৌত্র, যৌথখামারের সভাপতি ইভান ইভানভিচ — নীপার-কসাকদের বংশধর, আর স্কুলের দিদিমণি গালিনা সিদরভ্‌না কসাক বংশের মেয়ে।

আমাদের গাঁয়ে লোকে চিরকালই বুড়োবুড়িদের সম্মান করে আসছে, কিন্তু এমন সাফল্য এর আগে আর কখনও তাঁদের আসে নি। সারা দিন ধরে বুড়োবুড়িদের মুখ আর বন্ধ হয় না — স্মৃতিচারণ চলতে থাকে। দাদু, দাদুর দাদু, তস্য দাদু, ঠাকুমা-দিদিমা আর তাঁদের মা-বাবাদের স্মৃতিকথা তাঁদের মুখে শোনা যায়। আর সে সব কথা শুনলে মনে হয় ঐ ঠাকুমা-দিদিমারা সবাই যথারীতি ছিলেন পরমা সুন্দরী, আর দাদুরা ছিলেন এমনই পালোয়ান যে কী আর বলব (একজন কোন এক কালে একটা ষাঁড়কে কাবু করেছিলেন, আরেকজন আলুভর্তি গাড়ি তুলেছিলেন, কেউ বা মাটি থেকে একটা ওক গাছই উপড়ে ফেলেছিলেন)! কুৎসিত, দুর্বল, বাঁকা, কুঁজো — এ ধরনের কেউই কারও তিনকুলে ছিল না। কেবল তফাতটা এই যে একদল সুন্দরী আর পালোয়ান ছিলেন কসাক গোত্রের, অন্য দল — চাষী গোত্রের। এখানে কিছু করার নেই। পূর্বপুরুষদের বেছে নেওয়া যায় না, ফরমাস দিয়ে বানানোও যায় না। কুজমা বারিলো — কসাক বংশের, ভাসিয়া দেরকাচ — কসাক বংশের, গ্রেবনিউচকা — সেও। এদিকে আমরা... বিশেষত আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না যে আমাদের ক্লাসের মনিটর স্তেপা কারাফোলকা, কৃতী ছাত্র আর মোটের ওপর আদর্শ ছেলে, যাকে রোজই আমাদের সামনে দৃষ্টান্ত হিশেবে খাড়া করা হত আর সেই হেতু যাকে আমরা দুচক্ষে দেখতে পারতাম না — সেই স্তেপা কারাফোলকা, যার মধ্যে কসাকদের ছিটেফোঁটা কোন লক্ষণ ছিল না, সে কিনা খ্যাতনামা নীপার-কসাকদের সরাসরি, প্রত্যক্ষ বংশধর! আর আমরা... আমার অন্তত মাতৃকুলে কোন এক ভবঘুরে কসাক ছিল, কিন্তু জাভার — ওর তিনকুলে তেমন কেউ নেই, কেবলই যব-গমের চাষী!

'দাদু, আমাদের বংশে কি তাহলে সত্যি সত্যিই একজনও নীপার-কসাক ছিল না?' জাভা বড় আশা নিয়ে জিজ্ঞেস করল তার ভারাভা দাদুকে।

'না... সে রকম ত মনে করতে পারছি না।'

'বোঝ কাণ্ড!' রাগ করে মুখ ঘুরিয়ে নিল জাভা (যেন দোষটা দাদুর)।

'তুই একটা আকাট মুখ্যু,' শান্তস্বরে বললেন দাদু। 'আচ্ছা বল্ দেখি যব-গম চাষী না থাকলে তোর ঐ কসাকদের কোন দাম থাকত?.. কে ওদের খাওয়াত শুনি? না খেতে পেয়ে মারা যেত... আর আমাদের দেশ যখন বিপদে

পড়ে তখন তাকে রক্ষা করতে কেবল কস্যাকরাই এগিয়ে যায় না, যব-গম চাষীরাও এগিয়ে যায়। কাস্তে আর বিদা হাতে নিয়ে তারা কসাকদের চেয়ে কোন অংশে খারাপ লড়াই করে নি।'

কিন্তু দাদুর এই প্রচার জাভার ওপর কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল না। 'হুঁঃ. কস্যাক বংশের দিদিমাকে বিয়েও করতে পারলেন না...' বিড়বিড় করে এই বলে জাভা ভুরু কুঁচকে সেখান থেকে চলে গেল।

'ওনাদের সবই চাই নতুন, কেবল নতুন আর নতুন! আর কিছুটা কাল কাটানো যেত না বুঝি পুরনো বাড়িতে,' জাভা তাদের নতুন বাড়ির লোহার ছাদের দিকে ঘৃণাভরে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলল। 'হয়ত আমাদের ছাদেরও কড়িকাঠের গায়ে কিছু লেখা ছিল... দাদু যে বুড়ো: জানেন অনেক, কিন্তু তার চেয়েও বেশি গেছেন ভুলে।'

জাভা মেনে নিতে পারে না। জাভা মনে মনে কষ্ট পায়। তায় আবার কারাফোলকা নাক উঁচু করে চলতে লাগল, আর কেবল দাঁতের ফাঁক দিয়ে পিচ কেটে আমাদের দিকেই থুতু ফেলতে থাকে (মুখে কিছু বলার সাহস নেই, কেননা ও জানত যে আমরা ওর পূর্বপুরুষের ধার ধারতাম না, হাড়ে হাড়ে মজাটা টের পাইয়ে দিতাম)।

ওর এই নাক উঁচু ভাব, দাঁতের ফাঁক দিয়ে পিচ কেটে থুতু ফেলা — এসবই সহ্য করা গেলেও যেত। কিন্তু ও আমাদের গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয় অন্য একটি ব্যাপারে। পশুচরানোর মাঠে ও গড়ে তুলল 'নীপার-কসাক দল'। সেনাবাহিনী তৈরি করা হল কেবল 'বংশধরদের' নিয়ে। সর্বসম্মতিক্রমে নেতা নির্বাচিত হল কারাফোলকা।

যে নকসা তোলা কামিজ আর লালরঙের ঢোলা সালোয়ার পরে কারাফোলকার ভাই এককালে শখের দলে নাচত, সেগুলি পরে, আর দাদুর যে পাপাখা টুপিটা এ যাবৎ মুরগীর ঘরে গড়াগড়ি যাচ্ছিল এবং যেটা ছিল এতই পুরনো যে মুরগীরাও ওর মধ্যে ডিম পাড়তে বিশেষ কোন তৃপ্তি পেত না, সেটি কপালের ওপর টেনে মাথায় দিয়ে কারাফোলকা তার সেনাদলের সামনে জাঁক করে বেড়াত। সে তার বাহিনীকে নিয়ে অভিযান পরিচালনা করত, কস্যাক রীতিতে দুর্ধর্ষ আমোদপ্রমোদে মেতে উঠত।

আমরা ঝোপের মধ্যে বসে থেকে শুনতাম, পশুচরানোর মাঠের ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে নীপার-কসাকদের বেপরোয়া গানের সুর:

ওরে, হয় লাট-বেলাট, নয়ত লোপাট —
দুবার মরণ নাই,
ওরে তোরা ছোটা ঘোড়া!
টগবগে কাজ চাই, যশ চাই ভাই!

আমরা দাঁত কড়মড় করি। আর কখনও এত নিঃসঙ্গ, অপমানিত ও হতভাগ্য বলে নিজেদের আমরা অনুভব করি নি। কসাক-সর্দার যদি কাউকে হতে হয়, আমাদের দুঃসাহসিকতার জোরে সে ত হওয়া উচিত আমাদেরই! আমাদেরই হওয়া উচিত, আদর্শ বালক কারাফোলকার নয়। ইস্, ওর ঐ উঁচানো নাকটার ওপর এখন একটা ঝাড়তে পারলে হত!..

কিছু একটা কারসাজি করা দরকার, এমন একটা কিছু করা চাই যাতে ও জব্দ হয়।

'শোন্ জাভা,' হঠাৎ আমার মাথায় একটা চিন্তা খেলে যেতে আমি বললাম। ''তুরস্ক সুলতান সমীপে নীপার-কসাকবৃন্দের পত্র' — তোর মনে আছে কি?'

'অ্যাঁ? কিন্তু তাতে কী?'

'ওদের কাছেও ওরকম একটা চিঠি লিখব আমরা।'

'তা কী করে হয়? ওরা নিজেরাই ত নীপার-কসাক।'

'কোথাকার কোন্ নীপার-কসাক ওরা? ওরা কি আর সত্যিকারের? আর যাই হোক, সত্যিকারের নয়! জালিয়াত! হুঃ, ওদের পূর্বপুরুষরা ছিল — তাতে কী হয়েছে শুনি?.. ঐ রকমই লিখব: তোদের পূর্বপুরুষদের বাহবা দিতে হয়, কিন্তু তোরা হলি গিয়ে... ইয়ে... খোদ নীপার-কসাকদের লেখা ঐ চিঠিটা আমার বাড়িতে আছে, 'প্রফুল্ল ইউক্রেন' বইতে। অদলবদল করে নেব, যা দাঁড়াবে না — আর দেখতে হবে না!'

'চল্ তাহলে!'

আমার বাড়ি থেকে বই নিয়ে আমরা চললাম জাভার বাড়িতে। ওর ওখানে টেবিলের ওপরে রেপিনের আঁকা 'নীপার-কসাকদল' ছবিটাই ঝুলছিল। নীপার-কসাকরা কেমন মজাসে সুলতানকে চিঠি লিখছে ছবিটার নীচে বসে তা দেখতে দেখতে আমরা নিজেদের চিঠি শুরু করে দিলাম। রীতিমতো হাড়ভাঙ্গা কাজ ছিল এটা।

দীর্ঘকাল যন্ত্রণাভোগের পর অবশেষে যে বস্তুটির উদ্ভব ঘটল তা হল: 'কদর্য কৃতী ছাত্র, জাল কসাক-নেতা, জালিয়াত কারাফোলকা এবং তাহার আলুথালু সেনাদলের প্রতি খাঁটি নীপার-কসাকদের পত্র'। পত্রটা এই রকম:

'ওরে পাজী হতভাগা, শয়তানের দোসর আর সোদর! কোথাকার কোন্ বীরপুরুষ তুই? কোথাকার নীপার-কসাক তুই, তাও আবার কিনা কসাক-নেতা বলে নিজেকে জাহির করছিস? তোর মুখ দিয়ে ত লালা ঝরে, আর গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় চিঁচিঁ! তুই হলি একটা ফুটো কলসী! জংলা কাঁটা গাছ! তালিমারা ছেঁড়া প্যাণ্ট, তুই হলি ভালো ছাত্রের আধা চিবুনো ডেলা! তোর ঐ খোস পাঁচড়া ওঠা ফৌজকে আমরা ডরাই না, জলে স্থলে তোর সঙ্গে লড়তে প্রস্তুত আছি আমরা! তোকে কসাক নাম পেতে হচ্ছে না, ন্যাংটো পুতুল নিয়ে খেলা কর গে যা! তুই ভালো কথার যুগ্যি নোস, কটা রঙের গোরুতে তোকে চিবোক! তোর মাথায় ঘিলুটিলু কিসসু নেই, আছে তরকারীর খোসা, তুই হলি গিয়ে সবজি বাগানের কাকতাড়ুয়া! কেমন লাগছে এখন ওরে হতভাগা! আর এর জন্যে তোকে চুমো খেতে হবে আমাদের ফাটা পায়ের গোড়ালি, কেননা তোর সঙ্গীসাথীরা সব হল গিয়ে একেকটি শুয়োরছানা! ওঃ-হো-হো-হো!'

আমাদের নতুন বাড়ি তৈরি হওয়ার পর যে আধ মিটার পরিমাণ ওয়াল-পেপারের টুকরোটা বেঁচে গিয়েছিল তারই ওপর বড় বড় অক্ষরে আমরা কথাগুলি লিখলাম। ওয়াল-পেপারের গায়ে মোটা দড়ির সঙ্গে সীলমোহরের বদলে এঁটে দিলাম ঘুঁটে। আমাদের দৃষ্টিতে দাঁড়াল অতি খাসা।

মুখ দিয়ে 'গুড়ুম-গুম্-গু-ড়্-ড়ুম্-গুম্-গুম্-গুম্' আওয়াজ তুলে আমরা পশুচরানোর মাঠের দিকে রওনা দিলাম, আনুষ্ঠানিকভাবে 'লিপিটা' কারাফোলকার হাতে অর্পণ করলাম।

20–1068

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আমাদের চিঠির পর কারাফোলকার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে, ঢন্‌ঢন্‌ করবে শূন্য বালতির মতো।

ঐদিনই আমরা পেয়ে গেলাম জবাবী পত্র — লেখাটা বেশ সংযত ও ভদ্র:

'প্রিয় বন্ধুরা, তোমরা রীতিমতো মনের ঝাল মিটিয়ে গালাগাল করেছ, কিন্তু তার একমাত্র কারণ এই যে তোমরা কসাক বংশের নও, তাই তোমাদের মনে দুঃখ। এটা আমরা বেশ ভালো বুঝি। আমরা পরম তৃপ্তিসহকারে তোমাদের চিঠি পাঠ করেছি, আমাদের নীপার-কসাক বাহিনীতে কলমচীরূপে তোমাদের গ্রহণ করতেও আমরা রাজী আছি, যদিও তোমরা ব্যাকরণে ফেল-করা ছেলে।

অভিনন্দনসহ

বিখ্যাত নীপার-কসাক বাহিনীর আজ্ঞাক্রমে নেতা

স্তেপা কারাফোলকা।'

আমাদের দুজনকে একে একে ধরে ও যদি সবার সামনে চিত করে ফেলে দিত, তাহলে যা হত, এটা হল তার চেয়েও খারাপ।

আমরা একে অন্যের চোখে চোখে তাকাতে পারছিলাম না। এরকম নিদারুণ পরাজয়ের অভিজ্ঞতা আমাদের আর কখনও হয় নি। ভাসিউকোভ্‌কার সমবয়সী বন্ধুসমাজের সামনে এমন করুণ অবস্থা আমাদের আর কখনও হয় নি। কিছু একটা করা দরকার। আরেকটু হলেই ত কাজ শেষ — ক্লাস ওয়ানের শিকনি ঝরানো ছেলেরাও তখন আমাদের মাথায় হাত মুছবে।

'আহা, সত্যিকারের কসাক তলোয়ার যদি আমাদের থাকত!..' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম আমি। 'কিংবা পিস্তল, যেমন পিস্তল খুঁড়ে বার করেছে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা... কারাফোলকার নেতাগিরি ঘুচে যেত সঙ্গে সঙ্গে!'

'তা যা বলেছিস!' গা ঝাঁকি দিয়ে বলল জাভা। 'তলোয়ার কিংবা পিস্তল! শক্তি হত বটে!.. সত্যিকারের কসাক-অস্ত্র সঙ্গে থাকলে কাকে আর কসাক-নেতা না করে!'

'কিন্তু কোথায় তা পাওয়া যাবে?' হতাশভাবে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'খ্ৰঁড়ে!' হঠাৎ চোখমুখ কুঁচকে বলল জাভা।

'কোথায়? তোর জন্যে মাটির নীচে পড়ে আছে আর কি!.. যাও বা একটা কসাক-টিলা ছিল গাঁয়ের কাছাকাছি সেটাও এখন হয়ে গেল ফৌত!'

'আর কবরখানায়?'

'বলিস কী রে তুই! ওরে ব্‌বাপ্‌স!..'

'তোর মাথা! আমি কি আর টাটকা কবর খোঁড়ার কথা বলছি? তুইও যেমন! জানিস ত বড় রাস্তার এক ধারে যে পুরনো কবরগুলো আছে? ওপরে কোন ক্রস-ট্রস নেই, ঘাসের ভেতরে প্রায় নজরেই পড়ে না ওগুলো। কত কালের হবে? দুশ' বছরের, হয়ত বা তারও বেশি... সালিভোন দাদু একবার আমাকে বলেছিলেন যে তাঁর দাদুর বাবাকে ওখানে কবর দেওয়া হয়েছে... আর সালিভোন দাদুর বাবা কে? নীপার-কসাক। কী ভাবে কবর দেওয়া হত নীপার-কসাকদের? অস্ত্রশস্ত্র সমেত... তাহলেই বোঝ!'

'বটে বটে বটে... কিন্তু হাজার হোক কবরখানা যে... মড়া-টড়ার ব্যাপার...'

'আরে, কিসের মড়া-টড়া? মাথার খুলি, কয়েকটা হাড়গোড় — এর বেশি আর কী? প্রত্নতত্ত্ববিদরা যখন মাটি খোঁড়ে তখন তুই ত নিজের চোখেই দেখেছিস। একটা লোক দুশ' বছর মাটির নীচে পড়ে থাকলে তার কীই বা অবশিষ্ট থাকতে পারে! দেখিস ত তোর কী অবশিষ্ট থাকে দুশ' বছর পরে...'

'যা-ই বলিস না কেন... খুলিও যদি হয়... কেমন যেন...।'

'আরে, ঐ খুলি আমরা ছোঁবও না,' আমার কথায় বাধা দিয়ে বিরক্তির সঙ্গে বলল জাভা। 'আমরা বেশ কায়দা করে মাটি খুঁড়ে তলোয়ার আর পিস্তল তুলে নিয়ে কবরটা ফের মাটি চাপা দিয়ে দেব। কেউ লক্ষ করবে না।'

'তাহলেও অন্তত সালিভোন দাদুকে একবার জিজ্ঞেস করলে হত না?'

'এটা কি ওঁর সম্পত্তি নাকি? আমরা ত আর ওর সবজিবাগানে আলু খুঁড়ে তুলতে যাচ্ছি না... তাছাড়া তুই জিজ্ঞেস করবিই বা কী করে: 'আপনার দাদুর বাবাকে মাটি খুঁড়ে তোলার অনুমতি দিন?' বলতে পারবি এই কথা?'

'কখন খোঁড়া যায় তাহলে? দিনের বেলায়?'

'হ্‌ঁঃ, দিনের বেলায় যদি লোকে দেখে ফেলে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়ে রন্দা পড়বে।'

'তাহলে কখন?'

'রাতের বেলায়।'

'বলিস কি?'

'তুই কি ভয় পাচ্ছিস নাকি?'

'আরে না, কিন্তু...'

'ভালো রে ভালো, তুই সত্যিকারের কসাক অস্ত্রও পেতে চাস, আবার চাস সব যেন হয় দোকানের মতন। খায় কত!'

'আচ্ছা, ঠিক আছে,' আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। 'চেষ্টা করে দেখা যাক।'

...রাতে তোমরা কখনও কবরখানায় গেছ কি? যদি না গিয়ে থাক, তাহলে বলি কি গিয়ে কাজ নেই। ভয়াবহ... এত ভয়াবহ যে হৃৎপিন্ড থেমে যায়।

একথা আমি এখন বলছি, কিন্তু তখন... তখন কি আর আমি জাভার সামনে দেখাতে পারি যে আমি ভয় পাচ্ছি, যখন মুখে ছিট ছিট দাগওয়ালা এই শয়তানটা এমন হাবভাব করছিল যেন কবরখানায় যাচ্ছে না ত, চলেছে হাসির ছবি দেখতে।

'যারা ভীতুর ডিম, তারাই মনে করে যে রাতের বেলায় কবরখানা ভয়ের জায়গা,' খুশির সুরে বলল ও। 'কিন্তু সত্যি বলতে গেলে কি ভয়ের কী আছে? ভয় পেতে হয় জ্যান্তদের, মড়াদের দেখে ভয় পাবার কী আছে? মড়াদের কিছুই করার ক্ষমতা নেই। তোর মনে আছে, টম সইয়ার আর হাক্ ফিন্‌ও রাতের বেলায় কবরখানায় গিয়েছিল... কিছুই হয় নি।'

'হ্যাঁ বললেই হল আর কি, কিছুই হয় নি,' আমি মুখ বাঁকিয়ে কাষ্ঠহাসি হেসে বললাম। 'হওয়ার মধ্যে হয়েছিল এই যে ওদের চোখের সামনে রেড ইন্ডিয়ান জো ডাক্তারকে খুন করে...'

'তাতে কী হয়েছে? বয়েই গেল তাতে। খুন ত আর ওদের করে নি...' বোঝাই যাচ্ছিল রেড ইন্ডিয়ানের কথা জাভা ভুলেই গিয়েছিল। 'বললেই হয় যে তুই আসলে ভয় পাচ্ছিস।'

'ভয় পেতে যাব কেন?' গলার কাঁপুনি কোন রকমে দমন করে আমি বললাম। কেন যে ছাই মনে করতে গেলাম রেড ইন্ডিয়ান আর খুনের ঘটনাটা!

...গ্রামের শেষ প্রান্তের কুটিরটার পাশ কাটিয়ে আমরা চললাম কবরখানার দিকে। কুয়াসাচ্ছন্ন আকাশের প্রেক্ষাপটে জেগে আছে ক্রসগুলি। মেঘের ফাঁক দিয়ে চাঁদ উঁকি মারছে, অতি কষ্টে আলোকিত করে তুলছে পথ। পিছনে অন্ধকারে ঢাকা নীরবতার মধ্যে ঘুমিয়ে আছে গ্রাম, এমন কি কুকুরের ডাক পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল না। কবরখানার পিছনে, বাঁ দিকে কালো হয়ে ছেয়ে আছে ছোট বন, আর ডান দিকে ধুধু স্তেপ চলে গেছে সেই দিগন্ত অবধি। কোথাও জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। মনে হচ্ছিল যেন দুনিয়ায় থাকার মধ্যে আছি কেবল আমরা আর এই কবরখানা। আমরা নীচু হয়ে কবরখানার ভেতর দিয়ে চলতে লাগলাম, চলার সময় আমরা এপাশে-ওপাশে আর কবরগুলির দিকে ভালো করে চোখ মেলে না তাকানোরই চেষ্টা করছিলাম। আমাদের দুজনের হাতেই কোদাল। এছাড়া জুতোর বুরুশও ছিল আমার কাছে (প্রত্নতত্ত্ববিদদের বিশেষ ধরনের বুরুশের বদলে — ঐ বুরুশ আর আমরা কোথায় পাব?), আর জাভার কাছে ছিল ডায়নামো ফিট করা সেই বিনি ব্যাটারির টর্চটা, যেটা আমি ওকে কোন এক কালে উপহার দিয়েছিলাম।

হাওয়ায় গাছপালার মাথায় পাতাগুলি মৃদু সরসর আওয়াজ তুলছিল। কোথায় যেন শুকনো ডাল সামান্য ক্যাঁচকোঁচ করে উঠল, মনে হচ্ছিল যেন অন্ধকারের মধ্যে কেউ কবরখানার ওপর দিয়ে চলতে চলতে কাঠের পায়ের ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলছে।

হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল কিছুদিন আগে; গ্রীষ্মকালে পেতিয়া পাশ্‌কোর ঠাকুমার মাকে কবর দেওয়ার ঘটনাটা। আমাদের গাঁয়ে লোকে মরে ক্বচিৎ, তাই বলাই বাহুল্য, আমরা সবাই কবরখানায় যাই। আমার বেশ মনে আছে তার বলিরেখা পড়া মুখটা, যেন বাঁকা হাসি লেগে আছে সে মুখে।

আমি মনে মনে কল্পনা করতে পারছি এখন এখানে, একেবারে পাশেই মাটির নীচে কফিনের ভেতরে শুয়ে আছে সে। চোখ মেলছে, নড়াচড়া করছে, উঠে দাঁড়াতে চায়। কোথায় যেন আমি পড়েছিলাম যে কখন কখন অস্বাভাবিক তন্দ্রাচ্ছন্ন মানুষকে ভুলক্রমে কবর দেওয়া হয়েছে, আর কবরের ভেতরে সেই মড়া

মানুষেরা জেগে ওঠে, তখন... ভাবতে ভাবতে আমার মাথার চুল নড়েচড়ে খাড়া হয়ে উঠল, আমার দম বন্ধ হবার উপক্রম হল। এমন সময় আবার খচ্, খচ্! — যেন হাড় খটখট করে উঠল।

না, জাভা ওর টর্চ জ্বালাচ্ছে।

'এই যে এখানে,' উঁচু উঁচু ঘাসের নীচে প্রায় অলক্ষিত একটা ঢিবির ওপর আলো ফেলে বলল জাভা।

'খ্-খ্-খচ্... খ্-খচ্ আওয়াজ করবি না... অন্ধকারের মধ্যে খোঁড়াটাই ভালো...'

জাভার নিজেরও জানা ছিল যে এই টর্চটা কবরখানার উপযোগী নয়, তাই ও আর খচ্‌খচ্ আওয়াজ করল না। কয়েক সেকেন্ড আমরা কান খাড়া করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর কোদাল তুলে নিলাম। দুজনে একই সঙ্গে মাটিতে কোপ মারলাম, পায়ের চাপ দিলাম।

এমন সময়... আমরা আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়ে গেলাম... কবরের পেছন থেকে অন্ধকার ফুঁড়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে সবুজ রঙের বড় বড় একজোড়া চোখ। চোখজোড়ার ওপর খাড়া হয়ে দুটি শিঙ! আর তারপর (এখনও মনে হলে আমি স্থির থাকতে পারি না) সেখান থেকে ভেসে এলো এমন একটা অমানুষিক, মর্মভেদী চিৎকার!.. অমন চিৎকার আমি জীবনে কখনও শুনি নি।

পর মুহূর্তেই...

'আঁ-আঁ-আঁ!'

আমার মনে নেই আমাদের মধ্যে প্রথমে কে চেঁচিয়ে উঠেছিল, তবে আমরা দুজনেই যে চেঁচিয়েছিলাম এতে কোন সন্দেহ নেই।

আমরা ছুটছিলাম বললে ভুল হবে, আমরা যেন মাটিতে পা না ফেলে উড়ে চলছিলাম... আমাদের ভাসিউকোভ্কার বহু শতাব্দীর ইতিহাসে এমন গতিবেগ সম্ভবত জানা ছিল না। আমরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে জাভাদের উঠোনে এসে পড়লাম (ওদের বাড়িটাই ছিল কাছে), তারপর গেটটা বন্ধ করে একটা গুঁড়ি দিয়ে আটকে দিলাম।

তোমরা হয়ত শুনে হাসবে, কিন্তু সেই রাতে আমাদের ঘুমোতে হল কুকুরের গুমটিতে। আমরা দুদিক থেকে বিশাল আলসেশিয়ান কুকুর রিয়াব্কার গা ঘেঁষে ঘুমোলাম। ওটা ছিল এমনই রাগী কুকুর যে স্বয়ং শয়তানকে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিতে পারত। আসলে আমরা যে আকাট এবং ওটা যে নেহাৎই একটা হুলো বেড়াল, আর হুলো বেড়ালরাই যে অনেক সময় অমন বিকট চিৎকার করে — পর দিন সকালে এই বলে আমরা নিজেদের যত বুঝ দিই না কেন, নতুন করে নৈশ অভিযানের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। আমরা কবরখানা থেকে চুপি চুপি আমাদের কোদাল তুলে নিয়ে এলাম, আমাদের এড্ভেঞ্চার সম্পর্কে ঘুণাক্ষরে কাউকে কোন কথা বললাম না।

দেখতে দেখতে বর্ষা শুরু হয়ে গেল, তারপর শীতকাল; পশুচরানোর মাঠে 'নীপার-কসাক দলের' খেল আপনাআপনিই শেষ হয়ে গেল। আমি আর জাভা একটা পুরনো তিন চাকার সাইকেল দিয়ে বরফের ওপর গড়গড়িয়ে চলার উপযোগী গাড়ি বানিয়ে ফেললাম, আমাদের হারানো মর্যাদা পুনরুদ্ধার করা গেল।

কিন্তু সেই রাতের পর আমি নিজেকে বললাম: 'পাভেল, আর কখনও রাতদুপুরে কবরখানায় যাওয়া নয়। তোমাকে হতে হবে পাইলট, তাই ভয়ে চমকাতে বা তোতলাতে থাকলে তোমার একেবারেই চলবে না। তোমার শত্তুরে গেলে যাক ওখানে — চমকাক গে, তোতলাক গে।'

অথচ দেখ, বছর ঘুরতে না ঘুরতেই আমাকে ফের যেতে হচ্ছে কবরখানায়। আর যদিও সচরাচর যেমন হয়ে থাকে, ঐ রাতের স্মৃতিচারণমাত্রই আমার

বুকের কাছটা আতঙ্কে ঠাণ্ডা, শিরশিরে, ভিজে জবজবে হয়ে আসে, তবু আমি মনে মনে বলি: 'যাওয়া দরকার পাভেল। এটা যদি তোমার নিজের দরকার হত, তাহলে তুমি মরে গেলেও হয়ত যেতে না। কিন্তু এখানে কাজটা বুঝতেই পারছ জটিল। তোমাকে তাই যেতেই হবে। কেননা যে করেই হোক ঘড়িটা ফেরত দেওয়া চাই তার মালিককে।'

আমি শুনতে পাচ্ছি আমার পাশে জাভার দীর্ঘশ্বাস। আমি জানি সে-ও এই একই কথা ভাবছে।

আমরা শুয়ে শুয়ে অপেক্ষা করতে থাকি কখন কাকা-কাকীমা ঘুমিয়ে পড়েন। ওঁদের ঘরের দরজা বন্ধ থাকলে কী হবে, আমরা ঠিক জানি যে ওঁরা এখনও ঘুমোন নি; কেননা কোন সাড়াশব্দ নেই। ওঁরা ঘুমিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা শুনতে পাব। কেবল আমরাই বা বলি কেন, পাশের বাড়ির লোকজনও শুনতে পাবে, কেননা জানলা খোলা। তোমরা মনে করো না যে কাকা-কাকীমাকে আমি শ্রদ্ধা করি না। ওঁরা বেশ ভালো, সদাশয়, আন্তরিক লোক। আমার কাকা কারখানার অগ্রণী কর্মী (সেখানে সম্মানীয়দের বোর্ডে তাঁর ছবি ঝুলছে), তাছাড়া তিনি আবার স্পোর্টস মাস্টার। আর কাকীমা যা কেক বানান — একবার খেলে আর ভোলা যায় না! কিন্তু কী করা যাবে বল, যদি ওঁরা... শ্-শ! চুপ্! শুরু হয়ে গেছে! ঐ শোন!

'ঘর্-র-ঘর... অর্-ঘোঁ-ঘুরুৎ... গাঁ-গাঁ... ঘোঁৎ-ঘোঁৎ... ফোঁৎ-ঘোঁৎ... ফর্-র... ফোঁ...'

ঘুমিয়ে পড়েছেন ওঁরা!

মনে হচ্ছিল আমরা যেন গর্জনরত সিংহ কিংবা বাঘের মুখবিবরে পড়ে গেছি। ওঃ, কি নাসিকাগর্জনই করে চলেছেন কাকা-কাকীমা দুজনে মিলে! এ ব্যাপারে কেউ যদি প্রতিযোগিতার আয়োজন করত, তাহলে নির্ঘাত ওঁরাই হতেন বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন!

আমরা বিছানা ছেড়ে উঠে জামাকাপড় পরি। এবারে কামান দাগলেও ওঁরা শুনতে পাবেন না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

নৈশ অভিযান। গুহায় গুলিবর্ষণ

আমরা ব্যালকনিতে বেরিয়ে আসি। দিনের বেলায়ই বাক্সের নীচে একটা দড়ি লুকিয়ে রেখেছিলাম, সেটাকে এখন ওখান থেকে বার করে রেলিং-এর সঙ্গে বাঁধলাম। তোমরা কিন্তু মোটেই ভেবে বসো না যে কোন রোমান্সের খাতিরে আমরা এই কাজ করছি। ঈশ্বর রক্ষা করুন! দড়ি দিয়ে ব্যালকনি থেকে নীচে নামা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই, যেহেতু দরজা দিয়ে বেরোন সম্ভব নয় — আমরা বেরিয়ে গেলে দরজা বন্ধ করবে কে?

তাছাড়া কাকীমা আবার রাতের বেলায় দরজার চাবি নিজের ঘরে তুলে রেখে দেন।

দোতলা — তেমন একটা উঁচু মোটেই নয়। আমরা দড়ি বয়ে নামতে থাকি বানরের মতো। দড়িটাতে জায়গায় জায়গায় গিঁটও বেঁধেছিলাম অনেক, যাতে আমাদের ধরতে সুবিধে হয়।

সর্বত্র অন্ধকার, কেবল পাঁচতলার দুটি জানলায় আলো জ্বলছে, যেন বাড়িটার দুই চোখ। ওখানে লোকজনের চলাফেরা টের পাওয়া যাচ্ছে, গানবাজনা শোনা যাচ্ছে — সম্ভবত গৃহপ্রবেশের উৎসব চলছে (মাত্র এক সপ্তাহ হল কাকা-কাকীমা পেচিওর্স্কি ব্রিজের এই নতুন বাড়িটাতে উঠে এসেছেন)। পাশেই কোথাও লোকজন না ঘুমিয়ে আমোদ ফুর্তি করছে দেখে আমাদের নৈশ অভিযানে যাত্রাটাকে এখন আর আমার কাছে তেমন ভয়াবহ ও অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে না।

আরও যে জিনিসটা আমাকে চাঙ্গা করে তুলছে তা হল এই যে পকেটের ভেতরে আমি শক্ত করে চেপে ধরে আছি পিস্তল — কাকার খেলায় স্টার্ট দেওয়ার পিস্তলটা। অনেক ভাবনা-চিন্তা ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর আমরা অন্তত সাবধানতার খাতিরে পিস্তলটা সঙ্গে নেওয়াই সাব্যস্ত করলাম। কিন্তু আমরা যেহেতু সদা সত্য কথা বলার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছি সেই হেতু কাকাকে একটা চিঠি লিখে পিস্তলের জায়গায় সেটা রেখে দিলাম। চিঠিটাতে লিখলাম এই:

'প্রিয় গ্রিশা কাকা, আমরা আপনার স্টার্টের পিস্তলটা নিয়েছি, তার জন্য রাগ করবেন না, আমাদের ক্ষমা করবেন। ওটা আমাদের ভীষণ দরকার! আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনে যাচ্ছি। হয়ত আর ফিরবই না। না ফিরলে আমাদের লাশগুলো বড় মঠের মাটির তলার কুঠুরিতে খুঁজে দেখবেন। এছাড়া অন্য উপায় আমাদের ছিল না। আমাদের মানসম্মান এর সঙ্গে জড়িত। একজন লোককে তার জিনিস ফিরিয়ে দিতেই হবে আমাদের। আমরা চাই না লোকে আমাদের চোর বলে ভাবে।

পাছে কিছু ঘটে, তাই জানাই বিদায়।

পাভেল, জাভা।

তাহলে আমার নতুন স্যুটটা মাকে পাঠিয়ে দেবেন।

জাভা।

আর আমার সাইকেলটা যেন খুড়তুত ভাই ভলোদিয়াকে দিয়ে দেওয়া হয়।

পাভেল।'

তা যাই বল না কেন রাতের বেলায় বড় মঠে যেতে, যেখানে ভূতপ্রেত, মড়া-টড়া আছে সেই কবরখানার দিকে যেতে গা ছমছম করে ওঠে। এই আলোঝলমলে জানলাদুটোকে ছেড়ে যেতে, এই আমুদে গানবাজনার আওয়াজ ছেড়ে যেতে মোটেই মন চাইছে না। কিন্তু তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার!

আমরা চেপে বসলাম একটা ফাঁকা ট্রামগাড়িতে। ট্রামগাড়িটা, আমার মনে হল, দিনের বেলায় যেমন ছোটে তার চেয়ে দ্বিগুণ বেগে ছুটে চলল রাস্তার ওপর দিয়ে; চলতে চলতে ক্রমাগত ক্রিং-ক্রিং ঘণ্টি বাজাতে লাগল — যেন সে আতঙ্কগ্রস্ত। আমরা নামলাম গৌরব বাগে, যেখানে আছে অমর জ্যোতি আর অজানা সৈনিকের সমাধি। এখান থেকে আমরা পায়ে হেঁটে রওনা দিলাম বড়

মঠের দিকে। পার হয়ে গেলাম আমাদের পরিচিত উঠোন — ভালকাদের বাড়ির উঠোনটা (ও যদি জানতে পারত যে আমরা এখন এখানে! নির্ঘাত নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে, কত নম্বর স্বপ্ন যে দেখছে কে জানে!)।

সদর উঠোনের পেছন দিকে গিয়ে, নাছোড়বান্দা কাঁটা ঝোপের মাঝখান দিয়ে যে পায়ে-চলা-পথটা চলে গেছে সেটা ধরে মেরীমাতার গির্জার দিকে নামতে লাগলাম। বুকের ভেতরে ক্রমাগত জোরে জোরে ঘা পড়তে লাগল। আর আঁধারের কী মহিমা! — প্রতিটি ঝোপে যেন অধিষ্ঠান করছে অদ্ভুত অদ্ভুত বিকট সমস্ত জীব, তারা ওখানে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে এবং যে কোন মুহূর্তে তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য মুখিয়ে আছে। এমন কি যে সমস্ত জায়গা দিনের বেলায় বেশ আমোদের আর আলো ঝলমলে, রাতের বেলায় সেগুলিও যেন ভয়াবহ ও অলক্ষুণে বলে মনে হয়। তা-ই যদি হয়, তাহলে যেখানে দিনের বেলায় যাওয়াও তেমন একটা আমোদের নয়, সেই কবরখানা, গির্জা আর মাটির তলার কুঠুরির ত কোন কথাই নেই!

আচমকা, যেন আমাদের আগমন বার্তা কাউকে জানানোর উদ্দেশ্যেই আকাশ থেকে নেমে এলো ঘণ্টাধ্বনি। এক... দুই... তিন... আমরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে অলক্ষুণে আঁধারের ভেতরে দৃষ্টিপাত করি। উপলব্ধিটা এমনই যেন ঘণ্টার আওয়াজ আমাদের হৃৎপিণ্ডে বরফের পেরেক ঠুকে ঠুকে বসাচ্ছে। বম্!.. বম্!.. বম্!..

'ঘ-ঘড়ি... বড় মঠের ঘড়ি... বারোটা বাজল!' জাভা ফিসফিস করে বলল।

আমরা আরও এগিয়ে চললাম। আমরা আগে থেকে কথা বলে ঠিক করে না রাখলেও দুজনেই কিন্তু চুপেচুপে, প্রায় নিঃশব্দে পা ফেলার চেষ্টা করছিলাম — যেন প্রতিটি ঝোপের আড়ালে ঐ যারা আমাদের জন্য ওত পেতে অপেক্ষা করছে, তাদের জন্য এই সতর্কতা। পিঠ আর মাথার পেছনের দিক যেন শিরশির করছিল, মনে হচ্ছিল অন্ধকারের ভেতর থেকে কে যেন আমাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে পেছন থেকে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। হঠাৎ যাতে সবুজ চোখ না দেখতে হয় তার জন্য আমি চেষ্টা করছিলাম পেছন ফিরে না তাকানোর।

আমরা যখন একেবারে ফটকের সামনে, তখন ঝোপের ভেতরে কে যেন খচমচ করে উঠল, কে যেন ঝটকা মেরে সরে গেল, অস্ফুট চিৎকার করল। আমরা গুড়ি মেরে বসে গেলাম, দুই কাঁধের ভেতরে মাথা গুঁজে গুটিসুটি মেরে রইলাম।

আর আমি পিস্তলটা এমন চেপে ধরলাম যে গুলি ছুঁড়ি আর কি! ভালো বলতে হবে যে এই স্টার্ট দেওয়ার পিস্তলের ট্রিগারটা স্পোর্টসম্যানদেরই উপযোগী, খুবই শক্ত; নইলে আমি হয়ত ভয়ে পকেটের ভেতরেই গুড়ুম করে গুলি ছুঁড়ে বসতাম। তাহলে আমার নতুন শেভিয়ট্ প্যাণ্টের দফারফা হয়ে যেত আর কি!

এক মিনিট কেটে গেল। কেউ আমাদের ওপর হামলা করল না। 'সম্ভবত গুমটির বন্ধুবান্ধবদের কেউ হবে,' এই সিদ্ধান্ত করে আমরা মাথা উঠালাম, কাঁধজোড়া সিধে করলাম।

'না না, আমরা যে ভয় পাচ্ছি এটা ওদের মনে করতে দেওয়া ঠিক হবে না,' আমি মনে মনে ভাবলাম, 'জোর কদমে, হাসতে হাসতে চলা উচিত...' কিন্তু আমার পাজোড়া মানতে চাইল না, 'দূরের গুহার ঘণ্টাঘরের' খিলানাকার তোরণের নীচে চেপটা পাথরগুলির ওপর দিয়ে আমরা আবার চলতে লাগলাম বিড়ালের মতো চুপেচুপে, নিঃশব্দ পদসঞ্চারে। আর হাসি? — আমার বুকের এত গভীরে আটকে পড়ে ছিল যে আমি নিজেও শুনতে পাচ্ছিলাম না। তবে শুনতে পেলাম অন্য একটি জিনিস। জেনারেল কাইসারভের সমাধির ওপরকার শিলার আড়াল থেকে হঠাৎ ভেসে এলো চাপা গলার কথা:

'আরে বাদ দে... যাক গে — আর নয়... এখন কেউ আসছে না বলেই মনে হচ্ছে... বাড়ি থেকে বেরোতেই পারে নি আর কি। কোন সন্দেহ নেই...'

চেনা গলা, তবে গুমটির নয়।

'ভুল করছ! আমরা এসে গেছি!' আচমকা এত জোরে বলে উঠল জাভা যে আমিও চমকে গেলাম।

'আঁ!' কে যেন সমাধির ওপরকার শিলার আড়াল থেকে ভয়ে আঁতকে উঠে বলল। সঙ্গে সঙ্গে আকাশের পটভূমিকায় পাথরের চাঁইয়ের মাথার ওপর আবির্ভাব ঘটল তিনটি মাথার।

'আচ্ছা, তোমরা,' গুমটির কণ্ঠস্বর শোনা গেল, আমার কাছে মনে হল সে যেন কতকটা হতাশ আবার কতকটা অসন্তুষ্টও বটে — যেন সে অপেক্ষা করছিল অন্য কারও।

ওরা স্মৃতিস্তম্ভের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো। প্রথমে গুমটি, তার পেছন পেছন বেঁটেখাটো এক ছোকরা, যাকে আমরা মারামারির সময়ও লক্ষ করেছি,

আর ছিল ঢ্যাঙা রোগাটে একটা ছোঁড়া — কালো মুখোস পরা — সম্ভবত 'দাগী'।

আমি নিজের অজানতেই আঁতকে উঠলাম: যা-ই বল না কেন, রাতের বেলায় কালো মুখোস, তাও আবার এরকম জায়গায়, মোটেই তেমন একটা ভালো ছাপ মনে ফেলে না। 'হ্যাঁ, প্রায় প্রতি মুহূর্তেই ঠকঠক করে কাঁপতে হবে দেখছি। এভাবে বেশিক্ষণ চললে আমি অনবরত ঠকঠক করে কাঁপতেই থাকব, জ্বর বিকারের রোগীর মতো খিঁচুনি উঠবে দেখছি আমার। নিজেকে সামলানো দরকার,' মনে মনে ভাবলাম আমি। কিন্তু নিজেকে সামলানো অত সহজ কাজ নয় — কিছুতেই নিজেকে বাগে আনতে পারছিলাম না আমি!

'তোমাদের কাছে টর্চ আছে?' গুমটি জিজ্ঞেস করল।

'নেই।'

'না থাকাটা ভালো নয়।'

ভালো যে নয় তা আমরা অবশ্য নিজেরাই জানতাম। কিন্তু কী করা যাবে? ডায়নামো ফিট করা বিনি ব্যাটারির যে টর্চটা আমি এক সময় জাভাকে উপহার দিয়েছিলাম সেটা ঠিক সময় বুঝে বিগড়ে গেছে, এদিকে আমরা অনেকটা নিজেদের বোকামির দরুনই নতুন ব্যাটারির টর্চ যোগাড় করতে পারি নি, বাড়িতে কাকার কাছেও ছিল না (যদি জানা থাকত যে আমাদের নৈশ অভিযান করতে হবে!)। সাবধানের মা'র নেই ভেবে আমরা এক বাক্স দেশলাই সঙ্গে নিয়েছিলাম। তবে টর্চের সঙ্গে কি আর দেশলাইয়ের তুলনা চলে!

'যাক গে, আমাদের আছে, কোন রকমে কাজ চালিয়ে নেওয়া যাবে।'

আমার মনে হল আমাদের টর্চলাইট না থাকায় গুমটি যেন খুশিই।

'চল!' আমাদের সংবিৎ ফিরে পাবার সময় না দিয়ে বলল গুমটি।

আমরা বড় মঠের উঠোন থেকে বেরিয়ে এসে দুর্গের দেয়ালের পেছনে গেলাম। দেয়ালের ঠিক তলা থেকে নীচের দিকে চলে গেছে রেলিং দেওয়া একটা সরু কাঠের সিঁড়ি।

সিঁড়ির ওপর ঝুঁকে পড়েছে গাছের ডালপালা। ঘুটঘুটে অন্ধকার, চোখে কিছুই দেখা যায় না, মনে হচ্ছিল যেন আমরা কোন অতল গহ্বরে নেমে যাচ্ছি।

খোলাখুলি স্বীকার করতে গেলে, আমার দারুণ ভয় লাগছিল, আমার তাই খুবই ইচ্ছে করছিল, এই কুমীরগুলিকে বুঝিয়ে দিই যে আমার কাছে পিস্তল আছে, ওরা যদি কোন মতলব ভেঁজে থাকে তাহলে আমি... কিন্তু কী করে এটা করা যায় তা আমার জানা ছিল না।

গুমটি আর 'দাগী' পকেট টর্চ দিয়ে পথে আলো ফেলছিল, কিন্তু সিঁড়ির ধাপের ওপর দিয়ে কাঁপা কাঁপা এই যে দুটি আলোর বিন্দু লাফিয়ে লাফিয়ে চলছিল তাতে, আমার মতে, দেখাচ্ছিল আরও ভয়ঙ্কর। নীচে নামার পর আমরা কেন যেন আবার শুরু করলাম ওপরে উঠতে (এবারেও বড় মঠের দেয়াল বরাবর)। খানিকটা ওপরে উঠে আমরা ডান দিকে মোড় নিয়ে চললাম ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া গাছপালার মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা অ্যাসফল্‌ট বাঁধানো পথ ধরে। চললাম নীরবে। গুমটি আমার পাশে পাশে চলছিল। অবশেষে আমি সাহস সঞ্চয় করে ওকে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলাম:

'আচ্ছা এই এ... মুখোস পরে কেন?'

'গোপনতার জন্যে,' রহস্যের ভঙ্গিতে ফিসফিস করে বলল গুমটি। 'তোমাদের ত বলেইছি যে মিলিশিয়া ওকে খুঁজছে।'

'ছ্যাঃ,' আমি মনে মনে ভাবলাম, 'আমার ত মনে হয় আজকালকার দিনে, কালো মুখোস দিয়ে আত্মগোপন ত করাই যায় না বরং তার উলটো। সবাই যেমন চলছে সেই ভাবে যদি তুমি চল, তাহলে মিলিশিয়ার নজর এড়ালেও এড়াতে পার, আর যদি কালো মুখোস পরে যাও, তাহলে মিলিশিয়ার লোক সঙ্গে সঙ্গে খপ করে চেপে ধরে সোজা চালান করে দেবে থানায়।'

হঠাৎ আমার মাথায় খেলল এটাই ত বলার উপযুক্ত সময়!

'ও কিছু নয়,' আমি বললাম। 'মিলিশিয়ার পরোয়া আমরা করি না! আমাদের কাছে একটা জিনিস আছে! এই যে আলোটা এই দিকে ফেল।'

গুমটি তার টর্চের আলো আমার পকেটের ওপর ফেলতে আমি স্টার্ট দেওয়ার পিস্তলটার অর্ধেক বার করে দেখালাম।

'কী ব্যাপার?'

'আমার কাকা কিনা'... (এখানে আমি আরেকটু হলেই একটা ভুল করে বসছিলাম, প্রায় বলেই ফেলেছিলাম যে 'মিলিশিয়ায় কাজ করেন', কিন্তু সময়মতো

থেমে গেলাম — একটু আগেই না বলেছি যে 'মিলিশিয়ার পরোয়া করি না!') 'আমার কাকা কিনা সীমান্ত রক্ষিবাহিনীতে কাজ করেন,' আমি বললাম। 'আমরা কিছু সময়ের জন্যে ওঁর 'মাকারভ' পিস্তলটা বাগিয়ে এনেছি আর কি... মিলিশিয়া-টিলিশিয়া দেখা দেয় যদি...'

'তা... তা এটা... এটা দারুণ... বেশ ভালো,' মিনমিন করে বলল গুমটি। এ জিনিসটি সে একেবারেই প্রত্যাশা করে নি।

জাভা স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল — সে দাঁড়িয়ে ছিল আমার খুবই কাছে, টর্চের আলোয় আমি বেশ ভালোমতো দেখতে পাচ্ছিলাম ওর দৃষ্টি। সে দৃষ্টির বক্তব্য ছিল: 'মিথ্যে বলা আর টোকা মারা নিয়ে আমাদের যে শর্ত হয়েছিল তার কী হল?' জবাবে আমি মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে যা বললাম তার অর্থ হল: 'ঘাবড়াস নে, সব ঠিক আছে; শত্রুর কাছে অসত্য বলাটা মোটেই মিথ্যেবাদিতা নয়, একে বলে কৌশল...'

'দাগী' আর অন্য ছেলেটি আগে আগে চলছিল, আমাদের কথাবার্তা তারা শুনেও ঠিকমতো শুনতে পেল না, ফলে কিছু বুঝতেও পারল না। আমরা যখন আরও এগিয়ে গেলাম তখন গুমটি যেন দৈবাৎ আমাদের কাছ থেকে সরে গেছে, এমন ভাব করে 'দাগীর' কাছাকাছি এগিয়ে গেল।

'কী ব্যাপার রে?' মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল 'দাগী'।

'ওদের কাছে গুলি ছোঁড়ার অস্ত্র আছে,' খুবই মৃদুস্বরে বলল গুমটি — তার ধারণা ছিল আমরা শুনতে পাব না।

কিন্তু আমার কান এমনই...

'সত্যিকারের?' উদ্বিগ্ন হয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল 'দাগী'।

''মাকারভ' পিস্তল... ওর বাপ সীমান্ত রক্ষিবাহিনীতে কাজ করে।'

'তাই নাকি?.. ওটাতে বোধ হয় গুলি ভরা নেই।'

এর বেশি ফিসফিস করার সুযোগ তাদের হল না, কেননা আমরা ওদের নাগাল ধরে ফেললাম। আমরা ভান করলাম যেন কিছুই শুনতে পাই নি। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে ওরা বিব্রত হয়ে পড়েছে। ভালোই হল! ওরা জানুক যে আমাদের সঙ্গে তামাসা করলে ভালো হবে না। ওরা যদি কিছু করবে বলে ভেবে থাকে, তাহলে আমরা ওদের...

আমরা অ্যাসফল্‌ট বাঁধানো পথে মোড় নিয়ে অতি কষ্টে ঘন ঘন ঝোপঝাড় ভেদ করে ঢালু বয়ে নীচের দিকে চললাম। তারপর থমকে দাঁড়ালাম। পকেট-টর্চের ম্যাটমেটে আলোয় আমরা দেখতে পেলাম ছাতলা পড়া পুরনো ইঁটে গাঁথা একটা প্রবেশ-পথ — মাটির নীচের কোন এক সুরঙ্গের মুখ। ওখান থেকে কুলকুল শব্দে আমাদের পায়ের নীচে ছুটে চলছিল জলধারা।

'এই যে... লিখ্‌ট্‌ভেইটেসের গুহা,' জাঁক করে বলল গুমটি।

'লেইখ্‌টভাইস,' ঈষৎ শ্লেষের ভঙ্গিতে জাভা ওকে সংশোধন করে দিল (কনান ডয়েল আমরা ওদের চেয়ে খারাপ জানতাম না!)।

'লিখ্‌ট্‌ভেইটেসের' গুহা থেকে ভেসে আসছিল ঠাণ্ডা, ভিজে-ভিজে গন্ধ। আমার মনে হচ্ছিল যেন কবরের গন্ধ ভেসে আসছে। উ-হু-হু!..

'আমরা তাহলে এখানে অপেক্ষা করি, ও বরং নিয়ে আসুক?' এই বলে আমি মাথা নাড়িয়ে ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিলাম 'দাগীকে'।

'তোমরা যদি ভয় পেয়ে থাক তাহলে অবশ্য...' বিদ্রূপ করে বলল গুমটি।

কী পাজী রে বাবা! আচ্ছা, ঠিক আছে!

'চল!' দাঁত কড়মড় করে বললাম আমি।

যে করেই হোক ঘড়িটা আমাকে উদ্ধার করতেই হবে!..

'চল!' গুমটি বলল।

গুহায় প্রথমে নীচু হয়ে ঢুকল 'দাগী', পরে গুমটি, তারপর আমি, আমার পেছন পেছন জাভা আর শেষে ঢোকার কথা বেঁটেখাটো ছেলেটার (পরে অবশ্য জানা গিয়েছিল যে ছেলেটা গুহায় আদৌ ঢোকে নি, সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে হাঁটা দেয়)।

মাটির নীচের ঐ টানা কুঠুরিটা ছিল অনেকটা নীচু আর সরু কেবল এক এক করে সার বেঁধে নীচু হয়ে চলা যায়। আমরা খালি পায়ে ভিজে মাটির ওপর দিয়ে ছপছপ করে চলতে লাগলাম, ঠাণ্ডায় পা চিনচিন করছিল। হঠাৎ আমার এই বোধটা তীক্ষ্ন হয়ে জেগে উঠল যে আমি মাটির নীচে — স্যাঁতসেঁতে মাটি, জমাট অন্ধকার আর ভীতি আমাকে ঘিরে ধরে আছে। আর মাটি যেন আমার ওপর চেপে বসেছে, ওপর থেকে, চার পাশ থেকে তার চাপে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। ঠিক যেন কবরের নীচে।

'দাগী' আর গুমটি আমার আগে আগে একে অন্যের পেছন চলছিল নিজেদের

চলার পথে টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে — তারা দুজনে যেন এক হয়ে দুই মাথা, চার হাত আর চার পাওয়ালা একটা লেপাপোঁছা মূর্তির আকার ধারণ করেছে। আমরা একবার মোড় নিলাম, দ্বিতীয় মোড় — ডান দিকে, বাঁ দিকে... আমার তখন মনে হচ্ছিল যে-কোন মুহূর্তে (যেমন সর্বদাই হয়ে থাকে এড্‌ভেঞ্চার-উপন্যাসে) আমরা বেরিয়ে আসব গুহার উঁচু ছাদওয়ালা আলোকিত কক্ষে, যেখানে বিশাল এক সিন্দুকের মধ্যে লুট করা ধনরত্নের সঙ্গে আছে 'আমাদের' ঘড়িটা। কিন্তু এমন সময়...

এমন সময় মনে হল কেউ বুঝি একটা কম্বল দিয়ে আমার মাথা ঢেকে দিল। 'দাগী' আর গুমটির লেপাপোঁছা জোড়া মূর্তিটা উধাও হয়ে গেল। নিরেট সূচীভেদ্য অন্ধকার আমাকে ঘিরে ধরল। আমার না থেমে উপায় রইল না। সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলাম পেছন থেকে হুমড়ি খেয়ে আমার ওপর এসে পড়ল জাভা।

'কী হল?' চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল ও।

'এই! গেলে কোথায় তোমরা?' রুদ্ধ কণ্ঠে আমি চেঁচালাম। ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়ে আমি কান খাড়া করলাম।

উত্তরে একটি কথাও শোনা গেল না। কেবল মাটির তলাকার কালো, ঠান্ডা নিস্তব্ধতা। শুধু এই নিস্তব্ধতার গহনে কোথায় যেন শোনা যাচ্ছিল জলের আওয়াজ, যেন জলের পাইপ দিয়ে বয়ে চলেছে।

'ওরে পাজী, হতভাগারা!' মরিয়া হয়ে চিৎকার করলাম আমি। 'দাঁড়া বলছি! গুলি করব এখুনি!' এই বলে পকেট থেকে পিস্তলটা টেনে বার করে প্রাণপণ শক্তিতে ট্রিগারে চাপ দিলাম।

'গুড়্‌-ড়ুম্‌!' বিজলীর ঝলক তুলে গর্জে উঠল গুলির আওয়াজ।

'ওরে ব্‌বাপ্‌স রে! বাঁচাও, বাঁচাও!' খুবই কাছাকাছি জায়গায় ভয়ার্ত স্বরে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল।

জলকাদার ওপরে কিসের যেন একটা ঝুপঝাপ আওয়াজ হল, যেন ডজন কয়েক কোলাব্যাঙ এদিক ওদিক ছিটকে পড়ল। তারপর দূরে কী একটা ছপছপ করে উঠল, কে যেন চিৎকার করল — আওয়াজ ডুবে গেল অতল নিস্তব্ধতার মধ্যে।

জাভা পকেট থেকে দেশলাইয়ের বাক্স বার করে দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে খচ্‌খচ্‌ করল। তারপর হঠাৎই — 'এই রে!' — কাদার মধ্যে কী যেন পড়ে গেল।

21-1068

'পড়ে গেল,' ভেবাচেকা খেয়ে ফিসফিস করে বলল জাভা।

আমি শুনতে পেলাম ও হাত দিয়ে ছপছপ করে কাদা ঘাঁটতে ঘাঁটতে দেশলাইয়ের বাক্সটা তন্ন তন্ন করে খুঁজছে। কিন্তু কোন লাভ নেই — আমাদের দেশলাইয়ের এতক্ষণে দফারফা হয়ে গেছে — ও দিয়ে কোন কাজ হবে না। ঠিক তখনই আমি অনুভব করলাম আমাদের অবস্থাটা কত দূর ভয়াবহ ও নিরুপায়।

আমরা এখন আলো ছাড়া, নিঃসঙ্গ অবস্থায় মাটির নীচের জটপাকানো গোলকধাঁধার মধ্যে, পুরোপুরি অন্ধকারের মধ্যে পড়ে আছি। এখান থেকে বেরোতে গেলে স্রেফ আন্দাজের ওপর নির্ভর করতে হবে। কিন্তু তাতে পুরোপুরি পথ হারিয়ে ফেলারও সম্ভাবনা আছে। আর যদি মনে রাখা যায় যে এই সমস্ত গুহায় সচরাচর বাস করে বিষধর সাপখোপ, বাদুড়, বিশাল বিশাল ধেড়ে ইঁদুর এবং আরও কোন বিষাক্ত প্রাণী, তাহলে ত...

'আবার গুড়ুম কর্ ত রে, খুঁজে পাওয়া যাবে...' নীচ থেকে করুণ স্বরে বলল জাভা।

আমি দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ট্রিগার চেপে ধরলাম। গুড়্-ড়ুম্!.. গুলির ঝলকের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্য চোখে পড়ল আমার বন্ধু কাঁধদুটো জড়সড় করে কাচুমাচু হয়ে আছে। 'দেশলাইয়ের বাক্সটা হাত থেকে পড়ে যাওয়ায় ও নিশ্চয়ই এখন মনে মনে বড় কষ্ট পাচ্ছে,' আমি মনে মনে ভাবলাম (বিপদের মুহূর্তে সব সময় বন্ধুর জন্য সমবেদনা হয়)।

এমন সময় পাশেই কোথা থেকে যেন শোনা গেল ভালকার গলা:

'এই ছেলেরা, গুলি ছুঁড়ো না! কী করছ কী তোমরা?'

ভালকা! কোথা থেকে এলো এখানে?

'এ-এই! কোথায় তুমি?' আমি সোল্লাসে চেঁচিয়ে বললাম।

'এ-এ-খানে...' সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কয়েক পা দূরে, জাভার পেছনে আচমকা ঝলকে উঠল টর্চের আলো।

'আরে, তুমি টর্চ নিয়ে এসেছ দেখছি! চমৎকার! এদিকে আমরা দেশলাই হারিয়ে ফেলেছি!' খুশি হয়ে জাভা বলল ভারিক্কি চালে। আর — এই নিয়ে কতবার হল কে জানে? — জাভা সগর্বে তাকাল আমার দিকে: ভাবটা এই যে ওর ভালকা ফের আমাদের কাজে লেগেছে। তাও আবার এমন এক মুহূর্তে! ঠিক যেন সিনেমা!..

'তুমি এখানে এলে কী করে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'পরে, পরে হবে সে কথা... চল এখান থেকে যাওয়া যাক... এখানে গা ছমছম করে...'

কথাটা অবশ্য ঠিকই, কথা বলার অনেক সময় পাওয়া যাবে। আমরা তাড়াতাড়ি জলকাদা ভেঙে চললাম বেরোবার রাস্তাটার দিকে।

ওঃ!.. মাটির নীচের স্যাঁতসেঁতে ঠান্ডার ভেতর থেকে গ্রীষ্মকালের তারাভরা আকাশের উষ্ণ আলিঙ্গনের মধ্যে এসে পড়তে কী ভালোই না লাগে! কী সুন্দরই না লাগে অন্ধকারে ঢাকা এই থমথমে গাছপালাগুলি! যা-ই বল না কেন, মাটির তলার চেয়ে মাটির ওপরটা বহুগুণ ভালো!..

'আচ্ছা, এ কীরকম গুহা?' মাটির নীচের কুঠুরির কালো হাঁ করা মুখবিবরের ওপর দৃষ্টিপাত করতে করতে বলি আমি।

'আরে, এ হল নর্দমা। মাটির নীচের জল বেরোনর রাস্তা,' ভালকা বলল।

এই মামুলী 'নর্দমা' শব্দটা শোনামাত্রই মাটির নীচের কুঠুরির ভয়ঙ্কর রহস্যময়তা ঘুচে গেল, সেটা হয়ে উঠল বোধগম্য: অনেকটা যেন নর্দমার মতোই (যদিও রাতের বেলায় আমি নর্দমায়ও নামতে যেতাম না)।

'ওরা বুঝি তোমাদের এগিয়ে দিয়ে সটকে পড়েছে? অ্যাঁ?' ভালকা জিজ্ঞেস করল।

'কে জানে ওদের কথা?' আমি কাঁধ ঝাঁকালাম। 'ওরা গা ঢাকা দিয়ে চুপ করে আছে। আমি যখন গুলি ছুঁড়লাম তখন ওরা 'ওরে বাবাপ্‌সে রে! বাঁচাও বাঁচাও!' বলে পালিয়ে গেল। ওদের মধ্যে কে একজন আবার পথে আছাড় খেয়েও পড়ল! ওঃ, যা দড়াম করে আওয়াজটা হল! আমাদের যদি টর্চ থাকত...'

'ওঃ বল কি!' ভালকা দুহাতে গালদুটো চেপে ধরল (টর্চটা ত তার রগ ঘেঁষে ঠুকেই গেল)। 'ওখানে যে কুয়ো আছে! ঘা খেল কিনা কে জানে!..'

'কী? কিসের কুয়ো?'

'নর্দমার জল যাবার! তোমরা শুনেছ ত জলের কলকল শব্দ? ওখানে চলে গেছে টানা নালি, আর তার পরই কুয়ো, পরে ফের ঐরকম টানা নালি। তোমরা যেখানে ছিলে সেখানে একটা পথ চলে গেছে ঢালের দিকে, অন্যটা কুয়োর দিকে। কুয়োটা কিন্তু গভীর, মিটার দুয়েক, তার বেশিও বা হবে... ওঃ, কী হবে?'

আমি আর জাভা মুখ চাওয়া-চাউয়ি করলাম।

'যাব?' জাভা বলল।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

কোন জলে ডোবা লোককে সদ্য সদ্য জল থেকে ওঠানোর পর ফের জলে নামতে হলে যেমন হয়, আমাদের অবস্থাটাও সে রকমই বলা চলে।

'টর্চটা দাও,' আমি ভালকাকে বললাম।

এক হাতে টর্চ, অন্য হাতে পিস্তল ধরে আমি ঝট করে শ্বাস ফেলে (স্টার্টের সময় যেমন করে) প্রথম গিয়ে ঢুকলাম মাটির তলায় কুঠুরিতে। কী ভাবে জানি না, ঘটনাটা দাঁড়িয়েছিল এমন যে এই পর্বে বরাবর আমাকেই আগে আগে থাকতে হচ্ছিল। আমার জন্যই ঘড়ি নিয়ে এত কাণ্ড, সুতরাং আমাকে প্রথমে তার ভুক্তভোগী হতে হবে বৈকি!

চলতে চলতে মনে হচ্ছিল আমি যেন একজন গুপ্তকর্মী, চলেছি মারাত্মক বিপজ্জনক কাজের ভার নিয়ে। আমার কিন্তু বিন্দুমাত্র ভয় লাগছিল না। পেছনে ফোঁসফোঁস করছে জাভা, তার পেছন পেছন নাক টানছে ভালকা। মোট কথা, এ আর এমন কি! আমরা যে চলেছি নেহাৎই মামুলী নর্দমা দিয়ে। আরে ছোঃ! তাহলে পাকস্থলীটা এমন চিনচিন করে কেন? আরে ম'লো যা, কথা নেই বার্তা নেই, চিনচিন শুরু করে দিল!.. ভয়ের ত কিছুই দেখছি না... আমরা চলেছি গুমটিকে টেনে তুলতে — ও হয়ত কুয়োর মধ্যে চোট খেয়ে পড়ে আছে। ওঃ! ধুত্তোর!.. আমার ঠিক পায়ের কাছেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে একপাশে সরে গেল ইয়া বড় এক কোলাব্যাঙ। ছ্যাঃ!

এই যে সেই জায়গাটা, যেখান পর্যন্ত আমরা গিয়েছিলাম বলে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, ঠিকই! এই ত আমাদের দেশলাইয়ের বাক্স পড়ে আছে ভিজে জবজবে হয়ে। আরে, এখানে দেখছি লম্বা নালিটা বেঁকে গিয়ে দুভাগ হয়ে চলে গেছে। এবারে পরিষ্কার বোঝা গেল: ওরা টর্চ নিভিয়ে দিয়ে ছুটে এক কোনায় চলে গেছে। তারপর আমি যখন গুলি ছুঁড়ি তখন দৌড়ে পালিয়েছে। একজন গেছে এদিককার নালিটা দিয়ে। কিন্তু এমনও ত হতে পারে যে ওরা দুজনেই গেছে এদিকে? তাহলে কেউ কোন কুয়োয় পড়ে নি, চোটও পায় নি, আমরা মিছিমিছিই চলেছি। তাহলে ত খুবই ভালো কথা! কেউ চোট পাক এটা কি আর আমি চাই? ভগবান

রক্ষা করুন! কিন্তু সে যা-ই হোক না কেন, ওখানে, কুয়োটার দিকে যাওয়া দরকার। নইলে আবার... এদিকে জলের আওয়াজ প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠছে। জল বেরোবার পাইপ না আরও কিছু, এ যে দেখছি একেবারে সত্যিকারের জলপ্রপাত! কুয়োর ইঁট বাঁধানো দেয়াল নালি পেরিয়ে ওপর থেকে নীচ বরাবর চলে গেছে। টর্চের আলোর রেখা সেই দেয়ালের গায়ে এসে ঠেকেছে। আমি সন্তর্পণে এগিয়ে যাই। কেন জানি না প্রথমেই তাকাই ওপরের দিকে। আমার মাথার মিটার তিনেক ওপরে মোটা মোটা পাকানো লোহার গরাদ আড়াআড়ি করে সাজিয়ে গোল জাফরি করা আর তারই ফাঁক দিয়ে ঝকঝক করছে তারাভরা আকাশ।

টর্চের আলো আমি নীচে ফেলি। প্রথমে আমার চোখে পড়ে প্রবল জলস্রোতের ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাওয়া, ইঁটে বাঁধানো ঝকঝকে তলাটা — সেখানে কেউ নেই। আমি ততক্ষণে মনে মনে ধরেই নিয়েছি যে সব ঠিক আছে। এমন সময়... ভয়ংকর আকস্মিকতায় চমকে উঠে আমি নিজেই তখন কুয়োর ভেতরে পড়ে যাই আর কি! আমার ঠিক পায়ের কাছে আমি দেখতে পেলাম গুমটির ভিজে সপসপে মুখটা। আঙুলগুলো চওড়া করে ছড়িয়ে দিয়ে সে আঁকড়ে ধরে রেখেছে ইঁটের গাঁথুনির মাঝখানের খাঁজ। কুয়োর কিনারায়, আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম তার বিশ সেণ্টিমিটার খানেক দূরে খাড়া দেয়াল ধরে সে কোন রকমে ঝুলছিল। তার সর্বাঙ্গ ভিজে সপসপ করছে — প্রবল জলস্রোত তার বাঁ কাঁধের ওপরে ঝরে পড়ছে। আমি তখনও বুঝতে পারছি না ও কী করছে, তবে এটা পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে আর এক মুহূর্তের মধ্যেই ও ছিটকে পড়ে যাবে নীচে। আমি ঝট করে উপুড় হয়ে সোজা জলের মধ্যে শুয়ে পড়লাম, একটি কথাও বলার অবকাশ পেলাম না, কেবল পেছন ফিরে জাভার হাতে টর্চ আর পিস্তল গুঁজে দিলাম। দুহাতে গুমটির কাঁধ চেপে ধরলাম। একমাত্র তখনই আমি ভাঙা ভাঙা গলায় বললাম:

'জাভা, টর্চটা ভালকাকে দিয়ে দে, আমাকে সাহায্য কর্!'

পলকের মধ্যে জাভা উপুড় হয়ে জলকাদার মধ্যে আমার পাশে শুয়ে পড়ল। এবারে আমরা দুজনে মিলে গুমটির কাঁধ ধরলাম। এখন ওর পড়ে যাবার সম্ভাবনা নেই, ছিটকে নীচে পড়বে না ও... কিন্তু এভাবে শুয়ে থেকে ওকে টেনে তোলা আমাদের সাধ্য নেই: ও বেজায় ভারী, আর আমরাও হারকিউলিস নই। আমরা শুয়ে থেকে ওকে ধরে রাখি। আমাদের প্যাণ্টের ভেতর দিয়ে কলকল করে জল

বয়ে যাচ্ছে, গোটা শরীরের ওপর দিয়ে, শার্টের কলার ভেদ করে ছুটে চলেছে জলস্রোত। ব্যাপারটা যে কীরকম তা একমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবে না... কেবল একটি কথাই যোগ করতে পারি, জল কনকনে, যেন বরফগলা।

'কী হল তোমাদের? ওঃ! কী ব্যাপার? ওঃ! কিছু বলছ না যে!' আমাদের পেছনে তিড়িংবিড়িং করে লাফাতে লাফাতে ভালকা 'ওঃ-আঃ' করে চলল। আমাদের শরীর জায়গা জুড়ে থাকায় তার নিজের পক্ষে সামনে এসে উঁকি মেরে দেখার বাধা ছিল। ও হয়ত আমাদের শরীর মাড়িয়েই এগিয়ে আসত দেখার জন্য (তোমরা ত জানই মেয়েদের কৌতূহলপ্রবণতা কেমন হয়ে থাকে!), তবে ইতিমধ্যে সে কী কৌশলে জানি না, আমাদের দুজনের মাঝখানে দুপা রেখেছে: প্রথমে একটি পা, তার পরে আরেকটি, তার পরে আবার —

এই ভাবে এগোতে এগোতে এখন সোজা আমার নাকের কাছাকাছি... অবশেষে উঁকি মারল।

'ওঃ, গুমটি যে! ওঃ, গুমটি রে! ওঃ সামাল, সামাল! উঠে পড়্, উঠে পড়্! আর একটুখানি আছে যে। ওরে গুমটি, গুমটি রে... এই ত আর একটু...' ভালকা প্রাণপণে হাঁকডাক করতে থাকে।

আমি ওকে চেঁচিয়ে প্রায় বলতে গিয়েছিলাম যেন চুপ করে (সাহায্য নয় ঘোড়ার ডিম! কঁক-কঁক কঁক-কঁক করে চলেছে তা দেওয়া মুরগীর মতো), কিন্তু হঠাৎ অনুভব করলাম গুমটি উঠে আসছে।

আমাদের চেষ্টার চেয়ে তার ওপর বেশি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল ভালকার মুখের কথা। অথচ আমাদের চেষ্টা ছিল রীতিমতো আসুরিক। আমি এত জোরে টানছিলাম যে আমার মনে হচ্ছিল এই বুঝি আমার বুকের ভেতরের কিছু একটা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। কেবল তখনই আমি বুঝতে পারলাম আমি আর জাভা কত দুর্বল। অথচ ভাসিউকোভ্কার ছেলেদের মধ্যে আমরা নিজেদের একেকজন ভারোত্তলনকারী ভ্লাসভ ও জাবোতিন্স্কি বলে ভাবতাম। তার কারণ এই যে রেলের যে ভাঙা টুকরোটা বাজিয়ে আমাদের গাঁয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে দুপুরের সময় জানানো হত সেটা আমরা তুলেছি — জাভা নয় বার, আমি সাত বার... আর 'নীপার-কসাক' কারাফোলকা কঁকিয়ে-কুঁতিয়ে তিন বার, কোলিয়া কাগার্লিংস্কি ত একেবারেই তুলতে পারে নি। আর আমরা যখন নিজেদের বাইসেপ ফোলাতাম তখন সেগুলিকে ঐ রেলের চেয়েও শক্ত মনে হত। অথচ এখন... আমার মাথায় কেন যেন সর্বক্ষণ ঘুরছে এই কথাগুলি: 'ওঃ, জলকাদার ভেতর থেকে জলহস্তীকে টেনে তোলা মোটেই সহজ কাজ নয়...', 'ওঃ, মোটেই সহজ কাজ নয়...', মোটেই সহজ কা...' নাঃ, হুবহু নষ্ট রেকর্ডের মতো... কখন কখন হয় না, কোন একটা গান বা কথা সেই যে পেয়ে বসল — মাথার ভেতরে ঘুরছে ত ঘুরছেই, ঘুরছে ত ঘুরছেই।

গুমটি দুহাতে কুয়োর কিনারা চেপে ধরেছে। আমরা এখন আর শুয়ে নেই, আমরা হাঁটু গেড়ে বসে টানছি, প্রাণপণে টানছি। ভালকাও এক হাত দিয়ে গুমটির জামার কলার চেপে ধরেছে, সেও টানছে। দেখতে দেখতে গুমটি দুহাতে ভর দিল, এবারে হাঁটুতে ভর দিয়ে কিনারায় দাঁড়াল... উ-উঃ... ক্লান্তিতে আমার দুপা ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে, এই অবস্থায় আমি উঠে দাঁড়াই।

'চল, চল তাড়াতাড়ি খোলা হাওয়ায় যাওয়া যাক,' ভালকা তাড়া দিল। 'তোমরা ভিজে একেবারে চুপসে গেছ! ঠাণ্ডা লাগবে যে...'

'দাঁড়া, দাঁড়া! একটু আলো ফেল দেখি, আলো ফেল...' জাভা নীচু হয়ে ঝুঁকে বলল। 'পিস্তলটা... এখানেই কোথায় যেন রেখে দিয়েছিলাম... এখানেই কোথাও হবে... এই যে পেয়েছি!'

ভিজে, কাদামাখা পিস্তলটা ও তুলে নিল। গুমটি তাকিয়ে বলল:

'স্টার্ট দেবার বুঝি? আমি আ-আগেই আন্দাজ করেছি,' দাঁতে দাঁত ঠকঠক করতে করতে নাক টানতে টানতে বলল সে।

'তা-ই যদি হয় তাহলে অমন ভড়কে গিয়ে কুয়োয় পড়তে গেলি কেন?' আমি মনে মনে ভাবলাম, তবে চুপ করে গেলাম। বলাটা ঠিক শোভন নয়।

'চল, চল... আরে, অসুখে পড়ে যাবে যে তোমরা... ওখানে গিয়ে কথা হবে,' ভালকা আমাদের টানে।

এখানে কালবিলম্ব করার কোন ইচ্ছে আমাদের নিজেদেরও ছিল না — ভিজে জামাকাপড় শরীরে লেপটে গেছে, দাঁতে দাঁত ঠকঠক করছি আমরা। দেখতে দেখতে আবার উষ্ণ ও হালকা, বড় হালকা বাতাস চার দিক থেকে এসে জড়িয়ে ধরে আমাকে।

'শুনছ, তোমরা কাপড়চোপড় নিংড়ে ফেল, শিগগির নিংড়ে ফেল! আমি উলটো দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছি। তোমাদের দিকে আমি তাকাচ্ছি না... আরে, তোমরা বড় আজব ছেলে ত! বলছি শিগগির নিংড়ে ফেল! এই যে আমি সরে গেলাম, মুখ ঘুরিয়ে রইলাম... হল ত?'

কী একগুঁয়ে মেয়ে রে বাবা! আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গায়ের কাপড়চোপড় নিংড়াই। আমাদের যেটুকু শক্তি অবশিষ্ট ছিল তা নিয়োগ করি নিজেদের প্যাণ্ট আর জামার জল নিংড়ানোর পেছনে। মাটির ওপর কলকল করে জলের প্রবাহ চলেছে। আমরা ককাই আর ফোঁসফোঁস করি। এদিকে ভালকা বেশ দূরে দাঁড়িয়ে থাকে আমাদের দিকে পিঠ করে, মুখ না ঘুরিয়ে নির্দেশ দিয়ে বলে:

কুঁড়েমি নয়, কুঁড়েমি, নয়, ভালো করে নিংড়োও...'

''ভালো করে'... আরে কী আমার বুদ্ধি রে!' আমি দাঁত কড়মড় করে বলি।

'নিজে চেষ্টা করে দেখলে ঠ্যালাটা টের পেত। নিংড়ানোর কি আর আছে?' বিড়বিড় করে বলল জাভা।

'বলা সহজ...' গ্নর্মটি গলা ছাড়ে।

আমরা তিনজনে যে একই রকম বিবস্ত্র এবং সকলেই যে দাঁতে দাঁত ঠকঠক করছি আর ভালকার উদ্দেশে গজগজ করছি, এসবের ফলে কিন্তু আমরা গ্নর্মটির সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ি। আগে ওর ওপর আমার যে রাগ আর ঘৃণা ছিল এখন কেন যেন তা অন্নভব করছি না, যদিও ওরই চক্রান্তে মাটির তলার কুঠুরির ভয়ঙ্কর বন্দীদশার অভিজ্ঞতা আমাদের লাভ করতে হল। আর ঘড়ির ব্যাপারটা যে কী হল তা এখনও জানাই যায় নি।

একটা জিনিস কিন্তু আশ্চর্যের: কোন মান্নষের ভালো কিছ্ন যদি কর, তাহলে সে তোমার কাছে প্রীতিকর হবে। আর ঠিক তার উলটোটি হয় যখন তুমি কারও খারাপ কিছ্ন কর — সে হয় তোমার কাছে অপ্রীতিকর।

'কোথায় ঘ্-ঘড়ি-ই?' জিজ্ঞাসা ত নয়, প্যাণ্টটা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে নিংড়াতে নিংড়াতে দাঁতে দাঁত ঠকঠক করতে করতে বেরিয়ে এলো আমার ম্নখ দিয়ে।

'আছে, ঘাবড়াস নে... এ-এক-খ্ননি পাবি,' গ্নর্মটিও হিহি করে কাঁপতে কাঁপতে, জামা নিংড়োতে নিংড়োতে বলল। 'আর, আর এই 'দাগীটা' এমনই!' 'দাগী' না, ছাই! হাওয়া হয়ে গেল... মোট কথা, দাগী-টাগী ওসব কিছ্ন নয়, ভেবে বার করা। ওটা হল ভোভ্কা ইভানভ... ভালকা ওকে জানে।'

'মানে? তাহলে ঘড়ি?'

'আছে আছে... ওর কাছে। ভোভ্কা যখন তোকে আমার ওপর থেকে টেনে তোলে সেই সময় তোর পকেট থেকে পড়ে যায়। গোড়ায় সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেবার ইচ্ছে ছিল আমাদের, কিন্তু তারপর... আমি ভেবে বার করলাম এ জিনিসটা, মানে 'দাগীর' ব্যাপারটা, মজা করার জন্যে... তোদের একটু ভয় দেখানোর জন্যেও...'

'হাঃ!' আমি বললাম (ভাবটা এই যে ভয় দেখানোর আর লোক পেলি না!)।

'আমরা ভেবেছিলাম তোদের ওখানে ঢুকিয়ে দেবার পর যখন তোরা কান্নাকাটি করতে থাকবি তখন বার করে নিয়ে আসব। কথা ছিল আমরা সকলে মিলে কাজটা করব। কিন্তু এলো কেবল ভোভ্কা আর তার ছোট ভাই। যাই হোক...'

'তুই কি ভাবিস রাত-বিরেতে বাড়ি থেকে বের হওয়া অতই সোজা!' ভালকা ঝঙ্কার দিয়ে বলল। 'আমি ঝাড়া এক ঘণ্টা টয়লেটে বসে ছিলাম... শেষ পর্যন্ত বাড়ির সকলে যখন আমার কথা ভুলে গিয়ে ঘ্নমিয়ে পড়ল তখনই খিড়কি দিয়ে

বেরিয়ে পড়লাম। তোর আর কি? বাড়িতে কেউ নেই, মা কাজ করছেন রাতের শিফটে। ভোভ্‌কা আর ওর ভাই ত ঘুমোয় বারান্দায়, আমি জানি।'

'কিন্তু তুই... তুই কী করে এখানে এসে হাজির হলি?' আমি ঝট করে প্যাণ্ট টেনে ওঠাতে ওঠাতে বললাম (জাভা আর গুমটি ইতিমধ্যে প্যাণ্ট পরে ফেলেছে)। আমি জানতাম ও যখন কথা বলতে শুরু করেছে তখন মুখ ফেরাল বলে। কে কোথায় দেখেছে কোন মেয়ে অনেকক্ষণ তোমার দিকে পিঠ ফিরে দাঁড়িয়ে কথা বলছে?

'ইউরা স্ক্রিপ্‌নিচেঙ্কো আমাকে বলে... ওঃ! না, না, আমি তাকাই নি, তাকাচ্ছি না আমি! ইউরা স্ক্রিপ্‌নিচেঙ্কো বলেছে আমাকে। আমি সবে মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচের কাছ থেকে, স্টুডিও থেকে এসেছি (ঘড়ি নিয়ে যা যা ঘটেছে আদ্যোপান্ত ওঁকে বললাম)... পথে দেখা ইউরা স্ক্রিপ্‌নিচেঙ্কোর সঙ্গে। ও বলল: 'আজ রাতে আমরা তোর বন্ধুদের গুহার ভেতরে চেপে ধরব, বুঝলি!' কী? কী করে? — আমি জিজ্ঞেস করলাম। 'কী করে আবার,' বলে সঙ্গে সঙ্গে সে বৃত্তান্ত দিল... ওঃ যা রাগটা হল আমার! তোরা সকলে গুণ্ডা-বদমাশ! — আমি বললাম। — তায় আবার তুই হলি গিয়ে বিশ্বাসঘাতক, নিজের লোকজনকে ধরিয়ে দিস... বলতেই ও আমার বেণী ধরে টান দিল। আমিও ওর পিঠে মারলাম চটাস করে এক চাপড়।'

'যাক গে... ব্যবস্থা পরে আমরা করব। আপাতত চল্‌ ভোভ্‌কাকে খুঁজে বার করা যাক,' গুমটি বলল। 'একেবারে চলে গেছে বলে মনে হয় না... এখানেই কোথাও আছে।'

ঝোপঝাড়, নাছোড়বান্দা শক্ত কাঁটাগাছ আর জ্বলুনি ধরানো বিছুটির জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গুমটি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো খাড়া খাতের ভেতরে।

বটে এই কথা! আমাদের ভয় দেখাতে চেয়েছিল... 'দাগী,' মিলিশিয়া, গুহার ভেতরে গুপ্তস্থান — এসবই বানানো কথা। আর আমরা কিনা বিশ্বাস করে বসলাম! বুদ্ধু আর কাকে বলে! দুগ্ধপোষ্য শিশু। এসবই যে রাবিশ তা ত একজন অন্ধেরও চোখে পড়ে! মাটির তলার কুঠুরি। রাত বারোটা... কালো মুখোস... আজকাল বইতে পর্যন্ত অমন লেখে না। লজ্জার একশেষ! তা যাক গে... এখন ঘড়িটা ভালোয় ভালোয় দিলেই হয়! গোটা ব্যাপারটা স্রেফ ঘড়ির জন্য। ঘড়ি যদি না থাকত, কিংবা এই

ঘড়ি যদি আমার হত, তাহলে আমি মোটেই... ঘড়িটা এখন ভালোয় ভালোয় দিলেই হয়!.. না দিলেই বা আমরা ওর কী করতে পারি?.. ধোলাই লাগাব? কেমন যেন মেজাজ নেই...

'তোদের কিন্তু সাবাস বলব!' হঠাৎ বলল গুমটি। 'ভয় পাস নি। ঘড়িটা ত আর তোদের নয়। তোরা স্রেফ 'ধ্যুত্তোর' বলে ওটার আশা ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে পারতিস। তোদের সঙ্গে মিলে গুপ্তসন্ধানে যাওয়া যেতে পারে।'

দেখলে ত! এই সব কথার পর ওকে ধোলাই দেবে কী করে শুনি? এই কথাগুলি আমাদের বুকের ভেতরে মধু ঢেলে দিল। শত্রুর মুখ থেকে শোনা প্রশংসার ওপরে আর কোন প্রশংসা হতে পারে না। দাঁড়া, দাঁড়া, আচ্ছা ও কোথা থেকে জানতে পারল যে এটা আমাদের ঘড়ি নয়? আমি সবে হাঁ করেছি ওকে জিজ্ঞেস করার জন্য, এমন সময় অন্ধকার ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে, আমাদের একেবারে কাছাকাছি কোন জায়গায় শোনা গেল মৃদু শিস। জবাবে গুমটি শিস দিল। ডালপালার খসখস আওয়াজ উঠল, ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো 'দাগী'—ভোভ্‌কা। ও তখনও মুখোস পরা।

'ওরে ভুষো মাল, ঘড়িটা এদিকে দে দেখি!' গুমটি হুকুম দিল।

'আর তুই? তুই কী? হুঃ, ভারী আমার! বলল একটা কথা!' ভোভ্‌কা মুখোস খুলল। এ হল সেই ঢ্যাঙা ছেলেটা যে আমাকে ল্যাং মেরেছিল।

'তুই দে দেখি, বাজে বকবক না করে!' বিরক্তির সঙ্গে গুমটি ফের বলল।

'নে! ভারী আমার দরকার তোর ঐ ঘড়ি...' ভোভ্‌কা পকেট থেকে ঘড়ি বার করল।

আনন্দে আমার বুকের স্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল তাহলে! শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার আশঙ্কা ছিল এমন একটা কিছু ঘটে যেতে পারে যার ফলে ঘড়ি চোখেই দেখতে পাব না।

ভোভ্‌কার কাছ থেকে ঘড়িটা নিয়ে গুমটি আমার দিকে বাড়িয়ে দিল (বোঝা গেল ও নিজের হাতে ঘড়িটা আমাকে দিতে চায়):

'নে,' গুমটি বলল।

'ধন্যবাদ!' আপনাআপনিই ফস করে বেরিয়ে এলো আমার মুখ দিয়ে।

'থাক, থাক!' মনে মনে অস্বস্তি অনুভব করে বিড়বিড় করে বলল গুমটি।

ঘড়িটা আমি পকেটে রাখলাম না। পকেটকে আর বিশ্বাস নেই। আমি চেপে হাতে ধরে রাখলাম, মনে মনে ঠিক করলাম যতক্ষণ না বাড়ি ফিরে বালিশের তলায় রাখছি ততক্ষণ হাতের মুঠো খুলব না। দুনিয়ায় কোন শক্তির এখন সাধ্য নেই আমার কাছ থেকে ঘড়ি ছিনিয়ে নেয়।

আমরা ঐ একই পথ ধরে ফিরে চললাম। ফের চললাম দুর্গের দেয়ালের পাশ দিয়ে সরু কাঠের সিঁড়ি বয়ে, প্রায় পুরো অন্ধকারের মধ্যে — কেবল টিমটিম করে আলো দিচ্ছিল দুটো টর্চ (তবে এখন ঐ দুটোর মধ্যে একটা ভালকার — গুমটিরটা ভেঙে গেছে কুয়োর মধ্যে)।

'কী করে জানলি যে ঘড়িটা আমাদের নয়?' শেষকালে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আমাদের সব জানা আছে,' গুমটি রহস্যভরে বলল।

'না, না, ঠাট্টা নয়।'

'আরে ওর ভাই,' সে ভালকার দিকে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করে বলল, 'বলেছে এর ভাইকে,' বলে সে ইঙ্গিতে দেখাল ভোভ্‌কাকে, 'এই হল ব্যাপার! ওরা দুজনে বন্ধু।'

'আ-চ্‌-ছা...'

'শোন্ গুমটি,' ভালকা হঠাৎ বলল, 'তুই ঐ কুয়োটার ওপর বয়ে উঠতে গেলি কেন বল্ ত? তুই ত নীচের সুড়ঙ্গ দিয়ে চালের ওপর বেরিয়ে আসতে পারতিস।'

'বাদ দে ও কথা,' গুমটি কথা বাড়াতে চাইল না।

'না না, বাদ দেব কেন? ঠাট্টা নয়, সত্যি করে বল্‌ই না।'

'ওরা যদি ঠিক পথে না গিয়ে পথ গুলিয়ে ফেলত, তাহলে কী হত শুনি? পরে দায়ী হতে হত ত? ওদের কাছে যে টর্চ-ফর্চ কিছুই নেই।'

'পিস্তলের ভয় করিস নি তুই?'

'আমি তাহলে চিৎকার করতাম...'

বোঝ কাণ্ড! এই গুমটিটাকে দেখছি প্রায় বীরই বলতে হয় — আমাদের বাঁচানোর জন্য নেমেছে! মানুষের মতিগতি বোঝা ভার। অমনিতে মনে হয় নচ্ছার ধরনের, অথচ কিনা... না, কোন লোককে অত সহজে নচ্ছার ধরনের বলে রায় দেওয়া যায় না।

'শোন,' ভালকা বলল, 'তোমরা বাড়ি যাবে কী করে শুনি? ট্রাম ত এখন আর চলছে না।'

'আরে এইটুকু ত পথ!' গুমটি বলল। 'মৈত্রী বুলভার গিয়ে মোটরগাড়ি চলার পথ ধরবে — সেখান থেকে পেচিওর্‌স্কি ব্রিজ। আমি ওদের সঙ্গে করে দিয়ে আসব ফুলের কেয়ারি অবধি... আচ্ছা চলি!'

'চলি!' ভোভ্‌কা বলল।

'আচ্ছা!' ভালকা বলল।

'চললাম!' জাভা বলল।

'আজকের মতো!' আমি বললাম।

আমরা যে যার পথ ধরলাম। ভালকা চলে গেল তাদের সেই সদরে (খিড়কি পথে)। ভোভ্‌কা গেল বড় মঠের দিকে (ও থাকত বড় মঠের এলাকায়)। আর আমরা দুজনে গুমটির সঙ্গে ইঁটে গাঁথা বড় একটা খিলান পেরোলাম, পরে আরও একটা, তারপর নেমে এলাম ভারী ভারী পাথুরে ইঁট বাঁধানো একটা সরু রাস্তার ওপর। সারাটা পথ আমরা চললাম চুপচাপ, একটিও কথা হল না আমাদের মধ্যে। ভোভ্‌কা আর ভালকা যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ গুমটির মুখ দিয়ে কথা ছুটছিল, কিন্তু এখন আমাদের সঙ্গে একা পড়ে গিয়ে গুম হয়ে রইল। বোঝাই যাচ্ছিল, আমাদের সামনে সে তেমন একটা স্বস্তি বোধ করছিল না। আমাদেরও ইচ্ছে হচ্ছিল যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ওর কাছ থেকে বিদায় নিই। অবশেষে আমরা যখন মোটর চলাচলের পথ পর্যন্ত এলাম তখন গুমটি বলল:

'ঐ যে সোজা রাস্তাটা দেখছ ওটা ধরে চলে যাও — তাহলেই গিয়ে পড়বে পেচিওর্‌স্কি ব্রিজে! বাই-বাই!' সে আমাদের উদ্দেশে হাত নাড়াল।

কেউ যদি এমন কোন কথা বলে যার মানে তোমার জানা নেই, তখন কী খারাপই যে লাগে! ইস্‌, দেখ দেখি, কী জবাবটা দিই ওকে? ভাবনা-চিন্তা করার বিশেষ সময় ছিল না।

'ঝপাং!' বললাম আমি।

'ঝপ্‌!' আমাকে অনুসরণ করে বলল জাভা।

আমার মনে হল শহরবাসী গুমটি আমাদের এই 'ঝপাং-ঝপকে' আঞ্চলিক ভাষার কোন শব্দ বলে মনে করবে। আর সত্যিই তাই, ও আমাদের কথার রীতিমতো

গম্বুজ দিয়ে আমাদের উদ্দেশে হাত নাড়িয়ে ফিরে চলল। আমরা পায়ে পায়ে চললাম মোটর চলার পথের ওপর দিয়ে। কিন্তু তোমরা যদি মনে করে থাক যে আমাদের নৈশ অভিযানের এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটল, তাহলে ভুল করবে।

আমরা এগিয়ে এলাম বাড়ির দিকে, কাকীমার ব্যালকনির নীচে। আমাদের দড়িটা ঠিক জায়গায়ই ঝুলছিল। বাড়িসুদ্ধ সবাই ঘুমোচ্ছে, এমন কি যে ফ্ল্যাটে গৃহপ্রবেশের উৎসব হচ্ছিল, সেখানকার জানলায়ও এখন আর আলো দেখা যাচ্ছে না।

জাভা তার পুরনো অভ্যাসবশত প্রথমে উঠতে চাইল। কিন্তু আজ আমি কোন ইতস্তত না করে ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলাম: ভুলে গেছিস নাকি? আজ লীডার হলাম আমি, কাণ্ডজ্ঞানও নেই দেখছি তোর! ওঃ, কী মতিচ্ছন্ন, কী মতিচ্ছন্নই যে আমার হয়েছিল... আগে যদি জানতাম। কিন্তু আমি কিছুই জানতাম না।

আমি ওপরে উঠতে লাগলাম। যা-ই বল না কেন গম্বুজটিকে টানতে গিয়ে যে প্রচণ্ড ধকল সইতে হচ্ছিল তা বেশ জানান দিচ্ছিল। উঠতে কষ্ট হচ্ছিল, খুবই কষ্ট হচ্ছিল। আমার জানা ছিল না যে এত কষ্ট হবে। আমার সবগুলো পেশী টনটন করছিল, ব্যথায় ছিঁড়ে পড়ছিল। হাতে খিল ধরে আসছিল, কাঁধ কেউ যেন ছুরি দিয়ে কাটছিল, পাজোড়া বারবার দড়ির নাগাল ছেড়ে আসছিল আর আমি দুপা এলোপাতাড়ি ছুঁড়ছিলাম, গায়ের কাঁথা খুলে-আসা একটা বাচ্চা ছেলের মতো। মাত্র ত মিটার তিনেক — অথচ কী পরীক্ষাই না দিতে হচ্ছে। তবু রক্ষে এই যে বাড়িটা যাকে বলে 'ক্ষুদ্রকায়', তাই — ছাদের সিলিং দুই প'চাত্তর। গুঁড়ি মেরে ব্যালকনিতে উঠতে উঠতে আমি ততক্ষণে একটা পাম্পের মতো হাঁসফাঁস করছি। আর সামান্যই বাকি, আর একটুখানি হলেই আমি ব্যালকনির রেলিং-এর পাকানো লোহা ধরে ফেলি। এমন সময় আমার মাথার ওপর শুনতে পেলাম একটা আর্তস্বর: 'চোর!' আমি তাকিয়ে দেখি জানলার কালো গর্তটার ভেতরে সাদামত কী যেন একটা দেখা যাচ্ছে (ঐ ঘরেই কাকা-কাকীমা ঘুমোচ্ছিলেন)।

...গোটা ব্যাপারটা এমন বিদ্যুৎগতিতে ঘটে গেল যে আমি প্রকৃতিস্থ হবার অবকাশ পেলাম না। ব্যালকনিতে ভূতের মতো আবির্ভাব ঘটল সাদা ড্রেসিং গাউন পরা কাকীমার মূর্তি। তাঁর হাতে কালোপানা কী যেন একটা ধরা ছিল। রেলিং-এর ওপর ঝুঁকে পড়ে 'এই নে, ধর!' বলেই তিনি ঐ কালো জিনিসটা আমার গায়ের

ওপর উপড়ে করে দিলেন। আমার মাথার ওপর কী যেন ছলাৎ করে পড়ে চোখ কান দিয়ে গড়াতে গড়াতে জামার কলার আর প্যান্টের ভেতর দিয়ে একেবারে পায়ের গোড়ালি অবধি বয়ে চলল। ঠোঁটের ফাঁকে আমি অনুভব করলাম পরিচিত মিষ্টি-মিষ্টি স্বাদ, বুঝতে পারলাম: কাকীমা গামলা থেকে আমার ওপর ফেলেছেন তার প্রিয় চেরিফল সেদ্ধ সরবত। ব্যালকনিতেই ছিল সরবতের গামলাটা। হতবাক হয়ে গিয়ে কোন রকমে দড়ি ধরে ঝুলতে ঝুলতে আমি নাক ঝাড়া দিলাম, থু থু করলাম, ঝাড়া দিয়ে মাথা থেকে সরবতের চেরিফল ফেলে দেবার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু কাকীমার মনে হল এটাই যথেষ্ট নয়। আমি সময় থাকতে দেখতে পেলাম যে ওর হাতে ছুরি ঝকঝক করে উঠল। অনুমান করলাম এখনই দড়ি কাটবেন, আমি ধপাস করে গিয়ে পড়ব মাটিতে।

'কাকীমা, কাটবেন না!' আমি বিকট স্বরে চেঁচিয়ে বললাম।

কাকীমার হাত থেকে ছুরি পড়ে গেল, ছুরির বাঁটটা ঠকাস করে এসে আমার মাথার চাঁদিতে প্রচণ্ড ঘা মারল। আমি নিজেকে সামলাতে না পেরে সরসর করে দড়ি বয়ে নেমে গেলাম নীচে। মাটিতে নেমে পায়ে ভর দিয়ে খাড়া থাকতে পারলাম না, ধপ করে গিয়ে বসে পড়লাম ঠিক আমারই নীচে মাটিতে ফলের সরবতের যে ধারা বয়ে চলছিল সোজা তার ওপর। আর তখনই কাকীমা শেষ কালে ওপর থেকে চেঁচিয়ে বললেন:

'ওঃ পাভেল, তুই নাকি?'

'না, আমি নই!' ফলের সরবতের ধারার ওপর বসা অবস্থায় আমি বিড়বিড় করে বললাম।

জাভা আর সামলাতে না পেরে দমকে দমকে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসতে লাগল, যেন ওর পাঁজরের নীচে আচমকা কেউ সুড়সুড়ি দিতে শুরু করেছে।

পুরোপুরি ধাতস্থ হয়ে ওঠার পর কাকীমা আর্তনাদ করে বললেন:

'হায় ভগবান, তুই এখানে এলি কী করে? রাত দুপুরে তুই কী বলে দড়ি বয়ে ব্যালকনির নীচে গিয়েছিলি? ভানিয়াও ওখানে নাকি? তোদের মাথা-টাথা বিগড়ে গেছে নাকি? ওখানে তোরা করছিস কী?'

'আরে, চিৎকার করবেন না কাকীমা, লোকজনকে জাগিয়ে দেবেন দেখছি!' মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বিতৃষ্ণা ভরে প্যান্টের গা থেকে থেঁতলানো চেরিফল খুঁটে

তুলতে তুলতে দাঁতে দাঁত চেপে আমি বললাম।

কাকীমার অবশেষে চৈতন্য হল যে তিনি যে পোশাকে আছেন সেটা রাতে বিছানায় শোবার জামা, কোন আসরে উপস্থিত হওয়ার যোগ্য পোশাক নয়, এ বেশে নতুন পড়শীদের সঙ্গে পরিচিত হতে যাওয়াটা ঠিক হবে না। 'তাই চলে আয়, আমি এখুনি দরজা খুলে দিচ্ছি,' বলে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সিঁড়ি বয়ে উঠতে উঠতে আমরা বেশ ধারণা করতে পারছিলাম আত্মসমর্পণকারী যোদ্ধাদের মনের অবস্থা কী রকম হতে পারে। আমাদের সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা হচ্ছিল এই ভেবে যে এখন আমাদের অদ্ভুত আচরণের কী কৈফিয়ৎ দেব কাকীমার কাছে। সত্যি কথা বলতে গেলে কি, যে নিদারুণ অভিজ্ঞতা আজ আমাদের হল তার পরে কথা বলার কোন ক্ষমতাই আমাদের ছিল না — তাছাড়া বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়। কিন্তু কাকীমা ত আর ছেড়ে দেবেন না, কিছু একটা না বললে চলবে না।

জাভা, টুস্কি মারাটা সকাল অবধি বন্ধ রাখ্, তোর পায়ে পড়ি,' ক্ষীণকণ্ঠে আমি বললাম। 'কাল সকালে আমার কোন আপত্তি নেই।'

'ঠিক আছে,' জাভা বলল।

আর সময় নেই। চটপট কিছু একটা ভেবে বার করা দরকার। আমাদের মাথাদুটো কাজ করছিল কাউন্টিং মেশিনের মতো — সেকেন্ডে লক্ষ লক্ষ হিসাব। কিন্তু আমরা যেটা ভেবে বার করলাম সেটা নেহাৎই একটা মামুলি, বস্তাপচা ধরনের মিথ্যে কথা: বলব এই যে আমরা নিজেদের মধ্যে বাজী ধরেছিলাম কে কত তাড়াতাড়ি দড়ি বয়ে ব্যালকনিতে উঠতে পারে। আর রাতের বেলায় কেন? তা না করে উপায় কী? — দিনের বেলায় কে-ই বা করতে দিত?

কাকীমা ইতিমধ্যে একটা গাউন গায়ে চাপিয়ে এসে আমাদের দরজা খুলে দিলেন। আমরা আমাদের বানানো কথাগুলি এমনভাবে তাঁকে সাজিয়ে বললাম যে তিনি সত্যি বলে মেনে নিলেন। কাকীমা যে খুব সাহসী আর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তার পরিচয় আমরা এই মাত্র পেয়েছি, কিন্তু তাঁর মনে মায়ামমতাও আছে এবং তিনি আমাকে ভালোও বাসেন বটে (হয়ত তার নিজের ছেলেপুলে নেই বলে)। তিনি আমার কথা বিশ্বাস করলেন। ফলের সরবত এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্যও করল: আমাদের পরনের পোশাক যে কত ভিজে আর শোচনীয় হয়ে পড়েছে সেটা কাকীমার নজরে পড়ল না। আমি তাই জাভাকে পরামর্শ দিলাম সে যেন তার নিজের প্যান্টে আর জামায় সরবতের ফলের ছিবড়ে আচ্ছা করে লেপটায় — যেন তার গায়েও পড়েছে। এমনই কান্ড যে চেরিফলের ছিটেফোঁটাও ওর গায়ে লাগে নি! পুরোটা এসে পড়েছে আমার ভাগে।

কাকীমা আমাদের সামনে বেজায় অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে খুবই দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা চাইলেন। পরে বললেন:

'এত ভালো ফলের সরবত বানিয়েছিলাম! তিন দিনের জন্যে বানালাম। আমি ত ভাবলাম চোরই বুঝি হবে। কী আফশোসের কথা!'

আমরা বুঝতে পারলাম না আমাদের জন্য, না ফলের সরবতের জন্য — কোন্‌টার জন্য ওঁর আফশোস।

'কাকীমা, আপনি কিন্তু... কাকাকে এখন কিছু বলবেন না,' পাশের ঘরের সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি কান পেতে শুনতে শুনতে আমি অনুনয় করে বললাম। ভয় হচ্ছিল কাকা জেগে না ওঠেন। উনি রগচটা মানুষ, বলা যায় না রাগের মাথায় হয়ত আমাদের ট্রেনে চাপিয়ে স্রেফ বাড়িতেই পাঠিয়ে দিলেন।

'বেশ... কিন্তু ফলের সরবত? যাক গে, বলব' খন রাতের বেলায় ব্যালকনিতে বেরিয়ে যখন খোলা হাওয়া খেতে গিয়েছিলাম তখন দেখতে পাই নি — আমার ধাক্কা লেগে উলটে পড়ে গেছে। তবে একটা কথা এই যে এ ধরনের কান্ড আর বাধাস নে তোরা। আচ্ছা, এবারে জামাকাপড় খুলে স্নানের ঘরে। আমি তোদের জামাকাপড় কেচে শুকোতে দেব এখন। জলদি, জলদি কর্!'

আমরা চটপট জামাকাপড় ছাড়লাম। কাকীমা যাতে লক্ষ না করতে পারেন এমনভাবে কায়দা করে আমি হাত থেকে ঘড়ি খুলে বালিশের নীচে রাখলাম। দড়ি বয়ে ওঠার আগে ঘড়িটা আমি হাতে পরে নিয়েছিলাম কিনা।

তোমরা কখনও বাসন ধুয়েছ কি? গন্ধ মনে করতে পার? আমি আর জাভা যখন স্নানের টবে গিয়ে নামলাম তখন আমাদের গা থেকেও হুবহু অমনি গন্ধ ছাড়ছিল। যেন দুটি মানুষ স্নান করছে না ত, ধোয়া হচ্ছে ফল সেদ্ধ করা দুটি গামলা।

এবারে আমরা বিছানায়। দেখতে দেখতে আচ্ছন্ন হতে থাকি গভীর থেকে গভীরতর নিদ্রায়। আঃ কী আরাম! শেষ হল তাহলে আমাদের নৈশ অভিযান। অবশেষে শেষ হল... অবশে... ঘর্-র... ঘর্-র... ফর্র-ফোঁ...

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

'অ্যাটেনশন প্লীজ!.. স্টার্ট!.. মেশিন চালু করুন!'
ঘড়ির মালিকের সন্ধান।
জাভা স্তানিস্লাভ্স্কি ও পাভেল নেমিরভিচ্-দানচেঙ্কোর জন্ম

একটা ভয়ঙ্কর বিদঘুটে স্বপ্ন দেখলাম আমি। কোথায় যেন মাটির নীচে সমাধি-কুঠুরি... আমি সেখানে হামাগুড়ি দিয়ে চলছি। পুরোপুরি অন্ধকারের মধ্যে আমি একেবারে একা। কিন্তু সবই দেখতে পাচ্ছি: খিলানে ঝুলছে বাদুড়ের দল, দেয়াল বয়ে ছুটে চলছে জলধারা, আর নীচে, পায়ের তলায় বয়ে চলেছে কিসের

যেন নোংরা জল। নীচে, দেয়াল বরাবর বসে রয়েছে বিশ্রী ধরনের চোখ ড্যাবডেবে কোলাব্যাঙেরা। আমার মাথায় তখন এই চিন্তা: 'আরে, আমি তাহলে অন্ধকারে দেখতে পাই! এটা ত জানতাম না! তাহলে ত আমার টর্চের কোন দরকারই নেই!.. অন্ধকারে দেখতে পাওয়া আমার কাছে নেহাৎই ছেলেখেলা!..' আমি হামাগুড়ি দিয়ে চলি, ভয় পাই না, আর এসবের কারণ এই যে আমি অন্ধকারে দেখতে পাই... এমন সময় আমি দেখতে পাই দেয়ালে একটা কুলুঙ্গি। সেই কুলুঙ্গির ভেতরে সিংহাসনের মতন মস্ত এক চেয়ারে — যে রকম চেয়ারে এক কালে রাজা-রাজড়ারা বসতেন — বসে আছেন একশ' সাত বছর বয়সী ত্রিন্‌দিচ্‌কা দিদিমা। আমাদের স্কুলের দিদিমণি গালিনা সিদরভ্‌নার গলায় তিনি বলেন:

'এই পাজীটা, তুই আজও আমাদের রাজার ঘড়িটা ফেরত দিলি না যে?'

আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে জবাব দিলাম:

'ঘড়ি আমি ফেরত দেব, চিন্তা করবেন না। কিন্তু গালাগাল করছেন কেন আমাকে, বলুন ত? আমরা কখনও রূক্ষ ব্যবহার করলে স্কুলে আমাদের সব সময় বকুনি খেতে হয়, আর আপনি নিজেই কিনা গালাগাল করছেন! এটা ভালো নয়।'

'ওরে ছুঁচো, তুই আবার কথা শোনাচ্ছিস! এমন একটা ঝাড় ঝাড়ব না!' এবারে ত্রিন্‌দিচ্‌কা দিদিমার কণ্ঠস্বর কিন্তু শোনাল আমার বন্ধু জাভার কণ্ঠস্বরের মতো। ঘাড় ধরে তিনি আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন কুয়োর ভেতরে! উড়তে উড়তে হঠাৎ আমি অনুভব করি কে যেন আমার কাঁধদুটো আঁকড়ে ধরে আছে। আরে রোস, এ যে আমি নিজে! কুয়োর কিনারার ওপরে উপুড় হয়ে শুয়ে নিজেই আঁকড়ে ধরে রেখেছি আমার নিজের কাঁধ — যে আমি কুয়োর ভেতরে ঝুলছি, তার কাঁধ... ওটাও আমি... আবার এটাও আমি... আমরা যে দুজন এতে কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি না। 'জুটি বাঁধার নিয়ম' আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ভাবি।

ঠিক এই সময় শুনতে পাই আমার কাকার গলা:

'আরে, এগুলো কাদের গতর পড়ে আছে? কাদের, শুনি?'

আমি চোখ খুলি। আমার মনে হয় স্বপ্ন যেন এখনও চলছে। বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন কাকা। এক হাতে ধরে আছেন স্টার্টের পিস্তল, অন্য হাতে... আমাদের চিঠি, যেটা আমরা পিস্তলের বদলে রেখে দিয়েছিলাম (এই রে, চিঠির কথা যে ভুলেই গিয়েছিলাম আমরা!)।

'আর মড়ার মতো পড়ে পড়ে ঘুমোতে হবে না! দশটা বেজে গেছে... তা আজ রাতে তোমাদের লাশগুলো কোথায় ছিল শুনি? সত্যি করে বল দেখি,' কঠোর স্বরে এই কথা বলে কাকা পড়তে থাকেন: ''আমাদের লাশগুলো বড় মঠের মাটির তলার কুঠুরিতে খুঁজে দেখবেন...' ভালো কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলে বটে তোমরা আমাকে। হ্যাঁ, আরেকটা কথা, তোমাদের লাশের ওপরই কি ফলের সরবতের গামলা উলটে পড়েছিল? অ্যাঁ? এই মহিলাকে কিন্তু আমার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না,' বলে তিনি মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে কাকীমাকে দেখালেন।

কাকীমা পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, বেজার হয়ে তাকাচ্ছিলেন আমাদের দিকে। 'আমার দোষ নেই বাছারা!' তাঁর চোখের দৃষ্টি যেন বলছিল। 'কিন্তু আমার মতো একজন বয়োজ্যেষ্ঠ লোককে তোমরা ধাপ্পা দিতে গেলে কেন?'

আমি আর জাভা চোখ চাওয়া-চাউয়ি করলাম, গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। তারপর গায়ের কম্বল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে বসে আমি কপাল বাড়িয়ে দিয়ে জাভাকে বললাম:

'মার্! অন্তত ছয়টা টোকা!'

জাভাও উঠে বসে বলল:

'তুইও আমাকে মার্... একই সঙ্গে আমাদের দুজনের পাওনা হয়েছে। সমান-সমান...'

আমরা একই সঙ্গে একে অন্যকে ছয়টা করে টোকা মারলাম। আমরা যখন এই কাজে মেতে ছিলাম তখন কাকা নীরবে একবার জাভার দিকে আরেকবার আমার দিকে, তারপর ফের জাভার দিকে দৃষ্টিপাত করছিলেন। শেষকালে তিনি বললেন:

'এর অর্থ কী, আমার জানা নেই। জানার তেমন কোন উৎসাহও আমার নেই। কিন্তু কাজটা তোমরা ঠিকই করছ। আমি তোমাদের সমর্থন জানাতে চাই, তোমাদের দুজনকেই নিজের তরফ থেকে আরও কিছু দিতে চাই। মাথা বাড়িয়ে দিতে আজ্ঞা হোক!'

প্রথমে আমার কপালে, তারপর জাভার কপালে কাকা এত জোর মার মারলেন যে আমার মনে হল আমার মাথাটা যেন তরমুজের মতো দু আধখানা হয়ে ভেঙে গেল আর সেই দুই আধখানা থেকে ঝরে পড়ল ফুলকি। কাকার আঙুলগুলো তোমরা যদি দেখতে! — সসেজের মতো পুরুষ্টু একেকটা আঙুল।

'এখন শোনা যাক,' কাকা আদেশ করলেন।

'এই যে, একটু অপেক্ষা করুন... মাথা থেকে সব যেন বেরিয়ে গেছে! এমন মার খাবার পর আবার বলা!..' দুহাতে মাথা চেপে ধরে যেন তার দু আধখানা ধরে জোড়া লাগাতে লাগাতে আমি কাতরস্বরে বললাম।

আমার হাতের নীচে, কপালের ওপর উঠেছে একটা মস্ত আঁব। জাভার দিকে তাকিয়ে দেখি তারও কপালে বেগনী রঙ ধরে ফুটে উঠেছে ঠিক ঐ রকমই একটা আঁব। জাভার দিকে তাকিয়ে আমি যেন আয়নায় নিজেকেই দেখতে পাই: আমি একই সঙ্গে অনুভব করি আর দেখতে পাই আমার মাথার ফোলা জায়গাটা বেড়ে উঠছে, যদিও যেটা আমি দেখতে পাচ্ছি সেটা আমার নয়, জাভার! পরে আমি জানতে পারি যে চলচ্চিত্রকুশলীদের ভাষায় এর নাম 'সিংক্রনিজম'।

'ওঃ, এ তুমি কী করলে?' কাতরস্বরে বললেন কাকীমা। 'এভাবে ত বাচ্চাদের খুন করে ফেলা যেতে পারে!'

'ও কিছু নয়, ও কিছু নয়,' শান্তস্বরে বললেন কাকা। 'ছোঁড়াদুটো শক্তসমর্থ আছে, সহ্য করতে পারবে।'

'আপনার ত কিছু নয়! কিন্তু এখন আমরা সিনেমায় নামব কী করে?' করুণস্বরে বললাম আমি।

'কী? সিনেমা মানে? কী ব্যাপার বল দেখি!'

'আরে, অন্তত ঠান্ডা কিছু লাগাও। দাঁড়াও, চামচ দিচ্ছি তোমাদের!' বলে কাকীমা খাবারের আলমারির দিকে ছুটলেন।

আমরা কপালে চামচ ঠেকিয়ে রাখলাম। এই ভাবে চামচ ঠেকিয়ে রেখে বলতে শুরু করলাম। সবই বললাম। কোন রকম লুকোচুরি করলাম না। পত্র-পত্রিকার ভাষায় যাকে বলে স্বীকারোক্তি — আমাদের সেই স্বীকারোক্তির মাঝখানে বারবার বাধা সৃষ্টি করছিল দুহাতের তালু ঠোকাঠুকির চটাস্ চটাস্ শব্দ ও নানা রকম বিস্ময়সূচক উক্তি, কেননা কাকীমা থেকে থেকে দুহাতের তালু ঠোকাঠুকি করে চটাস্ চটাস্ শব্দ করেছিলেন আর অবাক হয়ে বলে উঠছিলেন: 'হা ভগবান!', 'বোঝ কান্ড...', 'ওঃ-হো-হো-হো!' — এমনি সব কথা।

সবচেয়ে বড় কথা যেটা, সেই ঘড়ির ঘটনাটা আমরা বললাম, ঘড়ি দেখালাম ('হা ভগবান!'), বললাম ভালকার কথা, গুমটির কথা, আমাদের মারপিট আর নৈশ

অভিযানের কথা ('ওঃ-হো-হো-হো!')। মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ আর ফিল্‌ম স্টুডিওর ঘটনাও বললাম ('বোঝ কান্ড...')।

আমরা শেষ করলাম এই বলে যে যে-কোন মুহূর্তে আমাদের নিয়ে যাবার জন্য অ্যাসিস্টেণ্টের আগমন ঘটতে পারে। কী হবে এখন?

'দেখ দেখি, আমি ত আর জানতাম না যে...' কাকা বললেন। 'আমি ত আর জানতাম না যে তোমরা হলে অভিনেতা... তোমাদের ফোটো এখনও রাস্তায় বেচতে দেখি নি... বেগতিক হয়ে গেল দেখছি। কালশিটে নিয়ে গোটা সোভিয়েত ইউনিয়ন আলো করাটা অস্বস্তিকর বটে... প্রতারণা না করে সঙ্গে সঙ্গে খোলাখুলি স্বীকার করলেই পারতে। অ্যাসিস্টেণ্টকে এখন আমরা কী বলব?'

ঠিক এই সময় — হুবহু নাটকের মতো — কাকার মুখ থেকে এই মন্তব্য বেরোতে না বেরোতেই দরজায় টোকা পড়ল। কাকীমা ছুটে গেলেন দরজা খুলতে, আমি আর জাভা ক্ষিপ্রগতিতে (সিনেমায় দ্রুতগতির ছবি দেখেছ ত!) জামাকাপড় পরতে লাগলাম। অ্যাসিস্টেণ্ট যখন ঘরে এসে প্রবেশ করলেন ততক্ষণে আমরা প্যাণ্ট পরে ফেলেছি, একই সঙ্গে দুজনে যে যার শার্ট মাথায় গলাচ্ছি (ফলে অ্যাসিস্টেণ্ট আমাদের মুখ দেখতে পেলেন না, আমরাও অ্যাসিস্টেণ্টকে দেখতে পেলাম না)।

'নমস্কার, নমস্কার, আমি এসেছি আপনাদের হিরোদুটোকে নিয়ে যেতে,' খুশির সুরে অ্যাসিস্টেণ্ট বললেন। 'ছেলেরা সম্ভবত ইতিমধ্যে আপনাদের বলেছে।'

'হ্যাঁ, তা ত বলেইছে,' কেমন যেন কাচুমাচু হয়ে বললেন কাকা। 'তবে কথাটা কি জানেন, দুঃখের বিষয়, আজ ওরা খানিকটা... এই আর কি... যাকে বলে... ঠিক ফোটো তোলার উপযুক্ত নয়।'

এই মুহূর্তে আমরা মাথা গলিয়ে জামা পরে ফেলতে আমাদের কপালের ফোলা অ্যাসিস্টেণ্টের চোখে পড়ে গেল।

'হুম্‌,' বললেন তিনি। 'এই যে ছেলেরা... কী ব্যাপার তোমাদের... তবে হ্যাঁ...' তিনি খানিকটা দূরে সরে গিয়ে চোখ কুঁচকে কেমন যেন একটা পাশ থেকে আমাদের দেখে নিয়ে বললেন: 'আমার মতে, মন্দ নয়। এমন কি আরও ভালোই, বলা যেতে পারে... টাইপ চরিত্রের পক্ষে... বিশেষ ধরনের চেহারার পক্ষে। চল হে!'

'আরে, একটু কিছু মুখে দিয়ে যাক,' কাকীমা ব্যস্তসমস্ত হয়ে রান্নাঘরে ছুটলেন।

‘ও, তোমরা এখনও সকালের খাবার খাও নি নাকি?’ অ্যাসিস্টেণ্ট অবাক হয়ে গেলেন। ‘শিগগিরই যে দুপুরের খাওয়ার সময় হয়ে গেল।’

‘দরকার নেই! দরকার নেই!’ আমি আর জাভা এমন মরিয়া চিৎকার করে উঠলাম যেন কেউ আমাদের ছুরি দিয়ে কাটছে। বলা যায় না আমরা সকালের খাবার খেতে খেতে সেই সময়ের মধ্যে অ্যাসিস্টেণ্টের মত যদি পালটে যায়!

‘না না কাকীমা, কিছু দরকার নেই!’ রান্নাঘরে ছুটে গিয়ে আমি তাঁর কানে কানে বললাম: ‘আমি কিন্তু কখনই আপনাকে ছেড়ে কথা কইব না! কখনই না, যদি আপনার এই সকালের খাবারের জন্যে আমাদের...’

‘আচ্ছা, আচ্ছা, অন্তত একটা করে স্যাণ্ডউইচ ত সাথে নাও,’ কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললেন কাকীমা।

‘দিন, তবে জলদি, নইলে চলে যাবে,’ আমি ফিসফিস করে বললাম।

কাকীমা ছোট রান্নাঘরটা জুড়ে ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করতে লাগলেন, ঘুরপাক খেতে লাগলেন তা-দেওয়া মুরগীর মতো। তেলের শিশি থেকে তেল পড়ে গেল, প্লেট খানখান হয়ে ভেঙে গেল, যাই হোক শেষ পর্যন্ত তৈরি করে দিলেন দুখানা ‘স্যাণ্ডউইচ’ যাদের ওজন সম্ভবত দেড় কিলো খানেক। কিন্তু আমরা তর্কাতর্কি করে অযথা সময় নষ্ট করতে গেলাম না।

বাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে ছিল একটা জীপগাড়ি। সেই দিকে আমাদের টেনে নিয়ে যেতে যেতে অ্যাসিস্টেণ্ট বললেন:

‘এখন যাব মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচের কাছে, তারপর স্টুডিওতে।’

গাড়ি যখন বড় মঠের কাছাকাছি এগিয়ে আসছিল তখন আমার মনে হল ভালকার কথা। ওকে স্টুডিওতে নিলে হত... ও আমাদের জন্য এত করেছে! ওর যেতে বাধাটা কোথায়?.. ওখানে গিয়ে পেছনে কোথাও দাঁড়িয়েই থাকল না হয়। ফিল্মে আমাদের বয়সী ছেলেরা যখন আছে তখন হয়ত বা মেয়েও আছে... তায় আবার এমন একটা মেয়ে! যে-মেয়ে একা এক দঙ্গল ছেলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে। যে-মেয়ে রাতের বেলায় মাটির তলার কুঠুরিতে নামতে ভয় পায় না। যার কিছুতেই কোন ভয়ডর নেই!

‘আচ্ছা শুনুন,’ অ্যাসিস্টেণ্টকে আমি বললাম, ‘একটা মেয়ে কি আমাদের সঙ্গে যেতে পারে?’

'মেয়ে?' মৃদু হাসলেন অ্যাসিস্টেণ্ট। 'ভালো মেয়ে?'

'ভালো বলে ভালো!' জাভা বলল। 'মেয়ে ত নয়, ওকে ছেলেই বলা যায়। ওকে আপনি দেখলেও দেখে থাকতে পারেন। গতকাল আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে ছিল।'

'সত্যি বলতে গেলে কি কথা আছে ছেলেদের নিয়ে যাবার, তবে কিনা...'

'ওকে কিন্তু মেক-আপ দিয়ে দিব্যি ছেলে বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। সত্যি বলছি, কারও চোখে পড়বে না!' উত্তেজিত হয়ে বলল জাভা।

'আচ্ছা, ঠিক আছে... তোমাদের সেই মেয়েটিকে নিয়ে এসো তাহলে। ততক্ষণে আমি মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচকে তুলে নিচ্ছি। এখানে, ট্যাক্সির ডিপোর সামনে আমার জন্যে অপেক্ষা করো।'

আমরা জীপগাড়ি থেকে নেমে পড়লাম, অ্যাসিস্টেণ্ট চলে গেলেন।

ভালকাদের বাড়ির প্রবেশপথে জাভা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, ইতস্তত এক জায়গায় পা ফেলল খানিকক্ষণ, তারপর নিজের মাথার ফোলাটায় হাত বুলিয়ে বলল:

'আমাদের একজন কেউ গিয়ে ওকে ডেকে আনলেই ত হয়। কষ্ট করে দুজনের যাবার কী দরকার?'

কী ফন্দিবাজ দেখ! নিজের চেহারার জন্য ওনার লজ্জা হচ্ছে! আরে বাপু, এখন হোক পরে হোক দেখতে ত পাবেই!

আমি বললাম:

'তোর যেমন খুশি, ইচ্ছে করলে তুই একাই যেতে পারিস। আমার কোন আপত্তি নেই। আমার চেয়ে বরং তোরই বান্ধবী বলা যেতে পারে ওকে।'

'না, মানে, আচ্ছা চল্ একসঙ্গেই যাওয়া যাক... আমি কেবল ভেবেছিলাম...'

ও যা-ই ভেবে থাকুক না কেন, শেষ অবধি গেলাম আমরা দুজনেই। হাতের তালু দিয়ে নিজেদের কপাল সামান্য আড়াল করে চললাম আমরা। বেশি দূরে যেতে হল না আমাদের। সঙ্গে সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ভালকার সঙ্গে। একেবারে গেটের মুখে।

'আরে এই যে!' সোল্লাসে চেঁচিয়ে বলল ভালকা। 'কী খবর তোমাদের? সব ভালো ত? বাড়িতে তোমাদের বকুনি-টকুনি খেতে হয় নি ত? আরে, তোমরা মাথা অমন ধরে আছ কেন?'

'ভালো ভালো!' আমরা জবাব এড়িয়ে গিয়ে বললাম। 'আমরা তোমাকে নিতে এসেছি... স্টুডিওতে যাওয়া যাক... অ্যাসিস্টেন্ট বলেছে...'

'তাই নাকি? চল চল! আরে, তোমাদের কপালে ফুলে দেখছি ঢিবি বেরিয়েছে!'

দেখে ফেলল তাহলে শেষ পর্যন্ত! আর লুকিয়ে রাখার কোন মানে হয় না। আমরা হাত সরিয়ে নিলাম।

'ও বুঝেছি, বুঝেছি, কী করে এমন হয়েছে!' ভালকা সরলমনে বলল। 'তোমরা বোধ হয় আবার নিজেদের মধ্যে ঢুঁস্‌কি চালাচালি করেছ... তাই না?'

আমরা নীরবে মাথা নাড়লাম। এমন সময় দেখতে পেলাম গুমটিকে। সে গোমড়ামুখে ভুরু কুঁচকে চলছিল উঠোন দিয়ে, আমাদের দেখতে পায় নি।

'ওঃ, আর তোমরা জান,' ভালকা ফিসফিস করে বলল, 'গুমটি এমন মার খেয়েছে, এত জোর খেয়েছে... ওর মা রোজকার চেয়ে আগে আগে কাজ থেকে ফিরে আসেন। গুমটি এসে দেখে মা ইতিমধ্যে বাড়িতে, আর ওর পোশাকের অবস্থা ত তোমরাই দেখেছ। তারপর যা হল না!.. ওর জন্যে আমার মায়া হয়... তাছাড়া, মোটের ওপর ও তেমন একটা খারাপ ছেলে নয়। অন্ততপক্ষে দুর্বল ওকে বলা যায় না, যেমন কেউ কেউ হয়ে থাকে... এই ধর না কেন ইউরা স্ক্রিপ্‌নিচেঙ্কোটাকে...'

আমি আর জাভা মুখ চাওয়া-চাউয়ি করলাম। আমার মনে হয় আমরা দুজনে একসঙ্গে একই কথা ভাবছিলাম। ওকেও ফিল্‌ম স্টুডিওতে নেওয়া দরকার!

পরিচালক ত আমাদের সরাসরি বলেইছেন যেন আমরা দু'-একটা ভালো ছেলেকে জুটিয়ে আনি। আমরা গুমটিকে নেব। কী আর আছে এতে? করুক না সিনেমায় পার্ট। গতকালও যে আমাদের শত্রু ছিল, যে আমাদের মাটির তলার কুঠুরিতে ঠেলে দিয়ে ভয় দেখিয়ে মেরে ফেলার মতলব করছিল সে না হয় খ্যাতি অর্জন করলই... করুক গে! আজ আমাদের ইচ্ছে হচ্ছিল উদার, দিলখোলা হতে।

গুমটি অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে বুঝে উঠতে পারল না ওর কাছ থেকে আমরা কী চাই।

'অ্যাঁ? কী?' চোখ পিটপিট করতে করতে ও বলল।

'আরে, ফিল্‌ম স্টুডিওতে চল্‌... সিনেমায় নামবি... চাস নে নাকি?' আমরা ওকে বুঝিয়ে বলি। 'তোর বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল নাকি? এমন ব্যাপারে কিনা রাজী হচ্ছিস না!..'

এক কথায়, অ্যাসিস্টেণ্ট যখন কথামতো ট্যাক্সির ডিপোর কাছে জীপগাড়ি চালিয়ে এলেন তখন আমরা জুটেছি চার জন।

অ্যাসিস্টেণ্ট ভদ্রলোকটির নিরীক্ষণ করার ক্ষমতা আছে। ভালকা বাদে গুমটিকেও লক্ষ করতে পেরে তিনি বললেন:

'বুঝলাম, তার মানে পাসে সংখ্যাটা চার করে দিতে হবে? তাই ত?'

'হ্যাঁ,' হেসে বলল জাভা।

মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ গাড়িতেই বসেছিলেন। বরাবরের মতো আজও তিনি আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন ঠাট্টার সুরে:

'এই যে ভালোমানুষ ভদ্রমহোদয়রা! কিছু জিজ্ঞেস করছি না। দেখতেই পাচ্ছি: সব ঠিক আছে... মারাত্মক লড়াই হয়েছিল, তবে জয় আমাদেরই হয়েছে... তাই না?'

আমি কোন কথা না বলে মাথা নাড়ালাম আর হাতা গুটিয়ে বাঁ হাতের কবজিতে বাঁধা ঘড়িটা দেখিয়ে দিলাম।

'বেশ বেশ... ভালো ভালো।' মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ হেঁয়ালিপূর্ণ মৃদু হাসি হাসলেন।

'কী হল? ঐ জারের খোঁজ এখনও পান নি নাকি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'দেখা যাবে, দেখা যাবে,' এই বলে তিনি ফের মৃদু হাসলেন।

আমার মনে হল তিনি কিছু একটা জানেন, কিন্তু কেন যেন বলতে চাইছেন না। আর একই সঙ্গে আমি অনুভব করলাম যে তিনি যেটা জানেন সেটা সুসংবাদ।

'বলুন না, দোহাই আপনার,' আমি অধৈর্য হয়ে অনুরোধ করলাম।

'ধৈর্য ধরুন ভদ্রমহোদয়গণ, ধৈর্য ধরুন! সব পরিষ্কার হয়ে যাবে স্টুডিওতে... বন্ধুরা, সিনেমা হল বিংশ শতাব্দীর পরমাশ্চর্য...'

এই রহস্যময় কথাগুলি আরও বেশি করে উত্তেজনা জাগিয়ে দিল। আমি এত অধীর হয়ে পড়লাম যে এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছিলাম না: সারাক্ষণ ছটফট করছিলাম আর গাড়ির জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখছিলাম — কখন যে এই স্টুডিও...

দেখতে দেখতে আবার সেই নীচু গেট। ফের ফলকের গায়ে লেখা নানা ধরনের বাণী। ফের সেই বাণী: 'মানুষের সবকিছু হওয়া চাই সুন্দর — তার চেহারা, পোশাক-পরিচ্ছদ, তার অন্তঃকরণ, ভাবনা-চিন্তা — সবই...'

'ওঃ, হায় ভগবান! আবার এসে জুটেছে! নাঃ আমাকে কখনও আর মানুষ হতে হচ্ছে না,' কপালের ফোলা জায়গাটায় হাত বুলাতে বুলাতে আমি মনে মনে ভাবলাম।

সেই যে দরজাগুলি পাক খায়, তার কাছাকাছি আসতে আমরা গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম।

'এখন আমাদের আলাদা আলাদা জায়গায় চলে যেতে হচ্ছে ভদ্রমহোদয়গণ,' বললেন মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ। 'আমাকে যেতে হবে প্যাভিলিয়নে, আর তোমরা যাবে দীঘির দিকে... আমাদের আলাদা আলাদা ছবিতে পার্ট... এই দিনটা তোমরা মনে রেখো। বলা যায় না, তোমাদের মধ্যে কারও কাছে এই দিনটা ঐতিহাসিক এবং সারা জীবনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণও হতে পারে। কে বলতে পারে তোমাদের মধ্যে কেউ ভবিষ্যতে সত্যিকারের অভিনেতা হবে না? সে তখন এই দিনটিকে স্মরণ করবে শিল্পদীক্ষার দিন হিশেবে। যাক, মঙ্গল হোক তোমাদের। আমার ভূমিকাটা ছোট, ছাড়া পেলেই তোমাদেরটা দেখতে আসব।'

মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ চলে গেলেন দরজার দিকে, আর আমরা চললাম অ্যাসফল্‌ট বাঁধানো পথ ধরে। আমরা অনুভব করছিলাম কেমন যেন একটা সমারোহ, আমাদের মনে হচ্ছিল উনি এইমাত্র আমাদের অভিনয়ে দীক্ষা দিয়ে গেলেন। খানিকটা এগিয়ে যাবার পর আমরা বাঁ দিকে দেখতে পেলাম এক পৌরুষদীপ্ত লোকের সাদা আবক্ষমূর্তি। খাড়া কপাল তার। আমাদের মনে হল এই লোকটির যেন ডানা আছে, তাকে দেখাচ্ছে কোন এক গর্বিত সাদা পাখির মতো। ইনি হলেন লেখক ও পরিচালক আলেক্সান্দর দভ্‌জেঙ্কো*⁾ — তাঁরই নামে কিয়েভের ফিল্‌ম স্টুডিওর নামকরণ করা হয়েছে। আমরা দেখেছি তাঁর তোলা ফিল্‌ম 'ধরণী', 'কূটনৈতিক পত্রাবাহকের থলি', 'শ্যের্স' (গত বছরের আগের বছরে আমাদের ক্লাবে এই ছবিগুলি দেখানো হয়েছিল)। হ্যাঁ, একে বলে ফিল্‌ম! বিশেষত 'শ্যের্স'। বীরদের সম্পর্কে এ ধরনের ফিল্‌ম ভারী ভালো লাগে। তাছাড়া 'সাগরের কাব্য' আর 'অগ্নিগর্ভ কালের কাহিনী'ও আমরা দেখেছি। আর 'মন্ত্রমুগ্ধ দেস্‌না'— আমরা ছবিও দেখেছি বইও পড়েছি। ওখানে ঠাকুমার মা'টি বেশ মজার — গালাগালি করেন। অমন গালাগাল আমাদের রুবামিলাও করতে পারে না। এক কথায়, দভ্‌জেঙ্কোকে আমরা খুব ভালোমতোই জানতাম।

মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচের 'আশীর্বাণীর' পর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমরা যে দভ্‌জেঙ্কোর পাশ দিয়ে গেলাম এই ঘটনাটা যেন প্রবীণ অভিনেতার কথায় কেমন একটা গুরুত্ব ও বিশেষ অর্থসঞ্চার করল এবং আমাদের মেজাজ আরও আনুষ্ঠানিক সমারোহপূর্ণ করে তুলল।

অ্যাসফল্ট বাঁধানো পথ মোড় নিয়েছে বাঁয়ে, ছাইরঙা বড় দালানের দিকে। আমরা চললাম সোজা পায়ে-চলা-পথ ধরে, কতকগুলি লম্বা লম্বা চালাঘরের পাশ দিয়ে। সেগুলির পাশে বিশৃঙ্খলভাবে রাখা ছিল কিছু টানাগাড়ি, মালটানার গাড়ি আর স্লেজগাড়ি — যৌথখামারের উঠোনে যেমন দেখা যায়। কতকগুলি আবার বহু পুরনো, যেন মিউজিয়ম থেকে আনা, কতক নতুন — সবে বানানো হয়েছে। কিছু ছিল বেশ মজবুত, কিছু বা ভাঙাচোরা। চোখে পড়তে লাগল কিছু কিছু মঞ্চসজ্জার অবশিষ্টাংশ — কোথাও দুটো থাম আর জানলা সমেত দেয়ালের অংশ (সম্ভবত জমিদার-বাড়ির); কোথাও বা রেলিং দেওয়া ভাঙা সিঁড়ি — জাহাজের ক্যাপ্টেনের ব্রিজের কোন অংশ হবে; কোথাও বা দেখা যাচ্ছে দুই চাকার ওপর খাড়া নীচু এক কামান — আধুনিক তোপের প্র-প্রপিতামহী। একটা জায়গায় আবার একেবারে স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে চূর্ণ-বিচূর্ণ প্লাইউডের ভাঙাচোরা টুকরো, পিচবোর্ড আর খোলামকুচি।

আচমকা ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে দেখা গেল জলের ঝলক। দীঘি। আমরা সেদিকে এগিয়ে গেলাম। সাধারণ ছোটখাটো দীঘি। সত্যিকারের ভিজে জল, জ্যান্ত শাপলা, সত্যিকারের নলখাগড়া, সত্যিকারের উইলো ঝুঁকে পড়েছে জলের ওপরে; আর এক পাড় থেকে আরেক পাড় পর্যন্ত পাতা নড়বড়ে পুল — সেটাও সত্যিকারের। তাহলে কী হবে, সত্যিকারের দীঘি এটা নয়! সিনেমা জগতের। দীঘির মাঝখানে ভাসছে টিনের পিপে দিয়ে তৈরি পন্টুন-ভেলা। সেই ভেলার ওপরে তিনটে ঠ্যাঙ ছড়িয়ে খাড়া হয়ে আছে মুভী ক্যামেরা, আর তার পাশে বিশেষ কাজের পোশাক পরে দুজন লোক ব্যস্তসমস্ত হয়ে কাজ করছে। সেখানে, মুভী ক্যামেরার ঠিক পাশেই একটা লোহার বেদির ওপর খাড়া হয়ে আছে এক মাথা-ভারী সার্চলাইট। আর ঐ পাড়ে ঐ রকমই বিশেষ ধরনের কাজের পোশাক পরনে দাঁড়িয়ে আছে আরও কিছু লোক, তাদের হাতে ধরা আছে কাঠের তৈরি বিশাল বিশাল ঢাল; ঢালগুলি আবার মোড়া হয়েছে রাঙতার কাগজ

দিয়ে, সেই রাঙতার কাগজ দিয়ে যাতে মোড়া হয় আমাদের প্রিয় টফি-লজেন্স। এই ঢালের সাহায্যে তারা বড় বড় আলোর বিন্দু ফেলছে পুলটার ওপর, যেখানে ইউনিফর্ম পরে, তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিপ্লবের আগের, জার-আমলের মিলিটারী পুলিশ। তার পাশে পাশ-বোতাম লাগানো জামা গায়ে একটা লোক। দুজনেই ধূমপান করছে, কী নিয়ে যেন কথাবার্তা বলছে।

এপাড়ে একটা ঢাকা লরি — দেখতে অনেকটা সেই সব ভ্যানের মতো যাতে করে রুটি এখানে-ওখানে সরবরাহ করা হয়। গাড়িটা চাপা গড়গড় আওয়াজ করছে, যেন একটা কুকুর, এখুনি ঘেউ ঘেউ ডাক ছাড়বে। আর গড়গড় আওয়াজটা হচ্ছে তার ইঞ্জিন থেকে নয়, ভ্যানের ভেতর থেকে। পরে আমরা জানতে পারি যে এটার নাম হল 'টোনওয়াগন' — এতে আওয়াজ টেপ করা হয়। আর ঘাসের ভেতরে একে অন্যের সঙ্গে জড়িয়ে থেকে সাপের মতো কিলবিল করছে মোটা মোটা রবারের কেব্‌ল। ওঃ কত যে কেব্‌ল! কতক গেছে টোনওয়াগনের দিকে, কতক গিয়ে ডুবেছে দীঘিতে, সোজা দীঘির জলে, তারপর গিয়ে জেগে উঠেছে ভেলাটার গায়ে এসে মুভী ক্যামেরা আর সার্চলাইটের গা বয়ে ওঠার উদ্দেশ্যে। এদিকে মাটির ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কতকগুলি টিনে মোড়া বাক্স-প্যাঁটরা, কিছু বেঞ্চি আর একটা টেবিলও আছে। এসবের মাঝখানে লোকজন ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে, চেঁচামেচি আর গালাগাল করছে। তাদের মধ্যে দেখতে পেলাম হাসপাতালের সাদা স্মক পরনে এক মহিলাকে। 'বোঝ কাণ্ড... তার মানে, শুটিং ব্যাপারটা সত্যিই নিরাপদ নয়। সাধে কি আর ওদের এখানে ঢোকার মুখের বড় ঘরটায় ওষুধ-ওষুধে গন্ধ!.. তায় আবার এখানে ডাক্তারকেও দেখা যাচ্ছে...' আমার চেতনার গভীরে কোথায় যেন এই চিন্তা নড়েচড়ে উঠল। কিন্তু এর বেশি ভাবার অবকাশ আমি পেলাম না... আমাদের পরিচিত টেকো জেনিয়া (ইয়েভ্‌গেনি মিখাইলভিচ) গাঁথুনিটার সামনে অধীর হয়ে এতক্ষণ একই জায়গায় পা ঠুকে চলছিলেন। তার পায়ে ছিল ইয়া উঁচু শিকারী-হাইবুট — এত উঁচু যে তার চেয়ে উঁচু আর হতেই পারে না। ইতিমধ্যে হঠাৎ আমাদের দেখতে পেয়ে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন:

'কী ব্যাপার, তোমাদের এত দেরি কেন? আমার শুটিং যে বন্ধ হবার জো!'

এই বলে জল তোলপাড় করে তিনি দ্রুত পায়ে চলে এলেন তীরে।

'এই যে দাদারা!'

বুটে ছপছপ আওয়াজ তুলে তিনি আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। এগিয়ে এসে ঝুঁকে পড়ে এক দৃষ্টিতে আমাদের মুখের দিকে তাকালেন, তারপর সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে অ্যাসিস্টেণ্টকে লক্ষ করে কঠোর স্বরে বললেন:

'এসব কোথাকার সব পঙ্গু? এদের ত আমি জানি না...'

আমার বুকের রক্ত জমে গেল।

'আমি জানতে চাই, এটা কী ব্যাপার!' এবারে কঠোর দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি। 'তোমাদের কি সব মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? যেন যুক্তি করে লাগিয়ে এসেছে। ওটার হল অসুখ, আর এরা কিনা... এই ফোলাগুলো কিসের? তোমাদের কি আমি আজকের জন্যে কপাল ফুলিয়ে আসতে বলেছিলাম? না না, কপালে ঢিবি তোলার ফরমাস আমি দিই নি! কী দারুণ টাইপ চরিত্র ছিল!.. আমার এত আনন্দ হয়েছিল! সব কিনা মাটি করে দিল!'

তারপরই হঠাৎ — যেন এতক্ষণ উনি চেঁচামেচি করছিলেন না, করছিল অন্য কেউ — আমাদের উদ্দেশে চোখ টিপে শান্ত কণ্ঠে, অন্তরঙ্গ সুরে তিনি বললেন:

'দাঁড়াও ছেলেরা, সব ঠিক আছে... ঢিবির দরকার অবশ্যই নেই, তবে এর জন্যে আছেন আমাদের ল্যুদমিলা ভাসিলিয়েভনা... ল্যুদমিলা ভাসিলিয়েভনা!' তিনি ডাকলেন সাদা স্মক পরনে সেই মহিলাটিকে (মহিলা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলেন)। 'ল্যুদমিলা ভাসিলিয়েভনা, এদের দয়া করে একটু পুটিং-টুটিং লাগিয়ে দিন। এই যে, এই জিনিসগুলো। মোট কথা, উপযুক্ত মেক-আপ দিন।'

ল্যুদমিলা ভাসিলিয়েভনা তাঁর ছোট্ট স্যুটকেসটা খুললেন। স্যুটকেসের ভেতরে ছিল কতকগুলি ব্রাশ, তুলি, টিউব, কৌটো, রঙ, পুটিং জাতীয় কিছু জিনিস... এক কথায়, মেক-আপের নানা সরঞ্জাম।

'আরে ধুৎ' — আমার মাথায় তখন খেলে গেল, 'আমি কিনা ভাবলাম পাছে বিপদ-আপদ ঘটে এই জন্যে ডাক্তার হিশেবে উনি এখানে আছেন, অথচ উনি কিনা মেক-আপ দেন, অনেকটা কেশপ্রসাধন শিল্পীর মতো আর কি...'

ল্যুদমিলা ভাসিলিয়েভনা প্রথমে নিয়ে পড়লেন জাভাকে, সে ছিল তাঁর অনেকটা কাছাকাছি। চটপট কী যেন একটা লাগিয়ে দিলেন, রঙ লাগিয়ে দিলেন,

খানিকটা পাউডার ছড়িয়ে দিলেন — সঙ্গে সঙ্গে ফোলা ঢিবি উধাও — যেন গোরুতে চেটে ফরসা করে দিয়েছে। তারপর ল্যুদমিলা ভাসিলিয়েভনা পড়লেন আমাকে নিয়ে। মেক-আপ শিল্পী যখন তোমার মুখের ওপর কিছু একটা লাগিয়ে দিচ্ছেন, ঘষছেন, পরন্তু পাউডার লাগাচ্ছেন (আমার ত ধারণা ছিল যে কেবল মেয়েরাই পাউডার মাখে!), তখন অনভ্যাসবশত তাঁর হাতের কোমল স্পর্শে কেমন যেন সুড়সুড়ি লাগে। জীবনে আমাদের কখনও মেক-আপ নিতে হয় নি। এ-ই আমাদের প্রথম কিনা... আর ল্যুদমিলা ভাসিলিয়েভনা যখন আমাদের চোখ আর ভুরুর ওপর তুলির টান দিতে শুরু করলেন, পরে লিপ্‌স্টিক দিয়ে ঠোঁটেও রঙ মাখিয়ে দিলেন তখন আমি আর সামলাতে না পেরে হো-হো করে হেসে উঠলাম। এই ভাবে যদি গাঁয়ের ভেতর দিয়ে আমাদের যেতে হত! চারদিক থেকে নির্ঘাত 'ছ্যাঃ-ছ্যাঃ!' রব উঠত, শুধু তা-ই নয়, হয়ত লোকে আজেবাজে কিছু জিনিস ছুঁড়তেও শুরু করত।

গুমটি আর ভালকা বৃষ্টির জলে ভেজা কুকুরের মতো মনমরা হয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। ওরা ততক্ষণে ভেবেই নিয়েছে যে ওদের নেওয়া হচ্ছে না, ওদের কথা লোকে ভুলেই গেছে, এখানে ওরা কারও কাজে আসছে না।

বিশ্রী রকমের অনুভূতি!

পরিচালক চোখ কুঁচকে ল্যুদমিলা ভাসিলিয়েভনার কাজ লক্ষ করতে লাগলেন। কখনও এপাশ থেকে কখনও বা ওপাশ থেকে আমাদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন, যেভাবে বাজারে বেদেরা ঘোড়া দেখে থাকে।

শেষকালে তিনি বললেন:

'ব্যস, হয়ে গেছে! আচ্ছা, এখন এই দুটিকে...' বলে তিনি ভালকা আর গুমটির দিকে মুখ ফেরালেন।

ওদের চোখমুখ সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ওদের যদি লেজ থাকত, তাহলে ওরা সম্ভবত লেজ নাড়াত।

মেক-আপ দেবার সময় গুমটি ভুরু কুঁচকে, ঠোঁট চেপে রীতিমতো গম্ভীর হয়ে থাকে। ভালকা কিন্তু নানা রকম ভাবভঙ্গি করে, স্যুটকেসের ডালার ওপর লাগানো আয়নাটার দিকে চোরা দৃষ্টিতে তাকায়। ভালকাকে কিন্তু সুন্দরী ফিল্‌ম স্টার বানানো হল না। বরং তার উলটো: পরিচালকের পরামর্শমতো

ভালকার হাল ফ্যাশনের 'হর্স টেইল' মার্কা চুলের সাজ বাতিল করে দিয়ে তার চুলগুলিকে এলোমেলো খাড়া খাড়া করে দেওয়া হল, সঙ্গে সঙ্গে ও দেখতে হয়ে গেল একটা ঘরবাড়ি ছাড়া মেয়ের মতো। এর পর আমাদের সকলকে মাখিয়ে দেওয়া হল ঝুলকালি।

'হয়ত ভবঘুরেদের পার্ট করতে হবে আমাদের,' আমি মনে মনে ভাবলাম।

'ক্লাভা কোথায় গেল? কোথায় বাচ্চাদের পোশাক? কী ব্যাপার?' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন পরিচালক।

'পোশাক-ঘরে গেছে... মেয়েটার জন্যে পোশাক আনতে,' কে যেন বলল।

'আগে সময় হল না বুঝি?'

'মেয়ে যে থাকবে তা ত আর আগে জানা ছিল না...'

'জানা উচিত ছিল... ছেলেরা থাকবে, অথচ মেয়ে নেই — এ কী করে হয়! সবই তোমাদের বলে দিতে হবে!'

ভালকা একটু বিব্রতই হয়ে পড়ল — তাকে নিয়েই এত হৈচৈ।

'এই যে আমি! এই যে!' ছুটে আসতে আসতে চেঁচিয়ে বলল উগ্র রঙচঙ মাখা ছিমছাম গড়নের একটি মেয়ে (একেই বলে সত্যিকারের ফিল্‌ম স্টার!)। তার হাতে ছিল ছিন্নভিন্ন একটা পোশাক।

'চলে এসো, খোকা খুকুরা!' খুশির সুরে সে ডাক দিল।

টোনওয়াগনের পেছনে, বেঞ্চির গায়ে ঝুলছিল আমাদের সিনেমার পোশাক। পোশাক ত নয়, শতচ্ছিন্ন কাপড় — হাতে ধরলে খসে পড়ে এমন অবস্থা, তালির ওপর তালি মারা। অমন পোশাক আমি জীবনেও পরতাম না। কিন্তু শিল্পের খাতিরে... ভালকা আর ক্লাভা টোনওয়াগনের এক কোনায় সরে গেল, আর আমরা জামাকাপড় বদলাতে শুরু করলাম, অর্থাৎ কিনা আমাদের রূপান্তর ঘটতে লাগল। জামাকাপড় পরা হয়ে গেলে আমরা আর নিজেদের সামলাতে পারলাম না, পেটে হাত দিয়ে আর একে অন্যের গায়ে আঙুল দিয়ে খোঁচা মারতে মারতে হাসির চোটে আমাদের দম বন্ধ হবার অবস্থা:

'দ্যাখ দ্যাখ, ওর দিকে চেয়ে দ্যাখ — একটা কাকতাড়ুয়া যেন!'

'আর তুই! তোর দশাটা কী! নিজের দিকে একবার তাকিয়ে দ্যাখ! যেন জেলখানা থেকে পালিয়ে এসেছিস!'

'ওঃ! ওরে ব্‌বাবা! এমন ছেঁড়া জামাকাপড় পরনে, আর ঠোঁট কিনা রঙ করা...'

টোনওয়াগনের কোনা থেকে বেরিয়ে এলো ভালকা। ওর গায়ে ছিল নোংরা শতচ্ছিন্ন একটা ফ্রক। ফ্রকটা কোন রকমে তার দুই কাঁধে লেগে ছিল। আমরা সবাই একসঙ্গে ঘাড় বাড়িয়ে দিয়ে ঝুঁকে অভিবাদন জানালাম:

'নমস্কার, মহাশয়া...'

ভালকা আঙুল দিয়ে তার পোশাকের প্রান্ত ধরে মঞ্চের ব্যালে নর্তকীর ভঙ্গিতে আলগোছে ঝুঁকে বসে আমাদের অভিবাদনের উত্তর দিল। আমরা চারজনেই হো-হো করে হেসে উঠলাম।

'হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে! এবারে কাজ!' শোনা গেল পরিচালকের গলা।

টোনওয়াগনের পেছন থেকে আমরা বেরিয়ে আসার পর তিনি দীঘির পাড় ধরে আমাদের নিয়ে চললেন দুটি বেঞ্চি সমেত একটা কাঠের টেবিলের দিকে। সেগুলি একটা ঝাঁকড়া গাছের নীচে মাটির সঙ্গে গাঁথা ছিল। আমাদের বেঞ্চের ওপর বসিয়ে দিয়ে তিনি নিজেও বসলেন, তারপর বলতে শুরু করলেন:

'তাহলে শোন দাদারা! যে ছবি আমরা তুলতে যাচ্ছি তার বিষয়বস্তু হল ১৯০৫ সালের ইউক্রেনে বৈপ্লবিক ঘটনা... তোমাদের ডাকা হয়েছে তারই একটি দৃশ্যে নামার জন্যে। দৃশ্যটির বিষয়বস্তু এই রকম: নদীর ওপরকার পুলটাতে বিপ্লবী শ্রমিক আর্তেমের নাগাল ধরে ফেলেছে মিলিটারী পুলিশ, ওকে গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্যে। আর্তেম মিলিটারী পুলিশকে ধরে মারে, মিলিটারী পুলিশ ছিটকে জলে গিয়ে পড়ে। আর্তেম পালাতে থাকে। তোমরা আছ পুলটা থেকে কিছু দূরে নৌকোয়। মাছ ধরছ। এই দৃশ্যটি দেখতে পেয়ে তোমাদের দারুণ ফুর্তি হয়েছে, তোমরা জোর লাফালাফি করছ। ব্যস, আর কিছু নয়... তবে হ্যাঁ, ফুর্তিটা হতে হবে পুরোমাত্রায়। এর জন্যে ধর গিয়ে তোমাদের মনে মনে কল্পনা করে নিতে হবে, মোটের ওপর মিলিটারী পুলিশমাত্রই (তোমরা শ্রমিক পরিবারের ছেলেপুলে কিনা) তোমাদের দুচক্ষের বিষ, তার ওপরে এই মিলিটারী পুলিশটা বিশেষ করে তোমাদের প্রধান শত্রু, সে সব সময় তোমাদের তাড়া করে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আচ্ছা, এবারে একটু রিহার্স্যাল দিয়ে দেখা যাক ত! ধর আমি হলাম মিলিটারী পুলিশ। আর্তেমকে ধরার জন্যে ছুটছি, ওর দুহাত চেপে ধরেছি। আর্তেম হাত ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসে, আমার বুকে ঘা মারে। আমি ঝপাং করে

পড়ে যাই জলে। নাও, শুরু কর!..'

'হা-হা! হা-লা-লা! ই-ই-ই! হো-ও-ও!' আমরা যত জোরে পারি গলা ফাটিয়ে হাত ছুঁড়ে, লাফাতে লাফাতে চেঁচামেচি করতে থাকি।

'স্টপ!' পরিচালক হাত তুলে বলেন। 'হল না। বড় বাড়াবাড়ি রকমের হয়ে যাচ্ছে। একেবারে মেছো বাজার। সাধারণ লোকেরা কেউ এভাবে ফুর্তি প্রকাশ করে না। এ হল পাগলদের কাণ্ডকারখানা। এমন হলে তোমরা নিজেরাই জলে পড়ে যাবে — আর দেখতে হবে না। দৃশ্যটা হওয়া চাই স্বাভাবিক, বিশ্বাসযোগ্য।'

বোঝ কাণ্ড! নিজেই বললেন 'পুরোমাত্রায়,' আর এখন কিনা এ হল বড় বাড়াবাড়ি রকমের! স্তেপা কারাফোলকা যখন চেঁচাতে চেঁচাতে আমাদের ক্লাসে ছুটে এসে জানায় যে অঙ্কের দিদিমণি অসুস্থ, তাই আজ আর অঙ্কের পিরিয়ড হবে না, তখন যে কাণ্ডটা হয় তা যদি তিনি দেখতেন! একেই বলে ফুর্তি!.. আর এটা হল...

'নাও, আরেকবার দেখা যাক। তবে হ্যাঁ, বেশ গুরুত্ব দিয়ে... সত্যিকারের যেমন হয়... মিলিটারী পুলিশ গিয়ে পড়ল... ঝপাং! নাও, শুরু কর!'

'আ!.. ও!.. ই!..' আমরা মুখে অতি সামান্য হাসি টেনে ক্ষীণকণ্ঠে চেঁচিয়ে বলি।

'স্টপ্!' ফের হাত তুললেন পরিচালক। 'না হে দাদারা, আমার কথাটা তোমরা ঠিকমতো বুঝতে পার নি। এটা একেবারে চূড়ান্ত দেখালে তোমরা। এভাবে লোকে ফুর্তি করে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়। তোমরা কি স্বাভাবিকভাবে লোককে

বিশ্বাস করানোর মতো করে, সত্যিকারের ফুর্তি করতে পার না? লোকটা যে তোমাদের শত্রু! পরম শত্রু যাকে বলে! তাকেই জলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এমন জিনিস দেখা কতই না আনন্দের! ও যে তোমাদের একেবারে তিতবিরক্ত করে ছেড়েছে! দাঁড়াও, দাঁড়াও! আরে, এই লোকটাই ত গতকাল তোমাদের কপাল ফুলিয়ে দিয়েছে... হ্যাঁ, ও-ই ত! তোমরা ভুলে গেলে নাকি?.. গতকাল তোমরা বেড়ার গায়ে আঁটা একটা ঘোষণাপত্র পড়ছিলে, সেই সময় ও তোমাদের ছত্রভঙ্গ করে দিতে থাকে, একবার ধাক্কা মারে, তারপর আরও ধাক্কা — ফলে তোমাদের এই ঢিবি... হতচ্ছাড়া! পাজী! দুচক্ষে দেখতে পারি না ওটাকে!' পরিচালক এমনভাবে বললেন যেন সত্যি সত্যি তাই ঘটেছিল।

ওঁর কথা শুনতে শুনতে কিছুক্ষণের জন্য আমারও যেন বিশ্বাস হল যে আসলে কাকা নন, মিলিটারী পুলিশই আমার কপাল ফুলিয়ে দিয়েছে।

'এই বদমাশটাই কিনা আর্তেমকে তাড়া করতে করতে ছুটছে পুলের ওপর দিয়ে। আর এই আর্তেম — ও যে তোমাদের দারুণ বন্ধু!' পরিচালক সোৎসাহে বলে চললেন। 'খপ করে আর্তেমের দুহাত চেপে ধরল... আর্তেম একটা পাক খেয়ে ঘুরে গেল। জাপটে ধরল মিলিটারী পুলিশকে... ঝপাং করে ফেলে দিল তাকে জলে! নাও, এবারে শুরু কর!'

'ওঃ! হা-হা! ইহি! ওঃ!' আমরা সকলে একসঙ্গে মহা উৎসাহে চেঁচিয়ে উঠলাম।

'এই ত! এই ত! চলবে! সাবাস! ধন্যবাদ। শুটিং-এর সময়ও যেন এমন হয়। তাহলে এ-ই কথা রইল ত?.. ল্যুদমিলা ভাসিলিয়েভনা! ল্যুদমিলা ভাসিলিয়েভনা! (ফের ছুটে এলেন সুটকেস হাতে, স্মক গায়ে সেই মহিলা) ওদের নতুন করে মেক-আপ দিন দয়া করে, ওদের ঢিবিগুলো ব্যর করে দিন। ভালো করে এঁকে ফুটিয়ে তুলুন, যেন চোখে পড়ে। এই ঢিবি নিয়ে একটা নেপথ্য দৃশ্য বানাতে হবে দেখছি...'

ল্যুদমিলা ভাসিলিয়েভনা যখন আমাদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তখন ভালকা আমার কানে কানে ফিসফিস করে বলল:

'তোমরা গর্ব করতে পার! তোমাদের মাথার ঢিবি সিনেমার ইতিহাসে জায়গা পাচ্ছে। শিল্পের উপযুক্ত রূপ গড়ে তুলতে সাহায্য করছে!'

'হয়েছে, হয়েছে!' আমি তাচ্ছিল্যের সুরে বললাম, তবে বললাম কেবল লোক দেখানোর খাতিরে, গর্বমিশ্রিত আনন্দ লুকিয়ে রাখার জন্য: তা নয়ত কী? — আমাদের জন্য ফিল্মে নতুন একটা দৃশ্যও দিতে হচ্ছে!

'চল, চল! শুটিং শুরু হবে!' পরিচালক বললেন।

তিনি আমাদের নৌকোর দিকে নিয়ে গেলেন।

'নৌকো বাইতে জান?'

জানি বৈ কি!' জাভা উল্লসিত হয়ে বলল। 'আমরা জলাতে বড় হয়েছি!'

'চমৎকার! তাহলে শোন। মেয়েটি বসে থাকবে নৌকোর মুখে। তুমি,' গুমটিকে দেখিয়ে তিনি বললেন, 'তুমি বসবে এই এখানে... তুমি,' আমার কাঁধ ধরে তিনি বললেন, 'দাঁড় নিয়ে এখানে... আর তুমি,' জাভার দিকে ঘুরে বললেন, 'হাল ধরে বসে থাকবে পেছনে... নৌকোর সামনে আর পেছনে, দেখতে পাচ্ছ ত, দড়ি আছে, পাথর বাঁধা। যেখানে বলা হবে সেখানে ফেলবে নোঙ্গরের বদলে। খেয়াল রাখবে নৌকো যেন সরে না যায়। আর দেখো, কক্ষনো ক্যামেরার দিকে তাকাবে না! তাকাবে কেবল মিলিটারী পুলিশটার দিকে। নইলে কিন্তু রীলটাই নষ্ট হয়ে যাবে।'

আমরা নৌকোয় চেপে বসলাম, জাভা দাঁড় দিয়ে ঠেলল। আমি ঝপাঝপ দাঁড় টানলাম, চেষ্টা করলাম যতদূর সম্ভব সুন্দর করে, কায়দা করে দাঁড় টানতে — দেখুক সবাই, কেমন আমি দাঁড় বাই!.. কিন্তু তৃতীয় বার আর দাঁড় ফেলতে হল না।

'স্টপ্!' ক্যামেরাম্যান নির্দেশ দিল। সে ততক্ষণে পুলের ওপারে ভেলা থেকে আমাদের ওপর মুভী ক্যামেরা তাগ করেছে। এই আকস্মিকতায় আমি চমকে উঠলাম, দাঁড়টা সামলাতে সামলাতে ফস করে এসে পড়ল জলের ওপর, গুমটি আর জাভার গায়ে জল ছিটকে গেল। দেখাতে আর পেলাম কোথায়, আমি কেমন বাইতে পারি!

'পেছনে হটাও!' ক্যামেরাম্যান চেঁচিয়ে বলল। 'একটু বাঁয়ে... এবারে একটু ডাইনে... সামান্য এগিয়ে... না, না, এটা বেশি হয়ে গেল... পেছনে... এবারে বাঁয়ে... আরও একটু... হয়েছে, হয়েছে। একটু ডাইনে...'

মিনিট পাঁচেকের কম হবে না, খুঁতখুঁতে স্বভাবের ক্যামেরাম্যানের হুকুমে

আমরা এদিক-ওদিক নৌকো চালাচালি করতে করতে হিমসিম খেয়ে যাই: শেষকালে সে চে'চিয়ে বলল:

'স্ট-অপ্! নোঙ্গর ফেল! চুপচাপ বসে থাক, নৌকো যেন নড়েচড়ে না...'

নৌকোর পেছন দিক থেকে জাভা আর সামনের দিক থেকে ভালকা জলে পাথর ছ‍ুঁড়ে দিল। নৌকো দাঁড়িয়ে পড়ল। আমরা স্থির হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম শ‍ুটিং-এর।

'অ্যাটেনশন প্লীজ, অ্যাটেনশন প্লীজ! রেডি! শ‍ুর‍ু হল...' হঠাৎ শোনা গেল পরিচালকের জোরালো গলা। এর মধ্যে কোন ফাঁকে তিনি এসে ক্যামেরাম্যানের পাশে ভেলার ওপর দাঁড়িয়ে পড়েছেন ঝকঝকে ধাতুর চোঙ ম‍ুখে লাগিয়ে। কী করে যে তিনি ভেলার ওপর এলেন আমরা লক্ষই করি নি — যেন যিশ‍ু খ‍্রীষ্টের মতো সোজা জলের ওপর দিয়ে হে'টে উঠে এসেছেন।

মিলিটারী প‍ুলিশ আর আর্তেম দ‍ুজনেই সিগারেট ফেলে দিল। পাড় থেকে প‍ুলের ওপর দিয়ে তাদের দিকে ছ‍ুটে এলো বেরেট টুপি মাথায় এক য‍ুবক। তার হাতে একটা কাঠের ফলক, ওপরের দিকটা রঙ দিয়ে ডোরাকাটা — অনেকটা রেলফটকের মতো, নীচটা কালো, যেন ক্লাসের ব্ল্যাকবোর্ড, আর সেই অংশে খড়ি দিয়ে লেখা আছে:

'আর্তেম'

২৯৭-১

'অ্যাটেনশন প্লীজ!.. স্টার্ট!.. শ‍ুটিং চলছে!' পরিচালক চে'চিয়ে বললেন।

ছোকরা তার কাঠের তক্তার 'রেলফটকটি' বাড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেল সোজা মিলিটারী প‍ুলিশের নাকের সামনে — তারপর চটাস করে একটা আওয়াজ!

''আর্তেম' দ‍ুশ' সাতানব্বই... ডাব্‌ল এক নম্বর...' ছোকরা চে'চিয়ে এই কথাগ‍ুলি বলেই তক্তাজোড়া বগলদাবা করে নীচু হয়ে দ্র‍ুত পায়ে চলে গেল পাড়ের দিকে।

মিলিটারী প‍ুলিশ আর আর্তেম ততক্ষণে জাপটাজাপটি লাগিয়ে দিয়েছে।

পুলের ওপর চলছে তাদের ব্যস্ততা। দেখতে দেখতে আর্তেম ঝট করে হাত ছাড়িয়ে নিল, হাত তুলল, দড়াম করে বসিয়ে দিল মিলিটারী পুলিশের বুকে। মিলিটারী পুলিশ ঝপাং করে গিয়ে পড়ল জলে। ও-হো-হো! জল ছিটকে উঠে যেন আকাশের গায়ে ঠেকল, আমার দাঁড় থেকে আর কতটা ছিটকেছিল! এক মুহূর্ত পরেই জল থেকে জেগে উঠল কেবল মিলিটারী পুলিশের বুটজোড়া। আর্তেম ততক্ষণে হাওয়া হয়ে গেছে। জলে তোলপাড় উঠল — আরে দ্যাখ, দ্যাখ, মিলিটারী পুলিশের মাথাটা ভেসে উঠেছে। মাথায় টুপি নেই, চুল এসে লেপটে পড়েছে চোখের ওপর, নাক দিয়ে জল ঝরছে, সর্বাঙ্গ বয়ে ঝরছে, গোঁফজোড়া দেখতে হয়েছে সিন্ধুঘোটকের মতো, মুখ দিয়ে জলের ফোয়ারা বেরোচ্ছে, দেড় মিটার দূরে ছিটকে পড়ছে। ওঃ কী কান্ড! দারুণ অ্যাক্টো করে কিন্তু!

'আরে, তোমরা ফুর্তির ভাব দেখাও! ফুর্তির ভাব দেখাও!' সঙ্গে সঙ্গে ভেলা থেকে শোনা গেল পরিচালকের পরিত্রাহি চিৎকার।

আমরা চমকে উঠে ফ্যালফ্যাল করে মুখ চাওয়া-চাউয়ি করতে লাগলাম, সামান্য উঠে দাঁড়ালাম... আমার কাছে আয়না না থাকায় নিজের মুখ আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু ভালকা, জাভা আর গুমটির মুখ সোজা কথায় দেখতে হয়েছিল বোকা-বোকা। চোখ ড্যাবড্যাব করে বেরিয়ে এসেছে, মুখ হাঁ, বেঁকে গেছে। একে অবশ্যই ফুর্তির প্রকাশ বলা যায় না। কী বলা যায় ভগবানই জানেন।

'স্টপ্!' পরিচালক চেঁচিয়ে বললেন। কোথায় কিসের যেন খুট খুট আওয়াজ হল। টোনওয়াগনের গুনগুনানি বন্ধ হয়ে গেল। 'তোমরা কি ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? তোমাদের হয়ে কে পার্ট করবে? আমি নাকি? তোমরা যে মিলিটারী পুলিশের সঙ্গে একই দৃশ্যে আছ। মিলিটারী পুলিশ পড়ে যাচ্ছে... তোমাদের উচিত বেজায় উল্লসিত হওয়া... আমি যে আগে থাকতে পইপই করে বলে দিলাম তোমাদের। আমার এক নম্বর ডাব্‌ল দিলে ত নষ্ট করে। এখন মিলিটারী পুলিশকে নতুন করে জামাকাপড় পরতে হবে। দেখ দেখি কী কান্ড বাধালে তোমরা!'

আমরা বসে রইলাম পর্যুদস্ত অবস্থায়। আমরা এতই মুগ্ধ হয়ে মিলিটারী পুলিশের অভিনয় দেখছিলাম যে আমাদের যখন আনন্দ করার কথা ছিল সেই মুহূর্তটি হাতছাড়া হয়ে গেল। কিন্তু কী আশা কর আমাদের কাছ থেকে?

হাজার হোক, এটা যে আমাদের জীবনের প্রথম শুটিং! তোমরা কি ভাব আমরা রাতারাতি আর্কাদি রাইকিন বনে যাব?!

মিলিটারী পুলিশ জল থেকে উঠে এসে ঘুষি তুলে আমাদের শাসাল, তবে তার সেই শাসানির মধ্যে কোন বিদ্বেষ ছিল না, সে মৃদু হাসল। তাছাড়া চোখও টিপল। তারপর জামাকাপড় পালটানোর জন্য চলে গেল টোনওয়াগনের পেছনে।

'আমরা ওদের ডুবিয়েছি! এসো অন্তত এবারে ভালো করে আনন্দ করা যাক,' নৌকোর পেছন দিক থেকে ফিসফিস করে বলল জাভা।

'আচ্ছা!'

'ঠিক আছে!'

'তা ত বটেই,' আমরা তিনজনেই সায় দিয়ে বললাম।

মিলিটারী পুলিশ যখন পোশাক পালটাচ্ছিল সেই অবসরে আমি আনন্দ সঞ্চয় করতে লাগলাম। বসে বসে স্মরণ করতে লাগলাম আমার জীবনের সবচেয়ে ভালো ভালো ঘটনাগুলি: মনে পড়ল আমাকে নতুন ফুটবল-বুট কিনে দেওয়া হয়েছিল, তরমুজখেতে একবার আমি প্রকাণ্ড তরমুজ বাগিয়েছিলাম, আমার শত্রু কারাফোলকা শরীরচর্চার ক্লাসে শোচনীয় নম্বর পেয়েছিল... আমি দেখতে পেলাম জাভার দৃষ্টি পড়ে আছে আমার ওপর। সে আমার দিকে তাকিয়ে শ্লেষের হাসি হাসল। আমি আন্দাজ করতে পারি ও কোন্ ঘটনা স্মরণ করছে! ওর সম্ভবত মনে পড়ছে সকলের সামনে গাছ থেকে জলে ঝাঁপ দিতে গিয়ে আমার দুর্দশার ঘটনা, যখন আমার জাঙ্গিয়া গাছের ডালে বেধে গিয়ে ছিঁড়ে ফালাফালা হয়ে যেতে আমি উলঙ্গ হয়ে জলে পড়ে যাই... তা মনে করুক গে, শিল্পের খাতিরে আমার আফশোস নেই! শুটিংটা বানচাল না হলেই হল!

'ওরে পাজী, ছুঁচো, ইউরোপের মিলিটারী পুলিশ, অমনই হওয়া দরকার তোর! হি-হি-হি!' আমার পাশে আপন মনে ফিসফিসিয়ে বলছে গুমটি — নিজেকে ঠিকঠাক করে নিচ্ছে, তৈরি হচ্ছে।

ভালকা যে কী ভাবে প্রস্তুত হচ্ছে তা আমি দেখতে পাচ্ছি না, শুনতেও পাচ্ছি না, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে সেও প্রস্তুত হচ্ছে। এইবারে আমরা দেখিয়ে দেব! ওঃ যা ফুর্তিটা করব না!

টোনওয়াগনের পেছন থেকে মিলিটারী পুলিশ বেরিয়ে এলো নতুন শুকনো ইউনিফর্ম পরে — দেখে মনে হচ্ছিল যেন আদৌ সে জলে পড়ে নি।

অবশেষে আবার... ফের দাঁড়িয়ে আছে সে আর আর্তেম পুলের ওপরে।

'অ্যাটেনশন প্লীজ!.. স্টার্ট!.. শুটিং চলছে!' পরিচালক চেঁচিয়ে বললেন।

ফের ছুটে আসে বেরেট টুপি মাথায় সেই ছোকরা, তার 'রেলফটকটা' দিয়ে চটাস আওয়াজ করে হাঁক দেয়:

''আর্তেম'... দুশ' সাতানব্বই... ডাব্‌ল দু নম্বর...'

গড়গড় করে ওঠে টোনওয়াগন। মিলিটারী পুলিশের সঙ্গে আর্তেমের হাতাহাতি বেধে যায়। ঝটাস!.. ঝপ!.. ঝপাং!.. মিলিটারী পুলিশ পড়ল গিয়ে জলে।

আমরা লাফিয়ে উঠি।

'স্টপ্!' পরিচালক চেঁচিয়ে বললেন।

ধুত্তোর! আমাদের জমা এত বারুদ কিনা মাঠে মারা গেল!

ব্যাপার কী? না, আর্তেম দৌড়ুতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গেছে। তখনও সে শুটিং-এর নাগালের ভেতরে ছিল। আর্তেম হল নায়ক — সে পড়ে গেলে চলবে কী করে? নায়কদের পড়ার কথা নয়। সিনেমায় পতন হয় কেবল খল-চরিত্রদের।

আর্তেম কাচুমাচু হয়ে গজগজ করে বলল:

'পড়ব না ত কী?.. কে না কে কতকগুলো তরমুজের খোসা ফেলে গেছে... সার্কাসে দড়ির ওপর যে খেলা দেখায় সে পর্যন্ত আছাড় খাবে এখানে।'

পরিচালক কোন কথা না বলে ভুরু কোঁচকান। ফিল্‌মের প্রধান চরিত্রদের গালাগাল করেন না পরিচালকরা। তাঁরা গালাগাল করেন কেবল এক্সট্রাদের।

মিলিটারী পুলিশ জল থেকে উঠে এসে ঘুষি তুলে শাসায় আর্তেমকে, কিন্তু এবারে আর হাসে না, চোখও টেপে না। টোনওয়াগনের পেছনে চলে যায় কাপড় বদলাতে।

ফের শুরু হল:

'অ্যাটেনশন প্লীজ!.. স্টার্ট!.. মেশিন চালু করুন!'

ক্ল্যাপ্‌স্টিক! — 'রেলফটক'।

''আর্তেম'... দুশ' সাতানব্বই... ডাব্‌ল তিন নম্বর...'

...ঝটাস! ঝপ্‌!.. ঝপাং!

'হুর্‌রে! হা-হা-হা! হো-হো-হো!' আমরা ফুর্তি করতে লাগলাম সত্যিকারের মতো, যেমন বলা হয়েছে তেমনি, আমাদের 'ভূমিকা অনুযায়ী' ততটা নয়, যতটা এই কারণে যে শেষ কালে আমাদের ছবি তোলা হচ্ছে। দেখলাম পরিচালক হাসছেন, আমাদের উদ্দেশে মাথা দুলিয়ে ইশারায় তাঁর সন্তুষ্টি জানাচ্ছেন। যাক, হল তাহলে!

'স্টপ্‌!' ক্যামেরাম্যান হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল। 'চলবে না! গাছের ডালে মেয়েটা আড়াল পড়ে যাচ্ছে।'

কী ফেসাদ রে বাবা!.. আমরা শত্রুভাবাপন্ন দৃষ্টিতে তাকালাম ভালকার দিকে, যেন গাছের কোন একটা ডাল এসে তাকে আড়াল করে দেওয়ায় দোষটা তারই।

'ডাল কেটে ফেলতে হবে!.. এক্ষুনি! এ কী যা তা কাণ্ড! শুটিং-এর জন্যে আগে থাকতে সব তৈরি করে রাখতে পারে না! আমার কাজ পণ্ড করে দেওয়া হচ্ছে! কী যাচ্ছেতাই ব্যাপার চলছে এই স্টুডিওতে!' পরিচালক চেঁচান — কার উদ্দেশে কে জানে?

আমরা বসে থাকি, সগর্বে চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। দোষটা আমাদের নয়। আমরা ভালোই পার্ট করেছি। পরিচালক মাথা নাড়িয়ে ইশারায় জানিয়েছেন, হেসেছেন। সত্যিই ত এই ডাব্‌লটা যে নষ্ট হল একে যা তা কাণ্ড ছাড়া আর কীই বা বলা যায়? দেখা যাচ্ছে আমাদের ফুর্তি করাটা মাঠে মারা গেল।

মিলিটারী পুলিশ জল থেকে উঠে এলো। এবারে আর ঘুষি উঁচিয়ে কাউকে শাসায় না, তবে আপন মনে গজগজ করে কী যেন বলে — মনে হয় গালাগাল দিচ্ছে... তা ত দেবেই, আমরা ওকে বুঝতে পারি। জলে পড়া ফুর্তি করার চেয়ে সহজ নয়।

'অ্যাটেনশন প্লীজ!.. স্টার্ট!.. মেশিন চালু করুন!'

আবার সেই 'রেলফটক'।

ক্ল্যাপ্‌স্টিক!

''আর্তেম'... দুশ' সাতানব্বই... ডাব্‌ল চার নম্বর...'

ঝটাস! ঝপ্‌! ঝপাং!

'হা-হা-হা! হুর্রে! হো-হো-হো!.. ই-ই-ই!'

'স্টপ্! আরও একবার! মিলিটারী পুলিশ যথেষ্ট পরিমাণ ভাব ফুটিয়ে তুলতে পারে নি।'

চার চারবার জলে হাবুডুবু খেলে ভাবটা আর কোত্থেকে আসবে?

'অ্যাটেনশন প্লীজ!.. স্টার্ট!.. মেশিন চালু করুন!'

'রেলফটক'।

ক্ল্যাপ্স্টিক!

''আর্তেম'... দুশ' সাতানব্বই... ডাব্ল পাঁচ নম্বর...'

ঝটাস! ঝপ্! ঝপাং!

'স্টপ্!'

মিলিটারী পুলিশের এক পাশের গোঁফ আলগা হয়ে গেছে। কী আশা কর শুনি? সত্যিকারের গোঁফই এমন পরীক্ষার সামনে টিকতে পারবে না, আঠালাগানো গোঁফ ত দূরের কথা!

ভিজে সপসপে মিলিটারী পুলিশ চলে যায় টোনওয়াগনের পেছনে। টোনওয়াগনের পেছন থেকে বেরিয়ে আসে শুকনো ঝরঝরে মিলিটারী পুলিশ।

'অ্যাটেনশন প্লীজ!.. স্টার্ট!.. মেশিন চালু করুন!'

'রেলফটক'।

ক্ল্যাপ্স্টিক!

''আর্তেম'... দুশ' সাতানব্বই!.. ডাব্ল ছয় নম্বর!'

ঝটাস! ঝপ্! ঝপাং!

'হা-হা!.. হো-হো! ওঃ-হো-হো!.. হি-হি!' আমরা চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখি না।

'স্টপ্! সাবাস! থাক! এখন মনে হচ্ছে সব ঠিক আছে! যেমনটি দরকার!' পরিচালক সন্তুষ্ট হয়ে

বললেন। (খুশিতে বিগলিত হাসি ফুটে ওঠে আমাদের মুখে)। এমন সময় পরিচালক আঁতকে ওঠেন, চোখ বিস্ফারিত করে বলেন: 'এটা কী? হাতে এটা কী?!'

আমি বুঝতে পারি না যে আমাকেই বলা হচ্ছে, তাই আরও খানিকক্ষণ খুশিতে হাসি-হাসি মুখ করে থাকি। গুমটি আমার পাঁজরে ঠেলা দেয়। আমি নিজের হাতের দিকে তাকাই, আর তখনই বুঝতে পারি গোটো ব্যাপারটা।

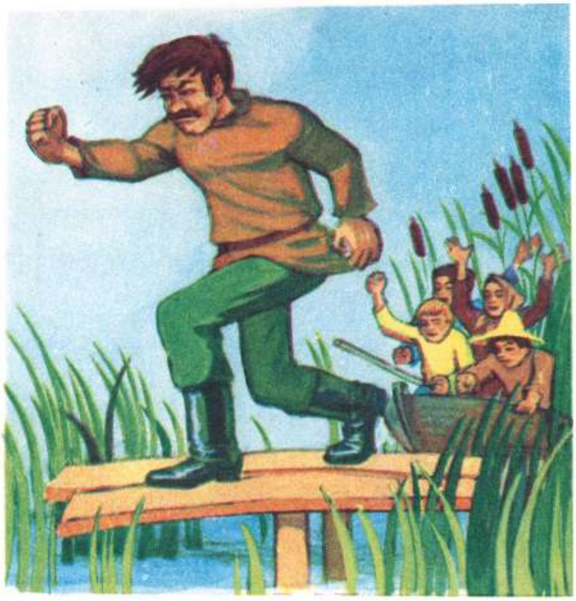

'ঘ-ড়ি...' আমি বিড়বিড় করে বলি।

'কী-ই? গেল, সব গেল! কে কোথায় দেখেছে বিপ্লবের আগের সময়কার গরিব ঘরের ছেলেপুলেদের হাতে ঘড়ি? ইস্! গেল, আমার সব ডাব্‌লগুলো গেল। হায়, হায়!' কেমন যেন কাঁদো-কাঁদো গলায় চিৎকার করলেন পরিচালক, তারপর মুখের সামনে চোঙা ধরে এবারে তাঁর নিজের অভ্যস্ত গলায় চেঁচাতে লাগলেন: 'যে যার জায়গায় থেকে যান! ফের শুটিং! ফের শুটিং!' তারপর কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন আমাকে: 'এক্ষুনি ঘড়ি খুলে পাড়ে দিয়ে দাও! এক্ষুনি!'

আমার ভেতরটা সঙ্গে সঙ্গে অসাড় হয়ে গেল, আমি মাথা হেঁট করে বললাম:

'দেব না!'

'অ্যাঁ? কী?' পরিচালক নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না।

'দেব না... এটা আমার ঘড়ি নয়... এর মধ্যে একবার খোয়া গিয়েছিল। আজই মালিককে ফিরিয়ে দেবার কথা।'

'তার মানে তুমি আমার গোটা শুটিংটা ভণ্ডুল করতে চাও?'

'যদি তা-ই হয় আমি বরং নামব না। আমি পাড়ে চলে যাচ্ছি।'

আমাদের থেকে খানিকটা দূরে কোমরজলে দাঁড়িয়ে ভিজে জবজবে মিলিটারী পুলিশ সমস্ত কথাবার্তা শুনছিল, সে বলল:

'আচ্ছা, দাও দেখি, এই হতভাগ্য ঘড়িটা আমাকে দাও...'

'ইস্, বললেই হল!' বলে আমি ঘড়িসুদ্ধ হাতটা পিছনে লুকিয়ে ফেলি, ভাবটা এই যেন মিলিটারী পুলিশ জোর করে ওটা ছিনিয়ে নেবার মতলব করছে।

'কী হল? বিশ্বাস করে দিতে পারছ না আমার হাতে?'

আমি চুপ করে থাকি।

হঠাৎ মিলিটারী পুলিশটা মৃদুস্বরে, খুবই মৃদুস্বরে বলে:

'আমি কিন্তু স্নানের ঘাটে বিশ্বাস করে তোমার হাতে তুলে দিয়েছিলাম... ইতস্তত করি নি...'

কেউ যেন আমার পিঠে দড়াম করে লাঠির বাড়ি মারল — আমি লাফিয়ে এগিয়ে এলাম, আমার মুখ হাঁ হয়ে গেল।

'কী-ই?'

'চিনতে পারলে না ত?' মিলিটারী পুলিশ হাসল।

আমি বেশ করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম... না, হতে পারে না। কোন মিলই যে নেই চেহারার! জাভার দিকে ফিরে তাকালাম — কেবল কাঁধ ঝাঁকায়: সে-ও চিনতে পারে না।

মিলিটারী পুলিশ তখন চারদিকে চোখ বুলিয়ে কাকে যেন খুঁজতে থাকে, শেষকালে সাদা স্মক পরা ল্যুদমিলা ভ্যাসিলিয়েভনার ওপর দৃষ্টি পড়তে তার নিজের সেই প্রিয় ভঙ্গিটা করল — ঘুষি তুলে শাসাল, চেঁচিয়ে বলল:

'উঃ!.. আমাকে এমনভাবে রঙচঙ মাখিয়ে দিয়েছে যে ছেলেরা আমার নিজের ঘড়িটাই ফেরত দিতে চাইছে না।'

দেখি, চারপাশের সবাই হাসছে — ল্যুদমিলা ভাসিলিয়েভনা, পরিচালক, ক্যামেরাম্যান, দীঘির পাড়ে আর যারা যারা ছিল তারাও। দেখি ভালকা হাসছে, গুমটিও, জাভার ঠোঁটজোড়াও ইতিমধ্যে প্রসারিত হয়ে পড়ছে। তার মানে, এ-ই সেই লোক!.. ও-ই আমাদের সেই তেরো নম্বর ফ্ল্যাটের অপরিচিত লোকটি! আমি নিজেই তখন শুরু করলাম হাসতে, তারপর বললাম:

'তা-ই যদি হবে তাহলে আপনি এমন কেন?.. বললেন ত 'জার, জার...' কিন্তু আসলে ত দেখছি এক এলেবেলে মিলিটারী পুলিশ। এদিকে আমরা বোকার মতো হন্যে হয়ে সারা কিয়েভ ঘুরে জারকে খুঁজে মরি।'

সবাই আরও বেশি করে হেসে উঠল।

'কোথাও কোন ভুল নেই,' মিলিটারী পুলিশবেশী অপরিচিত লোকটি বলল। 'জারের কথা যদি বল — তোমাদের দিক থেকে কোন ভুল নেই। জারের পার্ট আমি করি ঠিকই। এই ফিল্মেই। জার আর মিলিটারী পুলিশ — দুই ভূমিকা। এই ইয়েভ্গেনি মিখাইলভিচের মাথা থেকে বেরিয়েছে। মোট কথা, খোকারা, আমার ঘড়ি নিয়ে তোমাদের এত ঝামেলায় ফেলার জন্যে আমাকে ক্ষমা করো। বিশ্বাস কর, আমার একদম ইচ্ছে ছিল না... তখন আমার বড় তাড়া ছিল... রিহার্স্যালে যাবার তাগাদা ছিল। মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচের কাছ থেকে তোমাদের দুর্ভোগের কথা শুনলাম... তা, স্নানের ঘাটে মিলিশিয়ার কাছে যাবার কথাটা তোমাদের মাথায় খেলল না? আমি যে বিশেষ করে ছুটে গেলাম ওখানে — ওদের জানিয়ে দিলাম, আমার ঠিকানা রেখে এলাম ওখানে।

'আচ্ছা, হয়েছে হয়েছে...' হাসতে হাসতে তার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে পরিচালক বললেন। 'পরে কথাবার্তা হবে। আপনাদের ত সব ভালোয় ভালোয় শেষ হল, এদিকে আমার অবস্থা... ছুটে গিয়ে জামাকাপড় পালটে আসুন। ফের শুটিং! সবই আপনার ঘড়ির জন্যে।'

'আশঙ্কা হচ্ছে যে জামাকাপড় পালটে কোন লাভ হবে না,'

দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলল মিলিটারী পুলিশবেশী জার। 'এটা ছিল শেষ শুকনো ইউনিফর্ম।' এই বলে দু' আঙুল দিয়ে প্যান্টের প্রান্তভাগ তুলে ধরল। সেখান থেকে তখন টপটপ করে জল ঝরছিল।

'সে কী কথা? ক্লাভা! ক্লাভা! মিলিটারী পুলিশের শুকনো ইউনিফর্ম কোথায়? এক্ষুনি চাই শুকনো ইউনিফর্ম! অপেক্ষা করছি! শিগগির! আপনি আমার শুটিং ভণ্ডুল করে দিচ্ছেন!'

'ইয়েভ্‌গেনি মিখাইলভিচ! পোশাকের আলমারিতে ছিল ছয়টা ইউনিফর্ম। ছয়টার সব কটাই ভিজে।' ক্লাভা হাসতে হাসতে বলল। 'আর কোথা থেকেই বা নেব? শুকোনো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।'

'অপেক্ষা করতে হবে! অপেক্ষা করতে হবে মানে? সূর্য ত আর অপেক্ষা করবে না! সূর্য এদিকে অস্ত যেতে বসেছে!' চেঁচিয়ে বললেন পরিচালক, যদিও সূর্য অস্ত যাবার কোন লক্ষণ তখনও দেখা যাচ্ছিল না।

'ইয়েভ্‌গেনি মিখাইলভিচ,' শান্তস্বরে বলল ক্যামেরাম্যান, 'আমার মনে হয় নতুন করে শুটিং-এর কোন দরকার হবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ফিল্‌মে ঘড়ি আসে নি। এলে আমার চোখে পড়ত। ফিল্‌ম ডেভালপ করে দেখা যাক, তাহলেই বুঝতে পারবেন।'

'আর যদি থেকে যায়?'

'তাহলে ফের শুটিং করতে হবে।'

ক্যামেরাম্যানের সৌভাগ্য বলতে হবে যে শেষ অবধি বলে কয়ে পরিচালককে রাজী করাল; পরিচালক তখন মধ্যাহ্নের বিরতি ঘোষণা করলেন।

'বিরতির পর 'মারিয়ার সঙ্গে আর্তেমের সাক্ষাৎকার' দৃশ্যের শুটিং হবে।'

'তোমরা পালিয়ে যেয়ো না কিন্তু বন্ধুরা,' মিলিটারী পুলিশবেশী জার বলল। 'আমি জামাকাপড় পালটে এক্ষুনি বেরোচ্ছি। আজ আর আমার শুটিং নেই। মারিয়ার ভূমিকায় আমি নেই... তাই বলছি কি, তোমরা পালিয়ে যেয়ো না... আজকের দিনটা আমাদের উদ্‌যাপন করা দরকার। মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ, আপনি সামনের হলঘরে আমার জন্যে অপেক্ষা করুন। অপেক্ষা করবেন ত?'

মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ অনেকক্ষণ হল, তিন নম্বর ডাব্‌ল থেকেই

টোনওয়াগনের কাছাকাছি চেয়ারে বসেছিলেন। তিনি হেসে সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়লেন।

আমরা জামাকাপড় পালটাতে গেলাম। যে সহকারীটি আমাদের নিতে এসেছিলেন তিনি এর পর এসে আমাদের প্রত্যেককে তিনটি করে রুবল দিলেন। যে সমস্ত এক্সট্রা আর্টিস্ট শুটিং-এ নামে তাদের নাকি দৈনিক তিনটি করে রুবল দেওয়া হয়। এটা কিন্তু দারুণ! সিনেমায় নামলে, তোমার নামডাক হল, শুধু তাই-ই নয়, এ জন্য তার ওপর দক্ষিণাও পেলে!

আমাদের বিদায় জানানোর সময় ইয়েভ্গেনি মিখাইলভিচ বললেন:

'প্রিয় বন্ধুরা, তোমাদের ধন্যবাদ! সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ। সাবাস বলতে হবে তোমাদের! ১৯০৫ সালের সময়কার গরীবদুঃখী ঘরের ছেলেমেয়েদের বিপ্লবী মেজাজের খুবই বিশ্বাসযোগ্য দৃশ্য তোমরা গড়ে তুলেছ। ফের শুটিং করতে হলে আমরা তোমাদের ডেকে পাঠাব। আচ্ছা, চলি!'

এই বলে তিনি আমাদের প্রত্যেকের করমর্দন করলেন। এই করমর্দন, তার ওপরে তিন রুবল করে দক্ষিণা আমাদের মনে খুবই গভীর ছাপ ফেলল। আমরা তখন দারুণ মেজাজে আছি। আমার মনে হয়, এরকম মেজাজ থেকেই সুখের সূচনা।

আমাদের তেরো নম্বর ফ্ল্যাটের অজানা লোকটির নাম ওলেগ ইভানভিচ। পুশ্কিনের স্মৃতিমূর্তির সামনে থেকে ওলেগ ইভানভিচ ট্যাক্সি নিলেন। আমরা ট্যাক্সিতে চেপে চললাম — চললাম সেখানে যেখানে 'ষোল বছর পর্যন্ত বালক-বালিকাদের' কেন, সম্ভবত 'আঠারো বছর বয়সীদেরও প্রবেশ নিষেধ' — আমরা চললাম রেস্তোরাঁয়। চৌরাস্তার মাথার ওপর টিলার সেই রেস্তোরাঁটিতে, যাকে বলে কিয়েভের শীর্ষবিন্দু — সেই 'মস্কো' রেস্তোরাঁয়। আর ষোলতলা দালানের সবগুলি তলা পেরিয়ে দ্রুতগামী লিফ্‌টে করে আমরা গিয়ে উঠলাম একেবারে ছাদে।

গোটা কিয়েভ আমাদের পায়ের তলায়। খেলনার মতো গাড়ি ও ট্রলিবাস যাতায়াত করছে চৌরাস্তার ওপর, আর ফুটপাথে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছে লোকজন ত নয়, যেন পিপড়ের দল। এত দূর পর্যন্ত চোখে পড়ছিল যে মনে হচ্ছিল আরেকটু হলেই দেখা যাবে জন্মস্থান ভাসিউকোভ্কা...

আমরা টেবিলের ধারে বসামাত্র দূর থেকেই হাসিমুখে আমাদের সম্ভাষণ জানাতে জানাতে, সত্যি কথা বলতে গেলে কি ওলেগ ইভানভিচ ও মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচকে সম্ভাষণ জানাতে জানাতে আমাদের দিকে ছুটে এলো এক অল্পবয়সী পরিচারিকা। এভাবে লোকে কেবল তাদেরই সম্ভাষণ জানাতে পারে যাদের তারা ভালোমতো জানে, ভক্তিশ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে।

ওলেগ ইভানভিচ যত রকমের সম্ভব খাবারদাবার অর্ডার দিতে লাগলেন। অনেকক্ষণ ধরে অর্ডার দিতে লাগলেন, লিখতে লিখতে পরিচারিকার নোটবইয়ের দুটো পাতা ফুরিয়ে গেল।

আমাদের পাশ দিয়ে ছুটে গেল এক ওয়েটার। সেও মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ ও ওলেগ ইভানভিচের উদ্দেশে মাথা নেড়ে অমায়িক সম্ভাষণ জানাল। ওয়েটারের হাতে ছিল একটা বড় ট্রে। ট্রের ওপরকার প্লেটগুলি থেকে ভাপ বেরোচ্ছিল, আর বেরোচ্ছিল বেশ রুচিকর গন্ধ।

'এত সুন্দর গন্ধটা কিসের?' মৃদুস্বরে আমাকে জিজ্ঞেস করল জাভা। (আমরা যে সকাল থেকে কিছুই খাই নি — এমন কি নিজেদের স্যান্ডউইচের কথাও ভুলে গিয়েছিলাম)।

পরিচারিকা কথাটা শুনতে পেয়ে হাসিমুখে জাভার দিকে ঘুরে বলল:

'এ হল মাংসের চাপ। চাই নাকি?'

জাভা লজ্জায় লাল টকটকে হয়ে গেল। ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে সে যেন এই মাংসের চাপের জন্য আবদার ধরেছে।

'তা আর বলতে! এক্ষুনি সবাইকে মাংসের চাপ দেওয়া হোক। আমাদের বেজায় খিদে পেয়েছে যে! সারাটা দিন ধরে শুটিং চলেছে...' উঁচু গলায় রেস্তোরাঁর সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন ওলেগ ইভানভিচ।

একথায় আমরা চারজনেই লাল হয়ে উঠলাম — পরিতৃপ্তিতে আর গর্বে।

পরিচারিকাটি কোথায় যেন ছুটে চলে গেল, তারপর আমাদের টেবিলের ওপর একে একে এনে রাখতে লাগল নানা ধরনের বোতল ও প্লেট।

আমরা সত্যিকারের বয়স্ক অভিনেতাদের মতো রেস্তোরাঁয় 'যথেচ্ছাচার' করলাম। স্প্র্যাট, সার্ডিন, হ্যাম, মুরগীর সসেজ, স্যালাড, মাছের ডিম, কাঁকড়া ইত্যাদি

অসংখ্য খাবার আমরা খেলাম... মাংসের চাপ খেলাম... খেলাম পেস্ট্রি, মিঠাই, আইসক্রিম।

মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ আর ওলেগ ইভানভিচ ব্র্যাণ্ডি পান করলেন। আমাদের দেওয়া হল একটু করে শ্যাম্পেন। শ্যাম্পেন খেয়ে আমাদের হিক্কা উঠতে লাগল। আমরা ন্যাপকিনের আড়াল দিয়ে হিক্কা তুলতে তুলতে মন দিয়ে শুনলাম ওলেগ ইভানভিচের কথা:

'খুদে বন্ধুরা, এসো, তোমাদের সাফল্যের জন্যে পান করা যাক! পান করা যাক শিল্পের কণ্টকময় পথে তোমাদের প্রথম পদক্ষেপের জন্যে! এ পথে যারা পা বাড়িয়েছে তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে নিদারুণ দুঃখ, নিদারুণ কষ্ট, আবার পরম সুখও বটে। এসো তোমাদের পরম সুখ কামনায় পান করি!'

আমরা আপত্তি করলাম না।

আমরা বসে বসে আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে চারপাশের সবকিছু দেখছিলাম। গোঁফওয়ালা কতকগুলি ছোকরা, রঙচঙমাখা কিছু মেয়ে আমাদের পাশের টেবিলে বসে ছিল। তারা আমাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কী যেন বলাবলি করছিল।

এটা ছিল খ্যাতি।

সেই খ্যাতি, যা ছিল আমাদের বহুকালের স্বপ্ন।

ওঃ, এর নামই তাহলে খ্যাতি! রেস্তোরাঁ, টেবিল, টেবিলের ওপর ফুলদানিতে সাজানো কাগজের রুমাল, গোটা কিয়েভ আমাদের পায়ের তলায়, মাংসের চাপ, মুরগীর সসেজ, শ্যাম্পেন, আর হিক্কা... চমৎকার!

আমাদের সাফল্যের জন্য এবং আমাদের সুখকামনায় পান করার পর ওলেগ ইভানভিচ ও মাক্সিম ভালেরিয়ানভিচ আমাদের আর বিরক্ত না করে কথাবার্তা শুরু করলেন কোন এক স্তেপান স্তেপানভিচ সম্পর্কে, যে লোকটা নাকি 'মাফ করবেন, শিল্পের মাথামুণ্ডু কিছুই জানে না, সত্যিকারের শিল্পসম্মত চলচ্চিত্র তোলার পথে কেবল ব্যাঘাত সৃষ্টি করে'।

স্তেপান স্তেপানভিচ নামে সেই লোকটা খারাপ হোক আর যাই হোক আমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করলাম, যেহেতু তারই কল্যাণে আমরা নিজেদের সুখ থেকে শেষ পর্যন্ত জ্ঞান ফিরে পেয়ে আমাদের টেবিলের ওপরে রাখা পেস্ট্রি

মিঠাই এবং অন্যান্য ভোজ্যদ্রব্যের প্রতি যথাযোগ্য মনোযোগ দিতে পারলাম। সবই ছিল এত মুখরোচক, এতই মুখরোচক যে এর পর তিন দিন আমরা পেটের ব্যথায় ভুগলাম।

* * *

আর তিন দিন বাদে যখন আমরা সুস্থ হয়ে উঠলাম তখন আমরা আমাদের প্রথম রোজগারের তিন রুব্‌লগুলি যথাযথ উপায়ে খরচ করতে লাগলাম। টাকাগুলি আমরা খরচ করলাম যেমন যৌথভাবে — গুমটি ও ভালকার সঙ্গে মিলে, তেমনি আলাদা আলাদা করেও — আমি আর জাভা দুজনে মিলে।

ঐ 'শুটিং-এর দিনের' পর আমার আর জাভার যেন পুনর্জন্ম হল — আমরা চলাফেরা করতাম স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো, আমরা যেন মশগুল হয়ে থাকতাম কী এক ভাবনায়, আমরা যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন।

বড় মঠের ধারে ঘন ঝোপঝাড়ের ভেতরে মনকাড়া খেলাধুলায় আমাদের আর আগ্রহ নেই (গুমটি তার সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দেয়। দেখা গেল তারা মোটেই অনিষ্টকর প্রকৃতির নয়, রোজ রোজ তারা একটা না একটা মজার খেলা খেলত)। ভালকা আর তার বান্ধবীদের সঙ্গে নির্জন ভ্রমণেও আমরা আগ্রহ বোধ করতাম না।

তিন রুব্‌ল করে হাতে আসায় 'আমুদে শহরের' পথ এখন আমাদের কাছে প্রশস্ত হয়ে এলেও সেখানকার অসংখ্য আনন্দের জিনিস এখন আর আমাদের আনন্দ দেয় না।

আমাদের হৃদয় এখন অন্য জিনিসের জন্য, সম্পূর্ণ অন্য জিনিসের জন্য কাতর।

উইংস, মঞ্চসজ্জা, মেক-আপ, গোঁফদাড়ি সাঁটা, পাদপ্রদীপের আলো, ফ্লাড লাইট, শুটিং-এর যন্ত্রপাতি আর... করতালিধ্বনি... করতালিধ্বনি আর করতালিধ্বনি (ওঃ, বড় আফশোসের কথা যে শুটিং-এ হাততালি পড়ে না!) — আমরা অধীর আগ্রহে, ভীষণভাবে চাইছিলাম এগুলি।

আমরা যখন রাস্তায় বেরোতাম তখন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম ফিল্‌ম

স্টুডিওর অ্যাসিস্টেণ্ট আমাদের নিতে আসছেন কিনা। কোন শ্যুটিং, এমন কি ফের শ্যুটিংও আর আমাদের জন্য ছিল না।

কিছুই না থাকায় আমরা চলতে শুরু করতাম, অনেকক্ষণ ধরে শহরে হাঁটাহাঁটি করতাম, থিয়েটার-হলের সামনে এসে দাঁড়াতাম, আলোঝলমলে বিজ্ঞাপনগুলি দেখতাম আর দীর্ঘশ্বাস ফেলতাম।

তারপর আবার চলতে থাকতাম আর শোকেদুঃখে আমাদের তিন রুব্‌ল সোডাওয়াটার ও সিরাপ পান করে ওড়াতে লাগলাম।

অবশেষে একদিন 'গণমৈত্রী' বুলভারে 'ফলের রস ও পানীয়'-র দোকানে বসে আমরা যখন বেশ জুতসই এক গেলাস করে লেমনেড পান করছিলাম সেই সময় আমরা... অবশ্য সেটা ছিল জাভারই আইডিয়া। সমস্ত বড় বড় ঘটনার মতো এটাও ছিল নেহাৎই সহজসরল, অথচ আশ্চর্য এই যে এর আগে তা আমাদের মাথায় খেলে নি। থিয়েটার সংগঠন করতে হবে!.. ভাসিউকোভ্‌কায় নিজেদের, নিজস্ব থিয়েটার! যে সব নাট্যচক্র কোন উৎসব উপলক্ষে একটা আজেবাজে নাট্যপরিবেশনার পর শেষকালে ভেঙে যায় এটা তেমন হবে না। মোটেই তেমন হবে না! এ হবে থিয়েটার! খাঁটি থিয়েটার, স্থায়ী থিয়েটার, যার থাকবে সমৃদ্ধ কর্মসূচি... থাকবে প্রতীকচিহ্ন (মস্কো আর্ট থিয়েটারের আছে সিন্ধুচিল, আমাদের হতে পারে পাতিহাঁস, বুনো হাঁস কিংবা অন্তত পক্ষে সারস)। সেখানে থাকবে ক্লোকরুমের রক্ষক (সালিভোন দাদু এই পদের যোগ্য প্রার্থী!), আর টিকিট হবে প্রথম সারির জন্য এক রুব্‌ল থেকে গ্যালারির জন্য বিশ কোপেক অবধি। এটা করতেই হবে! বিনিপয়সায় নাটক দেখায় কেবল এলেবেলেরা। এক কথায়, সত্যিকারের আর্ট থিয়েটার। তা নয়ত কী? গাঁয়ের আর্ট গ্যালারি হতে পারে, আর্ট থিয়েটার নয় কেন?

কিয়েভে আমাদের আর কিছু করার ছিল না। যদিও অন্তত আরও একটা সপ্তাহ আমাদের থাকার কথা ছিল, তবু ঐ দিনই আমরা এই বলে গাওনা শুরু করে দিলাম যে বাড়ির জন্য মন বড় খারাপ লাগছে, কাকীমাকে বলে কয়ে টিকিট আনতে রাজী করালাম, তারপর যাত্রার আয়োজন শুরু করলাম।

জন্মস্থান ভাসিউকোভ্‌কায় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল মহৎ কর্ম।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

জাভা স্তানিস্লাভ্স্কি ও পাভেল নেমিরভিচ্-দানচেঙ্কোর অপমৃত্যু। তবুও আমরা জীবিত!

আমরা এখন চিত হয়ে ঘাসের ভেতরে শুয়ে আছি, আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। সেখানে তারাগুলি আমাদের দিকে ব্যঙ্গভরে চোখ টিপছে। আমরা কষ্ট ভোগ করছি। এই আর্ট থিয়েটারের ব্যাপারটা আমাদের মাথায় খেলল কী বলে!

এখন এই লজ্জার পর লোকের সামনে মুখ দেখাব কী করে! কী করে তাকাব তাদের চোখে চোখে!

আর এটাই ত প্রথম নয়। আগে থেকেই এর সঙ্কেত পাওয়া গিয়েছিল! অনেক আগে থেকেই দুর্ভাগ্য আমাদের দিকে গুড়ি মেরে আসছিল।

ব্যাপারটা আমরা প্রথমে টের পেলাম সেই সময় যখন আমাদের ক্লাবে কিয়েভের দভ্জেঙ্কো ফিল্ম-স্টুডিওর সদ্যমুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'আর্তেম' দেখান হল।

এই ফিল্মে বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন শিশুদের প্রধান ভূমিকায় যে আমরা দুই অভিনেতা আছি এ সংবাদ বহুকাল হল আমাদের গাঁয়ের লোকজনের জানা আছে; কেবল তা-ই নয়, আশেপাশের তিনটি গ্রামের — পেস্কি, ইয়াব্লনেভকা ও দেদোভ্শিচনারও কারও জানতে বাকি নেই... তাই ফিল্ম যখন প্রথম আমাদের গাঁয়ে দেখানো হয় তখন দেদোভ্শিচনা, ইয়াব্লনেভকা ও পেস্কি থেকে আমাদের অধীর আগ্রহী আত্মীয়স্বজনরা ঘোড়ার টানা গাড়ি, মোটরসাইকেল ও বাইসাইকেলে চড়ে সেই সন্ধ্যায় ভিড় করে এসে হাজির হল ভাসিউকোভ্কায়। আত্মীয়স্বজনের ভিড়ে ক্লাবঘরে তিলধারণের ঠাঁই ছিল না।

আমি আর জাভা সাদা জামা আর নতুন মসমসে জুতো পরে যৌথখামারের সভাপতি ইভান ইভানভিচ ও ক্লাবের পরিচালক আন্দ্রেই কেকালোর পাশে প্রথম সারিতে বসলাম। ক্লাবঘরের দরজার ওপর ইতিমধ্যে তিন দিন ধরে যে পোস্টারটা ঝুলছিল তাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল যে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর অন্তে 'ছবিতে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার' অনুষ্ঠিত হবে। আমরা তিন দিন ফুটবল

খেলতে পারলাম না — সাক্ষাৎকারের খসড়া লিখলাম. আমরা উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম।

অবশেষে সিনেমার রীল ঘুরতে লাগল। আমরা সামনের দিকে গলা বাড়িয়ে দিয়ে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলাম।

রীল ঘুরছে ত ঘুরছেই।

ছবির অর্ধেক রীল ঘুরে শেষ হয়ে গেল, অথচ আমাদের দেখা নেই।

হঠাৎ আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম যখন দেখতে পেলাম যে আমাদের পরিচিত মিলিটারী পুলিশ ওলেগ ইভানভিচ বিপ্লবীদের হাতে খুন হল। আমরা হিম হয়ে গেলাম... এটা কেমন হল? লোকটা যদি মরেই যায়, তাহলে আর কী করে পুলের ওপরে আর্তেমকে ধরবে? এখন আমাদের কী অবস্থা হবে?

আমরা আঁতকে উঠে কাঁপতে কাঁপতে দুহাতে চেয়ার চেপে ধরে পর্দার দিকে তাকালাম। আমাদের তখনও আশা ছিল হয়ত কোন এক অলৌকিক উপায়ে মিলিটারী পুলিশটি বেঁচে উঠবে (সিনেমায় কী না হয়!)। কিন্তু অলৌকিক কিছুই ঘটল না। মিলিটারী পুলিশ জীবন ফিরে পেল না। ফিল্মে না ছিল নদী, না পুল, না ধপাস, ঝপাং, ঝপ্, না বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন গরীব শিশুরা... যে দৃশ্যে আমরা ছিলাম তার অস্তিত্ব ছিল না... একেবারেই ছিল না।

আর অবশেষে হল্-ঘরে যখন আলো জ্বলে উঠল তখন, আমরা, হতভাগ্য আমরা করুণ অবস্থায় বসে রইলাম সাদা জামা আর মসমসে নতুন জুতো পরে। কিন্তু আমাদের আত্মীয়স্বজনরা ছিলেন ভালোমানুষ, উদার, সদাশয়। তাঁরা আমাদের উপহাস করলেন না, দুয়ো দিলেন না, বরং সান্ত্বনা দিলেন আমাদের।

'ও কিছু নয়, ও কিছু নয়... হয়ত এদের এমন একটা কিছু ব্যাপার ঘটেছে যার ফলে...' দেদোভ্শিচনা থেকে আমার জ্ঞাতিসম্পর্কের যে কাকা এসেছিলেন তিনি বললেন।

'সম্ভবত কোন টেকনিক্যাল কারণে এটা হয়েছে। কোন কারণে হয়ত বরবাদ হয়ে গেছে... শুটিং-এর সময় কী হাঙ্গামাটাই না হয়েছিল — সে ত তোমরা নিজেরাই বলেছ,' বলল দূর সম্পর্কের খুড়তুত ভাই যে এসেছিল ইয়াব্লনেভকা থেকে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ... ফিল্ম হয়ত আলো লেগে নষ্ট হয়ে গেছে কিংবা ঐরকম কিছু

হবে... সবই সম্ভব,' সায় দিয়ে বললেন বহু দূর সম্পর্কের পিসিমা। তিনি এসেছিলেন পেস্কি থেকে।

একমাত্র ক্লাবের পরিচালক আন্দ্রেই কেকালোই আমাদের দিকে তাকালেন আড়চোখে — আমরা তাঁর সাংস্কৃতিক কর্মসূচির এক নম্বর পরিকল্পনাটা ভেস্তে দিয়েছি কিনা।

আত্মীয়স্বজনরা ঠিকই আন্দাজ করেছিলেন। কয়েক দিন বাদে কিয়েভ থেকে ভালকার চিঠি পাওয়া গেল। চিঠিতে সে লিখেছে যে পরিচালক ইয়েভ্গেনি মিখাইলভিচ আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছেন এবং রীতিমতো ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন এই জন্য যে দুর্ভাগ্যবশত পুলের দৃশ্যটি কেটে বাদ দিতে হয়েছে যেহেতু ওটাকে সংযোজন করা সম্ভব হয় নি (অথচ মোটের ওপর, হয়েছিল খাসা। সাহায্যের জন্য উনি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা জানান, আর কেটে বাদ দেবার সময় স্রেফ কেঁদেই ফেলেন — এটা ওঁর নিজের মুখের কথা)।

চলচ্চিত্রশিল্পে এমনই শোচনীয় হাল হল আমাদের।

মনে হতে পারে খুঁতখুঁতে অভিনয়শিল্পের দিক থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কেত আমাদের সতর্ক করে দেবার পক্ষে, বিপদ সম্পর্কে সাবধান করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আমরা ছিলাম চপলমতি, নির্লজ্জ, বেহায়া, তাই সেদিকে আমরা মনোযোগ দিলাম না। ফলে যা হবার তা-ই হল! এখন শুয়ে শুয়ে কাঁদ, মাটি কামড়াও, আর ফালি চাঁদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নেকড়ের মতো হাউমাউ কর।

আমাদের ব্যক্তিগত ব্যর্থতার জন্য, ব্যক্তিগত লজ্জা ও অপমানের জন্য বেদনা ও তিক্ততা আমাদের ততটা নয়। আমাদের ব্যক্তিগত দুঃখ ও যন্ত্রণা — সে ত সামান্য ব্যাপার! কত বারই না আমরা দুঃখ ভোগ করেছি, এবারেও না হয় ভোগ করলাম!

সবচেয়ে বড় কথা, যা আমাদের বড় বেশি দুঃখ, বড় বেশি কষ্ট দেয় তা হল এই যে আমরা আচরণ করেছি উস্কানিদাতার মতো, বিশ্বাসঘাতকের মতো, নীচাশয়, হতভাগ্য স্ট্রাইকব্রেকারের মতো। আমরা যে গোটা অভিনয়টাকেই ভেস্তে দিয়েছি, সবাইকে ডুবিয়েছি। আমাদের আর্ট থিয়েটারের গোটা দলবলের বেশ কয়েক মাসের কাজ আমরা আবর্জনাস্তূপে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম।

বিবেকের দিক থেকে পাপকর্ম আমরা অনেকই করেছি। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা আমরা কদাপি করি নি। বিশ্বাসঘাতকদের প্রতি আমাদের নিজেদেরই সর্বদা ছিল প্রবল ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা। আর এখন কিনা...

'ওঃ হতভাগা ইতর, নোংরাগুলো, তোদের লজ্জাও করে না!' দাঁতে দাঁত চেপে আমাদের গালাগাল করল জাভা।

'জঘন্য হতচ্ছাড়া পাজীগুলোর বড় বাড় বেড়েছে!' আমি দাঁতে দাঁত চেপে গালাগাল করি আমাদের।

'তোরা হলি কতকগুলি বাক্সপেটরা, বেহেড, অভিনেতা না আরও কিছু!'

'ছালচামড়া ছাড়ানো রামপাখি...'

কথা না জেনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেড়ার মতো ব্যা-ব্যা করাটা অবশ্যই লজ্জার ব্যাপার ছিল। কিন্তু আমাদের উচিত ছিল মঞ্চে দাঁড়িয়ে থেকে যে করেই হোক জট ছাড়ানো।

হুঁ তা ঠিক, শেষ অবধি সাহস সঞ্চয় করে প্রম্পটারের কাছ থেকে জেনে নেওয়া উচিত ছিল এর পরে কী বলতে হবে। লোকে হয়ত একটু আধটু হাসত, কিন্তু নাটক ঠিকই চলত। তা নয় ত...

এখন ক্লাবে কী হচ্ছে তা ভাবতেই আমাদের ভয় হচ্ছে... সম্ভবত গালিনা সিদরভনা মঞ্চে বেরিয়ে এসে মিনমিন করে বলেছেন যে অভিনয় স্থগিত রাখতে হল, যেহেতু সকলেই দেখেছে কী ভাবে বব্‌চিনস্কি ও দব্‌চিনস্কি রণে ভঙ্গ দিয়েছে! হলসুদ্ধ লোকজন বিক্ষুব্ধ হয়ে গুঞ্জন তুলছে। আমাদের উদ্দেশে কতই না শাপ-শাপান্ত চলছে! আমাদের নিজেদের মায়েরা পর্যন্ত এই মুহূর্তে আমাদের ত্যাগ করেছেন। এখন কী উপায়? এই বিপদের সময় কী কর্তব্য? আমাদের নিরুপায় অবস্থা থেকে উদ্ধারলাভের উপায় কী?

কোন উপায় নেই।

এই পুল থেকে লাফিয়ে পড়ে জলে ডুবে মরব নাকি?

আমাদের জন্য কেউ আক্ষেপ করতে যাবে না। লোকে বলবে: ওদের অমনই হওয়া উচিত — ইতর স্ট্রাইকব্রেকার! উপায় নেই! কোন উপায় নেই।

পরের দিন আমরা জানতে পারি যে নিজেদের আমরা অতিরিক্ত বড় করে দেখেছি, জীবনে নিজেদের ভূমিকায় বড় বেশি মূল্য দিয়েছি। আমরা জানতে পারি যে অভিনয় মোটেই বানচাল হয় নি, আমরা পলায়ন করার পর নগরপাল বিভ্রান্ত না হয়ে বলে: 'আমি আগেই জানতাম যে এই অকেজো দুই ভীতু বব্‌চিনস্কি দব্‌চিনস্কি ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে। ভালো বলতে হবে যে এর আগে রাস্তায় ওদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়, আর তখন ওরা সব কথা আমাকে বলে...' এর পর আমার আর জাভার যা যা বলার ছিল প্রত্যুৎপন্নমতি কারাফোলকা আশ্চর্য ভঙ্গিতে সকলকে তা বলে। অভিনয়ে কোন ব্যাঘাত ঘটল না। অভিনেতারা ঘটনার গতির সঙ্গে নিজেদের দিব্যি খাপ খাইয়ে নিল, আমাদের বক্তব্য ওদেরই কেউ কেউ প্রকাশ করল। দর্শকেরা কিছু লক্ষ পর্যন্ত করতে পারল না। এমনভাবে অভিনয় হল যেন বব্‌চিনস্কি-দব্‌চিনস্কিকে ছাড়াই গোগল 'ইনস্পেক্টর জেনারেল' লিখেছেন। অসাধারণ সাফল্যের সঙ্গে নাটক অভিনীত হল। লোকে এমন হাততালি দিল যে বাইরে থেকে এখানে এসে সত্যিকারের যে-সমস্ত অভিনেতা অভিনয় করে গেছেন তাঁদেরও তারা কখনও এমন করতালিধ্বনিতে অভিনন্দন জানায় নি... আর শান্তশিষ্ট গোবেচারী যে কোলিয়া কাগারলিৎস্কি, যাকে তার প্যাড়াপড়শীরাও সবাই জানত না, সে ত খ্লেস্তাকভের ভূমিকায় অভিনয় করে রাতারাতি সারা গাঁয়ে বিখ্যাত হয়ে পড়ল। এমনই বিখ্যাত হয়ে পড়ল যে আরেকটু হতে পারলে বুঝি গাঁয়ের কোন রাস্তারই নামকরণ হয়ে যেত তার নামে। আর তখনই হঠাৎ আমাদের চৈতন্য হল যে সাফল্য লাভ করতে গেলে সর্বোপরি অনেক অনেক দিন ধরে একাগ্র পরিশ্রম করতে হয়, যেমন পরিশ্রম করেছিল কোলিয়া কাগারলিৎস্কি। এই প্রাচীন অথচ সুপরিচিত সত্যটি কতবারই না আমাদের সারা জীবনে বারবার বলেছেন, আমাদের মাথায় ঢোকানোর চেষ্টা করেছেন, বোঝাতে চেয়েছেন আমাদের মা-বাবা, শিক্ষক-শিক্ষিকা আর শিশুসাহিত্যিকরা; কিন্তু ব্যাপারটাকে আমরা হালকাভাবে নিয়ে নিজেদের এই বলে বুঝ দিয়েছি: 'আরে, এ হল গবেটদের জন্যে, যাদের কোন এলেম নেই তাদের জন্যে!' আজ কিন্তু এই প্রাচীন সত্যটিই অকস্মাৎ আমাদের কাছে এসে পৌঁছুল। পৌঁছুল হৃদয়ের গহন প্রদেশে। এলো এমনভাবে যেমনভাবে আসে অঙ্কের নিয়ম: এক নিমেষে সব পরিষ্কার। এই সত্য যে কত অকরুণ তা নিয়ে আমরা অনেকক্ষণ ধরে বিষণ্ণমনে

ভাবনা-চিন্তা করতে থাকি। কিন্তু সে হল পরের দিনের কথা। পরের দিনের ঘটনা!..

আজ কিন্তু আমরা এসবের কিছুই জানি না। আমরা চিত হয়ে ঘাসের ভেতরে শুয়ে শুয়ে মৃদুস্বরে কাতরাই।

আকাশে তারা খসে পড়ল।

ভাবনাচিন্তাহীন একটা বুলবুল প্রেমে বিভোর হয়ে ঝোপের ভেতরে ডেকে উঠল। কিছু দূরে শুয়োরের খোঁয়াড়ে ঘুমকাতর এক শুয়োর সুখাবেশে ঘোঁতঘোঁত করে উঠল নিজের শূকর জীবনের কোন এক গভীর পরিতৃপ্তির কথা স্মরণ করে।

দূরে, দেদোভ্শিচনায় কোথায় যেন তীব্র হাঁকডাক ছাড়ে কুকুরের দল।

কচি, তাজা ঘাসপাতার গন্ধ, মধুভরা ফুল আর গাভীদের ঘ্রাণ।

অপূর্ব, অনুপম পার্থিব জীবনের জয়-জয়কার, প্রত্যূষের পূর্বমুহূর্তে প্রশস্ত বিশ্বচরাচরের বুকে চলেছে তার জয়যাত্রা।

হঠাৎ জাভা লাফিয়ে উঠে বসে, দুহাতে হাঁটু জড়িয়ে ধরে হাঁটুর মধ্যে থুতনি গোঁজে। তার চোখজোড়ায় ঝলক খেলতে থাকে।

'আমাদের দ্বারা আর আর্টিস্ট হওয়া চলবে না — এতে কোন সন্দেহ নেই!' জাভা দৃঢ়স্বরে বলল। 'আমি নিজেই এখন মরে গেলেও আর্টিস্ট হতে চাই না। আমাকে দিনে একশ' রুব্ল করে দিলেও নয়। এমন নার্ভ-আলগা-করা কাজ আমার পোষাবে না। ব্যর্থ হওয়া... মনোকষ্ট ভোগ করা... স্বাস্থ্যের পক্ষে বড় ক্ষতিকর। জানিস পাভ্লো, একটা আইডিয়া আমার মাথায় এসেছে...'

'পাভ্লো'? আমি ওর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকালাম। পাভ্লো বলে ও আমাকে কখনও ডাকে না। কিছু একটা ব্যাপার ঘটেছে। নির্ঘাত সিরিয়াস কোন আইডিয়া, নইলে ও আনুষ্ঠানিক নামে আমাকে ডাকছে কেন?

'যদি তা-ই বলতে হয় তাহলে দেনিসভিচটাও যোগ কর না কেন...' আমি ওকে ধরিয়ে দিলাম।

'তা হ্যাঁ, দেনিসভিচও বলা যেতে পারে বৈকি...' কথাগুলো বলার সময় সে হাসল না পর্যন্ত। 'হ্যাঁ, যা বলছিলাম পাভ্লো দেনিসভিচ, গত গ্রীষ্মকালে আমার মনে হয় বেশ কিছু এড্ভেঞ্চার আমরা করেছি। তাই ত? আচ্ছা, এই এড্ভেঞ্চারগুলো যদি আমরা না করে আর কেউ করত এবং সেই আর কেউ

যদি আপনাকে তার গল্প করত, তাহলে ইন্টারেস্টিং হত ত? তাই না? তাহলে শুনুন আমার আইডিয়াটা: আসুন আমরা বসে বসে আমাদের এড্‌ভেঞ্চারের বিবরণ লিখি... বই লিখব, গাদা গাদা টাকা রোজগার হবে, ভূপ্রদক্ষিণ করে বেড়াব। সেই ভ্রমণের উপকরণের ভিত্তিতে লিখব আবার নতুন বই, ফের গাদা গাদা টাকা পাব, ফের কোথাও পাড়ি জমাব। এই ভাবে চলতে থাকবে... আমরা লেখক হব... এটা কি খারাপ নাকি? লেখক... আমি আর তুই — আমরা হব লেখক। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অটোগ্রাফ দেব... কারাফোলকাকে, কোলিয়া কাগারলিংস্কিকে, গ্রেবেনিউচকাকে... চমৎকার! কী বলিস? আচ্ছা এটা আমরা আগে ভাবি নি কেন? লেখক... এটা ভাই আর্টিস্ট হওয়া নয়, আর্টিস্ট থাকে হাজার হাজার, কিন্তু লেখক — গোটা কয়েক। তুইই বল্ না দেখি কজন লেখককে তুই জানিস? এই ধর না কেন পুশ্‌কিন... শেভচেঙ্কো, গ্লেবভ, ক্‌ভিতকা-অস্নোভিয়ানেঙ্কো, কত্‌লিয়ারেভস্কি... তলস্তয়, গোর্কি, চেখভ... এরা হলেন গিয়ে ক্লাসিক। আর আধুনিকদের মধ্যে? ধর না কেন, গাইদার, চুকোভ্‌স্কি, মিখালকভ... জাবিলা, বীচ্‌কো, কাভা... বলিজ্‌নেৎস... ব্যস্ আর কে? আরে ভাই, লেখকরা সব এমনই লোক... হ্যাঁ, প্রসঙ্গত বলতে হয় ছেলেবেলায় তাঁরা ছিলেন নেহাৎই সাধারণ লোক, অনেকটা আমাদের মতো, আর গোর্কির পায়ে ত জুতো-টুতোরও কোন বালাই ছিল না...'

আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে জাভার দিকে তাকাই আর তার কথা শুনি। ওঃ জাভা! কী দারুণ ছোকরা! যাই বল না কেন, বুদ্ধিমান ছেলে! এমন বুদ্ধিমান বন্ধু পাওয়া বড় ভাগ্যের ব্যাপার!

'আর সবচেয়ে বড় কথা, কোন ঝুঁকি নেই,' বলে চলল বুদ্ধিমান জাভা। 'ব্যর্থতার কোন প্রশ্ন ওঠে না। নেহাৎ তেমন হলে সংশোধনের জন্যে ফেরত আসবে। যেমন ফেরত আসে আন্দ্রেই কেকালোর কাছে।'

আমাদের গাঁয়ের কবি, ক্লাবের পরিচালক আন্দ্রেই কেকালো আজ কত বছর হলই না এখানে ওখানে, ইউক্রেনের যাবতীয় প্রজাতান্ত্রিক, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পত্রপত্রিকায় স্বরচিত কবিতা পাঠিয়ে আসছেন! তাঁর মতো এত চিঠি আমাদের গাঁয়ে আর কেউ পায় না।

তাঁকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে: 'কেমন চলছে কাব্যচর্চা?' — উত্তরে তিনি সগর্বে বলেন: 'সংশোধনের জন্যে ফেরত এসেছে।'

তিনি সংশোধন করেন, সমানেই সংশোধন করেন, তারপর দেখা যায় হঠাৎ কোন এক স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

'হ্যাঁ, তা ঠিক তা ঠিক,' আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম। 'সংশোধন ত সংশোধন! এ আর এমন একটা কী ব্যাপার! সবাই সংশোধন করে থাকে। এটা মারাত্মক কিছু নয়।'

আমরা তৎক্ষণাৎ জাভার আইডিয়া নিয়ে আলোচনায় নেমে পড়ি।

লিখব কী করে?

খুবই সহজ — হাতে। যেমন লিখেছেন পুশ্‌কিন, শেভচেঙ্কো। কোন কোন লেখক এখন টাইপরাইটারে লেখেন। আমরা তা করব না। প্রথমত, আমাদের যা জ্ঞান তাতে এক পৃষ্ঠার পেছনে তিন দিন নাকানি-চুবানি খেতে হবে। দ্বিতীয়ত, গ্রাম সোভিয়েতের টাইপরাইটারে কেই বা আমাদের টকাটক করতে দেবে? অবশ্য কেকালোর নিজেরও টাইপরাইটার আছে, কিন্তু তিনি ত আর প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিজের টাইপরাইটার দিতে যাবেন না। নিজেই রোজ টকাটক করেন।

কোন্ রীতিতে লিখব?

গদ্যে... একমাত্র গদ্যে। কবিতা-টবিতা নয়। যেমন যেমন ঘটেছে হুবহু সেই রকম। কোন গুলবাজী চলবে না। তবে হ্যাঁ, শিল্পের খাতিরে যে-সব বিশদ বিবরণ দরকার সেগুলোর কথা বাদ দেব না। আর লিখব আমরা উত্তম পুরুষে, তাতে সব সময়ই বিষয়টা অনেক বিশ্বাসযোগ্য হয়। তাছাড়া নিজেদের 'তারা' বলে উল্লেখ করাটাও হাস্যকর। আমরা — আমরাই। তবে আগাগোড়া 'আমরা' 'আমরা' বলে লেখাটাও যেন কেমন... তাহলে আমাদের দুজনের আলাদা আলাদা করে কিছুই করার থাকবে না। হাঁচা যাবে না, গা চুলকানো যাবে না, নাক খোঁটাও যাবে না। লিখতে হবে 'আমরা হাঁচলাম', 'আমরা গা চুলকালাম', 'আমরা নাক খুঁটলাম...' স্রেফ বোকামি! আমার যদি হাঁচি না পায় বা চুলকোতে ইচ্ছে না করে, তাহলে আমি হাঁচতে বা চুলকোতে যাব কেন? নেহাৎ সঙ্গদানের খাতিরে। না, ব্যাপারটা মোটেই শিল্পরীতি অনুযায়ী হবে না।

অনেক ভাবনা-চিন্তার পর আমরা ঠিক করলাম যে দুজনে মিলে লিখব বটে, তবে লিখব একজনেরই জবানীতে। আর অন্য জনের উল্লেখ করব তার নামে। প্রথম খণ্ড লিখবে কেবল 'আমি', দ্বিতীয় খণ্ড — অন্যজন।

প্রথম 'আমি' কে হবে? ঠিক করার জন্য আমরা দান ফেললাম। আমার ভাগ্যে পড়ল। জাভার মুখ কালো হয়ে গেল। তার বড় ইচ্ছে ছিল প্রথম 'আমি' হয়: আইডিয়াটা ত ছিল ওরই, তাছাড়া মোটের ওপর ওর বরাবরেরই অভ্যাস মাতব্বরি করা। ওর হয়ত ভরসা ছিল আমার উদারতার ওপর, বোধ হয় ভেবেছিল আমি প্রস্তাব দেব: 'জাভা তুইই প্রথম হ।' কিন্তু আমি সে রকম কোন প্রস্তাব দিলাম না। এবারে উদারতা দেখানোর কোন ইচ্ছে আমার ছিল না, আমার ইচ্ছে হচ্ছিল 'আমি' হওয়ার, তাছাড়া দানে ত ন্যায়সঙ্গতভাবেই আমার নাম উঠেছে। আমি ত আর কারচুপি করি নি। জাভা অবশ্য তর্ক করল না।

'নামটা কী হবে জানিস?' জাভা বলল। 'নাম হবে 'তেরো নম্বর ফ্ল্যাটের অচেনা লোকটি অথবা ঘড়ি নিয়ে ঘোরাঘুরি'। খাসা? — কী বলিস? আর তার নীচে ছোট করে লেখা থাকবে 'এড্‌ভেঞ্চার কাহিনী'। পাঠকরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে কিনবে।'

'খাসা,' আমি বললাম। যদিও নামটা আমার একোরেই পছন্দ হয় নি। বড় বেশি ডিটেকটিভ-ডিটেকটিভ, সিরিয়াস নয়। আমার ইচ্ছে ছিল রোমাণ্টিক ধরনের, উদাত্ত গোছের কিছু হয়। কিন্তু জাভা বিশেষ করে যখন আর 'আমি' হতে পারল না তখন তার দেওয়া নাম বদল করতে যাওয়াটা খুবই খারাপ দেখায়।

অতএব 'তেরো নম্বর ফ্ল্যাটের অচেনা লোকটি অথবা ঘড়ি নিয়ে ঘোরাঘুরি। এড্‌ভেঞ্চার কাহিনী' — এই নামই রাখতে হল।

আমরা বইয়ের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা শুরু করলাম। তার মানে, বইটা হবে এই রকম। শুরু হবে আমাদের কিয়েভে আগমন থেকে। লিখব পাতাল রেল-এ টবসংক্রান্ত ঘটনা, জাভার কানের কথা আর গুমটি সম্পর্কে। তারপর স্নানের ঘাট, তেরো নম্বর ফ্ল্যাটের অচেনা লোকটি, ঘড়ি আর জলে ডোবা লোকটির কাহিনী... এক কথায়, যা যা আমাদের জীবনে ঘটেছিল তার কোনটাই বাদ যাবে না। আর শেষ হবে 'ইনস্পেক্টর জেনারেল'-এ আমাদের ব্যর্থতা দিয়ে। খোলাখুলি কথা! লেখককে সর্বোপরি হতে হবে খোলাখুলি।

আমরা মাটি থেকে উঠে পড়ে কাঁধ সোজা করে নিই। আমাদের মনে হল আমাদের মাথা যেন একেবারে আকাশে গিয়ে ঠেকছে। জাভা তার একটা কান দিয়ে একটা তারা পর্যন্ত খসিয়ে দিল — তারাটা দেখতে দেখতে গড়িয়ে পড়ে গেল...

ব্যস্‌ — আর কী?

কাল আমরা গাঁয়ের দোকানে গিয়ে বড় দেখে একটা লাইনটানা এক্সারসাইজ বুক কিনব আর কিনব তিনটে পেন (একটা বাড়তি থাকবে!), এর পর বসে বসে লেখা।

লেখা, লেখা আর লেখা।

তারপর পাঠানো।

তারপর সংশোধন, সংশোধন আর সংশোধন।

তারপর ফের পাঠাও।

আর কী?

দেখ না কী হয়!

আমরা সবাইকে দেখিয়ে দেব আমাদের ক্ষমতা!

দাঁড়াও না!

জাভা আর পাভেলকে তোমাদের এখনও দেখা বাকি আছে!

* * *

আর তারপর, যা-ই বল না কেন আমি পাইলট হবই হব!

টীকা-টিপ্পনী

আজব এড্ভেঞ্চার

পৃঃ ১২১

মরাল সরোবর — ঊনবিংশ শতাব্দীর রুশ মহাসুরকার পিওতর চাইকোভ্স্কির (১৮৪০-১৮৯৩) ব্যালে।

ঘড়ি নিয়ে ঘোরাঘুরি

পৃঃ ১৬৭

মস্কো আর্ট থিয়েটার — গোর্কি নামাঙ্কিত মস্কো আর্ট থিয়েটার। বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী স্তানিস্লাভ্স্কি ও নেমিরভিচ্-দানচেঙ্কো ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা।

পৃঃ ২০১

মাগডেবুর্গীয় অধিকার — আত্মনিয়ন্ত্রণের ও নিজস্ব বিচার ব্যবস্থার সামন্ততান্ত্রিক নাগরিক অধিকার, ভূসম্পত্তির অধিকার এবং অধিকাংশ সামন্ততান্ত্রিক বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি।

পৃঃ ২৪৩

কোচুবেই — ভ. ল. কোচুবেই (১৬৪০-১৭০৮) — ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রকর্মী ও সমরনেতা। রাশিয়া থেকে ইউক্রেনকে বিচ্ছিন্নকরণের উদ্দেশ্যে সুইডেনের রাজা দ্বাদশ কার্ল ও পোল্যান্ডের রাজা স. লেশ্চিন্স্কির সঙ্গে সর্বাধিনায়ক মাজেপা-র সঙ্গে যে গোপন আলোচনা হয় তা জানতে পেরে বিশ্বাসঘাতক চক্রান্ত সম্পর্কে তিনি রাশিয়ার জার প্রথম পিটারকে একাধিকবার সতর্ক করে দেন। কিন্তু জার সর্বাধিনায়ককে বিশ্বাস করেন, কোচুবেই-এর এই তথ্যকে তিনি কুৎসারটনা বলে বিবেচনা করেন। কোচুবেই ও তাঁর সমমতাবলম্বী কর্ণেল ইস্ক্রা পালিয়ে রাশিয়ায় চলে এলে জার তাঁদের মাজেপা-র হাতে তুলে দেন। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তাঁদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে অবশেষে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। মাজেপা-র বিশ্বাসঘাতকতা পরে যখন প্রকাশ পায় তখন কোচুবেই ও ইস্ক্রাকে কিয়েভো-পেচের্স্কের বড় মঠে সমাধিস্থ করা হয়।

উশিন্স্কি ক. দ. (১৮২৪-১৮৮০) — বিখ্যাত রুশ শিক্ষাব্রতী।

ইউরি দলগোরুকি (আনুঃ ১০৯০-১১৫৭) — রুশ প্রিন্স। প্রাচীন ঘটনাপঞ্জীতে মস্কোর (১১৪৭ সাল) প্রথম উল্লেখ ও মস্কোর নগরকেল্লা গঠনের (১১৫৬ সাল) ঘটনা তাঁরই নামের সঙ্গে যুক্ত।

পৃঃ ২৫৪

পাভেল কাদোচ্নিকভ, নিকোলাই রিব্নিকভ, আলেক্সেই বাতালভ, ইন্নোকেন্তি স্মক্তুনোভ্স্কি, সের্গেই ফিলিপ্পভ — জনপ্রিয় সোভিয়েত চলচ্চিত্রশিল্পী।

পৃঃ ৩৪৭

দভ্জেঙ্কো আ. প. (১৮৯৪-১৯৫৬) — ইউক্রেনীয় সোভিয়েত চলচ্চিত্র পরিচালক, লেখক, চলচ্চিত্রনাট্যকার। ১৯৫৮ সালে ব্রাসেল্সের চলচ্চিত্র উৎসবে তাঁর ফিল্ম 'ধরণী' (১৯৩০) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বারোটি ফিল্মের একটি বলে উল্লেখিত হয়।

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জা বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে আমরা বাধিত হব।

আশা করি আপনাদের মাতৃভাষায় অনূদিত রুশ ও সোভিয়েত সাহিত্য আমাদের দেশের জনগণের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে আপনাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক হবে।

আমাদের ঠিকানা:

'রাদুগা' প্রকাশন
১৭, জুবোভ্স্কি বুলভার
মস্কো ১১৯৮৫৯, সোভিয়েত ইউনিয়ন

'Raduga' Publishers
17, Zubovsky Boulevard
Moscow 119859, Soviet Union

ভ্‌সেভলোদ নেস্তাইকো

দুই ইয়ারের যত কাণ্ড

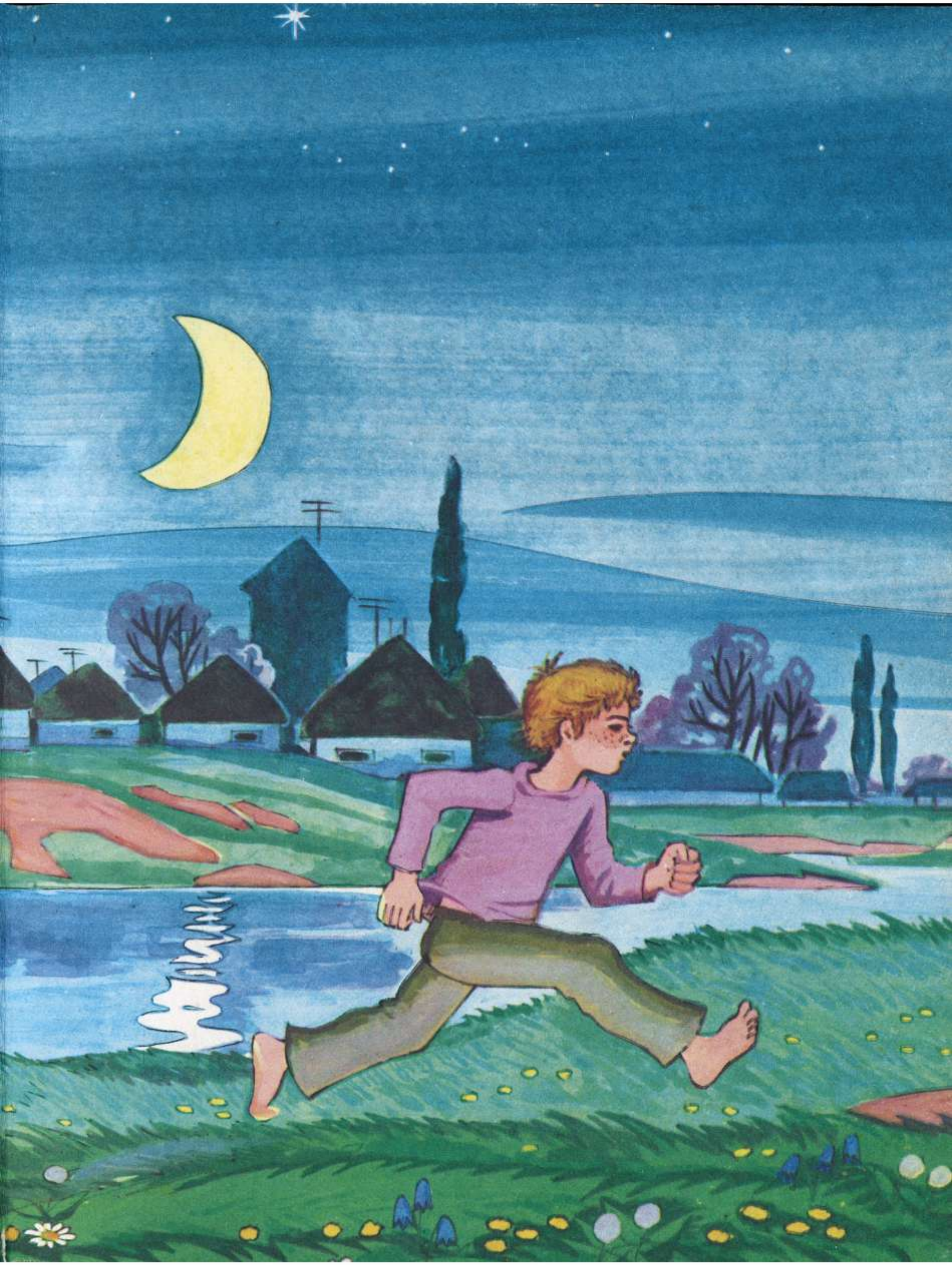

ইউক্রেনীয় শিশুসাহিত্যিক ভ্সেভলোদ নেস্তাইকোর (জন্ম ১৯৩০) লেখা যে উপাখ্যান দুটি পাঠকের দরবারে উপস্থিত করা হল সেগুলি লেখকের হাস্যরসাত্মক উপাখ্যানত্রয়ীর অংশবিশেষ। উপাখ্যানে সহপাঠী দুই বালক পাভেল আর জাভা তাদের ঘটনাবহুল জীবনের কাহিনী বর্ণনা করেছে। এড্ভেঞ্চার ও অভিযান ছাড়া ওদের একদিনও চলে না: প্রথমে ওরা খোঁজে নির্জন দ্বীপ, তারপর খুঁজে বেড়ায় এক অচেনা মানুষকে যার সম্পর্কে তারা কেবল এইটুকুই জানে সে বাস করে তেরো নম্বর ফ্ল্যাটে, পরিশেষে তারা ভেদ করে তিনটি অজ্ঞাত রহস্য — এই হল উপাখ্যানত্রয়ীর মূল বিষয়বস্তু।

'ঘটনাচক্রে কিনা বলতে পারি না,' লেখক কোন এক সময় বলেন, 'আমার সমস্ত বইয়ের প্রায় সবগুলি প্রধান চরিত্রেরই বয়স এগারো-বারোর মধ্যে। আমার এই বই পড়তে পড়তে খুদে পাঠক-পাঠিকাদের মুখে অন্তত একবারও যদি হাসি ফুটে ওঠে, তাহলে আমি মনে করব পৃথিবীতে আমার বাঁচা সার্থক।'

ISBN 5-05-001229-5